ভাষার ইতিহাস

ও

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব

রিডার্স সার্ভিস
৫৯/৫এ, গড়ফা মেন রোড
কলকাতা ৭০০০৭৫

প্রথম প্রকাশ
২০ জুন ১৯৬৫

প্রকাশক
তন্দ্রিতা চন্দ্র (ভাদুড়ী)
রিডার্স সার্ভিস
৫৯/৫এ গড়ফা মেন রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭৫

প্রচ্ছদ
সৈকত ঘোষাল

মুদ্রক
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্‌স প্রাঃ লিঃ
গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০১৩২

❖ উৎসর্গ ❖

ভাষাতত্ত্বের ক্লাশে তর্ক করার সুযোগ দিয়েছিলেন

যে সমস্ত শিক্ষক মহাশয়েরা

তাঁদের চরণকমলে ---

৺ কালীপদ সিংহ

রামেশ্বর শ'

গিরিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

গবেষকরা ক্ষমা করবেন। ছাত্র-ছাত্রী ও পরীক্ষার্থীদের চাহিদার প্রয়োজনে এই 'ভাষার ইতিহাস ও আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ' গ্রন্থ। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় অংশকে একত্রিত করেছি এবং আধুনিক মতামত দেওয়ার চেষ্টা করেছি । যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্ন-উত্তরের একটা মডেল সহজেই পেয়ে যায়। প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাষার জন্ম থেকে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থ, শব্দভাণ্ডার পর্যন্ত বিভিন্ন তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দের বুৎপত্তি ভাষাতাত্ত্বিক টিকা আধুনিক মতামত সহ দেওয়া হয়েছে । তৃতীয় অধ্যায়ে ভাষাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়টি ছাত্র-ছাত্রীদের এস.এস.সি. ও উচ্চ স্তরের পরীক্ষায় যথাযথ কাজে লাগবে। সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তর,সম্মানিক স্তর, স্নাতকোত্তর স্তর, স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা, নেট-স্লেটের পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে এই গ্রন্থ সংকলন করা ।

কিছু কিছু বিষয় যেমন ভাষা সৃষ্টিতে জিনেব প্রভাব, শিশুর ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর , এস. এম. এস. ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তারিত তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ চলছে পরবর্তী সংস্করণে তার বিস্তারিত প্রকাশ থাকবে বলে আশা করি।

আমার অগ্রজ ভাষাতত্ত্ব গ্রন্থ রচয়িতা ও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে আমি একান্তভাবে ঋণী। যথা স্থানে তাঁদের ঋণ স্বীকার করেছি। যাঁদের বক্তব্য ও ভাবনা গ্রহণ করেছি যদি এ ব্যপারে তাঁদের আপত্তি থাকে তাহলে জানাবেন, পরের সংস্করণে সংশোধন করবো । আমার এই প্রয়াসকে অনেকে ঔদ্ধত্য মনে করতে পারেন কিন্তু আমি ছাত্র-ছাত্রীদের আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণ ঘটিয়েছি মাত্র। কিছু ভুল-ক্রটি থাকলে এবং নতুন পরিকল্পনা দানে ইচ্ছা থাকলে চিঠি লিখে অথবা ফোনে জানান, পরবর্তী সংস্করণে তা গুরুত্ব পাবে।

গ্রন্থ প্রকাশে যে সমস্ত গ্রন্থ আমাকে ঋণী করেছে যথাস্থানে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করেছি পরিশেষে। তথ্যসূত্রের সঙ্গে কোথাও হুবহু মিলে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ উল্লিখিত গ্রন্থগুলিই এগ্রন্থ সংকলনের মূল উৎস। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দীর্ঘ দিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোবাসা আমাকে এই কঠিন পরিশ্রমে

উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, উদয়চাঁদ গ্রন্থাগার তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছে। বর্ণসংস্থাপনে তন্ময় দাঁ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। হাতের কাছে বই পৌঁছে দিয়ে শান্তি, মবারক, আল্পনা-কল্পনা ধন্যবাদ আদায় করে নিয়েছে। মুদ্রণে সাধনা প্রেসের কর্মীরা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে কৃতজ্ঞতা আদায় করে নিয়েছে।

বিনীত
রমজান আলি

এত তাড়াতাড়ি বইটা শেষ হয়ে যাবে ভাবতে পারি নি। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিতে হল। কলেজের স্যারেরা কেউ কেউ উৎসাহ দিয়েছেন আবার কেউ কেউ সমালোচনা করছেন। গঠনমূলক সমালোচনা অবশ্যই একটা গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করে। অনেকেই বলেছেন, বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের কথাই বেশি বলা হয়েছে। ভাষার আলোচনায় তাঁদের কৃতিত্বকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে থাকি কি করে ?

এই সংস্করণে অনেকখানিই সংযোজন করেছি। পূর্বের ধারণা কিছু বদলেছে। ভুল-ভাল যা ছিল সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। প্রথম সংস্করণের প্রস্তাব মতো এস.এম.এসের ভাষা সমস্যা ও সমাধানের একটা ইঙ্গিত বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে। অংশটি সাধারণ পাঠকদেরও ভালো লাগবে। এই লেখাটা নিয়ে বিতর্ক হলে আরও সমৃদ্ধি আসতো। নতুন সিলেবাসের দিকে তাকিয়ে সামাজিক উপভাষার প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন-উত্তরের দিকে তাকিয়ে বাক্যতত্ত্বের আলোচনাটা আরও বাড়ানো হয়েছে। এবারও গুণিদের মন্তব্যের জন্য তাকিয়ে থাকবো।

বিনীত
রমজান আলি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাধুভাষা ও চলিতভাষা ঃ

উপভাষা ঃ

সামাজিক উপভাষা ঃ

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা ঃ

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ঃ

বাংলা বাক্যতত্ত্ব ঃ

বাংলা বানান ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষাতাত্ত্বিক টিকা ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

ভাষার ইতিহাস ও আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জিজ্ঞাসা ঃ

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠিজাত ভাষাগুলির বিবর্তনের রেখাচিত্র

প্রথম অধ্যায়

ভাষার কথা

✧ ভাষার উৎপত্তি ✧

ভাষা কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে এ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ চালু আছে। এটা ঠিক যে পৃথিবীতে একমাত্র মানষুই ভাষিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং মানুষই ভাষা ব্যবহারের অধিকারী। হ্যাঁ টিয়া, ময়না, তোতাপাখি কথা বলে, কিংবা শিম্পাঞ্জি আকার ইঙ্গিতসহ মানুষের ভাষা অনেক কিছু বুঝতে পারে, কিন্তু তা পূর্ণরূপে নয়। তবে বানর ও গেরিলার স্বরযন্ত্র আছে। অন্যান্য প্রাণিদের তুলনায় মানুষ কি করে এ ব্যাপারে এগিয়ে গেল এ কৌতূহল জাগতেই পারে।

অতি-সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ডের সেন্ট অ্যাণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আর্ণল্ড এবং জুবেরবহলার নাইজেরিয়ার জঙ্গলে এক দল বানরের উপর গবেষণা চালিয়ে বলেছেন যে মানুষের ভাষার মূল উৎস বানরের বিভিন্ন ডাক। কারণ বানরেরা চিতাবাঘ দেখলে একরকম আওয়াজ করে, ঈগল এলে আর এক ধরণের আওয়াজ করে। আবার প্রাপ্ত বয়স্ক বানরেরা নিজেদের মধ্যে বিশেষ এক রকম ‘ পিয়াও’ ডাকের সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। এই সব ডাকই মানুষের ভাষার পূর্বাবস্থা। ‘নেচার’ পত্রিকায় প্রকাশিত এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের আগে এ রকম ভাষার ব্যবহার দেখা যায় নি।[১] শুধু বানর কেন প্রত্যেকটি প্রজাতিই তাদের নিজেদের মধ্য কিছু সংকেতপূর্ণ ভাষা বিনিময় করে। আজ এ প্রশ্ন উঠেছে মানুষ কোথা থেকে প্রথম ভাষা শিখল? উত্তর দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে।

ক) বো - বো তত্ত্ব :

এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃতির বিভিন্ন আওয়াজ শুনে তাকে অনুকরণ করে মানুষ ভাষা ব্যবহার শিখেছে। যেমন বাতাসের শব্দকে ‘শনশন’ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছে; কিংবা পাখিদের কাছ থেকে শিখেছে ‘ কুহু কুহু ’, ‘খোকা হোক ’, ‘পিউ কাঁহা’ ইত্যাদি। আবার শিয়ালের কাছে শুনেছে ‘হুক্কা হুয়া’, কুকুরের কাছে ‘ঘেউ ঘেউ’ ইত্যাদি।

খ) ফু - ফু তত্ত্ব ঃ

এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের আবেগ-উৎসাহ-যন্ত্রনা থেকে ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে। ঘৃণার জন্ম দিলে বাক্‌যন্ত্র থেকে বের হয়ে এসেছে 'ছিঃ ছিঃ', কারও যন্ত্রণায় সামিল হয়ে বলেছে 'আঃ', গরমে অতিষ্ট হয়ে বলেছে 'উঃ', সমস্যায় পড়ে বলেছে 'লে হালুয়া', 'যা চলে', 'ক্যাওড়া' ইত্যাদি।

গ) ও - হি - হো তত্ত্ব ঃ

এই তত্ত্বে বলা হয়েছে মানুষ তার শ্রম লাঘবের জন্য অথবা বলবৃদ্ধির জন্য ভাষা প্রকাশ করে এসেছে আদিমকাল থেকে। যেমন দড়ি ধরে ভারি বস্তু তোলার ক্ষেত্রে 'হেঁই ও' কিংবা কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটার সময় মুখ দিয়ে বের হয়ে 'ছোঃ' ইত্যাদি। আজকাল রেল লাইন পাল্টানোর সময় আমরা দেখি একজন লিডার অশ্লীল ছড়া বলছে , আর সঙ্গে সঙ্গে সমবেতভাবে আওয়াজ করছে।

ঘ) ডিং - ডং তত্ত্ব ঃ

এই তত্ত্ব অনুযায়ী আদিম মানুষ কোন কারণে আঘাত পেলে বেদনার প্রকাশ ঘটাতে যা উচ্চারণ করতো তা থেকেই ভাষার জন্ম হয়। যেমন -- ' মাগো' , 'বাপ রে' ইত্যাদি ।

ঙ) সুর তত্ত্ব ঃ

এই তত্ত্বটি মিউজিক্যাল তত্ত্ব নামে পরিচিত। বলা হয়েছে যে মানুষ একসময় গানের সুরের মতো করে মনের ভাব প্রকাশ করত, সে কান্নাই হোক আর আনন্দের প্রকাশই হোক , তা থেকেই ক্রমে ভাষার জন্ম হয়েছে। এগুলি আসলে অবিভাজ্য ধ্বনি। অবিভাজ্য ধ্বনি থেকে বিভাজ্য ধ্বনি জন্ম নিয়েছে।

চ) সম্পর্ক তত্ত্ব ঃ

এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষ তার সামাজিক প্রয়োজনে, ভাবের আদান প্রদানে এবং সম্পর্ক স্থাপনে নিজের প্রচেষ্টায় ভাষা ব্যবহার করেছে।

ছ) গেশ্চার তত্ত্ব ঃ

এই মতবাদে বলা হয়েছে মানুষ প্রথম তার প্রয়োজন মেটাতে দেহভঙ্গিমা, ইশারা, হাত-পায়ের ভঙ্গিমা ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষার কাজ শুরু করে, পরে তারই অনুষঙ্গে শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করেছে । যেমন - হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বলা ' কলা ', কিংম্বা পা তুলে বলে ' এক লাত্ দেবো'।

জ) বিবর্তন তত্ত্ব ঃ

বিবর্তনবাদীরা বলেন মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের বিবর্তন ঘটেছে। আজকের শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর যে কোন ভাষাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু আদিম কালে তা ছিল না । সভ্যতার বিবর্তনের ফলে অর্থাৎ জঙ্গল থেকে মানুষ সমাজ প্রতিষ্ঠা বলেই এমনটি ঘটেছে।

ঝ) ধর্মীয় তত্ত্ব ঃ

এই মতবাদে ভাষাকে ভগবানের দান বলা হয়েছে। প্রাচীন মিশরীয়দের মত অনুযায়ী বাক্য সৃষ্টি করেছেন 'থর্ত' নামক দেবতা। ব্যবিলিনীয়দের ধারণা অনুযায়ী 'নাব্যু' দেবতা ভাষা সৃষ্টি করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ধারণা হল দেবী সরস্বতী বিদ্যা তথা ভাষা দান করেছেন। কোরাণে 'সুরা বাকারাহ্' অনুযায়ী আল্লাহ পৃথিবীর প্রথম পুরুষ আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিয়েছেন (' এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন,তারপর সে-সকল ফেরেশ্‌তাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন ... ') । যা থেকে ভাষার সৃষ্টি মনে করা হয়েছে। বাইবেলের গল্প থেকে জানা যায় যে নূহ -এর সময় পর্যন্ত মানুষের একটাই ভাষা ছিল, যে ভাষা সবাই বুঝত। তিনিই প্রথম মানুষের জন্য ভাষা সংরক্ষণ করেন।

ঞ) জৈব-আশীর্বাদ তত্ত্ব ঃ

এই তত্ত্বের মূল কথা হলো— প্রকৃতির আশীর্বাদ নিয়ে মানবশিশু ভাষাশিক্ষার সব উপাদান জন্মসূত্রেই সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তাই সে ভাষা ব্যবহার করতে পারে।

আধুনিককালে পুরাতত্ত্বের গবেষণায় মানুষের ফসিল থেকে এটা জানা গেছে যে লক্ষ লক্ষ বছর আগেও মানুষ সুশৃঙ্খল ভাষায় কথা বলত। বিবর্তনের পথ ধরে তা আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে।

তবে কিভাবে ভাষার প্রচলন ঘটল তার রহস্য থেকেই গেছে। ভাষিক-পরিবেশ ছাড়া একটি শিশু ভাষা আয়ত্ত্ব করতে পারে কিনা, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা একেবারেযে হয় নি , তা নয়। শোনা যায় মিশরের বাদশা সামেটিচুস এক পর্বতে আলাদা কুঁড়ে ঘরে দুই নবজাতকে বাক্‌হীন পরিবেশে রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন পর তাদের মুখে একটি শব্দ বের হয় 'বেকস্'। ফ্রিজিয়ান ভাষায় শব্দটির অর্থ 'রুটি'।এর থেকে প্রমাণ হয় প্রয়োজনের ভিত্তিতেই মানুষ ভাষা ব্যবহার করেছে। তবে এটি গল্প মাত্র। আবার আবুল ফজলের 'আকবর নামা' অনুযায়ী সম্রাট আকবর কয়েকটি শিশুকে নির্বাক স্থানে রেখে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু চার বছর বয়স পর্যন্ত তারা কোন শব্দ ব্যবহার করেনি। এর থেকে বোঝা যায় যে ভাষিক - পরিবেশ না থাকার জন্য শিশুরা ভাষা শেখে নি।

আমরা 'টারজান' -এর কল্পিত কাহিনি জানি, সেখানে টারজান জঙ্গলের প্রাণিদের মতোই আওয়াজ করতো। পুরাণ কাহিনি অনুযায়ী শকুন্তলাকে শৈশবে রক্ষা করেছিল একটি পাখি। আটালাণ্টাকে একটি ভালুক পালন করে এবং রেমুস একটি নেকড়ের কাছে প্রতিপালিত হয় ।গ্রিক পুরাণের দেবরাজ জেউস শৈশবে বন্য প্রাণির দ্বারা পালিত হন। এগুলি গল্পকথা কারণ এগুলিতে শিশুদের ভাষা ব্যবহারে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই । পরবর্তীকালে দুর্ভাগ্যবশত যে সমস্ত শিশুরা বন্য পরিবেশে বড় হয়েছে , তারাও ভাষা ব্যবহার করতে পারে নি ।

এ প্রসঙ্গে এভিরনের জঙ্গল বালক, নেকড়ে আশ্রিতা কমলা-অমলা এবং গিনিপিগ জেনীর কাহিনি জানা প্রয়োজন —

এভিরনের জঙ্গল বালক ঃ

১৭৯৯ সালের শীতকালে একদিন জঙ্গলের পাশে একটি নগ্ন ও বোবা বালকের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত গভীর জঙ্গল ছেড়ে সে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে প্রবেশ করেছিল। প্রথমে অনেকে মনে করেছিলেন যে বোবা বলে হয়তো তাকে তার বাবা-মা পরিত্যাগ করেছে। অনাথ দেখেই ডাঃ ইটার্ডের তাকে গ্রহণ করলেন, তার নাম দিলেন 'ভিক্টর'। ডাক্তার নিজে ফরাসি ছিলেন বলে কিছু কিছু ফরাসি ভাষা শেখাতে শুরু করে দেখলেন ভিক্টর সত্যিই বোবা নয়। গভীর জঙ্গলে মানুষের ভাষিক পরিবেশ পায়নি বলে সে এতদিন বোবা ছিল।

নেকড়ে আশ্রিতা কমলা-অমলা ঃ

১৯২০ সালের ১৭ ই অক্টোবর মেদ্নিপুরের এক পাদ্রি অমৃতলাল সিং, বাংলা ও উড়িষার সীমান্তে দেঙ্গালিয়া নামক স্থান থেকে শিকারী বন্ধুদের সাহায্যে দুটি বালিকাকে নেকড়ের বাসা থেকে উদ্ধার করে বড়টির নাম রাখা হয় 'কমলা' তার বয়স ছয়ের কাছাকাছি, আর ছোটটির নাম 'অমলা' তার বয়স তিনের কাছাকাছি। ভাষিক পরিবেশ না পাওয়ায় দুটি বালিকা পাশাপাশি থাকলেও তারা কথা বলতে পারতো না। তাদেরকে অনাথ আশ্রমে রাখা হয়। প্রথম প্রথম তারা অনাথ আশ্রমের অন্যান্যদের কথাবার্তা বুঝতে পারতো না। আস্তে আস্তে তারা মিঃ সিং-এর স্ত্রীর সহায়তায় বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে শেখে।

গিনিপিগ জেনি ঃ

জেনির কাহিনি হৃদয় -বিদারক। গবেষণার প্রয়োজনে তাকে গিনিপিগের মতো ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালে আমেরিকার লস এঞ্জেলসের এক তালা বন্ধ ঘর থেকে জেনিকে উদ্ধার করা হয়। কুড়ি মাস বয়স থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত তাকে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। খাবার দেওয়া হলেও কোন কথা বলা হতো না। প্রথম দিকে কথা বলতে না পারলেও তাকে জনসমাজে আনলে তার ভাষা শিক্ষা হয়। যদিও এগারো বছর বয়সের শিক্ষা, শিশুদের স্বভাবিক শিক্ষার মতো ছিল না।

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ভাষার উৎপত্তি যে ভাবেই হোক না কেন ভাষা শিক্ষার জন্য একটা ভাষিক-পরিবেশের দরকার।

✧ জিনতত্ত্ব ও ভাষা ✧

ভাষিক-পরিবেশকে ভাষা শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হলে বংশগতির ধারক ও বাহক জিনের গুরুত্ব কি একেবারেই নেই ? হ্যাঁ জিনকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ জিনেটিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানুষ কথা বলতে পারে, অন্য প্রাণিরা কথা বলতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দির জার্মান দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ ব্যারন ভন্ হামবোল্ট(Baron Von Humboldt) বলেছিলেন " ভাষাকে ধন্যবাদ, কারণ এর জন্যই মানুষ মানুষ হতে

পেরেছে।" জীবের অন্যান্য বৈশিষ্টের মতো যদি মানুষের ভাষাকে একটি বৈশিষ্ট্য (character) হিসাবে ভাবা হয়, তাহলে এর উৎপত্তির চলে আসা ধারনাটিকে মেনে নেওয়া যায়। এই চলতি ধারণা হল ভাষার উৎপত্তির জৈবিক সূত্র (Biological) বর্তমান। কিন্তু বিংশ শতাব্দির ষাট ও সত্তর দশকে কিছু মনস্তত্ত্ববিদ্ দাবি করেন ভাষা মানুষেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয় এবং অন্যান্য প্রাণিও (যেমন শিম্পাঞ্জি) উপযুক্ত পরিবেশে ভাষা শিখতে পারে। সুতরাং মানুষের ভাষা আছে, এর সদুত্তর রয়েছে তার সামাজিক গোষ্ঠিবদ্ধ জীবনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই, যা অন্যান্য প্রাণির নেই।[১]

যে কোন জীবের সকল বৈশিষ্ট্যের পিছনে জিনের ভূমিকা আজ প্রশ্নাতীত। ২০০১ সালে প্রখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় অক্সফোর্ড বিজ্ঞানী ডঃ অ্যান্থনি পি. মোনাকো (Dr. Anthony P. Monaco) এবং তার সহকারী বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করলেন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই তথ্য অনুযায়ী লণ্ডনের এক পরিবারের সমস্ত সদস্যের ভাষা সংক্রান্ত ত্রুটি রয়েছে, যার মূল কারণ হল তাদের জিনগত ত্রুটি। এই জিনটির নাম Fox P_2। তবে পরিবারের সদস্যদের অন্যান্য জৈবিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক। এই জিনটি যে একেবারেই মানুষের, তা কিন্তু নয়, এর অস্তিত্ব রয়েছে অন্যান্য স্তন্যপায়ীতেও, যেমন ইঁদুর, শিম্পাঞ্জি। কিন্তু মানুষের জিনটিই উন্নত । মানুষের জিনটি যেভাবে মুখের ও গলার পেশিকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে, অন্যান্যরা তা পারে না। আর এই সূক্ষ্ম পেশি নিয়ন্ত্রন থেকেই আসে সুসংবদ্ধ, স্বচ্ছ, সাবলীল, স্পষ্টোচ্চারিত শব্দ প্রকাশের ক্ষমতা। অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর সক্রিয়তায় এই জিনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

তবে শুধু এই একটি জিনই নয়, বিজ্ঞানীদের ধারনা আরও অনেক জিনই ভাষার বিকাশের সহায়ক। অনেক জিনের মিলিত কার্যকলাপের দ্বারাই হয়তো আমাদের জটিল ভাষার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, যা অন্যান্য প্রাণিদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।।

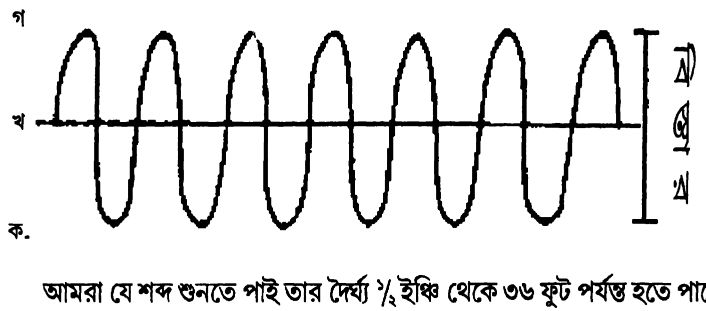
তাই জিনই ভাষার মূলে (অবশ্যই পরিবেশের দরকার) এবং মানুষই ভাষার জন্য দায়ী জিনগুলি বহন করে তাই তার ভাষা আছে, অন্যদের তা নেই। ২০০৩ সালের ১৪ ই এপ্রিল বিজ্ঞানীরা মানুষের জিনের মানচিত্র নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছেন। জিন গবেষণায় ক্রোমোজোম-১ এর যে সিকুয়েন্সি বাকি ছিল তার কাজও অতি সম্প্রতি শেষে হয়েছে। মানুষের দেহে সুতোর মতো জড়িয়ে থাকা ৪৬ টি ক্রোমোজমের মধ্যে এই ক্রোমোজোম-১ সব চেয়ে বড়। এতে ৩১৪১ টি জিন আছে - যাদের কয়েকটি ক্যান্সার, অ্যালঝাইমার ও পারকিনসন্সের মতো রোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জিন পরবর্তীকালে ভাষাভাবনায় অংশগ্রহণ করবে বলে আমাদের ধারণা। অচিরেই নতুন গবেষণা আমাদের কৌতূহলের নিরসন করবে।

১. জিন ও ভাষা অংশটির তথ্য সরবরাহ করেছেন বাগাটি কলেজের জীববিদ্যার অধ্যাপক শ্যামা সাঁই ।

✧ বলা ও শোনা ✧

বলা আর শোনার মধ্য দিয়েই ভাষিক - পরিবেশ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে শব্দ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। আমরা যখন কথা বলি তখন আসলে শব্দ করি। কিন্তু শ্রোতা তা শুনতে পারছে কি করে ? শব্দ বিজ্ঞানীরা বলছেন — তরঙ্গের মাধ্যমে। তরঙ্গ দুই প্রকার — তির্যকতরঙ্গ ও অনুদৈর্ঘ্যতরঙ্গ। তির্যকতরঙ্গ কোন তল ধরে উপর থেকে নীচের দিকে এগিয়ে যায় আর অনুদৈর্ঘ্যতরঙ্গের ক্ষেত্রে উৎসের চারিদিকে সমানভাবে এই তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়। এই প্রকার শব্দ তরঙ্গ মূলত লম্বালম্বি গতিতে এগিয়ে চলে।

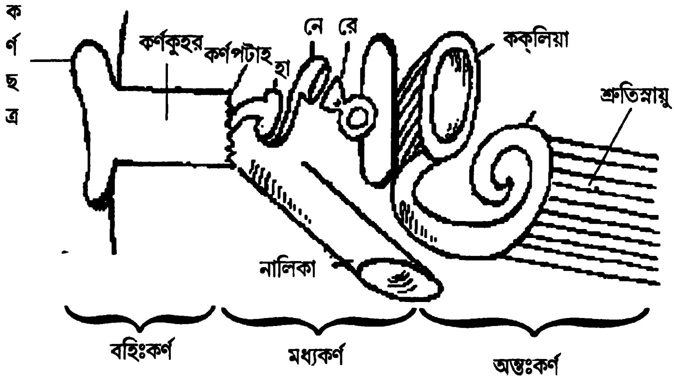
কিন্তু তরঙ্গ সৃষ্টি হয় কিভাবে ? শব্দ বিজ্ঞান অনুযায়ী কম্পন থেকেই তরঙ্গের সৃষ্টি। যেমন ঘন্টা পেটালে তার কম্পন থেকেই তরঙ্গের জন্ম আর তার থেকেই আমাদের কানে শব্দ আসে। সাধারণত ২০ থেকে ২০০০০ Hz. কম্পাঙ্কের শব্দ আমাদের কানে আসে। ভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কম্পনের কাজটি করে স্বরতন্ত্রী। শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে যে দূরত্ব থাকে তরঙ্গ সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে একাধিক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। একটি তরঙ্গ থেকে আর একটি তরঙ্গ পর্যন্ত যে দূরত্ব তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে।



আমরা যে শব্দ শুনতে পাই তার দৈর্ঘ্য ½ ইঞ্চি থেকে ৩৬ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। পুরুষ কণ্ঠে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ ফুট আর নারী কণ্ঠে ৪ ফুট। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে তীক্ষ্ণতা কমে আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমলে তীক্ষ্ণতা বাড়ে তাই মেয়েদের গলার তীক্ষ্ণতা বেশি। শব্দ বায়ু মাধ্যমে যতই এগুতে থাকে তরঙ্গের বিস্তার ততই কমে।

বক্তা স্বরতন্ত্রীর কম্পনে মুখবিবরের পথে ধ্বনির তরঙ্গ বাতাসে ছাড়ল। এক্ষেত্রে যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে সেই শ্রোতা কি ভাবে ঐ ধ্বনি তরঙ্গ বা ভাষাকে গ্রহণ করছে ? জীববিদ্যার আলোকে ভাষা বিজ্ঞানীরা কর্ণের গঠন প্রসঙ্গটি এনে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের মাথার দুপাশে দুটি কান শব্দকে গ্রহণ করে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দিচ্ছে। গঠন অনুযায়ী কান বা কর্ণ তিনটি অংশে বিভক্ত — বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ। বহিঃকর্ণের কর্ণছত্র শব্দ তরঙ্গকে কর্ণকুহরে প্রবেশ করায়। কর্ণকুহর পথে শব্দতরঙ্গ কর্ণপটহে আঘাত করে। মধ্যকর্ণে অবস্থিত হাতুড়ি, নেহাই ও রেকাব নামক তিনটি ছোট হাড় ঐ তরঙ্গকে অন্তকর্ণে অবস্থিত ককলিয়ায় প্রেরণ করে। ককলিয়ার সঙ্গে যুক্ত শ্রুতিস্নায়ু তরঙ্গকে মস্তিষ্কে প্রেরণ

করলে আমরা শুনতে পাই।

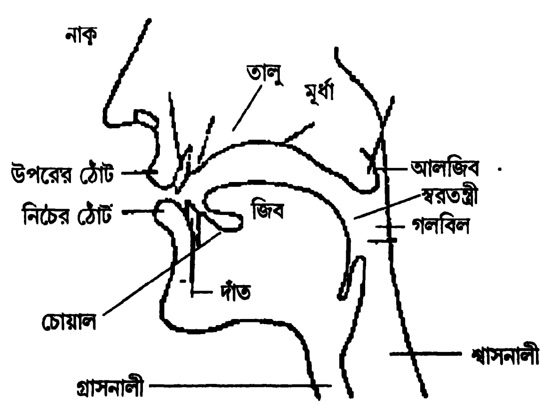


✧ বাগ্‌যন্ত্র ✧

অর্থ বা ধ্বনি সৃষ্টিতে মানুষের শরীরে ফুসফুস থেকে ওষ্ঠ পর্যন্ত যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত সেগুলিকে একত্রে বাগ্‌যন্ত্র বলে। ধ্বনি সৃষ্টি ছাড়াও বাগ্‌যন্ত্র শ্বাসকার্য এবং খাদ্য গ্রহণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। মানব দেহের বাগ্‌যন্ত্রগুলি হল --

ক) ফুসফুস	খ) শ্বাসনালী
গ) স্বরতন্ত্রী	ঘ) আলজিব
ঙ) অধিজিব	চ) জিব
ছ) মূর্ধা	জ) তালু
ঝ) দাঁত	ঞ) ঠোঁট
ট) চোয়াল	ঠ) নাক

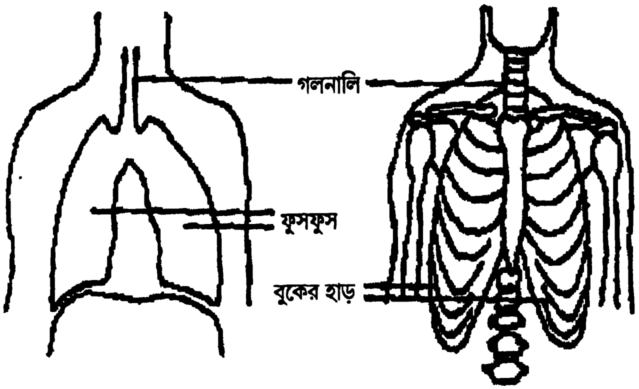
ফুসফুস ছাড়া বাগ্‌যন্ত্রের ছবি



ফুসফুস

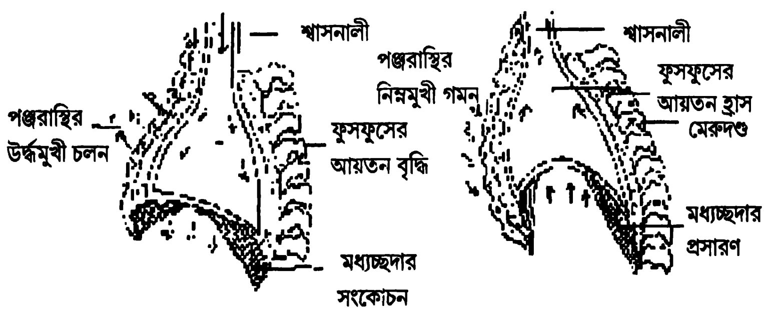
১. **অবস্থান ঃ**

আমাদের বক্ষগহ্বরের দুপাশে থাকে ফুসফুস। ফুসফুসের পিছনে থাকে মেরুদণ্ড।



২. **গঠন ঃ**

ফুসফুস অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুথলি দিয়ে গঠিত। এই বায়ুথলিগুলি ক্রমশ ক্লোমশাখা পথে একটি বড় ক্লোমশাখা ও শেষে ট্রাকিয়ায় মিলিত হয়। এর মধ্য দিয়েই বাতাস ফুসফুস থেকে মুখবিবর পথে বা নাসা পথে বের হয়ে আসে।



প্রশ্বাস প্রক্রিয়া　　নিঃশ্বাস প্রক্রিয়া

সংকোচন ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে শ্বাস প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। চুপ থাকলে প্রতি মিনিটে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হার ১২ টি। ফুসফুস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পূর্ণ বাতাস বের করার প্রক্রিয়াটিকে নিঃশ্বাস এবং বায়ুমন্ডল থেকে অক্সিজেন পূর্ণ বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াটিকে প্রশ্বাস বলে। ধ্বনি সৃষ্টিতে

নিঃশ্বাসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি একটি শ্বাসে প্রায় ৫০০ সি.সি. বাতাস দেওয়া-নেওয়া করে। কিন্তু কথোপকথনের সময় তার পরিমাণ প্রায় ১৫০০ – ২০০০ সি.সি.হয়ে যায়।

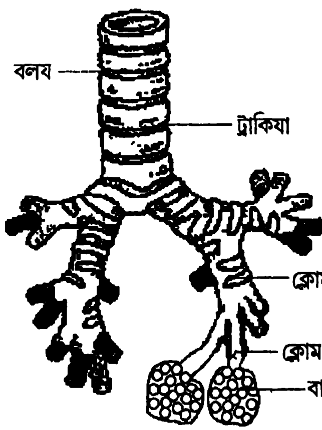
৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ ঃ**

ফুসফুসের বাতাসই ধ্বনি সৃষ্টির প্রধান উৎস। তবে ফুসফুস থেকে বাতাস বের করলেই চলবে না, শব্দের প্রকৃতি অনুযায়ী তা নির্ধারিত হয় ।

শ্বাসনালী

১. **অবস্থান ঃ**

অসংখ্য বলয় সমৃদ্ধ একটি নল অর্থাৎ ট্রাকিয়া গলদেশ থেকে বেরিয়ে ডান ও বাম দুটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করেছে এটিই হল শ্বাসনালী।



২. **গঠন ঃ**

গঠনের দিক থেকে এটি হাড়ের মতো শক্তও নয় আবার মাংসের মতো নরমও নয়। এটি তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি। এর ব্যাস ২- ২.৫ সেন্টিমিটার আর দৈর্ঘ্য ১১ সেন্টিমিটার। বাতাস ও খাদ্য চলাচলের জন্য এটি সবসময় খোলা থাকে।

৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ ঃ**

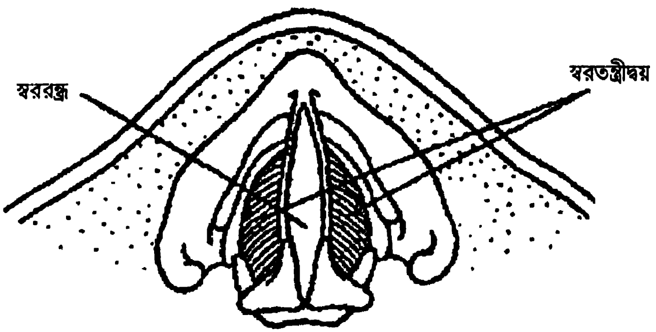
ফুসফুস থেকে বাতাস বের হওয়ার সময় এটির মধ্যে একপ্রকার অনুরণন সৃষ্টি হয়। বাতাসকে সাময়িক ভাবে ধরে রাখে।

স্বরতন্ত্রী

১. **অবস্থান ঃ**

ফুসফুস থেকে এসে শ্বাসনালী যেখানে শেষ হচ্ছে কিংবা বাইরের দিক থেকে যে

কণ্ঠমণি দেখা যায় তার ঠিক পিছনে স্বরতন্ত্রীর অবস্থান।



২. **গঠন ঃ**

এর ভেতরের দেওয়ালে সার বেধে কিছু পাতলা ও সূক্ষ্ম পেশি থাকে। স্বরতন্ত্রীতে বলয়, ফলক,অ্যারিটেনইড ও অধিজিব অবস্থান করে। এটি মাংসের মতো নরম তবে টানটান নয়। দুই ভাঁজ করা পর্দা নিয়ে যে ঝিল্লি এখানে থাকে তার মাঝে থাকে শ্বাসরন্ধ্র বা গ্লটিস।

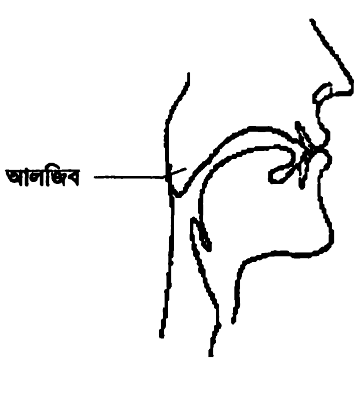
৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ ঃ**

এর প্রধান কাজ কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করা। তাছাড়া শ্বাসনালীতে খাদ্যবস্তুর অবাঞ্ছিত প্রবেশ রোধ করে। ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধ্বনিবিজ্ঞানী আবদুল হাই একে 'sound box ' বা ধ্বনি মঞ্জুষা বলেছেন। স্বরতন্ত্রী আসলে কম্পকের কাজ করে।

আলজিব

১. **অবস্থান ঃ**

কোমল তালুর পিছনে একটা আবের মতো, ঝুলন্ত মাংসপিণ্ডকে আলজিব বলে।



২. **গঠন** এটি পুরোপুরি মাংসের টুকরো। তবে বেশ নরম।

৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ ঃ**

কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি উচ্চারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া নাসিক্যধ্বনি উচ্চারণে বাতাসকে নাসাপথে প্রবাহিত করে বিশেষ সাহায্য করে।

অধিজিব

১. **অবস্থান ঃ**

স্বরতন্ত্রীকে যে উপাস্থির আবরণ থাকে তাকে সেই আবরণটিকে অধিজিব বলে। স্বরতন্ত্রীর উপরে এর অবস্থান।

২. **গঠন ঃ**

মাংসের তুলনায় নরম।

৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ ঃ**

ধ্বনি উৎপাদন অপেক্ষা জৈবিক কাজেই এর ব্যবহার বেশি।

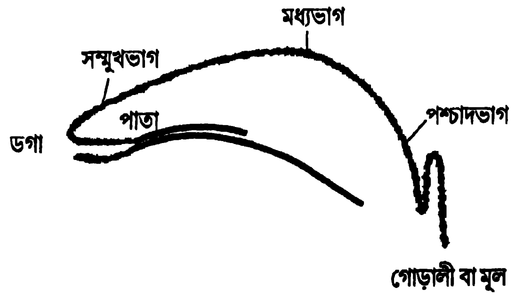
জিব

১. **অবস্থান ঃ**

মুখবিবরের নিচের অংশে জিবের অবস্থান। কণ্ঠনালী থেকে বের হয়ে এটি দন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

২. **গঠন ঃ**

হাইয়োগ্লোসাস্,জেনিয়োগ্লোসাস্ ও স্টাইলোগ্লোসাস্ - এই তিনটি মাংসপেশি এখানে থাকে । স্থিতিস্থাপক ও নরম মাংস দিয়ে এটি গঠিত তাই এটিকে চারিদিকে ইচ্ছামতো নাড়াচাড়া করা যায়। সুতোর মতো স্পর্শকাতর কিছু চুষি থাকে যে গুলি স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করে। এর তিনটি অংশ – ১) সম্মুখ জিব ২) পশ্চাৎ জিব ৩) মধ্য জিব।



৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ ঃ**

বাগযন্ত্রের সবচেয়ে সক্রিয় অংশ বলে একে উর্দুতে 'জবান'(কথা) বলে। জিব সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে সূক্ষ্ম ধ্বনি উৎপাদনে কাজে লাগে।

মূর্ধা

১. **অবস্থান ঃ**

তালুর পিছন দিকে যেখানে আমরা জিব উল্টে 'ট' উচ্চারণ করি সেখানটাই হল মূর্ধা।

২. **গঠন ঃ**

অপেক্ষাকৃত শক্ত অংশটি আসলে মুখবিবরের ছাদ। পাতলা হাড়ের আবরণ দিয়ে তৈরি।

৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ ঃ**

জিবকে আটকানোর স্থান হিসাবে ধ্বনি সৃষ্টিতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। ট-বর্গীয় ব্যঞ্জন উচ্চারণে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

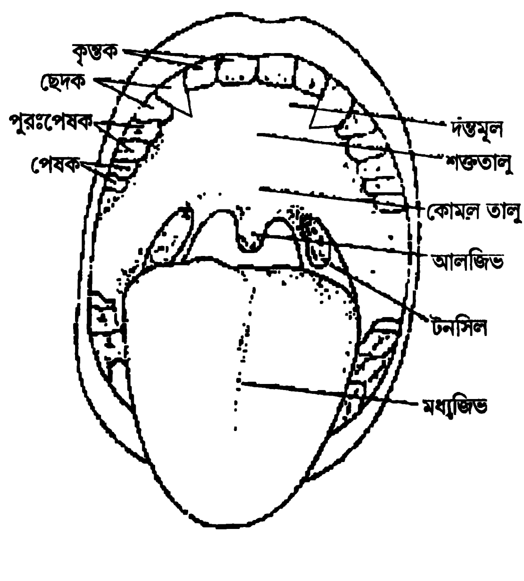
তালু

১. **অবস্থান ঃ**

মূর্ধার পরের স্থান হল তালু। তালু হল মুখবিবরের মধ্য ছাদ।

২. **গঠন ঃ**

দুটি ভাগ শক্ত তালু ও কোমল তালু। শক্ত তালু পাতলা হাড়ের আবরণ দিয়ে তৈরি। দেখতে ইগলুদের বাড়ির ছাদের মতো। তবে কোমল তালু নরম কলাতন্তুর সাহায্যে তৈরি।



৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ :**

ধ্বনি সৃষ্টিতে জিবের অগ্রভাগ শ্বাসবায়ু আটকাতে সাহায্য করে। নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণে বিশেষ ভূমিকা আছে। কোমল তালু মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি উচ্চারণে সাহায্য করে। শক্ততালুতে তালব্য ধ্বনি উচ্চারণে সাহায্য করে।

দাঁত

১. **অবস্থান :**

চোয়ালের সঙ্গে যুক্ত মাড়িতে যেগুলি বসানো থাকে সেগুলি দাঁত। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির মোট দাঁতের সংখ্যা ৩২ টি।

২. **গঠন :**

দাঁতগুলি মাড়ির ভিতরে অনেকখানি পোঁতা থাকে। ডেন্টিন, এনামেল ও সিমেন্ট দিয়ে এগুলি তৈরি। গঠন অনুযায়ী এগুলি চার প্রকার — কৃন্তক, ছেদক, পুরঃপেষক ও পেষক।

৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ :**

নিচের পাটির দাঁতগুলিই ধ্বনি সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা নেয়। তবে উপরের চারটি দাঁতও ধ্বনির উচ্চারণে কাজ করে। দন্তমূলের সঙ্গে জিবের ক্রিয়ায় যে ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেগুলি দন্তব্যঞ্জন (ত, থ, দ, ধ ইত্যাদি)।

ঠোঁট

১. **অবস্থান :**

বাগযন্ত্রের একেবারে বাইরের অংশ হল ঠোঁট। মুখ-গহ্বরের বাইরে চারদিকে যে মাংসল আচ্ছাদন থাকে তাকেই ঠোঁট বলে।

২. **গঠন :**

ঠোঁটের দুটি ভাগ — উপরের ঠোঁট আর নিচের ঠোঁট। উপরের ঠোঁটকে 'ওষ্ঠ' এবং নিচেরঠোঁটকে 'অধর' বলে।

৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ :**

স্বরধ্বনির প্রকৃতি নির্ণয়ে ঠোঁটের ভূমিকা যথেষ্ট। তাছাড়া ওষ্ঠ ব্যঞ্জন (প,ফ,ব,ভ ইত্যাদি) উচ্চারণেও এর গুরুত্ব আছে।

চোয়াল

১. **অবস্থান :**

দাঁত কপাটি যার উপর বসানো থাকে তাকে বলে চোয়াল। শ্বাসবায়ু বের করার সময় এটি নড়াচড়া শুরু করে।

২. **গঠন :**

চোয়ালের দুটি ভাগ— উপরের চোয়াল ও নিচের চোয়াল। পুরোপুরি হাড় দিয়ে তৈরি এটি। নিচের চোয়ালই সক্রিয়।

৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ ঃ**

ধ্বনি সৃষ্টিতে চোয়ালের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই ঠিকই তবে এর গতিশীলতা ধ্বনি উচ্চারণে সাহায্য করে। চোয়াল অসুস্থ হলে ভাষা প্রয়োগের স্বাভাবিকতা থাকে না।

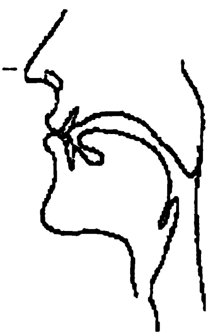
নাক

১. **অবস্থান ঃ**

মুখবিবর ছাড়া আর যে পথে বাঁচার জন্য বাতাস নির্গতহয় সেই পথকে নাসাপথ বলে। বাইরের উঁচু অংশ জুড়ে একে সামগ্রিকভাবে নাক বলে। নাকের ফুটোর উপরে আছে নরম তালু এবং নিচে আছে জিভের অংশ।

২. **গঠন ঃ**

একটি নল দুটো ফুটো হয়ে বের হয়েছে। সংযোগের দুই প্রান্তে থাকে দুটো করে খিলান । খিলান দুটোর মাঝখানের ঢালু অংশে সাইনাস ও টনসিল থাকে।



৩. **ধ্বনি সৃষ্টিতে কাজ ঃ**

সানুনাসিক স্বর সৃষ্টিতে এর গুরুত্ব আছে। সমস্ত মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি নাসাপথে বের হতে পারে।

✧ ভাষা ও মস্তিষ্ক ✧

জন্মের সময় সদ্যজাত শিশু মস্তিষ্কে সঙ্গে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মস্তিষ্ক বা মাথার বাহ্যিক কোন তারতম্য নেই। কিন্তু ভাষাগ্রহণের দিক থেকে তা অপরিণত। দু' বছরে শতকরা ৮০ ভাগ, পাঁচ বছরে শতকরা ৯০ ভাগ এবং ছয় বছরে তা পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করে। তবে ভাষার বোধগম্যতা আজকালকার শিশুদের একটু আগে আগেই শুরু হয়। মনে রাখতে হবে প্রায় কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত মাথার আভ্যন্তরীণ গঠনের পূর্ণতা প্রাপ্তি চলতে থাকে। বয়স অনুযায়ী মাথার ওজনও বাড়তে থাকে। বয়স অনুযায়ী মাথার স্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখাতে ব্রিলি একটি সরণি দিয়েছেন –

বয়স	মাথার ওজন
১ দিন	৩৪০ গ্রাম
৬ মাস	৭৫০ গ্রাম
১ বছর	৯৭০ গ্রাম
২ বছর	১১৫০ গ্রাম
৩ বছর	১২০০ গ্রাম
৬ বছর	১২৫০ গ্রাম
৯ বছর	১৩০০ গ্রাম
১২ বছর	১৩৫০ গ্রাম
২০ বছর	১৪০০ গ্রাম

মাথায় প্রায় এক লক্ষ কোটি নিউরোন থাকে। এগুলি পুষ্টি যোগানো, বিদ্যুৎরোধ, ইন্দ্রিয় থেকে আগত সংবাদ প্রেরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করে। ভাষা যেহেতু সংকেতের সংকেত তাই এই ভাষা ব্যবহারে নিউরোনের ভূমিকা কম নয়। এই নিউরোনের এ্যাকসন অংশ শিশুকে ধীরে ধীরে ভাষা গ্রহণক্ষমতার উপযোগী করে তোলে। দর্শন ও শ্রবণের স্নায়ুগুলি সক্রিয় হলে ছয় বছরের মধ্যেই শিশু ভাষা গ্রহণ ও প্রকাশে দক্ষ হয়ে উঠে।

✧ ভাষা ও শিশু ✧

ভাষা শিক্ষার বিষয়টি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর একটি কবিতায় তুলে ধরেছেন —

মায়ের কোলেতে শুয়ে উরুতে মস্তক থুয়ে
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে আধো আধো মৃদুস্বরে
আধো আধো বচনরচন॥
কহিতে অন্তরে আশা মুখে নাহি কটুভাষা
ব্যাকুল হয়েছে কত তায়।
মা-ম্মা-মা-মা বা-ব্বা-বা-বা আবো আবো
আবো -আবা
সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ উঠিল মনের সুখ
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো পিসে খুড়া বাপ জুজু ভূত ছুঁচো সাপ
স্থল জল আকাশ অনল ॥

(মাতৃভাষা ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

জন্মানোর সূত্র ধরে শিশু ভাষাজ্ঞান সঙ্গে করে আনে না। তবে শিশুর বাগ্‌যন্ত্র ও

শ্রবণযন্ত্র ভাষা শিক্ষায় পটু। ভাষিক পরিবেশে তার ভাষা শিক্ষার কাজ চলতে থাকে। প্রথম প্রথম সে বস্তুগত প্রয়োজনীয় উপাদান গুলি আয়ত্ত্ব করে তারপর তার জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিচারশক্তি ও চিন্তার উৎকর্ষ বাড়তে থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন ৬ - ৭ বছরই ভাষা শিক্ষার চরম সময়। তবে এই শিক্ষার কাজ সে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারে।

✧ শিশু ও তার ভাষাশিক্ষার প্রথম পর্ব ✧

ক্ষেত্র সমীক্ষা অনুযায়ী দু'মাস বয়স থেকে খুশ বাংলা শব্দ (ধ্বনিসমষ্টি) উচ্চারণ করেছে। তার প্রথম উচ্চারিত শব্দ হল 'বু-বু'। তিন মাস বয়সের আগেই সে উচ্চারণ করেছে 'বা-বা'। খুশ এই গ্রন্থ-লেখকের পুত্র। তার মা গৃহবধু। জন্মানোর পর তার পরিচর্যায় ছিলেন তার নানি (দিদিমা) যার সঙ্গে তার বুবু-ভাই সম্পর্ক । কিন্তু বাবা তার পাশে তখনও ছিল না, অথচ সে বাবা বলছে। আসলে এই বয়সে মুখে শব্দ করলেও প্রয়োগকর্তার কাছে তা অর্থবোধক নয়। বাংলা ভাষিক পরিবেশে অন্যান্য ধ্বনির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বলে একে আমরা শব্দ বলে ধরে নিয়েছি। ভাষা বিজ্ঞানীরা বলছেন শিশু প্রথম ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শব্দের কোন অর্থ বুঝতে পারে না।

নদীয়ার শিক্ষক সুব্রত-রূপালির মেয়ে ঋষিকা মুখ নিঃসৃত আওয়াজ ৭ মাস বয়স থেকেই রেকডিং করা হয়েছে। প্রথম প্রথম প্রতিটি শিশুর মতো সেও 'আও্', 'ওম্মা','ওজি' ইত্যাদি বলছে। বল 'বাবা' বললে 'বা' বলে আনন্দ প্রকাশ করেছে। ধ্বনি সৃষ্টির প্রচেষ্টায় এই সময় শ্বাসবায়ু টানা ও বের করার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে।

দ্বিতীয় পর্বে আমরা খুশের প্রথম পাঠে ধ্বনি উচ্চারণের রেকডিং করেছি। কোন বস্তুর দেখিয়ে 'ওটা কী' এই প্রশ্ন করলে 'এত্যে এত্যে' আওয়াজ করতো। কোন কিছু চাইতে গিয়ে সে প্রথম বলেছিল 'দাও' ,'দে' কিন্তু উচ্চারণ স্পষ্ট নয়। তবে 'ফোন দাও', 'চাবি দাও' কথাটা দ্রুত বলতে শিখেছে। ছবি ছড়ার বই থেকে ঘোড়ার ছবি দেখিয়ে ' এটা ঘোড়ার ছবি , তুমি চাপ্বে' এটা বলার পর ঘোড়ার ছবি দেখলেই 'চাপবো' বলে বইয়ের উপর বসে পড়তো আবার জিজ্ঞাসা করতো ' তুইই চাবে (তুমি চাপবে), মাছের ছবি দেখলেই বলতো 'খাবো', ব্যাঙ বললেই ব্যাঙের মতো লাফিয়ে নিতো। ' সিংঘ' ছবি দেখিয়ে উচ্চারণ করতে বললে সে বলেছে ' সিংঘু' বা 'সিগ্ঘো', পাণ্ডাকে দেখে বলতো ' পুতুল' , 'রামধো-ও-ও-নু' বললেই বলতো ' বু-বু কই' (এক্ষেত্রে তার মা ধনুর উপর অতিরিক্ত জোর দিয়ে উচ্চারণ করায় সে শব্দ অনুষঙ্গে তার দিদিমা অর্থাৎ 'বুবু'কে খুঁজতো)। চু বাঁচে (চুল বাঁধছে) , পিমে (পিঁপড়ে), ভুলু (ভালুক), চামকিকি (চামচিকি) , উঁদু (ইঁদুর) ইত্যাদি। প্রথম বাক্য গঠনে বলছে — তুমি যাব্ই , ছোবাই পও (সবাই পড়ো) , আমি বাক্ কাবো (আমি ভাত খাবো) ইত্যাদি। প্রথম ছড়া বলছে — দো দো দোউনি / বো আবে একোনি (দোল দোল দলুনি / বর আসবে এখুনি)। জিহ্বার স্বচ্ছল নড়াচড়া শব্দ অনুষঙ্গে হচ্ছে না বলেই উচ্চারণে সরলতা আসছে।

✧ ভাষার সংজ্ঞা ✧

ভাষা ব্যবহারেই অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষ এগিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে ভাষা কি ? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষা বিজ্ঞানীরা এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন।

প্রাচ্য ভাষাজ্ঞিানীদের বিভিন্ন সংজ্ঞা –

১. সুকুমার সেন

মনুষ্য জাতি যে ধ্বনি-সকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা ......।

২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

...মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্য প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।

৪. পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

স্পষ্ট উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি তথা শব্দের সাহায্যে মানুষ যখন পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে থাকে, তখনই তাকে বলা হয় ভাষা।

পাশ্চাত্য ভাষাজ্ঞিানীদের বিভিন্ন সংজ্ঞা –

1. **Edward Sapir**

   a) Language is purely human and noninstinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produced symbols.

   b) Language is primarily an auditory system of symbols.

2. **Leonard Bloomfield**

   Totality of the utterance that can be made in a speech community.

3. **Stuart Robertson and Frederic Cassidy**

   Language is the vocal and audible medium of human community.

4. Jacob Ornstein and Willam W Gage

A language is a structured system of vocal symbols by which a social group cooperates.

5. Dwight Bolinger

Human language is a system of vocal-auditory communication using conventional signs composed of arbitrary pattern sound units and assembled according to set rules, interacting with the experiences of its users.

6. G King

A language is a conventionalized system of arbitrary vocal signs.

7. Richard

Language is the system of human communication by means of structured arrangement of sounds (for their written representation) to form larger units.

✧ আমাদের সংজ্ঞা ঃ — ভাষিক-পরিবেশে মানুষ তার অনুভূতি প্রকাশ ও ভাব বিনিময়ের জন্য নির্দিষ্ট গঠন মেনে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ ব্যবহার করে তাকে ভাষা বলে।

✧ বৈশিষ্ট্য ✧

ক) ভাষা একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

খ) শিশু যে ভাষিক-পরিবেশে জন্মায় সেই ভাষাকেই সে আয়ত্ব করতে পারে।

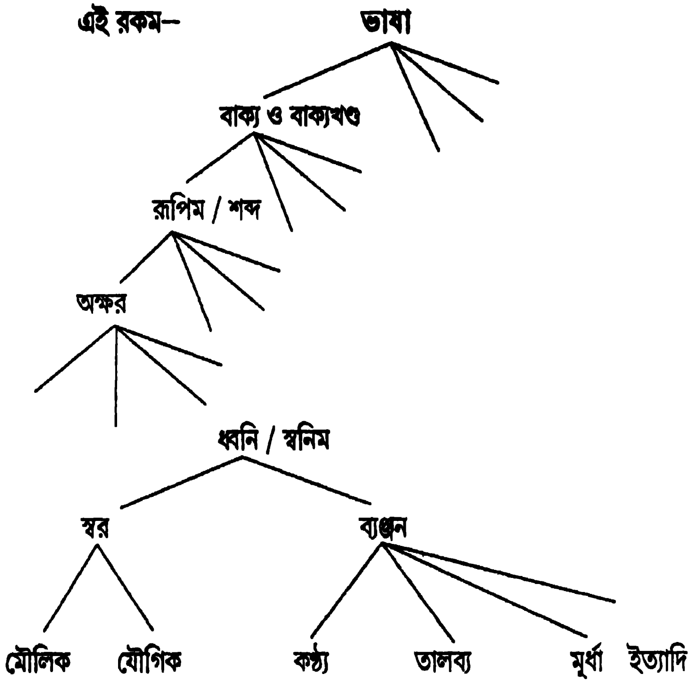
গ) ভাষা কতগুলি সংকেতকে প্রকাশ করে। তবে এই সংকেত ঐতিহ্য লব্ধ।

ঘ) কোন বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাকে যে ভাষায় চিনি তার নামকরণে কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। যেমন — চারপায়ে বসার জিনিসটিকে কেন 'চেয়ার' বলা হচ্ছে তার কোন সুনির্দিষ্ট কারণ নেই।

✧ ভাষার গঠন ✧

বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত অর্থবোধক এই ধ্বনিগুলির ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ভাষাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানে ভাগ করে নিয়েছি অর্থাৎ ভাষার ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম উপাদান খুঁজতে গিয়ে যে রেখাচিত্র পাচ্ছি তা

এই রকম—



আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানীরা ভাষার এই সমস্ত শাখাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিষয়টিকে প্রধান চারটি স্তরে লক্ষ করেছেন –

ক) ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব (phonetics & phonology)
খ) রূপতত্ত্ব (morphology)
গ) বাক্যতত্ত্ব (syntax)
ঘ) শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)

ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস

ভাষাকে ঘিরে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। এর সূত্রপাত বহু প্রাচীন যুগ থেকে। ভাষাজিজ্ঞাসা একটি সমীকরণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ধারার ভাষাজিজ্ঞাসাতেই সহজলভ্য ছিল । প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকরণকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে — প্রথাগত ব্যাকরণ ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান। প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষাজিজ্ঞাসার সূচনা যুগ থেকে গ্রিক, লাতিন বা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের ছকে ফেলা ভাষাচিন্তার বা ব্যাকরণচিন্তার বিভিন্ন বিবর্তন অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে আলোচিত হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ভাষাবিশ্লেষণ বা ব্যাকরণ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাত্ত্বিক পরিবর্তন। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলি হল তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব, বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্ব। প্রথাগত ভাষাবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ভাষাবিজ্ঞানের গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্ব এসেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই আজকের সাহিত্য-বিশ্লেষণ চলছে।

✧ গ্রিসে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা ঃ

ইয়োরোপে প্রথম স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনার গৌরব গ্রিকদের। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দিতে সফিষ্টরা প্রায়োগত শব্দের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের কৃতিছাত্র প্রোতাগোরাস প্রথম বাক্যের বিভিন্ন রীতি ও তার পার্থক্যের কথা বলেন। বাক্যে অক্ষরের সংখ্যা নির্ণয় এই সময় করা হয়েছিল। আনুমানিক ৪২৫ - ৩৪৮/৪৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিসে যথাযথ ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল । প্লেতো প্রথম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Dialogues' -এর 'ক্রাতিলুস' নামক অধ্যায়ে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উৎসের কথা আলোচনা করেছেন। প্লেতোর মতে প্রয়োজনের তাগিদেই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে । তিনি গ্রিক ধ্বনিগুলির বর্গীকরণ করেছেন এবং ধ্বনির তিন ধরণের শ্রেণিবিভাগ করেছেন — স্বরধ্বনি, অর্ধস্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনি।

পরবর্তীকালে প্লেতোর শিষ্য আরিস্ততল (৩৪৮-৩২২/২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) ভাষার বহিরঙ্গ গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁব লেখা 'Poetics' গ্রন্থে ভাষাকে বর্ণ, অক্ষর, বিশেষ্য, ক্রিয়া , কারক ইত্যাদি ভাগে বিশ্লেষণ করেছেন — " ভাষারীতির অঙ্গ হল ঃ বর্ণ, দল, সংযোজক, 'আরথ্রোন', বিশেষ্য , ক্রিয়া, কারক আর পদগুচ্ছ। বর্ণ হলো

অবিভাজ্য ধ্বনি, প্রত্যেক ধ্বনিই বর্ণ নয়, কিন্তু যারা পরস্পর মিলে অর্থময় ধ্বনি তৈরি করতে পারে তারাই বর্ণ। জীবজন্তুরাও অবিভাজ্য ধ্বনি উচ্চারণ করে, কিন্তু তাদের আমি বর্ণ বলি না। ধ্বনিকে ভাগ করা চলে (তিন শ্রেণীতে) ঃ স্বর , অর্ধস্বর এবং ব্যঞ্জন।. . . ." (অনুবাদ ঃ শিশির দাশ) তবে বিশেষণ বা সর্বনাম সম্পর্কে কিছু বলেন নি। তাঁর মতে বর্ণ ভাষার ক্ষুদ্রতম একক আর বাক্য হল বৃহত্তম একক ।

গ্রিসে ভাষাতত্ত্ব চর্চা সর্বাধিক বিকাশলাভ করেছিল আলেকজান্দ্রিয় যুগে। প্রথম তিন গ্রিক বৈয়াকরণ হলেন দিওনুসিওস্ থ্রাক্স (খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দি), আপোলোনিওস্ দুস্‌কোলোস্ (খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দি) ও তাঁর পুত্র হেরোদিয়ানুস্। দিওনুসিওস্ থ্রাক্স প্রধানত রূপতত্ত্বের মূল কাঠামোর বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দিতে গ্রিক ব্যাকরণের প্রায় সমস্ত দিক যথা — বাক্যে ব্যবহৃত পদের শ্রেণিকরণ, লিঙ্গ, বচন, কারক, ক্রিয়ার কাল, পুরুষ প্রভৃতি তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি বাক্যতত্ত্ব বোঝাতে Syntax শব্দটিব্যবহার করেছেন। এর পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দিতে আপোলোনিওস্ দুস্‌কোলোস্ এর সঙ্গে যোগ করেন বাক্যতত্ত্বের বিধিবদ্ধ আলোচনা। তারপর হেরোদিয়ানুস্ গ্রীক ভাষার স্বরাঘাত-বিধি ও বিরাম-বিধি নিয়ে আলোচনা করেন।

গ্রিক ব্যাকরণের তিনটি সীমাবদ্ধতা ছিল —

প্রথমত, এই ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব বেশি।

দ্বিতীয়ত , গ্রিকরা ভাবতো তাদের ব্যাকরণের কাঠামো সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য — অর্থাৎ তা সার্বজনীন।

তৃতীয়ত, এই ব্যাকরণের আলোচ্য ভাষা কথ্য ভাষা নয়, সাহিত্যের ভাষা।

✧ রোমে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা ঃ

ভাষাচর্চায় গ্রিসের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল রোমানদের উপর। তাদের রচিত অধিকাংশ ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রিক আদর্শে রচিত । গ্রিক ব্যাকরণের আদলে রোমে লেখা প্রথম যে লাতিন ব্যাকরণের নিদর্শন পাওয়া যায় তা হলো বৈয়াকরণ ভারো রচিত 'দে লিঙ্গুয়া লাতিনা'। ছাব্বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে লাতিন ভাষার অবিভক্তিক শব্দগুলির তিনি রূপতত্ত্বগত শ্রেণিবিভাগ করেছেন। লাতিন ভাষায় লেখা পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ হচ্ছে দোনাতুস এর 'আর্সমাইনর'। কাঠের টাইপে ছাপা এটিই প্রথম গ্রন্থ।

গ্রিক আদর্শে রচিত লাতিন ব্যাকরণের চরম বিকাশ হয়েছিল প্রিস্কিয়ানুস্ (৫১২-৬০) -এর লাতিন ব্যাকরণ 'ইন্স্‌তিতুতিওনেস্ গ্রামাতিকা'(খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) নামক রচনায়।। গ্রিক বৈয়াকরণদের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করলেও প্রিস্কিয়ান কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৌলিকতাও দেখিয়েছেন। তিনি ক্লাসিকাল লাতিন ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর মতে ভাষার ধ্বনি চার শ্রেণির —

ক. অর্থের জন্য উচ্চারিত ধ্বনি,

খ. অর্থের জন্য উচ্চারিত নয় এমন ধ্বনি,

গ. শুধু লেখার প্রয়োজনে ব্যবহৃত ধ্বনি,

ঘ. ধ্বনি উচ্চারিত হয় কিন্তু তার কোন লিখিত রূপ নেই।

পদের কথা বলতে গিয়ে আট প্রকার পদের কথা বলেছেন — বিশেষ্য, ক্রিয়া, সর্বনাম, ক্রিয়া-বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, পদান্বয়ী অব্যয়, অনন্বয়ী অব্যয় ও সংযোজক অব্যয়। মধ্যযুগে বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধ ব্যক্তির আভিজাত্যের মাপকাঠি ছিল ক্লাসিকাল লাতিনের চর্চা ও তার সহায়ক প্রিস্কিয়ানুস্ এর ব্যাকরণ অনুসরণ। এমনকি পরবর্তী যুগের লাতিন ভাষায় ব্যাকরণ রচিত হয়েছে তা মূলত এই ব্যাকরণেরই অনুসারী। শুধু তাই নয়, এই লাতিন ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠেছিল যে লাতিন ভাষার ব্যাকরণের কাঠামো সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরবর্তীকালে শুধু রোম নয়, সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগ পর্যন্ত লেখা সমস্ত ব্যাকরণই প্রিস্কিয়ানকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছিল।

✧ প্রাচীন ভারতে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা :

প্রাচীন ভারতে ভাষাজিজ্ঞাসার সূচনা বৈদিক সাহিত্যের 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থাবলীতে। তবে ভাষাবিজ্ঞানের সুস্পষ্ট বিকাশ দেখা যায় 'বেদাঙ্গের' মধ্যে। প্রাচীন ভারতে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দিতে যাস্ক, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দিতে পাণিনি, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দিতে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ভাষাচর্চা করেছিলেন। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন পাণিনি। তাঁর ব্যাকরণের নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। বিভিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে বহু শ্রুত, বহু পঠিত ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বহুল প্রচারিত হলো পাণিনির এই ব্যাকরণ। এতে আছে বীজগণিতের সূত্রের মতো প্রায় চারহাজার সূত্র। সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত ও সুবিন্যস্ত। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'-এর সাহায্য ছাড়া ঐ সূত্রগুলির তাৎপর্য বোঝা কঠিন। ' সুপ্ তিঙন্তং পদম্ ' পাণিনির এই সূত্র আজও ভাষা গঠনের মূল কথা । তাঁর মতে শব্দ মাত্রই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয় ।

পাণিনি সংস্কৃত ভাষার গঠনমূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অসাধারণ মনীষা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। একারণে তিনি পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতমহলেও শ্রদ্ধাঅর্জন করেছেন। পাণিনি ও তাঁর অষ্টাধ্যায়ীর কালনির্ণয় আজও অমীমাংসিত। সংস্কৃতে 'ব্যাকরণ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ' বিচ্ছিন্নকরণ, বিশ্লেষণ' । বিশ্লেষণাত্মকদৃষ্টিভঙ্গীতেই পাণিনি তাঁর ভাষাভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। পাণিনি ব্যঞ্জন আলোচনায় কণ্ঠনালী থেকে বিচার শুরু করেছেন কিন্তু পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীরা ঠোঁট থেকে আলোচনা শুরু করেছেন। ব্যাকরণের ভারতীয় ঐতিহ্যের শুরু যেমন পাণিনির আগে তেমনই পাণিনির পরবর্তী সময়েও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত।

✧ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চা :

উনবিংশ শতাব্দির শেষ পাদেই পাশ্চাত্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বা গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত। এরপর বিংশ শতাব্দির প্রথমে সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুরের হাত ধরে এই ধারার প্রতিষ্ঠালাভ। বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান একছত্রাধিপত্য লাভ করে এবং এর চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল আমেরিকা। গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল কোনো ভাষার একটি নির্দিষ্টকালের রূপ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা।

রূপ বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় ভাষার গাঠনিক উপাদানগুলির বিশ্লেষণ — কীভাবে বিভিন্ন ছোট ছোট এককের সমন্বয়ে বড় বড় এককগুলি গঠিত হচ্ছে বা বড় এককগুলিকে ক্ষুদ্রতর এককে বিভক্ত করা হচ্ছে। বিভিন্ন মাপের এককগুলি চিহ্নিত করা ও তাদের শ্রেণিবদ্ধ করা ইত্যাদিও হল বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি। মূলত ভাষার গঠন বিশ্লেষণ করে বলে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্য নাম গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান । গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার গাঠনিক উপাদানগুলিকে তিনটি স্তরে ভাগ করে বিশ্লেষণ করে — ধ্বনি, রূপ ও বাক্য। এই তিন স্তর অনুসারে, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান তিনটি আলোচ্য বিভাগের নাম — ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব।

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ব্লুমফিল্ডের রচিত 'ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থটি গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বকে প্রভাবিত করে। ব্লুমফিল্ডের রচনার সময় প্রাগে ধ্বনিতত্ব নিয়ে একটি ভাষাতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ত্রুবেৎস্কয়ের (১৮৯০-১৯৩৮) নেতৃত্বে সুনিপুণ আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের মৌল রূপরেখা এরা নির্ধারণ করেন। ধ্বনিতত্ত্বের স্বতন্ত্র জগৎ চিহ্নিত হল। একটি বিশেষ ভাষার ধ্বনিপ্রতীকগুলির উপাদান, নিয়মাবলী এবং স্বাতন্ত্র্যের ধারণা, বিন্যাসরীতি ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রাধিকার পেল। স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকেই ধ্বনিমূল ধারণাটি এল। শব্দজোড় (minimal pairs), পরিপূরক অবস্থান (complementary Distribution), বৈপরীত্য ধারণা (Binary opposition) ধ্বনিপরিবেশ সমস্ত কিছুই গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে বিস্তৃত ভূমিকা নিল।

নোয়াক চমস্কি ১৯৫৭ সালে বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় যে গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম 'Syntatic structures' এখানে ব্লুমফিল্ডীয় পদ্ধতি অস্বীকৃত হল। মানুষ কিভাবে ভাষা আয়ত্ত করে — এ বিষয়ে চমস্কির কৌতূহল ছিল অসীম। তিনি বললেন একটি প্রাথমিক ভাষাতথ্য (Primary Linguistic data) সমস্ত মানুষের বোধশক্তিতে জন্মের পরই থাকে। মানুষ পরে সেই প্রাথমিক ভাষাতথ্যের জায়গায় পরিচিত শব্দ যোগ করে নিজের ভাষায় কাজকর্ম চালায়। ব্যাকরণ এমনভাবে লিখিত হবে যাতে সে মানুষের বলা বাক্যমালা কিভাবে উৎপাদিত হয় তার ব্যাখ্যা করতে পারে। চমস্কি এক্ষেত্রে সোস্যুরের বলা লাঙ' এবং 'পারোল' তত্ত্বকে সামর্থ্য ও সম্পাদন (Competence & Performance) বলে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করলেন। বক্তা বাক্শক্তি ব্যবহারের মুহূর্ত থেকেই তার

ভাষার ব্যাকরণ জানে। এটাই হল সামর্থ্য।

যেহেতু মানুষ তার সীমিত ভাষা উপাদান দিয়ে অসংখ্য বাক্য সৃষ্টি করতে পারে, তাই চমস্কিয় ব্যাকরণ সংবর্তনী-সঞ্জননী। তাহলে তা রূপান্তরী কেন! তিনি এক্ষেত্রে রূপান্তরের কয়েক নিয়ম যুক্ত করেছেন। যেমন নূতন উপাদান যোগ হতে পারে, পরিবর্ত উপাদান আসতে পারে। আবার রূপান্তর করলে বাক্ গ্রন্থনায় পরিবর্তন ঘটতে পারে। অন্বয় নিয়ে চমস্কির এই তত্ত্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মগ্ন গঠন এবং প্রতিভাসিক গঠনের কল্পনা। মগ্ন গঠনের উপাদান দিয়ে বাক্য গড়ে তোলে। কিন্তু সে বাক্য অনুচ্চারিত থাকে। রূপান্তর বিধিতে পালটে ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মে যে বাক্য আমরা শুনি, তা হল প্রাতিভাসিক গঠন। অনেক সময় দেখা যায় প্রাতিভাসিক গঠনে দুটি বাক্য আলাদা হলেও মগ্ন গঠনে তারা এক।

মগ্ন গঠন কিছু নিয়মের মধ্য দিয়ে প্রাতিভাসিকে পৌঁছয়। এই নিয়মগুলি রূপান্তরের নিয়ম এবং ধ্বনিরূপমূলের নিয়ম। মগ্ন গঠনে বাক্য থাকে বিমূর্ত। যেমন উদ্দেশ্য-বিধেয়। এখানে শব্দের আন্বয়িক সম্পর্ক তুলে ধরা হয় । পরে প্রাতিভাসিক গঠন তা বাক্যে শোনা যায়। প্রয়োজনে বক্তব্য বদলালে রূপান্তরী প্রাতিভাসিক গঠনও বদলাতে পারে। প্রাতিভাসিক রূপ আমরা শুনি ধ্বনির মাধ্যমে। এই ধ্বনি বিমূর্ত নয়। বাক্যের প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুতর হল অর্থ। বাক্যের একপ্রান্তে থাকে অর্থ আরেক প্রান্তে ধ্বনি। অর্থ শেষ অবধি অন্বয় হয়ে ধ্বনিতে পৌঁছে যায়।

চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্বে খুব বড়ো করে দেখা হয়েছে মানুষের মনের সঙ্গে ভাষা সৃষ্টির সম্পর্ককে। এ পর্যন্ত মনের কথা, বোধ শক্তির কথা মস্তিষ্কের কথা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় উপেক্ষিত ছিল। এখন প্রশ্ন উঠেছে চমস্কির এই ব্যাকরণও সঠিক কিনা। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণ মনোবাদী ধারণা এবং ভাষাতত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে চমস্কিই প্রথম আমাদের সচেতন করলেন, এটা স্বীকার করতেই হয়।

আধুনিককালে বাক্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার ধারাটি সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে জর্জ ল্যাকফের 'ইন সিনট্যাক্স (১৯২৫), ডেভিড পার্লমুটারের ' সারফেস স্ট্রাকচার কন্‌সট্রেন্টস ইন সিনট্যাকস'(১৯২৫ , এমোন বাখের ' সিনট্যাকটিক থিওরি' (১৯২৫), সাইমন ডিকের 'স্টাডিজ ইন ফাংশনাল গ্রামার'(১৯২৫) ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

✧ সূত্রাকারে প্রথাগত, সাংগঠনিক ও রূপান্তর বা সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণের পার্থক্য ঃ

ক. প্রথাগত ব্যাকরণের সময়সীমা ব্যাকরণ চর্চার আদি অর্থাৎ ৪২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে মোটামুটি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ।

গঠনমূলক ব্যাকরণের সময়সীমা ১৯২৫ খিষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ।

রূপান্তর মূলক বা সৃজনী ব্যাকরণের সময়সীমা ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত তৎ অনুসারীদের চর্চা ।

খ. প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষা বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী মন্ময় বা আত্মনিষ্ঠ ।
গঠনমূলক ব্যাকরণে ভাষা বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ ।
রূপান্তর মূলক বা সৃজনী ব্যাকরণে ভাষা বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিশীল ।

গ. অর্থই প্রথাগত ব্যাকরণের প্রধান মানদণ্ড ।
অর্থের উপর গুরুত্ব না দিয়ে গঠনমূলক ব্যাকরণে বিভিন্ন তত্ত্ব (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব) -এর উপর জোর দেওয়া হয়।
মগ্ন বচনের উপর জোর দেওয়া হয় সৃজনী ব্যাকরণে ।

ঘ. প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ।
গঠনমূলক ব্যাকরণে বিশেষ সূত্র ধরে বর্ণনা করা হয় ।
রূপান্তরমূলকে ভাষার সৃজনী শক্তির উপর জোর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

ঙ. প্রথাগত ও গঠনমূলক ব্যাকরণে অনেকটাই বাহ্যঅর্থের উপর জোর দেওয়া হয়।
রূপন্তরমূলক ব্যাকরণে বাক্যের গভীরতল ও উপরিতল বিশ্লেষণ করে গূঢ় অর্থকেও ধরা হয় ।

✧ বিংশ শতাব্দির বাংলা ভাষাবিজ্ঞান চর্চা ঃ

বিংশ শতাব্দিকে বলা হয় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের যুগ । এই সময় বাংলা ব্যাকরণ চর্চার দুটি সমান্তরাল ধারা দেখা যায়। একটি ধারায় আছে প্রথাগত ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ। অন্যধারাটিকে বলা যায় আধুনিক ব্যাকরণ ভাবনার ধারা। এই ধারাটির আবার দুটি উপধারা রয়েছে। একটি উপধারায় রয়েছে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সোচ্চার যেসব ভাষাবিদ্, তাঁদের নিজস্ব ভাবনা চিন্তার ফসল প্রবন্ধ, পুস্তক ইত্যাদি। যেমন — রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব', 'বাংলাভাষা পরিচয়', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত', 'না', প্রমথ চোধুরীর 'কথার কথা' ইত্যাদি। এই ধারার প্রবন্ধ পুস্তকে বাংলা ভাষার আংশিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তবে এগুলি কোন সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নয়।

দ্বিতীয় উপধারাটি পুরোপুরি পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান প্রভাবিত। এই উপধারার বিভিন্ন প্রবন্ধ-পুস্তকে পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। সেই প্রতিফলনে গড়ে ওঠে বাংলার তুলনামূলক ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, বর্ণনামূলক ব্যাকরণ, সঞ্জননী ব্যাকরণ, ভাষাশিক্ষা সহায়ক ব্যাকরণ, উপভাষা, সমাজ

ভাষার বিশ্লেষণ ইত্যাদি। এই ধারার প্রবন্ধ পুস্তকের মধ্যে দু-চারটি ছাড়া সবই ভাষার আংশিক বিশ্লেষণ, ভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণ নেই। এই ধারাটিকেই বলা যায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান। এই ধরণের আলোচনায় বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞানীরা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে আছেন।

আধুনিক বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিফলিত রূপগুলি --

ক. **তুলনামূলক ঐতিহাসিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব :** -- এই পর্বের তুলনামূলক ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্ভর প্রধান এবং সম্পূর্ণ গ্রন্থ হলো সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of the Bengali Language' (ODBL), পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' ও 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা'। এছাড়াও রয়েছে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শ্রীনাথ সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ।

খ. **বর্ণনামূলক বাংলা ভাষাতত্ত্ব :** -- তুলনামূলক ঐতিহাসিক তত্ত্ব থেকে বর্ণনামূলক তত্ত্বে উত্তরণের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। এই ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ পদ্ধতি মূলত বর্ণনামূলক। রফিকুল ইসলামের 'ভাষাতত্ত্ব', হুমায়ুন আজাদের 'বাক্যতত্ত্ব', প্রবাল দাশগুপ্তর 'কথার ক্রিয়াকর্ম' ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে পুণ্যশ্লোক রায়ের 'Bengali Language Hand-book', এবং সোমদেব ভট্টাচার্য্য ও সুহাস চ্যাটার্জীর সম্মিলিত ভাষাশিক্ষা সহায়ক ব্যাকরণ 'Introduction to Bengali'।

গ. **সংবর্তনী-সঞ্জননী বাংলা ভাষাতত্ত্ব :** -- বাংলায় সংবর্তনী সঞ্জননী তত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত ১৯২৫ সালে প্রবাল দাশগুপ্তের 'চমস্কি', 'হ্যালি', 'নত্ববিধান' প্রভৃতি প্রবন্ধে। পবিত্র সরকারের 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ ও বাংলা ভাষা বিচারে তার প্রয়োগ' প্রবন্ধ। পরবর্তীকালে অরুণ কুমার ঘোষ ইত্যাদি এ বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু আজও এ ধারায় কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ নেই। তবে উদয়কুমার চক্রবর্তীর ' বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন ' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

ঘ. **উপভাষাতত্ত্ব ও সমাজভাষাতত্ত্ব :** -- বাংলা উপভাষা ও সমাজভাষার ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেন, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (আধুনিক ভাষাতত্ত্ব) , নির্মল দাশ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের ' মেদিনীপুরের উচ্চারণ', গোপাল হালদারের 'নোয়াখালি চট্টগ্রামের উপভাষা', মনিরুজ্জামানের 'কুমিল্লা উপভাষা', নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা', চম্পারাণী চট্টোপাধ্যায়ের ' বিষ্ণুপুরের উপভাষা' ইত্যাদি বিভিন্ন জেলাভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক গবেষণা নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

ঙ. **পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব :** -- বাংলা ভাষাতত্ত্বের পাঠ্যপুস্তকরূপে উল্লেখযোগ্য হলো সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত', রামেশ্বর শ-র 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান

ও বাংলা ভাষা', আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের ' আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ' , পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ' ভাষাবিদ্যা পরিচয়' ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

চ. **বানান ভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব :** — বাংলা বানানের সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে বাংলা ভাষাবিদ্‌রা অনেকেই ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া মনীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন ' বাংলা বানান', পবিত্র সরকার লিখেছেন ' বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' , পরেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ' বাংলা বানানবিধি' ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ।

ছ. **শৈলি ভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব :** — ব্লুমফিল্ড প্রভাবিত গঠনভিত্তিক বিশ্লেষণী ব্যাখায় শৈলিবিজ্ঞান আজকের যুগে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে । এ বিষয়ে আশিস্ কুমার দের 'উপন্যাসের শৈলি', পবিত্র সরকারের 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি' , অরুণ কুমার বসুর সম্পাদিত 'বাঙলা গদ্য : শৈলি বিজ্ঞান' , অপূর্ব কুমার রায়ের 'শৈলীবিজ্ঞান' , অবন্তী কুমার সান্যালের 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি' , বিপ্লব চক্রবর্তীর সম্পাদিত 'শৈলী : চিন্তাচর্চা' ইত্যাদি গ্রন্থ ভাষাভাবনার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

লিপি

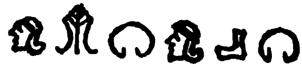
✧ লিপির ইতিহাস ও বিবর্তন ✧

মানুষ তার মনোভাবকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে লিপির ব্যবহার করে। এই লিপি থেকেই বর্তমান বর্ণমালা জন্মলাভ করেছে। ইতিহাসের থেকে আমরা জেনেছি মানুষ প্রথম পাহাড় পর্বতের গুহায় ছবির মাধ্যমে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলছেন যে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর মধ্যবর্তী ব্যবিলন অঞ্চলে (বর্তমান ইরাকে) ও নীলনদের পলিসমৃদ্ধ মিশরদেশেও লিপির আবির্ভাব ঘটে। ব্যবিলনের এই লিপি হল কিউনেইফর্ম বা বাণমুখ লিপি আর মিশরে পাওয়া লিপির নাম হিয়েরোগ্লিফ বা পূতলিপি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছবির পাশাপাশি তারা বিষয়বস্তুর প্রতীকীরূপ দেয়। এর পর আসে শব্দলিপি। ধীরে ধীরে মানুষ অক্ষরলিপি ও ধ্বনিলিপির ব্যবহার শেখে। এইভাবেই জন্ম নিয়েছে রোমীয় লিপি কিংবা ব্রাহ্মী লিপি। ভারতে ব্যবহৃত সব লিপিগুলির মধ্যে ব্রাহ্মী লিপিই প্রাচীন।

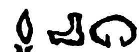
পৃথিবীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার লিপিগুলি হল — সুমেরীয় লিপি, মিশরীয় লিপি, ফিনিসীয় লিপি, চিনা লিপি, ভারতীয় লিপি ইত্যাদি। এছাড়া পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এমন কতকগুলি লিপি যেমন মায়া লিপি ইত্যাদি লিপি আছে।

✧ বিভিন্ন প্রকার লিপির চিত্র ✧

সুমেরীয় লিপি —



নর



নারী

মিশরীয় লিপি —



বৃষন্ র ম পত্

উঠে সূর্য মধ্যে আকাশ

ফিনিসীয় লিপি —



হ্ ন্ ম্ ক্ ল্ ম্

মনেহ্ মেলেক্

মণ (বাটখারা) রাজার

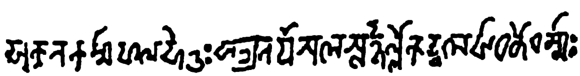
চীনা লিপি —



উচ্চারণ	অর্থ
ম	ঘোড়া
র্মা	মা
ম্য	একটা কাপড়
মা	গালি বিশেষ

ভারতীয় লিপি —

অশোকের ব্রাহ্মী লিপি



সুকৃতকর্মফলহেতুঃ সত্যতপোময়মূর্তিল্লোকদ্বয়সাধনো ধর্ম ঃ

সুন্দরবনের তিলপিতে পাওয়া ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত পোড়া মাটির সিল

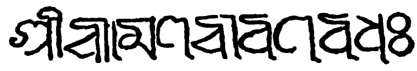


ষষ্ঠ শতাব্দির কুটিল লিপি —

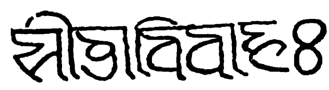


দেবান পিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন

দ্বাদশ শতাব্দির বাংলা লিপি —



শ্রী রা মে ণ রা ব ণ ব ধঃ



সী তা বি বা হ ঃ

✧ ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তন ঃ

কার্নিংহামের মতে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব ভারতেই। আর এই ব্রাহ্মী লিপি থেকে ক্রম বিবর্তিত হয়ে বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। শুধু বাংলা নয় কুটিল নাম নিয়ে এই লিপি ভারতীয় অন্যান্য লিপিগুলিরও আদি উৎস এই লিপি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে দ্বাদশ শতাব্দিতেই বাংলা লিপি সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে।

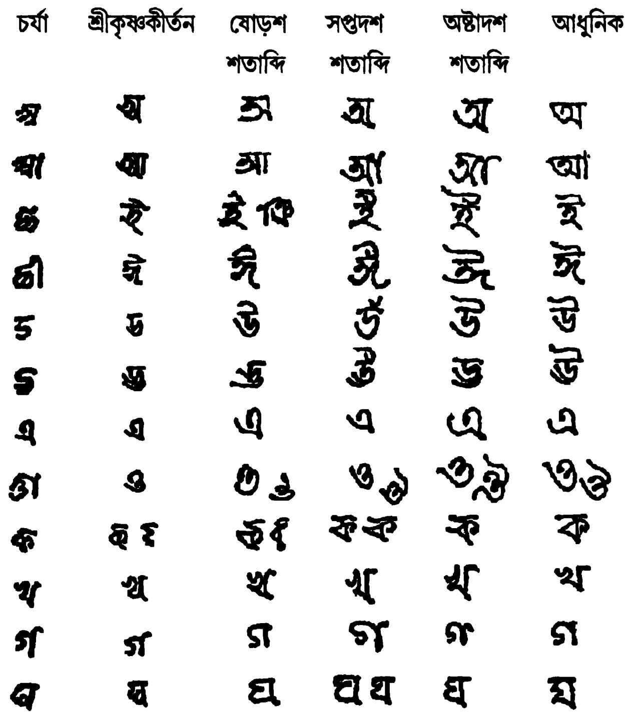
ব্রাহ্মীলিপি	দেবনাগরী	বাংলা,অসমিয়া	ওড়িয়া	গুরমুখি/পাঞ্জাবি	গুজরাতি
𑀅	अ म्र	অ	ଅ	ਅ	અ
𑀆	आ म्रा	আ	ଆ	ਆ	આ
𑀇	इ	ই	ଇ	ਇ	ઇ
	ई	ঈ	ଈ	ਈ	ઈ
𑀉	उ	উ	ଉ	ਉ	ઉ
	ऊ	ঊ	ଊ	ਊ	ઊ
	ऋ ऋ	ঋ	ଋ		ઋ
𑀏	ए	এ	ଏ	ਏ	એ
	ऐ	ঐ	ଐ	ਐ	ઐ
𑀑	ओ ग्रो	ও	ଓ	ਓ	ઓ
	औ ग्रौ	ঔ	ଔ	ਔ	ઔ
𑀓	क	ক	କ	ਕ	ક
𑀔	ख	খ	ଖ	ਖ	ખ
𑀕	ग	গ	ଗ	ਗ	ગ
𑀖	घ	ঘ	ଘ	ਘ	ઘ
	ङ	ঙ	ଙ	ਙ	ઙ
𑀘	च	চ	ଚ	ਚ	ચ

✧ বাংলা আধুনিক লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ✧

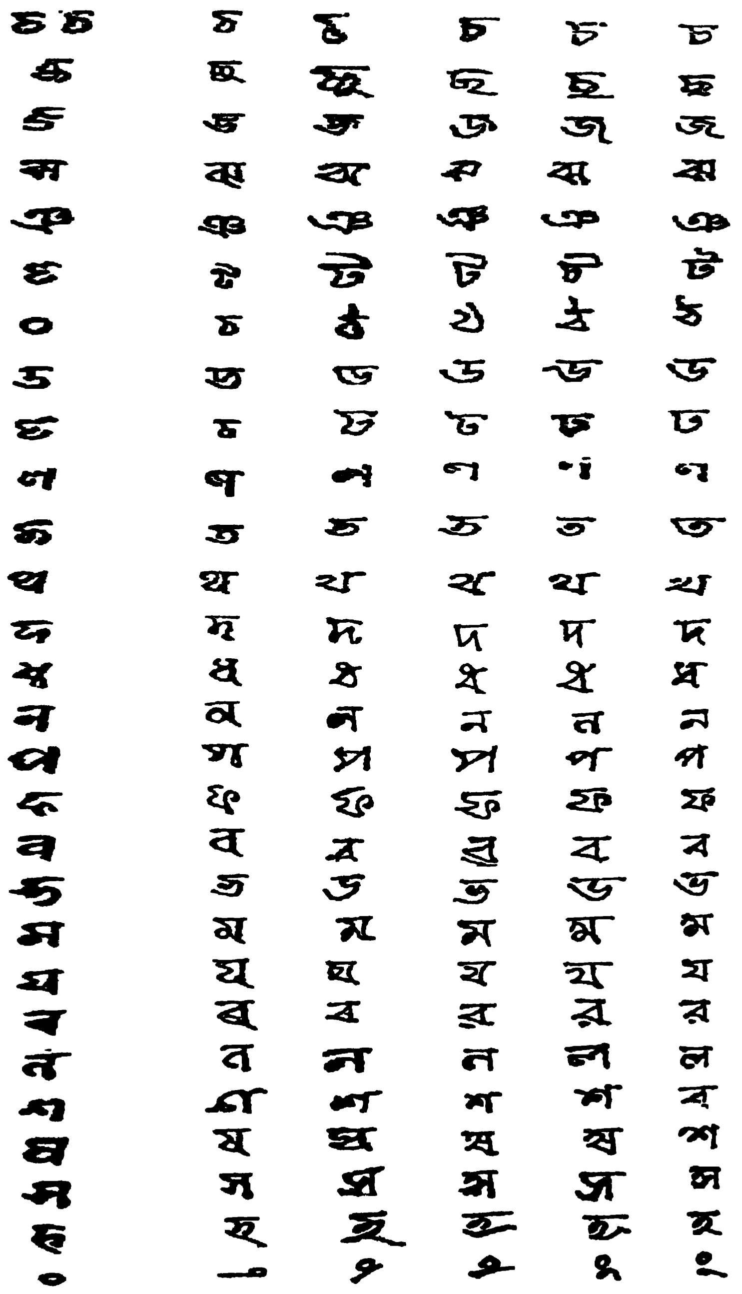
সপ্তম থেকে নবম শতাব্দিতে যে লিপির প্রচলন বাংলাদেশে ছিল তা হল ব্রাহ্মী লিপি। স্বরের মাত্রার আকৃতি কুটিল ছিল বলে এই লিপির নাম ‘কুটিল’। বাংলা লিপির প্রথম প্রয়োগ ঘটেছিল নবম শতাব্দিতে নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে। এরপর দশম- দ্বাদশ শতাব্দিতে চর্যাকারেরা এই লিপির প্রয়োগ করেন। তখনও ছাপাখানার প্রচলন ছিল না, তাই লিপির কোন নির্দিষ্ট মান বজায় ছিল না।

উইলকিন্স নামক এক ইংরেজ কুঠিয়ালের উৎসাহে হুগলি জেলার অধিবাসি খুশমৎ মুনশি হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে বাংলা লিপি তৈরি করেছিলেন। হুগলীর এন্‌ড্রুজ প্রেস থেকে একটি গ্রন্থ ছাপা হল। ভারতবর্ষে বাংলা মুদ্রিত লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন এটি। গ্রন্থটি হল হ্যালহেড (হালেদ) -এর রচিত ‘A Grammar of the Bengali Language’। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে।

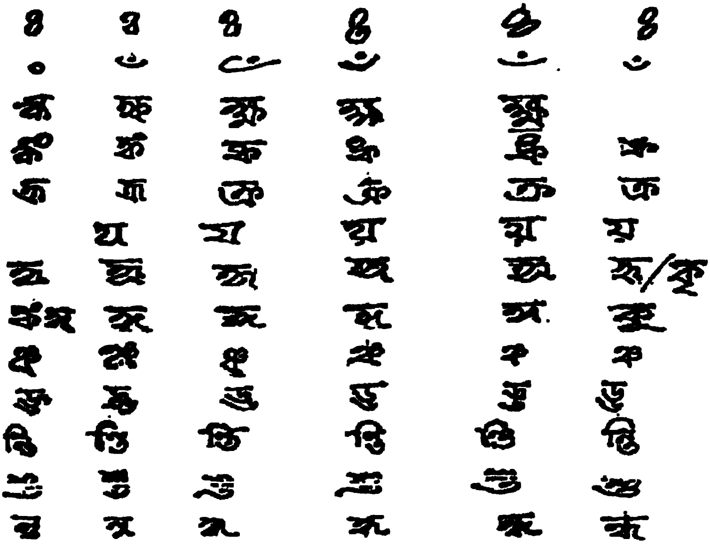
এরপর ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরির তত্ত্বাবধানে পঞ্চানন কর্মকার ও তার জামাতা মনোহর কর্মকার বাংলা লিপি তৈরি করলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার কালীকুমার রায়ের হাতের লেখা থেকেই এই হরফ তৈরি করা হয়। তারপর বিবর্তিত হতে হতে আজকের লিপিতে পৌঁছেছি।



চর্যা	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	ষোড়শ শতাব্দি	সপ্তদশ শতাব্দি	অষ্টাদশ শতাব্দি	আধুনিক



চর্যা	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	ষোড়শ শতাব্দি	সপ্তদশ শতাব্দি	অষ্টাদশ শতাব্দি	আধুনিক



'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে রচয়িতা মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আবার কিছুটা সংস্কার করেন। আজকে আমরা বাংলায় যে হরফ লিখছি তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি সংস্কৃত বর্ণমালাকে অনুসরণ করে এই বাংলা বর্ণমালা তৈরি করেছেন। মূল সংস্কৃতে ১৬ টি স্বর ও ৩৪ টি ব্যঞ্জন ছিল, বিদ্যাসাগর সেক্ষেত্রে ১২ টি স্বর ও ৪০ টি ব্যঞ্জন দিয়েছেন।

সংস্কৃত —

স্বর ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ

ব্যঞ্জন ঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ

বাংলা — (বিদ্যাসাগর প্রণীত)

স্বরবর্ণ —

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	ঌ
এ	ঐ	ও	ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ —

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ

এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর দীর্ঘ ঋ , দীর্ঘ ৯ , অং অঃ এই সংস্কৃত স্বরগুলি বাদ দিয়েছেন। আর ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে 'ক্ষ' কে বাদ দিয়ে নতুন ছয়টি ব্যঞ্জন অর্থাৎ ঢ় ড় য় ৎ ং ঃ ঁ এই ছয়টিকে স্থান দিয়েছেন। এখানে স্বরবর্ণের সংখ্যা ১২ টি ও ব্যঞ্জনের সংখ্যা ৪০ টি ।

পরবর্তীকালে ব্যবহার ও উচ্চারণের দিকে লক্ষ রেখে এই বর্ণমালা পুণর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র সরকারের প্রস্তাবিত বর্ণমালা হল —

স্বরবর্ণ —

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	এ	ও
ঐ	ঔ	ঋ	

ব্যঞ্জনবর্ণ —

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ড়	ঢ়	ল
য়	শ	ষ	স	হ
ৎ	ং	ঃ	ঁ	

বাঙালির উচ্চারণ ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমালার দিকে লক্ষ রেখে বাংলা বর্ণগুলি এরকম হওয়া উচিত । অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাব হল —

স্বরবর্ণ ঃ

মৌলিক স্বর —

ই	এ	অ্যা
	আ	
অ	ও	উ

যৌগিক স্বর —

ঐ	ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ

প	ফ	ব	ভ	ম
ত	থ	দ	ধ	ন
চ	ছ	জ	ঝ	
ট	ঠ	ড	ঢ	
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
য	র	ল	শ	
হ	ড়	ঢ়	ং	ঁ

এই হিসাব অনুযায়ী বাংলা স্বরবর্ণের সংখ্যা হলো ৯ টি এবং ব্যঞ্জনের সংখ্যা ৩২ টি। ছাপার প্রয়োজনে পাশাপাশি যুক্তব্যঞ্জন তৈরি করা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী বাংলা লিপি আর মোট ৫২ টি নয়, যুক্তব্যঞ্জন ধরে এর সংখ্যা প্রায় ৯৭৩ টি। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বানান সংস্কারের পর এর সংখ্যা এখন ৫০৭ এ নেমে এসেছে। অনেকে মনে করছেন লাইনোটাইপে ২৬০ টিতেই কাজ চালানো যায়। বাঙালিদের উচ্চারণ অনুযায়ী আমাদের প্রস্তাব মেনে নিলে এবং কম্পিউটারের যুগে যুক্তলিপি তলায় তলায় লিখলে সংখ্যা আরও কমতে বাধ্য ।আবার যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে হসন্ত দিয়ে লেখার একটা চল আছে, সেক্ষেত্রে যুক্তরূপের আর প্রয়োজন থাকে না।

✧ যুক্তরূপ লিপির রূপ পরিবর্তন ঃ

যুক্ত বাংলা লিপির যে রূপগুলির কম্পিউটারে সফ্‌টওয়ারে আগে বহুল প্রচলিত ছিল সেগুলি হল – টপটাইপ, লিপ অফিস ইত্যাদি কিন্তু বর্তমানে লিপির সংস্কার অনুযায়ী নতুন স ফ্‌টওয়ার হিসাবে এসেছে – বিজয়, তন্মাত্র, এস. টি. এম. ইত্যাদি। পূর্বের লিপির রূপকে বলা হচ্ছে 'নর্মাল ফ্রন্ট' এবং নতুন রূপকে বলা হচ্ছে 'একাডেমিক ফ্রন্ট'।

অতি-সম্প্রতি আকাদেমির বানানরীতি অনুযায়ী বিদেশি শব্দ ছাড়াও অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব শব্দ , অজ্ঞাতমূল শব্দের ক্ষেত্রে উচ্চারণ অনুযায়ী ' ্যা '-কার যোগ করে লিখতে হবে। যেমন - ক্যাবিনেট , অ্যালকোহল , ক্যাবলা, ন্যাকড়া , হ্যাংলা ইত্যাদি। তবে উচ্চারণে 'এ্যা' থাকলেও কতকগুলো বানানে 'এ' রাখা হচ্ছে । যেমন – এখন, কেমন, খেলা, বেড়ানো ইত্যাদি।

· যুক্তব্যঞ্জন লিপির রূপ পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে এ-কার, উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত রূপে ব্যবহার করা হতো এখন এগুলি ব্যঞ্জনের তলায় লেখা হচ্ছে। যেমন - শু > শু, গু > গু , ক্রু > ক্রু , হু > হু ইত্যাদি। যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে তলায় তলায় লেখা হচ্ছে । যেমন – ঞ্চ > ঞ্চ, ক্ত > ক্ত , হ্ন > হ্ন, স্থ > স্থ, ঙ্গ > ঙ্গ ইত্যাদি। 'ব' ও 'য' কে আলাদা করে ভেঙ্গে লেখার কথা বলা হয়েছে । যেমন – উদ্‌বাস্তু, উদ্‌বিগ্ন, উদ্‌বেগ ইত্যাদি।

পৃথিবীর ভাষাগোষ্ঠি

মানুষের জন্ম এবং মানব গোষ্ঠি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখের ভাষারও বিস্তার ঘটেছে। মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। সারা পৃথিবীতে যে মানব গোষ্ঠি বর্তমান তাদের ব্যবহৃত ভাষার নির্দিষ্ট সংখ্যা এনে হাজির করা বাস্তবে কঠিন। ভাষাবিদ্‌রা তার মধ্যে প্রায় চার হাজার প্রধান ভাষাকে বহুল প্রচলিত হিসাবে দেখিয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে প্রায় ২৫ টি ভাষা গোষ্ঠিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এমন অনেক ভাষার কথা জানা গেছে যেগুলি আজ মৃত অর্থাৎ তাদের ব্যবহার নেই।

✧ শ্রেণিবিভাগ ✧

ভাষার শ্রেণিবিভাগ বিষয়ে ভাষাবিদ্‌রা ঐকমতে পৌঁছাতে পারেন নি। তবুও কতকগুলি বিষয়ের উপর লক্ষ করে ভাষার শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

বংশানুগত বা ঐতিহাসিক বা গোষ্ঠিগত ঃ

সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এই পদ্ধতি অনুযায়ী ভাষার বংশতালিকা বা গোষ্ঠি অনুসন্ধান করে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। কোন্ ভাষার সূত্র থেকে একটা ভাষা জন্ম নিয়েছে এবং তার ঐতিহাসিক বিবর্তন থেকে তুলে ধরে এই ধরণের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

রূপতত্ত্বগত ঃ

এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের গঠনের উপর ভিত্তি করেই শ্রেণিবিভাগটি করা হয়েছে। বিশেষ করে ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যগঠনের প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করে এই শ্রেণিবিভাজন।

ভৌগোলিক ঃ

ভাষার ভৌগোলিক অবস্থান অর্থাৎ ভাষাগুলি পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রচলিত। এই অঞ্চলের উপর ভিত্তি করেই ভাষার শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

জাতিভিত্তিক ঃ

এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষাভাষির জাতির উৎস ও তার বিস্তারের উপর ভিত্তি করেই এই ধরণের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বহুল প্রচলিত ভাষাবংশগুলির জন্ম উৎস থেকে অর্থাৎ বংশগত শ্রেণিবিভাগের উপর ভিত্তি করে তাদের কতকগুলি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেগুলিকে আমরা ভাষাগোষ্ঠি বলছি।

বিভিন্নপ্রকার ভাষাগোষ্ঠিগুলি হল –

১. অস্ট্রিক গোষ্ঠি ঃ

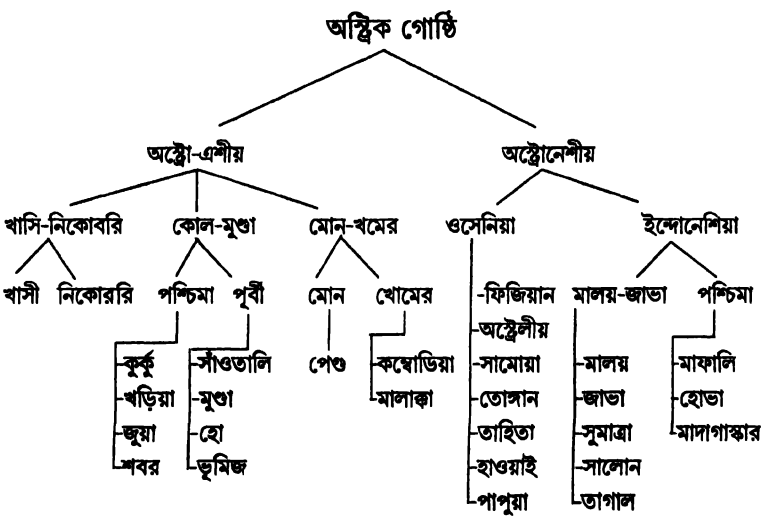
এই ভাষাবংশ মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত – ক) অস্ট্রো-এশীয় খ) অস্ট্রোনেশীয়।

i) অস্ট্রো-এশীয় ঃ

ভারত এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই ভাষাগোষ্ঠির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ভাষাবংশটি আবার তিনটি উপশাখায় বিভক্ত – (ক) খাসি-নিকোবরি, (খ) কোল-মুণ্ডা, (গ) মোন-খমের। মায়ানমার, মালয় এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের খাসি-নিকোবরি উপশাখার ভাষাগুলি প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িষ্যা ও মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থান জুড়ে কোল ও মুণ্ডা উপশাখার ভাষাগুলি প্রচলিত। কম্বোডিয়া, পেগু প্রভৃতি অঞ্চলে মোন-খমের উপশাখার ভাষাগুলি প্রচলিত আছে। এই শাখা ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠি।

ii) অস্ট্রোনেশীয় ঃ

অস্ট্রোনেশীয় ভাষাবংশ দুটি উপশাখায় বিভক্ত – (ক) ওসেনিয়া (খ) ইন্দোনেশিয়া। ফিলিপাইনস, নিউজিল্যাণ্ড, সামোয়া, তাহিতি, হাওয়াই, ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ওসেনিয়া উপশাখার ভাষাগুলি প্রচলিত। ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপপুঞ্জে ইন্দোনেশীয় উপশাখার ভাষাগুলি প্রচলিত। প্রাচীন মালয় ভাষার উপর ভিত্তি করেই বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষা বিস্তার লাভ করেছে।



২. **অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠি ঃ**

অস্ট্রেলীয়ার আদিম ভাষাগুলি এই গোষ্ঠিভুক্ত। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া অন্যত্র এই ভাষাগোষ্ঠির ভাষা প্রচলিত নেই বলে এক্ষেত্রে বিভাজনটি অনেকটাই ভৌগোলিক মানদণ্ডের উপর নির্ধারিত হয়েছে।

৩. **আন্দামানীয় গোষ্ঠি ঃ**

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত আদিম ভাষাগুলি এই গোষ্ঠিভুক্ত। তবে এই গোষ্ঠির ভাষা ব্যবহার খুবই কমে গেছে। গ্রিয়ার্সন আন্দামানীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা জানিয়েছিলেন ১৮৮২ টি, কিন্তু সাম্প্রতিককালে ১৫ টির বেশি ভাষার ব্যবহার নেই। তবে এর মধ্যে বাংলা , তামিল , তেলেগু, মালায়ালি ভাষার ব্যবহার বেশি। প্রায় ৬৫ হাজার লোক বাংলা, ৫৪ হাজার লোক তামিল, ৩২ হাজার লোক তেলেগু ভাষায় কথা বলে।

৪. **আলতীয় গোষ্ঠি ঃ**

এই ভাষাগোষ্ঠির প্রধান তিনটি উপশাখা হল – (ক) তুর্ক-তাতার বা তুরেনীয় (খ) মোঙ্গল (গ) মাঞ্চু। এই ভাষাগোষ্ঠি জাত ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যা কয়েক কোটি। তুরস্ক, ভল্গা নদীর পূর্ব প্রান্তিয় রাশিয়া, তুর্কিস্থান অঞ্চলে তুর্ক-তাতার উপশাখার বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। মঙ্গোলিয়াতে মোঙ্গল এবং মাঞ্চুরিয়াতে মাঞ্চু উপশাখার বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। তাছাড়া উত্তর-পশ্চিম ইরান এবং উত্তর আফগানিস্তানের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই ভাষাগোষ্ঠিভুক্ত প্রধান ভাষাগুলি প্রচলিত। কোন কোন ভাষাবিদ্ জাপানি, কোবিয় এবং এস্কিমো গোষ্ঠিকে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।

আলতাইক গোষ্ঠি
- তুর্ক-তাতার বা তুরেনীয়
- মোঙ্গল
- মাঞ্চু

৫. **ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠি ঃ**

আজকের পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ও উন্নত সাহিত্য রচিত হয়েছে এই গোষ্ঠি ভুক্ত ভাষা থেকেই। সেইজন্য এই ভাষা গোষ্ঠিকে পৃথিবীর প্রধান ভাষা গোষ্ঠি বলা হয়। আনুমানিক ৪৫০০ হাজার বছর আগে এই গোষ্ঠির জন্ম হয়। ভাষাবিদ্দের ধারণা রাশিয়ার ইউরাল অঞ্চলে খ্রিষ্ট-পূর্ব ২৫০০ বছর আগে আর্যরা এই ভাষার সূত্রপাত ঘটায়। আধুনিক গবেষণায় কোন কোন ভাষাবিদ্ বলেছেন এই জনগোষ্ঠি সম্ভবত টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী দুটির মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে বাস করত। ভাষাবিজ্ঞানীরা এই গোষ্ঠির নাম দিয়েছেন 'বীর'। এই ভাষাগাষ্ঠি প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত – কেন্তুম্ ও শতম্।

৬. উত্তর আমেরিকাদেশীয় গোষ্ঠি ঃ

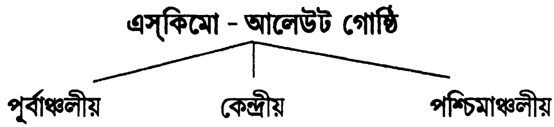
কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাগুলি এই শ্রেণিভূক্ত। এই গোষ্ঠির ভাষা আবার ২৫ টি উপগোষ্ঠিতে বিভক্ত। এর মধ্যে আলগোন্‌কিন ও আথাপাস্‌কানের ব্যবহার বেশি।

৭. ইউরালীয় বা ফিন্নো- উগ্রীয় গোষ্ঠি ঃ

হাঙ্গেরির মাজ্যর বা হাঙ্গেরীয়, স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ার যাযাবরদের ভাষা লাপ্পীয়, ফিনল্যাণ্ডের ফিন্নীয়, সাইবেরিয়া অঞ্চলে সামোয়েদ এবং এস্থোনিয়ার ভাষা এস্থোনীয় এই গোষ্ঠিভূক্ত ভাষা। ত্রয়োদশ শতক থেকে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালার পার্শ্ববর্তী ভাষা বলে একে ইউরালীয় বলা হয়।

৮. এস্‌কিমো - আলেউট গোষ্ঠি ঃ

উত্তর আমেরিকার আলাস্কা থেকে পূর্বে গ্রিনল্যাণ্ড পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী এস্কিমো ও আলেউশীয় দ্বীপপুঞ্জে আলিউটদের ভাষা এই গোষ্ঠিভূক্ত। এর তিনটি উপগোষ্ঠি আছে — ক) পূর্বাঞ্চলীয় খ) কেন্দ্রীয় গ) পশ্চিমাঞ্চলীয়।

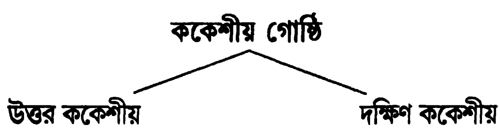


৯. এশিয়ানীয় গোষ্ঠি ঃ

নাম থেকেই বোঝা যায় যে এটি ভৌগোলিক বিভাজন পদ্ধতি অনুযায়ী এসেছে। এই গোষ্ঠির অধিকাংশ ভাষাই বিলুপ্ত। এশিয়া মাইনর, মোসোপটেমিয়া, ব্যাবিলনের জাগ্রোস পার্বত্য অঞ্চল, ক্রীট দ্বীপ অঞ্চলে এই ভাষার বিস্তার ছিল। ভাষাগুলি হল সুমেরীয়, এলামীয়, কাসসীয়, খালদীয়, লাইসীয়, লাইদীয় ইত্যাদি।

১০. ককেশীয় গোষ্ঠি ঃ

কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের এই ভাষা দুটি উপশাখায় বিভক্ত। দুটি ভাগ হল — ক) উত্তর ককেশীয় খ) দক্ষিণ ককেশীয়।



১১. জাপানি এবং কোরীয় গোষ্ঠি ঃ

জাপান ও কোরিয়ায় প্রচলিত ভাষাগুলি এই গোষ্ঠিভূক্ত। জাপানির প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে কোজিকি ও নিহোনগিতে।

১২. তাসমানীয় গোষ্ঠি ঃ

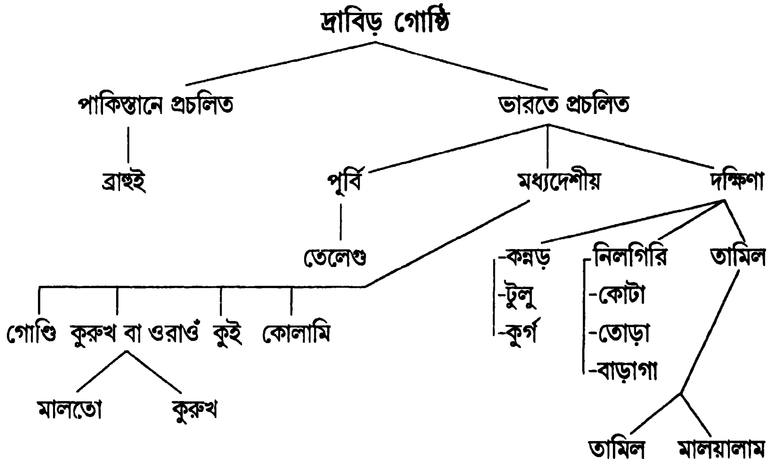
তাসমানিয়ার এই গোষ্ঠির ভাষাগুলি বর্তমানে লুপ্ত।

১৩. দক্ষিণ আমেরিকাদেশীয় গোষ্ঠি ঃ

ভৌগোলিক মানদণ্ডে এই গোষ্ঠিকে বিভাজিত করা হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চলের এই ভাষাগুলি হল আলাকলুফ, আমুএশা, আরাওয়াক, আয়মারা, শিকিটো, এনিমাগা, গুয়াহিবো, জে ইত্যাদি।

১৪. দ্রাবিড় গোষ্ঠি ঃ

এই ভাষাগোষ্ঠির ভাষাগুলি অধিকাংশই ভারতবর্ষের এবং একটি মাত্র ভাষা বর্তমান পাকিস্তানে প্রচলিত আছে। ভারতে প্রচলিত এই ভাষাগুলি তামিল, তেলেগু কানাড়া, মালয়ালাম এবং পাকিস্তানে প্রচলিত এই ভাষা হল ব্রাহুই।



১৫. পাপুয়ী গোষ্ঠি ঃ

ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এই গোষ্ঠির ভাষাগুলি নির্ণিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিউগিনি, হাল্‌মাহেরা,ইন্দোনেশীয়, মেলামেশীয় ভাষা এই গোষ্ঠিভূক্ত।

১৬. প্রত্ন - এশীয় বা হাইপারবোরীয় গোষ্ঠি ঃ

ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এই গোষ্ঠির ভাষাগুলি নির্ণিত হয়েছে। এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ইউকাগির, শুকচি - কামশাডাল ও আইনু এই গোষ্ঠিভূক্ত ভাষা।

১৭. বাস্ক গোষ্ঠি ঃ

স্পেন ও ফ্রান্সের কিছু অঞ্চলে এই ভাষা প্রচলিত। বাস্কভাষীরা এই ভাষাকে ইউসকারা

বা এসকুয়ারা বলে চেনে। এর অন্তর্গত প্রধান দুটি ভাষা হল বাস্ক ও আইবেরো।

১৮. বাণ্টু গোষ্ঠি ঃ

সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে এই ভাষা প্রচলিত। এই গোষ্ঠির ১১টি উপশাখা আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হলো সোয়াহিলি। কাফি, জুলু, রুনডি, গনডা, ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত ভাষা।

১৯. বুরুশাস্‌কি বা খাজুনা গোষ্ঠি ঃ

ভারতের কাশ্মিরের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত ।বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠি ঘিরে এর অবস্থান বলে এটি ব্যবহার ক্ষীণ।

২০. ভোট - চিনীয় গোষ্ঠি ঃ

হুমায়ুন আজাদ এই গোষ্ঠির নাম দিয়েছেন ' চীনা - তিব্বতি '। চিন, তিব্বত , বর্মা, শ্যাম, আন্নাম প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভাষাগোষ্ঠির ভাষা প্রচলিত আছে। সব থেকে বেশি মানুষ এই গোষ্ঠিভূক্ত ভাষাতেই কথা বলে।

২১. মেক্সীয় গোষ্ঠি ঃ

ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এই গোষ্ঠির ভাষাগুলি নির্ণিত হয়েছে। মায়া, শিনানটেক, লেংকা, জাপোটেক ইত্যাদি এই গোষ্ঠিভূক্ত ভাষা।

২২. লা - তি গোষ্ঠি ঃ

য়ুনান, তোংকিং সীমান্তে ও উত্তর ভিয়েতনাম অঞ্চলে প্রচলিত।

২৩. সুদানি - গিনীয় গোষ্ঠি ঃ

আফ্রিকার কিছু অংশে এই ভাষা প্রচলিত। সুদানে হাউস্‌সা, কানুরি, শিলুক, এফিক , ইওরুবা ইত্যাদি ভাষা এই গোষ্ঠিভূক্ত ।

২৪. সেমীয়-হামীয় গোষ্ঠি ঃ

এই গোষ্ঠির ভাষা সৌদি আরব, ইরাক , ইরান, সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, মিশর, মরক্কো, ইথোপিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। এই গোষ্ঠির প্রধান দুটি উপগোষ্ঠি হল-- ক) সেমীয় খ) হামীয়। সেমীয় শাখার প্রধান ভাষা হল আরবি।



২৫. হটেনটট্ - বুশ্‌মান গোষ্ঠি ঃ

আফ্রিকার দক্ষিণ- পশ্চিম অঞ্চলে পিগ্‌মিদের ভাষা এই গোষ্ঠিভূক্ত। এর প্রধান দুটি উপগোষ্ঠি হল — ক) হটেনটট্ খ) বুশ্‌মান ।

✧ ইন্দো - ইউরোপীয় গোষ্ঠি ✧

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারছি যে, আদিম জনগোষ্ঠি যাযাবর ছিল। খাদ্য ও পশুচারণক্ষেত্রের অভাব ঘটলে তারা বাসস্থান পরিবর্তন করতো। তাছাড়া নানা গোষ্ঠির দ্বন্দ্বের ফলে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপগোষ্ঠিরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আনুমানিক ২৫০০ হাজার বছর খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে এই গোষ্ঠির মানুষেরা (আর্য) ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এবং ভাষার বিস্তার ঘটে। মনে করা হয় ভূমধ্যসাগরের আশে পাশের অঞ্চল অথবা রাশিয়ার উরাল অঞ্চল থেকেই আর্য গোষ্ঠি পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীতে যত ভাষাগোষ্ঠি আছে তার মধ্যে প্রধান হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠি।

নামকরণ ঃ

'ইন্দো-ইউরোপীয়' এই নামকরণটি করেছিলেন ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানীরা। সুকুমার সেনের মতে --

> এই ভাষাবংশের নাম দেওয়া হইয়াছে ইন্দো-ইউরোপীয়, কেননা এগুলির বর্তমান বংশধর ভাষাসমূহ একসীমায় ভারতবর্ষে, অপরসীমায় ইউরোপে, এবং ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যস্থানে -- ইরানে ও পূর্ব-এশিয়ার অপর কোনো কোনো অঞ্চলে -- বরাবর প্রচলিত আছে।

অর্থাৎ ভাষা প্রয়োগের বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকা ধরে এর নামকরণ করা হয়েছে। বিস্তৃত সীমার একদিকে আছে ইন্দো (India) আর অন্য সীমান্তে ইউরোপ। দ্বন্দ্ব সমাস করে এই নামকরণ করা হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয়। সীমার দুই প্রান্ত ধরে নামকরণ করলে ভৌগোলিক বিভাজন পদ্ধতি অনুযায়ী অন্য অঞ্চল গুলি বাদ পড়ে যায়। যেমন এই গোষ্ঠির একটি প্রধান শাখা যা ইরানে প্রচলিত তা বাদ পড়ে যায়। তাছাড়া ইউরোপ হল মহাদেশ সেক্ষেত্রে সীমা বোঝাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, 'ইন্দো' শব্দ দিয়ে ভারতকে বোঝালেও ভারতে বর্তমানে প্রচলিত সব ভাষাই এই গোষ্ঠিভুক্ত নয়। দক্ষিণ ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে দ্রাবিড় গোষ্ঠির ভাষা এবং মধ্য ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে অষ্ট্রিক ভাষা প্রচলিত। তাই নামকরণ নিয়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে। জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ্ উইনফ্রেড লেমান্ এই গোষ্ঠির নাম দিয়েছেন 'ইন্দো-জার্মানিক্' তাঁর মতে --

> Since the Germanic family was located farthest to the north, in the Iceland, many scholars, particularly in Germany, label the family Indo-Germanic.

এই নামকরণে ইন্দো শব্দটি বাতিলযোগ্য। তাই রামেশ্বর শ' 'আর্য শব্দটির উপর জোর দিয়ে নামকরণ করা উচিত বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে --

> ভাষার নাম ধরলে দুই প্রান্তের দু'টি প্রাচীন ভাষার নাম অনুসারে এর নাম হওয়া উচিত ছিল 'বৈদিক-জার্মানিক্'। আর স্থানের নাম ধরলে এর নাম হওয়া উচিত ছিল ভারত-আইসল্যাণ্ডিক। কিন্তু আইসল্যাণ্ডিক বলতে এখন একটি অন্য বংশের ভাষাকে বোঝায়।

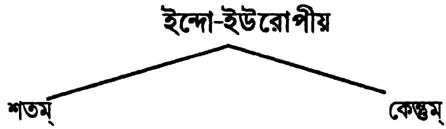
এইসব কারণে এই ভাষাবংশের সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও সহজ নাম মনে হয় — 'আর্য ভাষাবংশ'।

হুমায়ুন আজাদ আবার এই 'আর্য ভাষা বংশ ' নাম সম্পর্কে ভিন্নমত দিয়েছেন—

আর্য নামটি এখন পরিত্যক্ত। নাৎসীরা আর্যোমোকে এতো দূর নিয়ে গিয়েছিলো যে আর্য শব্দে ফ্যাশিবাদী দাগ কলুষের মতো লেগে আছে। এখন এ-ভাষাবংশটি ইন্দো-ইউরোপীয় নামেই পরিচিত।

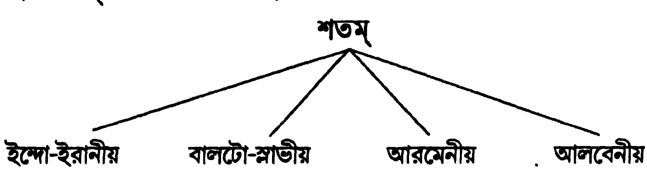
বিভাগ

দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলে এই ভাষাগোষ্ঠির পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের ভাষাব্যবহারে পার্থক্য দেখা দেয়। পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনির (K) রূপান্তরের উপর ভিত্তি করে ভাষাবিজ্ঞানী অ্যাসকোলি একে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।



মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় শতবাচক শব্দ (*Kmtom) পরবর্তীকালে কোন কোন ভাষায় 'শতম' হল আবার কোন কোন ভাষায় 'কেন্তুম্' হল। যেমন — সংস্কৃতে 'শতম্', গ্রিকে তা হল 'হে-কাতোন'।

শতম্ ঃ ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির যে ভাষাগুলিতে মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ স্পৃষ্ট ধ্বনি রূপান্তরিত হয়ে শিষধ্বনি (শ ষ স) -তে পরিণত হয়েছে সেই শাখাগুলিকে শতম্ বলা হয়। শতম্ শাখার ভাষাগুলি হল —



কেন্তুম্ ঃ ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির যে ভাষাগুলিতে মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ স্পৃষ্ট ধ্বনি বা কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে পশ্চাৎ কণ্ঠ বা স্নিগ্ধ তালব্য ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে সেই শাখাগুলিকে কেন্তুম্ বলা হয়। কেন্তুম্ শাখার ভাষাগুলি হল —



বিংশ শতাব্দিতে আরও দুটি শাখা আবিষ্কৃত হয়। অনেকেই এই দুটি শাখাকে কেন্তুম্ গোষ্ঠিতে রেখেছেন। কারণ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'ক' ধ্বনিটির পরিবর্তন ঘটেনি। নব আবিষ্কৃত শাখা দুটি হল —

নব আবিষ্কৃত (কেন্তুম্)

হিত্তীয় তোখারীয়

'শত' শব্দের ব্যবহার ঃ

শতম্ শাখা—

ইন্দো-ইরানীয় — শতম্
বাল্‌তো-স্লাভীয় — শুতো
আরমেনীয় —
আলবেনীয় —

কেন্তুম্ শাখা —

কেলতীয় — কেত
ইতালীয় — কেন্তুম্
জার্মানীয় — খুন্দ
হেল্লেনীয় — হে-কাতোন

নব আবিষ্কৃত —

হিত্তীয় —
তোখারীয় — কন্ত্

✧ শতম্ ✧

ইন্দো - ইরানীয় ঃ

শতম্ শ্রেণির একটি অন্যতম শাখা ইন্দো-ইরানীয়। ভারত ও ইরানে প্রাপ্ত নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে এই শাখার নামকরণ করা হয়েছে। এই শাখাকে ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে দলটি ইরানের দিকে চলে যায় সেটি হল ইরানীয় এবং যেটি ভারতের দিকে আসে তার নাম হল ভারতীয় আর্য।

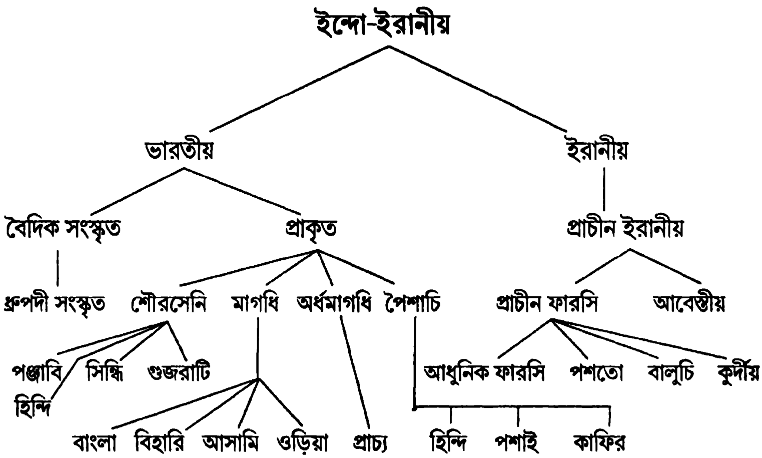
ইরানীয় বিভাগটি থেকে আবার দুটি প্রাচীন ভাষার জন্ম হয় — আবেস্তীয় ও প্রাচীন পারসিক। আবেস্তীয় ভাষার নিদর্শন হিসাবে জরাথুষ্ট্রের 'জেন্দ্ আবেস্তা' (পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ) পাওয়া গেছে। আর প্রাচীন পারসিকের নিদর্শনরূপে পাওয়া গেছে সম্রাট দারায়ুস ও তার পুত্র খশয়র্শার শিলালিপি ও ধাতু থেকে। ইরানীয় বংশের আধুনিক ভাষা হল আফগানিস্তানের পস্তু, ইরানে ফারসি, ইরাকের কুর্দি, বেলুচিস্তানে বেলুচির ব্যবহার আছে।

ভারতীয় আর্য শাখাটি আনুমানিক খ্রিষ্ট পূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এর প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে ঋক্ বেদের ভাষা পাওয়া গেছে। ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে এই শাখার তিনটি স্তর পাওয়া যায় —

ক) বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত (আনুমানিক ১২০০-৮০০ খ্রিঃ পূঃ)

খ) ধ্রুপদী সংস্কৃত (আনুমানিক ৪০০ খ্রিঃ পূঃ)

গ) প্রাকৃত



আর্মেনীয় ঃ

এই শাখাটি এশিয়া মাইনর অঞ্চলে খ্রিষ্ট পূর্ব সপ্তম অষ্টম শতাব্দিতে প্রচলিত ছিল। এর প্রাচীন নিদর্শনগুলি হল খ্রিষ্ট ধর্মের নানা বাণীর অনুবাদ। এই ভাষার দুটি রূপ বর্তমানে প্রচলিত আছে। একটি হল পূর্ব শাখা যা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নে ও ইরানে প্রচলিত। আর একটি হল পশ্চিম শাখা যেটি তুরস্কে প্রচলিত।

বাল্‌তো - স্লাভীয় ঃ

নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এই শাখার প্রধান দুটি ভাগ একটি হল বালতীয় আর অন্যটি স্লাভীয়। বালতীয় শাখার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা হল ষোড়শ শতাব্দিতে অনুদিত লুথারের রচনা। পশ্চিম কুরল্যাণ্ডে প্রচলিত তাহমীয় লিভনিয়ায় প্রচলিত 'উচ্চ', লিথুনীয়, লাতভীয় ইত্যাদি এই শাখার উত্তরসূরি। স্লাভ ভাষার প্রাচীন নাম ছিল বুলগার। এই শাখার আধুনিক প্রতিনিধি বুলগেরীয়, স্লোভেনীয়, রুথেনীয়, পোলীয়, রুশ, চেক ইত্যাদি।

আলবানীয় ঃ

এই শাখার আদি ইতিহাস তেমন কিছু জানা যায় নি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ

শতকের অনুদিত খ্রিষ্টীয় রচনাগুলি এর প্রাচীনতম নির্দশন। শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এটিকে ইলিরীয় শাখার আধুনিক রূপ বলে মনে করেছেন। এই শাখার প্রচলিত দুটি রূপ হল — উত্তরাঞ্চলে 'গেগ' এবং দক্ষিণাঞ্চলে 'টোস্ক'।

✧ কেন্তুম্ ✧

গ্রিক ঃ

কেন্তুম্ শাখার প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা হল গ্রিক (হেল্লেনিয়)। গ্রিস্, এশিয়া মাইনর, সাইপ্রাস ও ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এই শাখার প্রাচীন রূপ প্রচলিত ছিল। ক্রিট দ্বীপে প্রাপ্ত একটি মাটির চাকার উপর লিখিত রূপই এর প্রাচীন নিদর্শন। সাহিত্য নিদর্শন হিসাবে আমরা পেয়েছি হোমারের ইলিয়াড্ ও ওডিসি। বর্তমান গ্রিসে প্রচলিত ভাষাগুলি এই শাখাজাত।

ইতালীয় ঃ

ইতালীয় বা লাতিন ভাষার ইতালির লাতিউম প্রদেশেই ভাষা ছিল। পরে এটি রোম, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালের দিকে ছড়িয়ে পড়ে । খ্রিষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে লেখা একটি উৎকীর্ণ লিপিতে লাতিন ভাষার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই শাখার আধুনিক প্রতিনিধি ইতালির ইতালীয়, ফ্রান্সের ফরাসি, স্পেনের স্পেনীয়, পর্তুগালের পর্তুগিজ ইত্যাদি।

কেলতীয় ঃ

আদিতে এই শাখা সম্ভবত মধ্য ইউরোপে প্রচালিত ছিল। পরে এই গোষ্ঠির মানুষেরা ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের দিকে ছড়িয়ে পরে। গলীয় (ব্রাইথনীয় ভুক্ত) ভাষাতেই এর প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর দুটি প্রধান বিভাগ — ক) ব্রাইথনীয় খ) গয়িডেলীয়। এই শাখার আধুনিক প্রতিনিধি আয়ারল্যাণ্ডের আইরিশ।

জার্মানীয় ঃ

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির সর্বাধিক বিস্তৃত শাখাটি হল জার্মানীয় বা টিউটোনীয় ভাষা। চতুর্থ শতাব্দিতে উল্‌ফিলা গথিক ভাষায় বাইবেলের যে অনুবাদ করেছিলেন সেটিই এই শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন। ভৌগোলিক বিভাজনের সূত্র ধরে এর তিনটি ভাগ —

ক) পূর্ব জার্মানীয়	—	এই শাখার গথিক ভাষা অধুনা লুপ্ত।
খ) উত্তর জার্মানীয়	—	এই শাখার আধুনিক প্রতিনিধি স্থানিয় ভাষাগুলি হল সুইডেনের সুইডিশ, আইসল্যাণ্ডের আইসল্যাণ্ডিক ইত্যাদি।
গ) পশ্চিম জার্মানীয়	—	এই শাখার আধুনিক প্রতিনিধি স্থানীয় ভাষাগুলি হল ইংরেজি, জার্মান, ওলন্দাজ, ফ্লেমিশ ইত্যাদি।

তোখারীয় ঃ

সম্ভবত চিনের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এই শাখার প্রচলন ছিল। বিংশ শতাব্দিতে চীনের অন্তর্গত তুর্কিস্থান থেকে যে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় কিছু পুথি ও প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হয়েছে এগুলি এই ভাষার প্রাচীন নির্দশন। অ্যাগনীয় ও কুচীয় এই দুটি ভাগে এই শ্রেণিকে বিভক্ত করা হয়েছে। এটি একটি মৃত শাখা।

হিত্তীয় ঃ

আংকারা প্রদেশে বোগাজ- কোয় গ্রামে ১৮৯৩, ১৯০৫, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে খনন কার্যের ফলে কিউনিফর্ম লিপিতে যে ভাষা আবিষ্কৃত হয় সেটিই হল হিত্তীয়। চেক ভাষাবিজ্ঞানি হ্রজনি এটিকে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠি বলে সনাক্ত করেন। অনেকে মনে করেন এটি ইন্দো-ইউরোপীয়ের সহদরা ভাষা। লুয়িইয়, পালাইয়, লাইসীয়, লাইডীয় — এই ভাষাগুলির সঙ্গে হিত্তীয়ের সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা হয়। এই শাখার কোন বংশধর নেই, তাই এটি মৃত ভাষা।

প্রাচীন-মধ্য-নব্য ভারতীয় আর্য শাখা

✧ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা ✧

✧ কালসীমা ঃ

মনে করা হয়, ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-জার্মানিক ভাষা থেকে বেরিয়ে যে শাখাটি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল সেই ভাষাটি প্রাচীন ভারতীয় আর্য নামে পরিচিত। এই ভাষার আনুমানিক কাল বিস্তৃত হিসাবে বেদের যে অংশটি পাওয়া গেছে সেটি আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে রচিত এবং এর বিস্তার পরবর্তী ক্ষেত্রে ৪০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং সাহিত্যে নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কালসীমা আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ।

কালানুযায়ী পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখে এই ভাষার চারটি স্তর কল্পনা করা হয়েছে।

স্তরনাম	সময় সীমা	প্রামানিক নিদর্শন
১. প্রাচীন বৈদিক —	খ্রিঃ পূর্ব ১২০০ -খ্রিঃ পূর্ব ১০০০ —	ঋক্‌বেদের প্রাচীন অংশ — অগ্নিমিলে পুরহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ হোতারং রত্ন ধাতমম্।। (ঋক্‌বেদ সংহিতা)
২. অর্বাচীন বৈদিক —	খ্রিঃ পূর্ব ১০০০- খ্রিঃপূর্ব ৭০০ -	ঋক্‌বেদের বাকি অংশ ও অর্থববেদ
৩. প্রাচীন সংস্কৃত —	খ্রিঃপূর্ব ৭০০ - খ্রিঃপূর্ব ৫০০ —	ব্রাহ্মণ অংশ অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি ও ব্যাখ্যা
৪. ধ্রুপদি বা ক্লাসিক সংস্কৃত —	খ্রিঃপূর্ব ৪০০ - পরবর্তী সংস্কৃতচর্চা পর্যন্ত —	পাণিনির নির্ধারিত ভাগ।

✧ শব্দভাণ্ডার ঃ

আর্যরা ভারতবর্ষে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিস্তার এই অঞ্চলে ঘটতে থাকে। অবশ্য তাদের আসার পূর্বেই এই অঞ্চলে দ্রাবিড় এবং অষ্ট্রিক

গোষ্ঠির মানুষের বাস ছিল। স্বভাবতই অভিযোজনের প্রয়োজনে প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পুরাতন শব্দের বর্জন, পরিবর্তন ও নতুন শব্দের প্রবেশ ঘটে। পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন বৈদিক ভাষার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শব্দ-পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে। নতুন শব্দগুলির মধ্যে দ্রাবিড় ভাষা থেকে বিড়াল, ময়ূর, মল্লিকা (ফুল),মালা, ইত্যাদি শব্দ এবং অষ্ট্রিয় (অষ্ট্রিক) ভাষা থেকে চাষবাস সংক্রান্ত যেমন লাঙল, অলাবু (লাউ), কার্পাস, তাম্বুল, মরিচ ইত্যাদি শব্দ এসেছে।

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

অবিভাজ্য ধ্বনি ঃ —

(১) স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনি বিশেষ ক্রম অনুসারে গুণগত পরিবর্তন হত। যেমন 'স্বপ্' ধাতু থেকে জাত 'স্বপ্ন' শব্দে 'অ' স্বরধ্বনিটি অবিকৃত আছে। কোথাও বৃদ্ধি আবার কোথাও সম্প্রসারণ হয়েছে।

বৃদ্ধি — স্বপ > স্বাপ (অ > আ)

সম্প্রসারণ — স্বপ > সুপ্ত ('অ'-লোপ, ব > উ)

(২) কোথাও সুরের পৃথক ব্যবহারে একই শব্দের অর্থগত ও ব্যকরণগত পার্থক্য সৃষ্টি হত। যেমন ঃ

অর্থগত ঃ ´মাতৃ — এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ পরিমাপকারি বা তির্যকগামি।

মা´তৃ — এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ জননী।

ব্যাকরণগত ঃ ´রাজপুত্র — রাজা পুত্র যার (বহুব্রীহি)

রাজ´পুত্র — রাজার পুত্র (তৎপুরুষ)

বিভাজ্য ধ্বনি ঃ —

(১) ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ প্রভৃতি স্বরধ্বনি এবং শ, ষ, স প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনি বেদের পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হয়েছে বা লোপ পেয়েছে, কিন্তু এগুলি বৈদিক ছিল।

(২) সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মধ্যে যেখানে সন্ধি সম্ভব সেখানে সন্ধি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল।

(৩) মূলতঃ যৌগিক স্বর ছিল দুটি, ঐ এবং ঔ।

(৪) বিবিধ যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার ছিল। যেমন ক্র, র্দ্ধ, ষ্ট্র ইত্যাদি।

(৫) ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির মধ্যে ঙ, ঞ, ণ ছাড়া সবগুলিই শব্দের যে কোন স্থানে ব্যবহৃত হত।

✧ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

শব্দরূপ ঃ —

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে জাত গ্রিক, ল্যাটিন, গথিক প্রভৃতি ভাষার

তুলনায় প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো, অনেক বেশি রক্ষিত আছে। স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পৃথকরূপ ছিল। একাধিক শব্দ যুক্ত করে সন্ধি ও সমাসের সাহায্যে নতুন শব্দ গঠন করা হত। ধাতুর সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় এবং শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠন করা হত।

বচন ঃ একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন -এই তিনটি বচনই প্রাচীন ভারতীয় আর্যে প্রচলিত ছিল।

লিঙ্গ ঃ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার ছিল। বিশেষ বিশেষ শব্দের লিঙ্গ ব্যকরণে নির্দিষ্ট থাকত। যেমন — 'লতা' প্রাকৃতিক বিচারে ক্লীব হলেও এটি স্ত্রী-লিঙ্গ। লিঙ্গ ভেদে শব্দরূপ পৃথক হলেও ক্রিয়ারূপ পৃথক হত না।

কারক ঃ আটটি কারক ছিল। যেমন— বিভিন্ন কারকের পৃথক বিভক্তি চিহ্ন ছিল এবং বিভক্তি যোগে বিভিন্ন কারকের বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণের পৃথক রূপ ছিল। মূল শব্দের অন্ত্যধ্বনি পৃথক হলেও শব্দরূপও পৃথক হত।

ধাতুরূপ ঃ —

বাচ্য ঃ শব্দরূপের চেয়ে ত্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য অনেক বেশি ছিল। দুই বাচ্য অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য এবং কর্মভাববাচ্যের ক্রিয়ার রূপ ছিল পৃথক পৃথক।

কাল ঃ ক্রিয়ার কাল দশটি হলেও পাঁচটি কালই প্রধানভাবে প্রচলিত ছিল —

লট — বর্তমান কাল বাচক

লৃট — ভবিষ্যৎ কাল বাচক

লঙ্, লুঙ্, লিট — অতীতকাল বাচক

বাকি পাঁচটি হল লোট্, লুট্, বিধিলিঙ্, লৃঙ্, আশীলিঙ্।

ক্রিয়া ঃ বিভক্তিযোগে সমাপিকা ক্রিয়া এবং প্রত্যয়যোগে অসমপিকা ক্রিয়া গঠিত হত। ধাতুর সঙ্গে -ত্বা, -ত্বায় প্রত্যয় যোগ করে বহু অসমাপিকা ক্রিয়া রচনা করা হত। যেমন — √পা + ত্বা = পিত্বা।

পুরুষ ঃ উত্তম, মধ্যম ও প্রথম — এই তিন পুরুষে ক্রিয়ারূপ পৃথক ছিল। প্রত্যেক পুরুষের আবার তিন বচনে ক্রিয়া রূপ পৃথক হত।

পদ ঃ দুই পদ — পরস্মৈয়ি পদ ও আত্মনেপদ -এর ব্যবহার ছিল।

ধাতু ঃ ধাতু তিনভাগে বিভক্ত ছিল — পরস্মৈয়ি পদি, আত্মনেপদি ও উভয়পদি।

ভাবঃ অভিপ্রায়, নিবন্ধ, নির্দেশক, সম্ভাবক ও অনুজ্ঞা -এই পাঁচভাব ছিল। অবশ্য ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে অভিপ্রায় ও নিবন্ধ ছিল না।

✧ বাক্যগঠন বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কর্তা, কর্ম প্রভৃতি আটটি কারকের এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের বিভক্তি চিহ্ন সুনির্দিষ্ট ছিল বলেই বাক্য গঠন কিছুটা জটিল রূপ ধারণ করে। অবশ্য এই সমস্ত বিষয়গুলি বাক্যের যেখানেই ব্যবহৃত হোক না

কেন, তা চিনে নিতে অসুবিধা ছিল না। কর্তা-ক্রিয়া-কর্মের ব্যবহার বাক্যের পদবিন্যাস রীতিতে কিছুটা উলোট-পালোট ঘটালেও অর্থের পরিবর্তন হত না। বাক্যের পদক্রম রীতিটি ছিল সাধারণত -কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। যেমন — ব্যাঘ্রঃ নরং খাদতি। বিশ্লেষণ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া পরপর অবস্থান করেছে ।

✧ ছন্দগত বৈশিষ্ট্য ঃ

বৈদিক ও সংস্কৃতে ছন্দ ছিল প্রধানত অক্ষরমূলক। অক্ষর বিন্যাস, বিরাম ও যতির উপর ছন্দ বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল ছিল। সংস্কৃতে লঘু গুরু অক্ষরের উপর ভিত্তি করে ছন্দ নির্ণয় করা হত। যেমন কশ্চিৎ কান্তা / বিরহ্ গুরণা / স্বাধিকার প্রমত্তঃ।

✧ মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা ✧

✧ কালসীমা ঃ

ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে কালক্রমে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্য আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময় থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিগত ও ব্যাকরণগত পরিবর্তন হয়ে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে পৃথকরূপে যে ভাষা বৈশিষ্ট্যের জন্ম হয়, তাকে বলা হয় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা। এই ভাষা স্তরের ব্যাপ্তিকাল আনুমানিক ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ের প্রধান ভাষা হল প্রাকৃত ভাষা সেই জন্য এই স্তরকে প্রাকৃত স্তরও বলা হয়। তবে এই নামটি নিয়ে মতভেদ আছে প্রকৃত ভাষার বৈয়াকরণ হেমচন্দ্রের মতে প্রকৃতি (মূল উপাদান) থেকে প্রাকৃতের জন্ম — ‘ প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্, যত্র ভবম্ তত্র আগতম্ বা প্রাকৃতম্’। সুকুমার সেন মনে করেন — “ প্রাকৃত বা প্রাকৃত ভাষা কথাটির আসল তাৎপর্য হইতেছে ‘প্রকৃতি’ র অর্থাৎ জনগনের ব্যবহৃত ভাষা।” প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষীরা তাদের বাসভূমি থেকে ক্রমশঃ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনার্য ভাষাগোষ্ঠির সান্নিধ্যে আসার ফলে মূলতঃ ভাষার বিবর্তনের কাজটি ঘটতে থাকে। বিষয়গত, ভাষাগত পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে মধ্যভারতীয় আর্যের কালসীমাকে কয়েকটি উপস্তরে ভাগ করা যায় —

স্তর নাম	সময় সীমা	নিদর্শন
প্রথম স্তর	৬০০খ্রিঃ পূর্বাব্দ থেকে ১০০খ্রিঃ	অশোকের অনুশাসন, সুতনুকা প্রত্নলেখ, খারবেল অনুশাসন, কুষাণ সম্রাটদের অনুশাসন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তর	১০০ খ্রিঃ -৬০০ খ্রিঃ	১. সংস্কৃত সাহিত্যের নারী ও ভৃত্যের ভাষা সংলাপ। ২. জৈনসাহিত্য, বিভিন্ন প্রকার নাটক ও মহাকাব্য ইত্যাদি।
তৃতীয় স্তর	৬০০ খ্রিঃ-৯০০ খ্রিঃ	১. 'বিক্রর্মোবশী' নাটকের কয়েকটি গান। ২. সরহ পাদের 'দোঁহাকোষ' ৩. বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'কাব্য ৪. প্রাকৃত পৈঙ্গল

কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ মধ্য ভারতীয় আর্যের সময়সীমাকে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দি পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়ে যেতে চান। কারণ অপভ্রংশের পর অবহট্ঠ সাহিত্য তখনও পর্যন্ত রচিত হয়েছিল।

✧ শব্দভাণ্ডার ঃ

আর্যরা তাদের মূল কেন্দ্রভূমি থেকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এরই ফলে মূল সংস্কৃত শব্দের বিবর্তন ঘটে এবং কিছু অনার্য ভাষাকেও গ্রহণ করতে হয়। মধ্য ভারতিয় আর্যস্তরের কতকগুলি শব্দ ও ধাতুর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন — অনাড়ি (বোকা), অট্টক (স্টপেজ), কোর (খারাপ), গোড্ড (পা), ঢুন্ঢ (অসুস্থ) ইত্যাদি।

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

অবিভাজ্য ধ্বনি ঃ —

এই স্তরে অবিভাজ্য ধ্বনির ক্ষেত্রে সুরের পরিবর্তে ঝোঁকের ব্যবহার শুর হল। দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠির সান্নিধ্যে আসার ফলেই এই পরিবর্তন ঘটে।

বিভাজ্য ধ্বনি ঃ —

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি অর্ধব্যঞ্জন 'ঋ' ও 'ঌ' স্বর দুটি মধ্য ভারতীয় আর্যে লুপ্ত হল। 'ঋ'-এর পরিবর্তে 'রি' এবং 'ঌ' এর পরিবর্তে 'লি' ব্যবহার হত। যেমন — ঋষি > রিষি ইত্যাদি।

(২) 'ঐ' এবং 'ঔ' যৌগিক স্বর একক স্বরে অর্থাৎ 'এ' এবং 'ও' স্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন ধর্মানুশস্তেঃ > ধর্মানুসথিয়ে, ঔষধানি > ওষাধানি ইত্যাদি।

(৩) 'অয়' এবং 'অব' সংকোচনের ফলে 'এ' এবং 'ও' স্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন — পূজয়তি > পূজেতি, ভবতি > ভোদি ইত্যাদি।

(৪) স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ অঘোষ ব্যঞ্জন, ঘোষ ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। যেমন — রত্ন > রতন > রদন।

(৫) স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ 'হ'-এ পরিণত হয়েছে। যেমন — মধু > মহু।
(৬) স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের লোপ ঘটেছে। যেমন — নদী > নঈ ।
(৭) শব্দান্তে একক ব্যঞ্জনের লোপ ঘটেছে। যেমন — নরাৎ > নরা।
(৮) পদান্তে 'ঃ' লোপ পেলেও 'ং' রক্ষিত আছে। যেমন — পুত্রাঃ>পুত্তা, নরম্>নরাং।
(৯) শ, ষ, স -এর মধ্যে শুধুমাত্র 'স' এর ব্যবহার। যেমন — বিংশতি > বীসতি।
(১০) ঋ, র, ষ ধ্বনির পরবর্তী দন্তধ্বনি মূর্ধণ্য ধ্বনিতে রূপ লাভ করেছে। যেমন— কৃত > কট ।
(১১) যুক্তব্যঞ্জন সমব্যঞ্জন হয়েছে অথবা বিশ্লিষ্ট হয়েছে। যেমন — ভক্ত > ভত্ত, ধর্ম > ধম্ম , কক্ষ > কচ্ছ ।

✧ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

শব্দরূপ ঃ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের শব্দের অন্তব্যঞ্জন লুপ্ত হওয়ার ফলে মধ্য ভারতীয় আর্যে সব শব্দই স্বরান্ত হয়ে যায়। তাই শব্দরূপ স্বরান্ত অনুযায়ী। যেমন — নরঃ > নর (শব্দান্তে অ)। ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলির মধ্যে যে সব শব্দের শেষে 'ং' ছিল শুধু সেগুলি ব্যঞ্জনান্তই থাকল, বাকিগুলি স্বরান্তে পরিণত হল। যেমন — 'কর্মণে' এর স্থলে 'কম্মায়'।

লিঙ্গ ঃ — পুং, স্ত্রী এবং ক্লীবলিঙ্গের প্রচলন ছিল তবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মতো স্ত্রী লিঙ্গে বিচিত্র প্রত্যয় ছিল না। অপভ্রংশ স্তরে শুধু 'ঈ' যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গড়ে উঠে। 'ই' এবং 'উ' প্রত্যয় দ্বারা পুং লিঙ্গ এবং 'আ' প্রত্যয়ে ক্লীবলিঙ্গ গঠন করা হয়।

বচন ঃ — (১) দ্বিবচন লোপ পাওয়ায় একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ রইল। দ্বিবচনের ক্ষেত্রে বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হতো।
যেমন — দ্বৌ-ময়ূরৌ > দো-মোরা।
(২) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের বহুবচনের বিভক্তি 'ভিস' ধ্বনি পরিবর্তনে 'হি' তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন — মুনিভিঃ > মুনহি।

কারক ঃ — সংস্কৃতের মতো কারকের ব্যবহার থাকলেও বিভিন্ন কারকের বিভক্তি চিহ্নগুলি লোপ পেতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক কারকের বিভক্তি চিহ্ন এক হয়ে যায় এবং তার ফলে কর্তৃকারক ও কর্মকারক এবং করণকারক ও অধিকরণ কারক এক রূপ লাভ করে।

বিভক্তি ঃ — স্বরান্ত শব্দরূপে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বিভক্তির যে প্রভেদ ছিল মধ্য ভারতীয় আর্যে তা লুপ্ত হলো। যেমন 'নর' শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ যথাক্রমে 'নরাঃ' ও 'নরান্' তা লুপ্ত হয়ে হলো 'নরা'।

অনুসর্গ ঃ — বিভক্তির বদলে অনুসর্গের ব্যবহার শুরু হল। যেমন — লই।

ধাতুরূপ ঃ

ক্রিয়া ঃ — প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ক্রিয়ার ধাতু ভ্বাদি, দ্বিবাদি প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক শ্রেণিতে ক্রিয়ার রূপ আলাদা -আলাদা হত। কিন্তু এই স্তরে ক্রমশঃ তা লুপ্ত হয়ে অথবা সব ধাতুর রূপ মিশে গিয়ে কেবলমাত্র ভ্বাদি শ্রেণি থেকে গেল।

ভাব ঃ — ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব হল — নির্দেশক, অনুজ্ঞা, অভিপ্রায়, নির্বন্ধ এবং বিধিলিঙ্। এগুলির মধ্যে অভিপ্রায় এবং নির্বন্ধ লুপ্ত হয়ে তিনটি ভাব থেকে গেল। -ত্বা, -ত্বায় প্রত্যয় যোগ করে যে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করা হতো তা এই স্তরে লুপ্ত হল।

কাল ঃ — ক্রিয়ার কাল ছিল পাঁচটি। যথা — লট্, লঙ্, লিট্, লৃট্, লুঙ্। এদের মধ্যে লিট মধ্য ভারতীয় আর্যে লুপ্ত হয় আর 'লঙ্' ও 'লুঙ্' মিলে এক হয়ে যায়।

✧ বাক্যগঠন বৈশিষ্ট্য ঃ

ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে শব্দে বিভক্তির ব্যবহার হ্রাস ও লোপ পাওয়ার ফলে বাক্যের পদবিন্যাস বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। কর্তা-কর্ম ব্যতিরেকে কারক বিভক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার হতে থাকে। এই সূত্র ধরেই মধ্য ভারতীয় আর্যে প্রত্যয়ের ব্যবহার এবং অনুসর্গের প্রচলন চলতে থাকে।

✧ ছন্দগত বৈশিষ্ট্য ঃ

অক্ষর উচ্চারণকালে কাল পরিমাণের ওপর ছন্দের মাত্রানির্ভর করতো বলে ছন্দ ছিল মাত্রামূলক। প্রথমদিকে চরণগুলি অসমমাত্রিক হলেও পরে সমমাত্রিক চরণের কবিতা পাওয়া গেছে। এই স্তরের শেষের দিকে অন্ত্যানুপ্রাস ও চরণান্ত মিল দেখা যায়। অসমমাত্রিক মাত্রাপ্রধান ছন্দের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে -
" অপ্‌প মত্তো পমত্তেসু / সুত্তসু বহু জাগবো।"

✧ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা ✧

✧ কালসীমা ঃ

দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলেগু, মালায়লাম্ ইত্যাদি দ্রাবিড় গোষ্ঠির ভাষা, মধ্য-পূর্ব ভারতে অষ্ট্রিক গোষ্ঠির কিছু ভাষা ও ভোট বর্মি ছাড়া ভারতে বর্তমান চর্চিত ভাষাগুলির জন্ম নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (সংস্কৃত) থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত হয়ে অপভ্রংশের জন্ম। এই অপভ্রংশ থেকেই পরবর্তীকালে

নব ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম হয়েছে। সুকুমার সেনের মতে — "নব্য ভারতীয়-আর্যভাষাগুলি এক মূল অপভ্রষ্ট ও তাহার কাণ্ড প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্য হইতে উদ্‌গত"। কিন্তু রামেশ্বর শ' মনে করেন — "একটিমাত্র মূল অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট থেকে সব নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্মলাভ করে নি .. "। কথ্যরূপের আঞ্চলিক পার্থক্য থেকেই তা আলাদা আলাদা ভাবে গড়ে উঠেছে। এই ভাষা স্তরের সময়সীমা ও প্রামাণিক সাহিত্য নিদর্শনগুলি হল—

স্তর	সময় সীমা	প্রামানিক নিদর্শন	ভাষা
নব্য ভারতীয়	৯০০-১২০০ খ্রিঃ শুরু		
	আনুঃ ৯০০-১০০০ খ্রিঃ	চর্যাগীতি	বাংলা
	আনুঃ ১২০০ খ্রিঃ	জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী	মারাঠি
	আনুঃ ১৪০০ খ্রিঃ	বিদ্যাপতির পদাবলি	মৈথিলি
	আনুঃ ১৫০০ খ্রিঃ	তুলসীদাসের রামচরিতমানস	হিন্দি
	আনুঃ ১৫০০ খ্রিঃ	মাধবকন্দলীর রামায়ণ	অসমিয়া
	১৬০৪ খ্রিঃ	শিখধর্মগ্রন্থ	পঞ্জাবি
	১৮৭০ খ্রিঃ	ভানুদত্তের রামায়ণ	নেপালি
			ইত্যাদি

✧ শব্দভাণ্ডার ঃ

এই ভাষাস্তরে নানা রকম আগন্তুক শব্দের উৎসগত পার্থক্য এবং তদ্ভব শব্দের বিভিন্ন অর্থগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন — ঘর্ম > ঘম্ম > ঘাম

ঘাম — সূর্যের তাপ (নেপালী ভাষায়)
ঘাম — স্বেদ (বাংলা ভাষায়)

আবার 'পুত্র' শব্দটি বোঝানোর জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার দর্শনযোগ্য —

পুত্র —
ছেলে — বাংলা
মুলগা — মারাঠি
মুণ্ডা — পঞ্জাবি
কেটা — নেপালি
লরা — অসমিয়া
পুঅ — ওড়িয়া
লেড়কা — হিন্দি ইত্যাদি।

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

অবিভাজ্য ধ্বনি ঃ –

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরে কণ্ঠ স্বরের উঠানামায় মাত্রাগত পার্থক্য নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে রইল না।

(২) নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে বিভিন্ন ভাষার শ্বাসাঘাত তথা প্রস্বরের প্রভাব দেখা যায়। এর ফলে অনেক সময় পদান্তের স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়েছে।

যেমন – রাম > রাম্।

বিভাজ্য ধ্বনি ঃ –

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরের ঋ, ঌ এর ব্যবহার রইল না, এগুলি মধ্য ভারতীয় আর্য থেকে স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়। নব্য ভারতীয় আর্য স্তরেও তাই আছে।

(২) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে যুক্তব্যঞ্জন মধ্য ভারতিয় আর্য স্তরে যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয় এবং নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে তা একক ব্যঞ্জনে পরিণতি লাভ করেছে বা বিভাজিত হয়েছে।

যেমন – ধর্ম > ধম্ম < ধাম (বাংলা) / ধরম (হিন্দি)

(৩) ব্যঞ্জনলোপের ফলে, লোপের ক্ষতিপূরণ হিসাবে পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘ হয়।

যেমন হস্ত < হাত (বাংলা) / হাথ (হিন্দি)

(৪) যুক্তব্যঞ্জনের নাসিক্যধ্বনি লোপের ফলে পূর্ববর্তী স্বরের সানুনাসিকতা দেখা যায়।

যেমন –

কন্টক < কাঁড়ো (নেপালি) / কাঁটা (বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি) / কাঁইট (অসমিয়া)

(৫) মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে স্বর মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ লুপ্ত হওয়ায় দুই স্বর পাশাপাশি এসে শ্রুতিধ্বনি আগমন না ঘটলে তারা একস্বর বা যৌগিক স্বরে পরিণত হয়েছে নব্য ভারতীয় আর্যে।

যেমন —

মৃত্তিকা > মট্টিআ
- মিট্টী (হিন্দি)
- মাটি (বাংলা, অসমিয়া)
- মাটো (নেপালি)

(৬) নতুন ব্যঞ্জনধ্বনির আবির্ভাব ঘটেছে — ড়, ঢ় ইত্যাদি।

✧ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

শব্দরূপ ঃ

লিঙ্গ ঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ নির্দেশ রক্ষিত হয়নি, ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। মারাঠি-গুজরাটি ভাষায় ক্লীব লিঙ্গ লোপ পেয়েছে। হিন্দিতে শব্দ মাত্রই স্ত্রী লিঙ্গ হয়েছে।

বচন ঃ মারাঠি, হিন্দি, সিন্ধিতে ছাড়া অধিকাংশ ভাষায় একবচন বহুবচন পার্থক্য লোপ পেয়েছে। পরিবর্তে সম্বন্ধ পদ ও বহুত্ববাচক শব্দ যোগে বহুবচন করা হয়েছে।

যেমন — বাংলায় — লোক — লোকেরা
অসমিয়া — বহুল — বোর
হিন্দিতে — আপ — আপলোগ্

কারক ঃ শব্দের মূলরূপ ধরে কারক দুটি — মুখ্য এবং গৌণ বা তির্যক।

বিভক্তি ঃ ধ্বনি-পরিবর্তনে কারক বাচক বিভক্তিগুলি লুপ্ত হওয়ায় নব্য ভারতীয় আর্যে নতুন করে বিভক্তি সৃষ্টি হলো। বাংলায় করণে 'এ' এবং অধিকরণে 'হি' বিভক্তি এল।

অনুসর্গ ঃ বিভক্তি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ায় বিভক্তি বাচক অনুসর্গ বা অনুসর্গ স্থানীয় সহায়ক শব্দ ব্যবহৃত হল। যেমন, মেরে সাথ (হিন্দি)।

ধাতুরূপ ঃ

ক্রিয়া ঃ নব্য ভারতীয় আর্যে ক্রিয়ারূপে সরলীকরণ হয়েছে। পাঁচকাল ও পাঁচভাবের মধ্যে কর্তৃ ও কর্মভাববাচ্যে বর্তমান কালের এবং অনুজ্ঞার রূপ বজায় আছে।

কাল ঃ

(i) একাধিক ধাতুর সংযোগ যৌগিক কালের রূপ দেখা যায়। যেমন বাংলায় কর + ইয়া (এ) + আছ + এ = করেছে।

(ii) ভবিষ্যৎ কালের পদগুলি -'তব্য' অথবা শতৃ নিষ্পন্ন। চলিতব্য > চলিঅব্ব > বাংলা —চলিব, মৈথিলি — চলব।

(iii) অতীতকালের ক্রিয়াপদ সর্বত্রই ধ্বনি পরিবর্তন সাপেক্ষে (-ক্ত) প্রত্যয় থেকে সৃষ্টি।

গত > গঅ + ইল > — হিন্দি — গয়া
— বাংলা — গেল
— মৈথিলি — গঅল

✧ বাক্যগঠন বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) পদবিন্যাসরীতি গুরুত্ব পেল। পূর্বাঞ্চলে বাক্যগঠনে ক্রিয়াহীন নামবাক্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। যেমন —

তোমার নাম কি ? — বাংলা
তুম্ভার নাম কন ? — ওড়িয়া
তিম্রো নাম কে হো ? — নেপালি
তুম্‌হারা নাম ক্যা হ্যায় ?— হিন্দি ইত্যাদি।

(ii) নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বাক্যের গঠনে পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কর্মবাচ্য নব্য ভারতীয় আর্যে কর্তৃবাচ্য হয়েছে। যেমন — আস্মাভিঃ পুস্তিকা পঠিতা (কর্মবাচ্য) > আমি পুথি পড়ি (কর্তৃবাচ্য)।

(iii) বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের বিভক্তি লোপের ফলে পদ সনাক্তকরণে অসুবিধা হয়। কেবল মাত্র অর্থ ধরে কর্তা কর্ম চেনা যায়। যেমন —

(১) 'মানুষ কোন কোন বন্য প্রাণী খায়"। — এখানে 'মানুষ' কর্তা।
(২) 'কোন কোন বন্যপ্রাণী মানুষ খায় '। — এখানে 'মানুষ' হল কর্ম।

✧ ছন্দগত বৈশিষ্ট্য ঃ

নব ভারতীয় আর্যে ছন্দ পদ্ধতি সমমাত্রিক এবং মাত্রামূলক অন্ত্য মিলে প্রাধান্য ছিল। অক্ষরমূলক রীতি লক্ষ্যণীয়। পদ্য ছন্দের স্থলে গদ্য রূপ দেখা গেল। পদ্যে ও গদ্যে উভয় বাক্য গঠন রীতিতে ছন্দের প্রয়োজন কর্তা-ক্রিয়া-কর্মের বিভিন্ন অবস্থান দেখা যায়। অন্ত্যমিল যুক্ত ছন্দের উদাহরণ —

ওড়িয়া — "প্রথমে তুমকু দেখিথিলি অড়কা সান্যাল,
বিদেহর রাজপুরে, লক্ষ স্বর্ণ হরিনর ছাল,'

বাংলা — কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।

✧ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বর্গিকরণ ✧

'লিঙ্গুয়েষ্টিক সার্বে অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে গ্রিয়ার্সন (G. A. Grieson) নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার শ্রেণি বিভাজন প্রসঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ গুচ্ছের উল্লেখ করেছেন। হোর্নলে (R. Hornle) এর একটি অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বর্গিকরণ। হোর্নলের মতে আর্যরা ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন দুটি দলে সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। প্রথম যে দল এসেছিল তারা সিন্ধু ও গঙ্গা উপকূল অঞ্চলে বসবাস করতেন, পরবর্তীদল পূর্ববর্তী দলকে চারদিকে ঠেলে দেয়। প্রথম দলকে গোলমুন্ড 'আল্পিয় আর্য' এবং দ্বিতীয় দলকে 'নর্ডিক আর্য' বলে অনুমান করা হয়। এই অনুমান অনুসরণে গ্রিয়ার্সন, প্রথম দলকে বললেন বহিরঙ্গ বা Outer Aryan এবং পরবর্তী দল অন্তরঙ্গ বা Inner Aryan আরও বললেন প্রাচীন ভারতীয় আর্যে এদের ভাষা পার্থক্য ছিল এবং নব্য ভারতীয় আর্যে ভাষা পার্থক্য আরও বেড়ে গেল। গ্রিয়ার্সন ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের দিকে থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে বহিরঙ্গভাষাগুলির লক্ষণ নির্দেশ করলেন। ভাষাবিদ্ হোর্নলের অভিমত আর গ্রিয়ার্সনের ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ একত্রে হোর্নলে-গ্রিয়ার্সন বর্গিকরণ মতবাদ নামে পরিচিত।

কিন্তু ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বর্গীকরণ মানতে পারেননি। কারণ গ্রিয়ার্সন যে বহিরঙ্গ ভাষার লক্ষণগুলি দেখিয়েছেন তার সব লক্ষণ এই ভাষাগুলিতে নেই। আবার অন্তরঙ্গ ভাষাগুলিতে বহিরঙ্গ ভাষার লক্ষণ বিদ্যমান। গ্রিয়ার্সন কথিত ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব উভয়ের বিপক্ষে পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারণা আর্যরা দুটি দলে নয়, একটি দলে ভারতে আসে পরে অঞ্চল ভেদে ভাষার পার্থক্য ঘটে। কারণ হিসাবে বলেন যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যতে তাদের কথ্য ভাষা সংস্কৃত ছিল কিন্তু ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভাষার সাহচর্যে এই পরিবর্তন আসে। আলাদা ভাষাগুচ্ছে বিভক্ত থাকলে তার প্রমাণ প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলিতে পাওয়া যেত। অর্থাৎ দুটি প্রধান কারণে এই পার্থক্য ঘটে –

(১) স্থানিক বিন্যাসে আঞ্চলিক ভিন্নতার কারণে

(২) কাল জনিত পরিবর্তন, আবহাওয়ার পরিবর্তনে উচ্চারণ আড়ষ্টতা এবং অন্য ভাষার প্রভাবে।

আর দুই ভাষা গুচ্ছের ভাষার মিলের থাকার কারণ হল, উভয়ের মাতৃস্থানীয় ভাষা – প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা।

গ্রিয়ার্সনের বিভাজন –

গ্রিয়ার্সনের বিভাজন রেখা ধরেই আজকের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সীমারেখা টানা হয়েছে। তবে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিভাজন অবিভক্ত ভারতবর্ষ অর্থাৎ ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, ত্রিপুরার সীমারেখা ধরে করা হয়েছিল ।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা

অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
(পূর্বী পঞ্জাবি, পশ্চিমা হিন্দি, বাজস্থানি, গুজরাতি গাড়োয়ালি, নেপালি, খান্দেশি,হিন্দুস্থানি ব্রজভাষা, কনৌজি)	(সিন্ধি, পশ্চিমা পঞ্জাবি, কাশ্মিবি, মারাঠি কোঙ্কনি, পূর্ব হিন্দি, মাগধি, অসমিযা ওড়িয়া, বাংলা, মৈথিলি,লহন্দা ইত্যাদি)

এবার গ্রিয়ার্সনের কথিত বহিরঙ্গ ভাষার লক্ষণগুলি এবং পাশাপাশি সুনীতি চট্টোপাধ্যায় যে যুক্তি দিয়ে গ্রিয়ার্সনের মত খণ্ডন করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক

১. বহিরঙ্গের ভাষা লক্ষণ হিসাবে গ্রিয়ার্সন বললেন যে পদান্তে 'ই', 'উ', 'এ' ধ্বনি রক্ষিত, যা অন্তরঙ্গ ভাষায় নেই।
সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বললেন যে অন্তরঙ্গ শ্রেণিতেও এ লক্ষণ দেখা যায় এবং বিপরীতভাবে বহিরঙ্গ ভাষা শ্রেণিতে উক্ত ধ্বনি সর্বদা রক্ষিত নয়। সংস্কৃত 'অক্ষি' শব্দের তদ্ভব রূপ, বহিরঙ্গ কাশ্মিরিতে 'অছই', সিন্ধিতে 'অখই', অন্তরঙ্গ ব্রজভাষা ও কনৌজিতে শব্দান্তে 'ই' এবং 'উ' রক্ষিত যেমন, সর্ব > সব্বো > সব্বু > সব। পূর্বী পঞ্জাবিতে শব্দের শেষে একটা অস্পষ্ট নিরপেক্ষ স্বরধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়। অবধীতে 'সাচু' (সত্য > সচ্চো > সাচু)। অর্থাৎ অন্ত 'উ' বর্তমান। সুতরাং অন্তঃস্বর রক্ষা ভিত্তিতে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ বিভাজন যথার্থ নয়।

২. বহিরঙ্গের লক্ষণ হিসাবে গ্রিয়ার্সন অপিনিহিতি পরিবর্তনের কথা বলেছেন। সুনীতিবাবু বহিরঙ্গ ভাষায় আবশ্যকীয় লক্ষণ অপিনিহিতি নয়, প্রমাণ করেন। প্রাচ্য ভাষার মধ্যে বিশেষত পূর্বী মাগধি ভুক্ত ভাষার অপিনিহিতি একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলেও এবং লহন্দা ও কাশ্মিরিতে এর অস্থিত্ব দেখা গেলেও মারাঠি ও সিন্ধিতে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে অন্তরঙ্গ গুজরাতিতে এর অস্তিত্ব আছে। শৌরসেনি প্রাকৃতে অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত —

পর্যন্ত > পরিঅন্ত > পইরন্ত > পেরন্ত

লক্ষ্যণীয় যে প্রাচীন বাংলাতে অপিনিহিতির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাংলা মৈথিলি, কাশ্মিরি, লহন্দা এরা অপিনিহিতি প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে পায় নি। এটা একান্ত আধুনিক কালের ব্যাপার।

৩. 'ই' এবং 'উ' ধ্বনি যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা গ্রিয়ার্সন কথিত বহিরঙ্গের একটি লক্ষণ।
সুনীতিবাবুর বক্তব্য প্রাচ্য ভাষাগুলিতে বিশেষভাবে বাংলায় উচ্চারণ শৈথিল্যের

জন্য ই > এ এবং উ > ও হয়। প্রাকৃতেও এই প্রবণতা দেখা যায়। যেমন বিল্ব > বেল্ল।

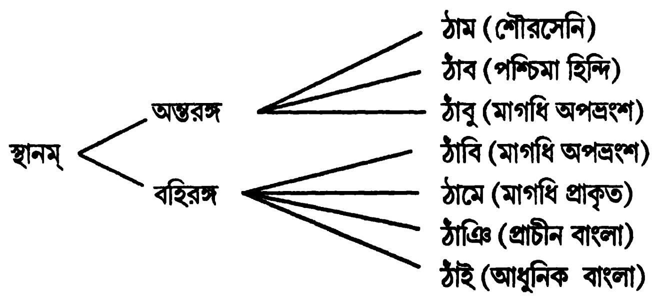
অন্তরঙ্গ পশ্চিমা হিন্দিতে ব্রজভাষাতেও এদের বিকল্প ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, মুহি < মোহি। হিন্দুস্থানিতেও নিজ-অনিজ ভেদে ধাতুর মূল স্বরের এই রকম পরিবর্তন হয়। যেমন, দিখনা < দেখ্না।

৪. গ্রিয়ার্সন বলেছেন 'উ' ধ্বনি 'ই' ধ্বনি হিসাবে উচ্চারণ প্রবণতা বহিরঙ্গ লক্ষণ। অন্তরঙ্গের নয় । সুনীতি চট্টোপাধ্যায় পক্ষান্তরে অন্তরঙ্গ পশ্চিমা হিন্দিতে এই পরিবর্তন দেখিয়েছেন। যেমন – খুলনা > খিলনা (হিন্দি) এবং কিছু কিছু উল্টো ব্যাপার লক্ষ করা যায় যেমন 'গুণ' ধাতুর বেলায় বাংলায় গৌণ, পশ্চিমা হিন্দিতে গিন্না, গিণতি।

৫. গ্রিয়ার্সনের বহিরঙ্গের লক্ষণ হিসাবে দ্বিস্বর ঐ > অই, ঔ > অউ এর কথা বলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুনীতিবাবু বলছেন বহিরঙ্গ সিন্ধি ও লহন্দাতে এই পরিবর্তন দেখা গেলেও প্রাচ্যে পরিবর্তন হয় নি। পক্ষান্তরে অন্তবঙ্গ পশ্চিমা হিন্দি, গুজরাতি, রাজস্থানিতে এই প্রবণতা রয়েছে। পশ্চিমা হিন্দিতে যেমন, ভবতি > হই > হঅই > হৈ > হ্যায়।

৬. গ্রিয়ার্সন কথিত বহিরঙ্গের ষষ্ট লক্ষণ চ ও জ ঘৃষ্টব্যঞ্জন উষ্মিভূত হয়ে 'স' এবং জ (z) পরিণত হয়। কিন্তু সুনীতিবাবু দেখালেন এই লক্ষণ বহিরঙ্গ ভাষা ওড়িয়া অসমীয়া এবং বঙ্গালি উপভাষায় দেখা যায় কিন্তু বহিরঙ্গের অন্যভাষা রাঢ়ী, মৈথিলি, লহন্দা, সিন্ধিতে দেখা যায় না। অসমীয়া, বঙ্গালির ক্ষেত্রে ভোটবর্মির প্রভাব, ওড়িয়া ও মারাঠিতে অনার্য ভাষা তামিল-তেলেগুর প্রভাব পড়েছে।

৭. গ্রিয়ার্সন বলেছেন বহিরঙ্গে নাসিক্য ধ্বনি ঙ এবং ঞ রক্ষিত।
সুনীতিবাবু বলেছেন কোন শ্রেণিতে প্রায় 'ঙ', 'ঞ' ধ্বনির বর্তমান অস্তিত্ব নেই। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে স্বরমধ্যবর্তী 'ম' হচ্ছে ব (অন্তস্থ) এবং 'ঞ' এই স্বরের নাসিক্যীভবনেরই লিখিত রূপ মাত্র, ধ্বনির নয়।
যেমন–



৮. গ্রিয়ার্সনের মতে বহিরঙ্গে ড > ড়, দ; দ > ড, জ; স্ব > ব; ল > র ; স্বরমধ্যবর্তীর

-'র'-এর লোপ এবং স্বরমধ্যবর্তী স > হ ও স (ষ > শ) হয়েছে।

সুনীতিবাবু এই মত খণ্ডন করে বলেছেন বহিরঙ্গের সিন্ধি মতো অন্তরঙ্গের পশ্চিমা হিন্দিতে ড > ড় এবং ল > র হয়েছে। বহিরঙ্গ ব্রজভাষায় বল > বর হয়েছে। বহিরঙ্গ দ এবং ড এর ব্যবহার সর্বত্র নয়। অসমিয়াতে ড > দ (এবং ট > ত হয়েছে) ভোট বর্মির প্রভাবে। পক্ষান্তরে গুজরাতি ভাষাতে (অন্তরঙ্গে) গ্রিয়ার্সন সূত্র কাজ দেয়। উচ্চ হিন্দিতে দেখা যায়। দর্ভ > ডাভ> ডড়্ঢ।

অব্যবহিত পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী তালব্য স্বরের প্রভাবে দ > জ এটা ভারতীয় আর্য ভাষার ক্ষেত্রে একটি দুর্লভ ঘটনা। এক্ষেত্রে তালব্যীভবনের সাধারণ নিয়ম হল দ > জ এবং ধ > ঝ যেমন – অদ্য > অজ্জ > আজ, মধ্য > মঝ্ঝ > মাব দুহিতা থেকে, বাংলায় 'ঝি', ওড়িয়ায় 'ঝিঅ', মারাঠি নিদ্রা > নিজ এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র।

যুক্ত ব্যঞ্জনে স্ব > ব পরিবর্তনে বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন – জম্বুক > জামুন/জাঁবু (পশ্চিমা হিন্দি)।

স্বরমধ্যবর্তী 'র' এর লোপ বিশেষভাবে বহিরঙ্গে সীমাবদ্ধ নয় অন্তরঙ্গেরও প্রবণতা আছে যেমন পশ্চিমা হিন্দিতে করি > কৈ, উপরি > পরি > পই।

স্বরমধ্যবর্তী স > হ পরিণতি অন্তরঙ্গের ভাষাতেও পাওয়া যায়। ব্রজভাষায় কেশরী > কেহরী, করিষ্যতি > করিস্‌সডি > করিসই > করিহই। স(ষ) > শ মাগধী বৈশিষ্ট্য কেবল, বহিরঙ্গ লহন্দি পরিবর্তন ঘটে নি যেমন করিষ্যতি > করেসি।

৯. গ্রিয়ার্সনের বিচারে মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণহীনতা কেবল বহিরঙ্গের লক্ষণ। সুনীতিবাবু দেখালেন যে পূর্বী মাগধিভূক্ত ভাষাগুলিতে স্বরমধ্যবর্তী এবং পদান্তে মহাপ্রাণহীনতা খুব প্রাচীন ব্যাপার নয়। যেমন ভগ্নী > ভইনী > বহিন (পশ্চিমা হিন্দি)। এছাড়া বিপরীত ব্যাপারও দেখা যায় যেমন, বহিরঙ্গ বাংলায় প্রেরিত > পেল্লই > পেলে > ফেলে।

১০. ধ্বনিতত্ত্বের শেষ বহিরঙ্গ লক্ষণে গ্রিয়ার্সন যুগ্মব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত হতে এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হতে দেখেছেন।

সুনীতিবাবু প্রমাণ করলেন এটা কেবল বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গেরও লক্ষণ। যেমন, হস্ত > হত্থ > হথ (পঞ্জাবি), হাত (পশ্চিমা হিন্দি)।

✧ রূপতাত্ত্বিক :

রূপতত্ত্বের দিক থেকে গ্রিয়ার্সন অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ বিভাজনে বহিরঙ্গের যে লক্ষণগুলি বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতেও সুনীতিবাবু বক্তব্য রেখেছেন –

১. বহিরঙ্গের স্ত্রী প্রত্যয় 'ই' রক্ষিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুনীতিবাবু বলেছেন, প্রাচীন ভারতীয় আর্যে সাধারণ স্ত্রী প্রত্যয় 'আ' অপভ্রংশ স্তরে ক্ষীণ হয়ে 'অ'-তে পরিণত

হয়। পুংলিঙ্গের সঙ্গে বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য সমস্ত অপভ্রংশে স্ত্রী প্রত্যয় 'ঈ' এর ব্যবহার শুরু হয়। এ ব্যাপারে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

২. গ্রিয়ার্সন বলেছেন সহায়ক ধাতুকে অপাদান বাচক অনুসর্গ রূপে ব্যবহার বহিরঙ্গের লক্ষণ।
সুনীতিবাবুর বক্তব্য সহায়ক ধাতুকে অপাদান কারকের অনুসর্গ রূপে কোন প্রাচীন রীতির অনুসরণ নয়। অপভ্রংশ স্তরে থেকে এই ব্যাপার দেখা যায় এবং নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ নির্বেশেষে স্বতন্ত্রভাবে এগুলি গড়ে ওঠে। যেমন — অস্ন্ত (সন্ত) > অহন্তে > অহেন্তে > হন্তে > হতে (বাংলা)।
সুতরাং সিন্ধি ও বাংলার মূলগত ঐক্য আছে। কিন্তু অন্তরঙ্গের পশ্চিমা রাজস্থানিতে 'হন্দো'। আবার বাংলায় 'থে', 'থেকে', থাকিয়া এর সঙ্গে গুজরাতি 'থী' 'থকী' এ মিলও দুর্লক্ষ্য নয়।

৩. কেবল বহিরঙ্গ ভাষাগুলির মধ্যে সংশ্লেষধর্মী শব্দরূপ লক্ষ করেছেন গ্রিয়ার্সন। সুনীতিবাবুর মতে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র এবং সেক্ষেত্রে একটা ভাষা যে কারক বিভক্তি ব্যবহার করে অন্য ভাষা তা করে না। তাছাড়া বিপরীত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তির্যক কারকের সম্বন্ধ পদের রূপ পশ্চিমা হিন্দিতে। যেমন, ঘোড়ো কা (ঘোটকেভি কৃত) এবং বাংলায় ঘোড়া (ঘোটককর)। পশ্চিমা হিন্দিতে বরং প্রাচীন সংশ্লেষ ধর্মীরূপ রক্ষিত। বাংলা মাগধিতে তা হয় নি।

৪. গ্রিয়ার্সন বলেছেন বহিরঙ্গের সাধারণ একটা লক্ষণ হল প্রত্যয় যুক্ত সর্বনাম বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহার।
আসলে তা নয় লহন্দা ও সিন্ধি ছাড়া কোন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাতে সর্বনামীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায় না। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটেছে সন্নিহিত ইরানি গোষ্ঠিভুক্ত ভাষার প্রভাবে। যেমন পিউ = পিতা। অসমিয়াতে যে সীমাবদ্ধক্ষেত্রে সর্বনামীয় প্রত্যয় ব্যবহার দেখা যায় যেমন, 'তো জীয়ে'র একবচন এবং 'তোমার জীয়া' — বহুবচন। এটা ভোটবর্মি প্রভাব স্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়।

৫. গ্রিয়ার্সন কথিত কর্ম ও অনুক্ত কর্তার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত কর্মভাববাচ্যে নিষ্ঠান্ত পদের সাহায্যে সকর্মক ধাতুর অতীত কালের ক্রিয়াপদ গঠন। কিন্তু সুনীতিবাবু মতে এটা বহিরঙ্গের লক্ষণই নয় ঐতিহ্য সূত্রে এটা সব ভাষাগুলির প্রায় লাভ করেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের বিশিষ্ঠ লক্ষণ ছিল না। ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যে সমাপিকা ক্রিয়া রূপটি বিলুপ্ত হয় এবং মধ্য ভারতিয় আর্যে সাধারণভাবে এই প্রবণতা দেখা দেয়। যেমন অগচ্ছত্ শেষে অ নেই। নতুন করে অতীত কাল গঠনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
সমস্ত নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট অপভ্রংশ ভাষাগুলি থেকে সকর্মক ধাতুর অতীতকাল বোঝাতে কর্মভাববাচ্যের রূপ ব্যবহার করার প্রবণতা ঐতিহ্য সূত্রে

লাভ।

লহন্দা, সিন্ধি ও মারাঠির পাশাপাশি গুজরাতি, রাজস্থানিতেও এই প্রবণতা রক্ষিত। কিন্তু পূর্বী হিন্দি ও মাগধিজাত ভাষাগুলি কর্মভাববাচ্যে এইরূপ পরিত্যাগ করে নতুন করে কর্তৃবাচ্যের রূপ গঠন করে নিয়েছে। সুতরাং অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বিচারের মানদণ্ডে একে গ্রহণ করা চলে না। বস্তুতপক্ষে এই পার্থক্য পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলের পার্থক্য –

পশ্চিমাঞ্চলের ন.ভা.আ.	পূর্বাঞ্চলের ন.ভা.আ.
পশ্চিমা হিন্দি – মৈঁনে পোথী পড়ী।	পূর্বীহিন্দি – ম্যোঁয় পোথী পঢ়উঁ।
গুজরাতি – মেঁ পোথী বাঁচী।	ভোজপুরি – হম্ পোথী পঢ়লী।
মারাঠি – মী পোথী বাচিলী।	মৈথিলি – হম্ পোথী পঢ়লহুঁ।
সিন্ধি – মূঁ পোথী পঢ়ীম্‌ ।	বাংলা – আমি পুথি পড়িলাম।
লহন্দা – মৈঁ পোথী পঢ়ীম্ ।	ওড়িয়া – অম্ভে পোথি পঢ়লুঁ।

৬. গ্রিয়ার্সন অতীতকালবোধক প্রত্যয় হিসাবে 'ল' এর ব্যবহারের কথা বলেছেন। বিপক্ষে সুনীতিবাবুর মন্তব্য হল, বিশেষণী 'ল' প্রত্যয় ('তাতল সৈকত')-এর ব্যবহার ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহ্য থেকে নব্য ভারতিয় আর্যতে এসেছে। অন্তরঙ্গেও এই লক্ষণ বর্তমান।

পূর্বী ভাষা ও মারাঠিতে অতীতবোধক 'ল' প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু সিন্ধি ও গুজরাতিতে কর্মভাববাচ্য কৃদন্ত পদ ব্যবহৃত হল। লহন্দা ও পঞ্জাবিতে এই বিশিষ্ট প্রত্যয়টির ব্যবহার নেই। পশ্চিমা হিন্দি আর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভাষা এই বিশিষ্ট লক্ষণ বর্তমান। যেমন, 'লজ্জিত' অর্থে 'লাজিলি'।

৭. গ্রিয়ার্সন বহিরঙ্গ ভাষায় 'আছ্' ধাতুর ব্যবহার লক্ষ করেছেন। সুনীতিবাবু এ সম্পর্কে বলেছেন ভোজপুরি ও মাগহিতে 'আছ্' ধাতুর ব্যবহার আছে। তাছাড়া 'আছ্' ধাতু প্রাচীন ভারতীয় আর্য 'অস্' থেকে এসেছে। সুতরাং কেবল বহিরঙ্গ লক্ষণ নয় অন্তরঙ্গ গুজরাতি ও রাজস্থানিতে এর ব্যবহার আছে।

উপরিউক্ত দিকগুলি বিচার বিবেচনা করে ভাষাবিজ্ঞানীরা আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য মেনে নিয়েছেন এবং হোর্নেল-গ্রিয়ার্সনের বর্গিকরণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

✧ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার শ্রেণিবিভাগ ✧

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দিক

থেকে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে—

ক. উত্তর-পশ্চিমা (উদীচ্য) ঃ সিন্ধি, পঞ্জাবি ও পাহাড়ি

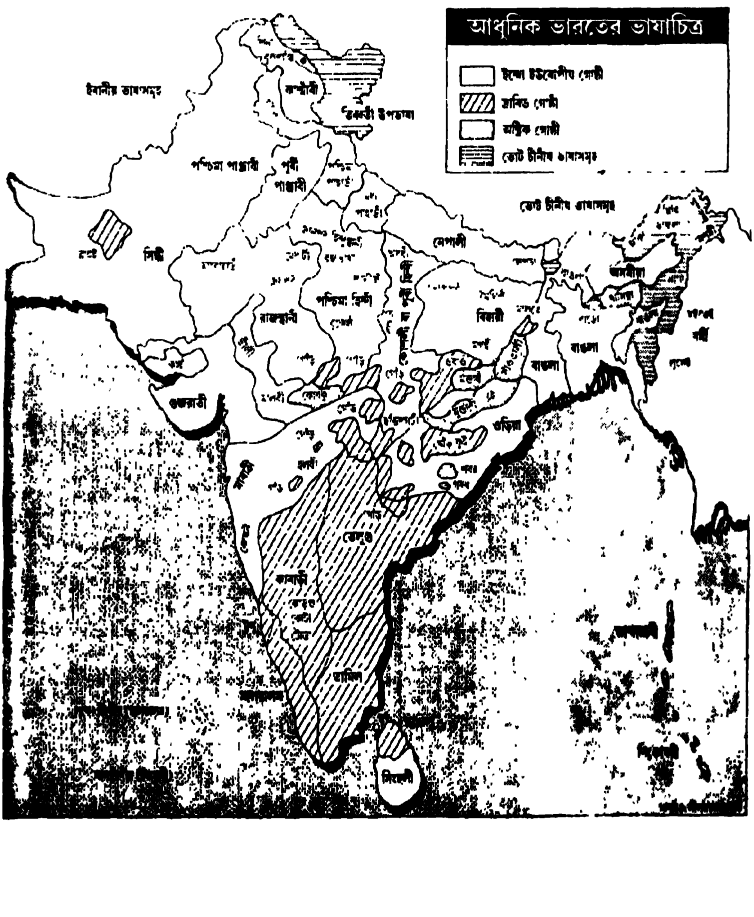
খ. পশ্চিমা ঃ পশ্চিমা হিন্দি, হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, গুজরাতি, রাজস্থানি, কনৌজি, উর্দু ইত্যাদি।

গ. উত্তরা ঃ গোর্খালি, নেপালি, কুমায়ুনি, গোড়োয়ালি।

ঘ. প্রাচ্য-মধ্য ঃ অবধি, বাঘেলি, ছত্তিশগড়ি।

ঙ. প্রাচ্য ঃ বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলি, মগহি, ভোজপুরি।

চ. দাক্ষিনি ঃ মারাঠি, কোঙ্কণি।



✧ একটি বাক্য : বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ✧

১. **বাংলা :**

(ক) সাধুভাষা — এক ব্যক্তির (বেক্তির) দুইটি পুত্র ছিল।

(খ) চলিত ভাষা — একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল।

(ঘ) মান্য চলিত — একটি লোকের দুটো ছেলে ছিল।

(ঘ) উপভাষা - রাঢ়ি — একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল।

বঙ্গালি - য়্যাক জনের দুইডী ছাওয়াল্ আছিলো।

বরেন্দ্রি - য্যাক্ ঝোন্ মানুসের দুটা ব্যাটা আছ্লো।

কামরূপি- এক জনা মান্সির্ দুই কোনা বেটা আছিল্।

ঝাড়খণ্ডি - এক লোকের দুটা বেটা ছিল।

২. **ওড়িয়া :**

জণ-কর দুই পুঅ থিলা।

৩. **অসমিয়া :**

কোনো এজন মানুহর দুটা পুতেক আছিল্।

৪. **বিহারি :**

(ক) ভোজপুরি — এক আদমীকা দূ বেটা রহে।

(খ) মগহি — এক আদমীকে দু-গো বেটা হলথীন্।

(গ) মৈথিলি — কোনো মনুখ্যকেঁ দুই বেটা রহৈন্হি।

৫. **উর্দু :**

(ক) আদর্শ উর্দু — এক (কিসি) শখ্. স-কে দো বেটে থে।

(খ) দক্নি / দখ্নি — এক আদমীকে দো বেটে থে।

৬. **হিন্দি তথা পশ্চিমা হিন্দি :**

(ক) শুদ্ধ বা সাধু হিন্দি (রাষ্ট্রভাষা) — কিসি মনুষ্য-কে দো পুত্র্ থে।

(খ) খড়িবোলি হিন্দুস্থানি (মিরাট জেলা) — এক আদমি-কে দো লোণ্ডে থে।

(গ) ব্রজভাষা (মথুরা ও আলিগড় জেলা) — এক জনে-কে দ্বৈ (দো) বেটা হে।

(ঘ) বাঙ্গ্রূ বা জাটু (কর্ণল জেলা) — এক মাণস্কৈ দো ছোরে থে।

(ঙ) কনৌজি — এক জনেকে দোএ লড়িকা হতে।

(চ) বুন্দেলি (ঝাঁসি জেলা) — এক জনে-কে দো মোড়া হতে।

৭. **অবধি (পূর্বী হিন্দি) :**

কৌনৌ মনঈ-কে দুই বেট্বা রহিন।

৮. **রাজস্থানি :**

(ক) মারোয়াড়ি (যোধপুর) — এক্ জিণৈ-রৈ দোয়্ ডাবড়া হা।

(খ) জয়পুরি — এক জণা-কৈ দো বেটা ছা।

৯. **গুজরাতি ঃ**

এক মাণস-নে বে' দিক্‌রা হতা।

১০. **পঞ্জাবি ঃ**

(ক) পূর্বী পঞ্জাবি (আদর্শ ভাষা) — ইক্ক মনুক্‌খ্-দে দো পুত্ত্ সন্।

(খ) হিন্দ্‌কি বা লহ্‌ন্দা (পশ্চিমা পঞ্জাবি) — হিক্কি জণে-নেঁ দোঁ পুত্তর্ আহে।

১১. **সিন্ধি ঃ**

হিকিড়ে মাণ্‌হুঅঁ-খে ব' পুট হুআ।

১২. **মারাঠি ঃ**

কোণে এক মাণসাস্ দান্ পুত্র হোতে।

১৩. **কাশ্মিরি (দরদ্ শাখাভুক্ত) ঃ**

অকিস্ মহনিবিস্ আসি জ.হ ন্যচিরি।

১৪. **নেপালি (পূর্বী পাহাড়ি) ঃ**

এক জনা মান্‌ছে-কা দুই-ভাঈ ছোরা থিয়ে।

১৫. **সিংহলি ঃ**

এক্-তরা মিনিহেকু-ট পুত্রয়ো দেঃ-দেনেঃক্ রূহ।

১৬. **জিপসি (ব্রিটেনের ওয়েলস্ প্রদেশ) ঃ**

সাস য়েখেন্তী মানুশেন্তী দুঈ চাবে।

১৭. **তামিল ঃ**

ওরুমনু'ষনু'ক্কু ইরণ্ডু কুমারর্ ইরুন্দার্‌গল।

১৮. **মালয়ালি ঃ**

ওরু মনুষ্যন্-নু রণ্ডু মক্কল. উণ্ড্-আয়-ইরুন্নু।

১৯. **কানাড়ি ঃ**

ওব্ব মনুষ্য-নি-গে ইব্বরু মক্কল. ইদ্দুর।

২০. **তেলেগু ঃ**

বোক মনুষ্য-নি-কি য়িদ্দরু কুমারু-লু বুণ্ডিরি।

২১. **সাওঁতালি /সান্তালি (কোল/মুণ্ডা শাখা) ঃ**

মিত্' হড়-র‍্যান্ বারেআ কোড়া-হপন্-কিন্ তাহেকান-তাএ-আ।

২২. **খাসি (মোন্-খ্‌মের শাখা) ঃ**

লা-দোন্ উ-বেই উ-ব্রীব্, উ-বা লা-দোন্ আর্-ঙ্গুত্ কি-খূন শিন্-বাঙ্।

২৩. **নেওয়ারি (হিমালয়ি তিব্বতি-বর্মি শাখা) ঃ**

ছ-ম্‌হ মনুচ্ছ-য়া কাএ ম-চা নী-ম্‌হ দ-স্যাঁ চো-ন।

২৪. **মেইতেই /মণিপুরি (কুক-চিন-শাখা)**

মি আ-মা-গি মা-চাঃ নি-পাঃ আ-নি লাই-রাম্মি।

✧ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ও নব্য ভারতীয় আর্য স্তরের ধ্বনিতত্ত্বের বিবর্তন ✧

ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তর (অনুমানিক খ্রিষ্ট পূর্ব ১৫০০) বা সংস্কৃত থেকে ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে কাছাকাছি সময়ে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম। যা থেকে বাংলা ভাষার ক্রম বিবর্তিত রূপটি আমরা বর্তমানে লাভ করেছি। শব্দভান্ডার, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যগঠন, ছন্দ ইত্যাদি নানাদিক দিয়েই এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

✧ স্বরধ্বনি ঃ

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরে শব্দের আদি স্বর মধ্য ভারতীয় আর্য স্তর থেকেই লুপ্ত হতে শুরু করে। নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে তা পুরোপুরি লুপ্ত হয়। কখনো কখনো আবার মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে আদি স্তর রক্ষিত হয়েছে। উদাহরণ –
(ক) সংস্কৃত অতিসী > প্রাকৃত তিসী > বাংলায় তিসি
(খ) সংস্কৃত উপবিসতি > প্রাকৃত উবইসই > বাংলা বইসই > বসে।

২. শব্দের আদিতে অসংযুক্ত কিংবা ব্যঞ্জন সংযুক্ত 'ঋ' কার মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে সরলিকরণ ঘটেছে। এবং অ, ই, উ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে পূর্ব স্তরের ধ্বনি পরিবর্তনটি রক্ষিত হয়েছে। যেমন –
সংস্কৃত শৃগাল > প্রাকৃত সিআল > বাংলায় শিয়াল।

৩. শব্দের আদিতে অসংযুক্ত কিংবা ব্যঞ্জন সংযুক্ত 'ঐ' এবং 'ঔ' যৌগিক স্বরদুটি মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে মৌলিক স্বরধ্বনি 'এ' এবং 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে বাংলায় ধ্বনি পরিবর্তনের এই রূপটি রক্ষিত আছে । যেমন–
ঐ – সংস্কৃত তৈল > প্রাকৃত তেল্ল > বাংলা তেল।
ঔ – সংস্কৃত লৌহ > প্রাকৃত লোহ > বাংলায় লোহা।

৪. প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তর থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে ব্যাপক স্বর-সংযোগ ঘটেছে। প্রাকৃতের এই স্বর সংযোগকে 'উদ্বৃত্ত স্বর' বলে। আধুনিক ভারতীয় আর্য স্তরে এই উদ্বৃত্ত স্বর অন্য স্বরের সঙ্গে মিশে গেছে অথবা ব্যঞ্জনাগমের ফলে নিজের স্বধর্ম বজায় রাখতে পেরেছে। কোথাও কোথাও আবার স্বরসংকোচন বা সন্ধি ঘটেছে। যেমন-
(ক) শ্রুতি ধ্বনির আগমনে স্বরের স্বধর্ম রক্ষিত।
যেমন – সংস্কৃত সাগর > প্রাকৃত সাঅর > বাংলায় সায়র।
(খ) যৌগিক স্বর পরিণতি ঘটেছে ।

(গ) স্বর সংকোচন বা সন্ধি — সংস্কৃত ঘৃত > প্রাকৃত ঘিঅ > বাংলা ঘি।

৫. প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরে শ্বাসাঘাতের ফলে অক্ষরস্থিত স্বরের মাত্রা এবং গুণ বজায় ছিল। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্য স্তর থেকেই শ্বাসাঘাতের অভাব ঘটে। আধুনিক ভারতীয় আর্য স্তরে শ্বাসাঘাতের প্রভাবে অন্ত্যস্বরের ক্রমিক লোপ অথবা হ্রস্বস্বরে পরিণতি ঘটেছে। উদাহরণ — সংস্কৃত কুম্ভকার > প্রাকৃত কুম্ভার > বাংলায় কুমোর।

৬. প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরে পদের অন্ত্যে অবস্থিত স্বরধ্বনিটি মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে রক্ষিত হলেও আধুনিক ভারতীয় আর্য স্তরে পুরোপুরি লুপ্ত হয়েছে অথবা বিক�ৃত হয়েছে। উদাহরণ — সংস্কৃত রাম > প্রাকৃত রাম > বাংলায় রাম্।
অনুরূপভাবে কোথাও কোথাও পদমধ্যবর্তী স্বর আধুনিক লুপ্ত হয়েছে। যেমন - - সংস্কৃত বলীবর্দ্ধ > প্রাকৃত বলদ্দ > বাংলায় বলদ।
ব্যতিক্রম হিসাবে কোথাও কোথাও আবার অন্ত্যস্বর রক্ষিত হয়েছে। যেমন — সংস্কৃত শক্তু > প্রাকৃত সত্তু > বাংলায় ছাতু।

৭. প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরের নাসিক্য স্পর্শব্যঞ্জন সংযুক্ত বর্ণ হিসাবে থাকলে মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে তা দ্বিত্ব হয়ে আধুনিক বাংলায় আনুনাসিক স্বরে পরিণত হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় আর্য স্তরে এটি আনুনাসিক স্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন — সংস্কৃত পঙ্ক > প্রাকৃত পক্ক > বাংলায় পাঁক।

✧ ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরের ভিন্নব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুক্ত ব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় আর্য স্তরে এই যুগ্ম ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণতি লাভ করেছে। উদাহরণ — সংস্কৃত কর্ম > প্রাকৃত কম্ম > বাংলায় কাম।

২. প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরের আদি কিংবা অনাদি শ, ষ, স প্রাকৃত স্তরে 'স' -কারে পরিণত হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় আর্য স্তরে এই 'স', 'ষ', 'শ' এ রূপান্তরিত। ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করেন সংস্কৃত স্তরে ধরে এই ধরণের প্রয়োগ অবৈজ্ঞানিক। যেমন — সংস্কৃত শকুল > প্রাকৃত সউল > বাংলায় শোল (মাছ)।
রাঢ়ি, বঙ্গালি উপভাষাতে তিনটি শিস ধ্বনির স্থলে 'ছ' এর ব্যবহার ঘটেছে। যেমন — সংস্কৃত শ্রী > প্রাকৃত সিরি > বাংলায় ছিরি।

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরে 'ক' ব্যঞ্জন ধ্বনির স্থলে মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে 'খ' ধ্বনি হয়েছে। কোথাও আবার ধ্বনিটি 'চ' ধ্বনিরূপে উচ্চারিত আধুনিক স্তরেও এটি বজায় আছে। উদাহরণ — সংস্কৃত কর্পর > প্রাকৃত খপ্পর > বাংলায় খাপরা।

৪. ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃত ধ্বনিমালা উচ্চারণ মান আধুনিক আর্য ভাষাতেও

মোটামুটি বজায় আছে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ সংস্কৃতে 'চ' -বর্গের উচ্চারণ ছিল প্রকৃত স্পর্শ ধ্বনি। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে অর্থাৎ প্রাকৃত স্তরে ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণে সরলীকরণ ঘটে এবং সৃষ্ট উচ্চারণের দিকে ধাবিত হয়। নব্য ভারতীয় আর্যে পুরোপুরি এই ব্যঞ্জনগুলি সৃষ্ট ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

৫. শব্দের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরে অসংযুক্ত মহাপ্রাণ বর্ণগুলি (খ, ঘ, থ,ধ, ফ ইত্যাদি) মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে 'হ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত। নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে বিশেষ করে বাংলায় 'হ' ব্যঞ্জনের উত্তরাধিকার থাকলেও আধুনিক বাংলায় 'হ' লোপ পেয়েছে। যেমন – সংস্কৃত সখী > প্রাকৃতে সহী > বাংলা সই।

৬. শব্দের আদিতে যুক্তাক্ষর মধ্য ভারতীয় আর্য স্তরে এসে সরলীকরণ ঘটেছে। নব্য ভারতীয় আর্য স্তরেও এই যুক্তব্যঞ্জনের একীকরণ ঘটেছে। যেমন–
সংস্কৃত ব্রাহ্মণ > প্রাকৃত বাহ্‌ম্‌ন > বাংলায় বামুন।

✧ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ও নব্য ভারতীয় আর্য স্তরের রূপতত্ত্বের বিবর্তন ✧

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করছেন যে বর্তমান পৃথিবীতে বহুল প্রচলিত ও উন্নতমানের যে ভাষাগুলির প্রচলন আছে সেগুলির অধিকাংশই একটি মূলভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই ইন্দো-ইউরোপীয়ের একটি শাখা ইন্দো-ইরানীয়র যে উপশাখা ভারতবর্ষের দিকে নরগোষ্ঠির হাত ধরে এসেছিল সেই শাখাটি প্রাচীন ভারতীয় আর্য নামে পরিচিত। পরে এই শাখা মধ্য ভারতীয় আর্যস্তর অতিক্রম করে নব্য ভারতীয় আর্য স্তরে প্রবেশ করেছে। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় পনের'শ বছর আগে থেকে এখন পর্যন্ত যে ভাষার বিবর্তনটি ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই তা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

একটি রেখাচিত্রে এই ধারাটি লক্ষ করা যেতে পারে –

ইন্দো-ইউরোপীয়

ইন্দো-ইরানীয় | গ্রিক | জার্মানীয় | ইতালীয় ইত্যাদি

ইন্দো-ইরানীয় → ইরানীয়

- প্রাচীন ভারতীয় আর্য (খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ - খ্রিঃ পূঃ ৬০০; **নিদর্শন** - ঋক্‌বেদের সংহিতা অংশ)।
- মধ্য ভারতীয় আর্য (খ্রিঃ পূঃ ৬০০ - ৯০০ খ্রিঃ; **নিদর্শন** - অশোকের শিলালিপি, বৌদ্ধ গ্রন্থ ইত্যাদি)।
- নব্য ভারতীয় আর্য (৯০০ খ্রিঃ – আজ পর্যন্ত; **নিদর্শন** - হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি, বাংলা ইত্যাদি ভাষার সাহিত্য)।

কোনো ভাষাস্তরে রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলে সেই স্তরের ভাষার লিঙ্গ, বচন, কারক, বিভক্তি ইত্যাদি শব্দরূপ । ধাতুরূপ হিসাবে ক্রিয়া-ভাব-কাল ইত্যাদির আলোচনা প্রয়োজন। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিক আলোচনায় তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ করা দরকার ।

✧ রূপতাত্ত্বিক বিবর্তন

(১) শব্দরূপ

(ক) লিঙ্গ ঃ

প্রাচীন ভারতীয় আর্য –

মূল ভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয়ের মত পুং, স্ত্রী ও ক্লীব – এই তিন ধরণের লিঙ্গের ব্যবহার ছিল। লিঙ্গ ভেদ ছিল ব্যাকরণগত। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শব্দের লিঙ্গ ব্যাকরণে নির্দিষ্ট থাকত। যেমন 'লতা' শব্দ প্রাকৃতিক বিচারে ক্লীব লিঙ্গ। কিন্তু সংস্কৃতে শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ বাচক। লিঙ্গ ভেদ অনুসারে শব্দরূপ পৃথক হত কিন্তু ক্রিয়ারূপ পৃথক হত না।

মধ্য ভারতীয় আর্য –

তিনটি লিঙ্গ বজায় থাকলেও পূর্বস্তরের মত স্ত্রী লিঙ্গের বৈচিত্র ছিল না। অপভ্রংশ স্তরে শুধু 'ঈ' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হত। 'ই' এবং 'উ' প্রত্যয় দ্বারা পুংলিঙ্গ এবং 'আ' প্রত্যয় যোগে ক্লীবলিঙ্গ গঠন করা হত।

নব্যভারতীয় আর্য –

পদের শেষে স্বরধ্বনি বিকৃত ও লুপ্ত হওয়ায় এই স্তরে লিঙ্গবিধির পরিবর্তন ঘটেছে। শব্দের অর্থ অনুসারে লিঙ্গগঠন হয়।

প্রাঃ ভাঃ আঃ → দধি (ক্লীব লিঙ্গ)
- দহী – স্ত্রী লিঙ্গ (সিন্ধি)
- দহী - পুংলিঙ্গ (হিন্দি)
- দহি – ক্লীবলিঙ্গ (মারাঠি)
- দই – ক্লীবলিঙ্গ (বাংলা)

(খ) বচন ঃ

প্রাচীন ভারতীয় আর্য –

মূল ভাষার তিনটি বচন অর্থাৎ একবচন , দ্বিবচন ও বহুবচন প্রচলিত ছিল। মূল ভাষায় দ্বিবচন বলতে শুধু প্রকৃতি নির্দিষ্ট জোড়া প্রাণি (পিতা-মাতা) ইত্যাদি বোঝাতে। বচনভেদে ধাতুরূপ ও শব্দরূপের পার্থক্য ছিল।

মধ্য ভারতীয় আর্য –

পূর্বস্তরের তিন বচনের মধ্যে দ্বিবচন লোপ পেল এবং তার জায়গায় বহুবচনের

রূপ ব্যবহৃত হত, যেমন 'দ্বৌ ময়ূরৌ'— এর স্থলে 'দ্বো মোরা'।

নব্যভারতীয় আর্য –

এই স্তরে অধিকাংশ ভাষায় একবচন ও বহুবচন শব্দ দিয়ে বহুবচন বোঝান হয়। যেমন হিন্দিতে –

একবচন – আপ্ (আপনি)

বহুবচন – আপ্‌লোগ্ (আপনারা) 'লোগ' হল বহুত্ববোধক শব্দ।

(গ) **কারক ও বিভক্তি ঃ**

প্রাচীন ভারতীয় আর্য –

মূল ভাষার মত এই ভাষা স্তরের কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ পদ, সম্বোধন পদ, অধিকরণ কারক ছিল। তবে অর্বাচীন সংস্কৃতে কারকের সংখ্যা দাঁড়াল সাতে। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদকে আলাদা করা হয়নি। প্রতিটি কারকের জন্য আলাদা আলাদা বিভক্তি ছিল।

মধ্য ভারতীয় আর্য –

পূর্বস্তরের মত সাতটি কারক। বিভক্তির চিহ্ন দেখেই কোন্ কারক বোঝা যেত। স্বরান্ত শব্দরূপে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রভেদ লুপ্ত হল।

নব্য ভারতীয় আর্য –

কারকের সংখ্যা বজায় থকলেও কারকের বিভক্তিগুলির পরিবর্তন ঘটেছে। কোথাও আবার নুতন করে অনুসর্গ এবং অনুসর্গজাত পদাংশ যুক্ত হয়েছে।

যেমন – বাংলা – তোমার দ্বারা হবে না।

হিন্দি – কলম সে (কলমের দ্বারা)।

(২) **ধাতুরূপ**

(ক) **ক্রিয়া ঃ**

প্রাচীন ভারতীয় আর্য –

ক্রিয়া বিভক্তির দুটি রূপ— পরস্মৈয়ীপদ, আত্মনেপদ। ধাতুর তিন ভাগে বিভক্তি – পরস্মৈয়ীপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী। নিজের জন্য কোন কাজ করলে আত্মনেপদ বিভক্তি ও পদের জন্য কাজ করলে পরস্মৈয়ীপদ বিভক্তি হত। কর্মভাববাচ্যে আত্মনেপদের বিভক্তি যোগ হত।

মধ্য ভারতীয় আর্য –

পূর্ব স্তরের প্রকারভেদ বজায় ছিল না। আত্মনেপদ লোপ পাওয়ায় সব ক্ষেত্রেই পরস্মৈয়ীপদের প্রভাব ছিল।

নব্য ভারতীয় আর্য –

ক্রিয়া রূপের আরো সরলীকরণ ঘটেছে। পৃথক পৃথক বিভক্তির যে রূপ বৈচিত্র্য ছিল তা অনেকখানি লুপ্ত।

(খ) **ভাব ঃ**

প্রাচীন ভারতীয় আর্য –

বৈদিকে পাঁচটি ভাব ছিল। অভিপ্রায়, নির্বন্ধ, নির্দেশক, সম্ভাবক এবং অনুজ্ঞা। তবে এই স্তরের শেষের দিকে পাঁচ ভাবের মধ্যে দুটি ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ ছিল না।

মধ্য ভারতীয় আর্য –

অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ লোপ পেয়ে বাকি তিনটি ভাব বজায় ছিল।

নব্যভারতীয় আর্য –

এই স্তরে কেবলমাত্র নির্দেশক ও অনুজ্ঞার স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে।

(গ) **কাল ঃ**

প্রাচীন ভারতীয় আর্য –

পাঁচটি কাল ছিল

১. লঙ্ ⟶ অতীতকাল
২. লিট্ ⟶ অতীতকাল
৩. লুঙ্ ⟶ অতীতকাল
৪. লট্ – বর্তমান কাল
৫. লৃট্ – ভবিষ্যৎ কাল

মধ্য ভারতীয় আর্য –

পাঁচটি কালের মধ্যে লিট্ লুপ্ত হয়েছিল।

১. লঙ্ ⟶ অতীত কালের মিলিত রূপ।
২. লিট্ (লুপ্ত)
৩. লুঙ্ ⟶ অতীত কালের মিলিত রূপ।
৪. লট্ – বর্তমান কাল
৫. লৃট্ – ভবিষ্যৎ কাল

নব্যভারতীয় আর্য –

মধ্য ভারতীয় আর্যস্তরের অনুরূপ তবে এই স্তরে একাধিক ধাতু সংযোগ যৌগিক কালের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন – কর্+√ আছ্= করিয়াছ।

(ঘ) **প্রত্যয় ঃ**

প্রাচীন ভারতীয় আর্য –

প্রত্যয় যোগে প্রচুর শব্দ তৈরি হয়েছিল। প্রত্যয় দুই রকম– কৃৎ প্রত্যয় – ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগে গঠিত। উদাহরণ – মন্ (ধাতু) + উ (প্রত্যয়) = মনু
তদ্ধিত প্রত্যয় – শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগে গঠিত। উদাহরণ – মনু (শব্দ) + অণ্ (প্রত্যয়) = মানব।

মধ্য ভারতীয় আর্য –

এই স্তরে প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের এত বৈচিত্র ছিল না।

নব্যভারতীয় আর্য –

অতীতকালে নিষ্ঠা প্রত্যয় এবং ভবিষ্যৎকালের শতৃ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন হত। যেমন – √ চল + ক্ত = চলিত - এর অনুসরণে বাংলায় চলিল =√ চল + ইল্ল। এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিক পরিবর্তনটি ঘটেছে ।

✧ সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী ?

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা দেখিয়েছেন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্যতম শাখা ইন্দো-ইরানীয় থেকে ক্রমান্বয়ে প্রাচীন ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য ও নব ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের চিত্রটি । নব্য ভারতীয় আর্যের অন্যান্য ভাষার মধ্যে সৃষ্ট একটি সমৃদ্ধ ভাষা হলো বাংলা। এই সূত্র ধরে সহজেই বলা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। আমরা যাকে সংস্কৃত বলছি তার উদ্ভব ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম অথবা ষষ্ঠ শতকে। সেযুগে সংস্কৃতের একটা লিখিত রূপ ছিল এবং আর একটা রূপ ছিল লৌকিক । পাণিনি এই লিখিত রূপের ভাষা সংস্কার করেন এবং তার ছান্দস বিকৃতিকে সংশোধন করে সরল রূপদান করে 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ রচনা করেন। ভাষা সংস্কার করা হলো বলেই ভাষার নাম হয় সংস্কৃত।

লিখিতরূপ বা বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গেই বাংলার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তাই বলা হয়ে থাকে সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী । কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা এই মত মানতে চান না। রামেশ্বর'শ বলেছেন –

> " সাধারণের ধারণা হল সংস্কৃত থেকেই বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম। কিন্তু এই ধারণার মূলে উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রেম যতই থাক, সঠিক বিচারে এ ধারণা যে ভ্রান্ত তা সতর্ক ভাষাবিজ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করবেন। "

কিন্তু সুকুমার সেন, পরেশচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি ভাষাবিদ্‌রা সংস্কৃত ভাষা সম্পকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সুকুমার সেনের মতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের প্রাচীনতর সাহিত্যিক রূপটি হল বৈদিক সাহিত্যের ভাষা তার নতুনরূপ হল সেকালের শিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের ও লৌকিক আখ্যান উপাখ্যানের ভাষা। এই ভাষাই আসলে সংস্কৃত ভাষা। তবে এই ভাষা ধ্বনিতে , শব্দরূপে, ধাতুরূপে ও পদ ব্যবহারে পরিবর্তিত হতে থাকে । এই সূত্রে তিনি বলেছেন সংস্কৃত ভাষা থেকেই কালক্রমে প্রাকৃত স্তরে পৌছে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্ম।

পরেশচন্দ্র মজুমদারের মতে —

> "সংস্কৃত বাঙলা ভাষার জননী — সাধাবণের এমন সহজ সরল সিদ্ধান্ত প্রচলিত থাকলেও ভাষাবিজ্ঞানীর পক্ষে অপরিহার্য তথ্যটি হল ঃ এই কথ্য সংস্কৃতের প্রবাহমান ধারাটিই কালক্রমে প্রাকৃত / অপভ্রংশেব খাত বেয়ে আধুনিক ভাষার মোহানা সৃষ্টি কবেছে ।"

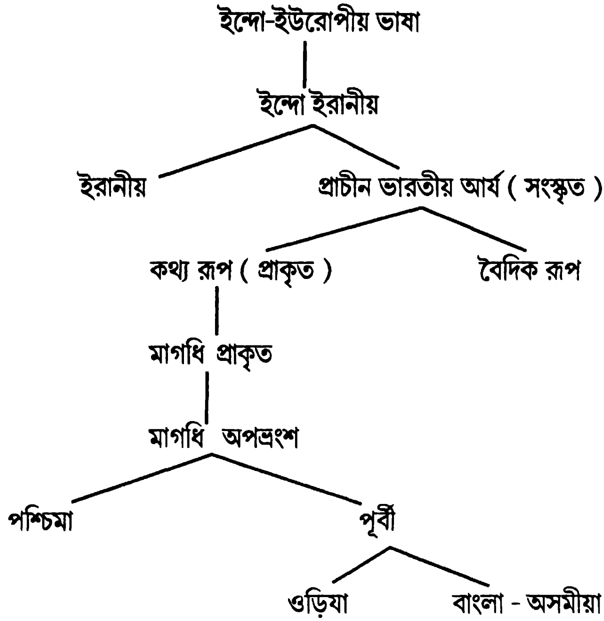
আসলে বাংলা শব্দভান্ডারে প্রায় নব্বই শতাংশ সংস্কৃত ও সংস্কৃতজাত শব্দের ব্যবহার এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি রাখতে সাহায্য করেছে । তাছাড়া বৈদিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলি প্রাকৃতস্তর হয়ে বাংলা বিভক্তি প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে । যেমন — সং শৃণোতি > সুণই > বাং শোনে। পাশাপাশি অনুসর্গ , উপসর্গ, বচন, পদ প্রকরণ ইত্যাদিতেও সংস্কৃতের উপাদান পাওয়া যায়। তাই বৈদিক সংস্কৃত থেকে যে বেশির ভাগ আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম হয়েছে একথা পুরোপুরি অস্বীকার করা যাবে না।

ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদারের এই মতকে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ সাহিত্যের ভাষা ও কথ্য ভাষা আলাদা হলেও কথ্য ভাষাকে অস্বীকার করা যায় না। সুকুমার সেন অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে সংস্কৃতের কথ্যরূপের নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান ভারতীয় ভাষার জন্ম হয়েছে । আটপৌরে কথ্য ভাষা দিয়েও যথাযথ সাহিত্য রচিত হয়। আসলে মানুষের ভাষা ব্যবহারের শৈথিল্য থেকেই কালক্রমে ভাষার বিবর্তন ঘটে । তাই ভাষা বিবর্তনে কেবল মাত্র বৈদিক ভাষাকে গ্রহণ করলে চলবে না। সুনীতিবাবু অবশ্য স্পষ্ট করে বৈদিক সংস্কৃত থেকেই বাংলার জন্ম হয়েছে তা বলেন নি । 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ' গ্রন্থে বলেছেন — ' ভারতের প্রাচীন আর্যভাষা পরিবর্তনে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে ।' হাজার হাজার বছর ধরে ভাষা ব্যবহারে অসংখ্য পরিবর্তন হয়েছে ধরে নিয়ে বাংলা ভাষা জন্মের ভিন্নমতটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে যাকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বলছি, তা আসলে প্রাকৃত ভাষা । প্রকৃত জনের ভাষা তাই এর নাম প্রাকৃত ভাষা। এই ভাষা শৌরসেনী, মাগধী,পৈশাচী ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত । বলা হচ্ছে তার মধ্যে 'মাগধী প্রাকৃত' থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম। মাগধি প্রাকৃতের পরের স্তর ছিল মাগধী অপভ্রংশ । আনুমানিক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দের আগে-পরে পূর্বী মাগধি অপভ্রংশ থেকে প্রাচীন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। তবে বাংলা ভাষার উৎস স্থানীয় মাগধি অপভ্রংশের কোন লিখিত নিদর্শন এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন মাগধি অপভ্রংশ থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম। তবে আমরা আজকে যে বাংলা ভাষা পাচ্ছি তারও বয়স হাজার বছরের বেশি । এতদিনের প্রচলিত একটি ভাষার নানা রূপ পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটে চলেছে । এই সূত্রে বাংলা ভাষাকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক — এই তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। মধ্য ও আধুনিককে আবার কয়েকটি উপস্তরে ভাগ করা চলে। একটি রেখা চিত্রে বাংলা ভাষার জন্ম ও বিবর্তনের রূপটিকে দেখানো

যেতে পারে -



সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী না হলেও বাংলা ভাষা দ্বারা যে লালিত একথা অস্বীকার করা যায় না।

✧ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে বাংলা ✧

আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে পিছিয়ে গিয়ে একটি বাংলা বাক্য উদাহরণ দিয়ে দেখবো তার উচ্চারণ ও শব্দ প্রয়োগ ইন্দো-ইউরোপীয়তে কেমন ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বতন্ত্র বাক্যের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা শহীদুল্লাহের উদাহরণটি একটু সাজিয়ে নিয়ে দেখাতে পারি –

মান্য চলিতে	(২০০৭ খ্রিঃ)	– তুমি ঘোড়া দ্যাখো।
আধুনিক বাংলা	(১৮০০ খ্রিঃ)	– তুমি ঘোড়া দেখ।
অন্ত্য-মধ্য বাংলা	(১৫০০ খ্রিঃ)	– তুম্হি ঘোড়া দেখহ।
আদি-মধ্য বাংলা	(১৩৫০ খ্রিঃ)	– তুম্হে / তুহ্মে ঘোড়া দেখহ।
আদি বাংলা	(৮০০ খ্রিঃ)	– তুম্হে / তু ঘোড়অ দেখহ।
অপভ্রংশ	(৫০০ খ্রিঃ)	– তুম্হে ঘোড়অ দেক্খহ।

গৌড়ী-প্রাকৃত	(২০০ খ্রিঃ)	– তুম্‌হে ঘোড়অং দেক্‌খহ।
পালি- প্রাকৃত	(খ্রিঃপূ ২০০)	– তুম্‌হে ঘোটকং দেক্‌খথ।
আদি-প্রাকৃত	(খ্রিঃপূ ৫০০)	– তুম্মে ঘোটকং দৃক্ষথ।
সংস্কৃত	(খ্রিঃপূ ৮০০)	– য়ুয়ং ঘোটকং / অশ্বং পশ্যথ।
বৈদিক	(খ্রিঃপূ ১২০০)	– য়ুয়মশ্বং স্পশ্যথ।
ইন্দো-ইরানীয়	(খ্রিঃপূ ২০০০)	– য়ুস্ অশ্বম্ স্পশ্যথ।
শতম্	(খ্রিঃপূ ২৫০০)	– য়ুস্ এশ্বোম্ স্পেশিএথে।
ইন্দো - ইউরোপীয়	(খ্রিঃপূ ৩৫০০)	– য়ুস্ এক্বোম্ স্পেকিএথে।

বাংলাভাষার স্তরবিভাগ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

✧ যুগ-বিভাজন ও তার কারণ ✧

বলা হয় সমুদ্র যেমন জীবের আদি জননি, তেমনি ভারতীয় আর্য ভাষা বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ ভাষার আদিমূল। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভাষা এতবার পরিবর্তিত হয়েছে যে মূলের সঙ্গে শাখার সম্পর্ক খুঁজতে গেলে আমাদের ভাষাতাত্ত্বিকের বিশেষ জ্ঞানের সহায়তার প্রয়োজন।

ভাষাচার্যদের মতে আর্যরা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার সময় সঙ্গে এনেছিলেন তাদের আদি ভারতীয় আর্যভাষা। এর দুটি শাখা হল — (১) বৈদিক বা ছান্দস্ ভাষা ও (২) সংস্কৃত ভাষা।

নদীপ্রবাহ ও ভাষাপ্রবাহ একই রীতিতে বহমান। প্রাকৃতিক কারণে নদীর ধারা যেমন বদলায়, ভাষাও তেমনি বদলায়। পাণিনির নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা পরেও সংস্কৃত ভাষা একটি অপরিবর্তনীয় সাধু ও শিষ্টরূপ হয়ে গেল। কিন্তু খ্রিষ্ট পূর্ব ৬০০ অব্দ থেকেই জনসাধারণের অশিক্ষা ও জিহ্বার আড়ষ্টতার ফলে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তন শুরু হল। চলল প্রায় দশম শতাব্দি পর্যন্ত। এই দেড় হাজার বছর ধরে ভাষার পরিবর্তনকে প্রাকৃত বলা হয়। এই প্রাকৃতের মধ্যে দুটি ভাষাগত স্তর দেখা যায় —

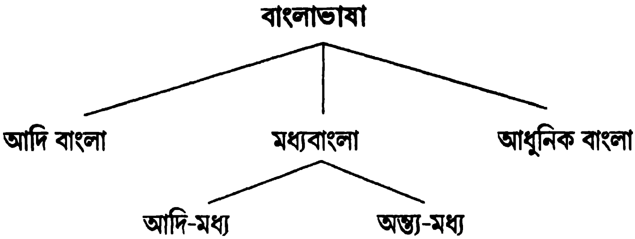
(১) পালি অর্থাৎ বুদ্ধদেব নিজে বলতেন এবং শিষ্যদেরকে যে ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(২) সংস্কৃতের পাশাপাশি প্রাকৃত ভাষা গড়ে উঠল। প্রাকৃত ভাষা মধ্য ভারতিয় আর্যভাষা নামে পরিচিত। এই প্রাকৃত ভাষার স্থানভেদে ৪ টি স্তর দেখা যায়। যথা — (ক) শৌরসেনি, (খ) মহারাষ্ট্রি, (গ) মাগধি, (ঘ) অর্ধমাগধি বা জৈন মাগধি।

উক্ত চারটি প্রাকৃত ভেঙে হল অপভ্রংশ। মাগধি থেকে জন্মলাভ করলো আধুনিক ভাষা — বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলি, ভোজপুরি ও মগহি ইত্যাদি।

এই বাংলা ভাষার বিকাশে হয় ৯ম থেকে ২০ শতক — প্রায় এগারো শো বছর ধরে। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় , শহীদুল্লাহ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সুকুমার সেন এঁদের মতামত ও ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনের দিক থেকে বাংলা ভাষাকে কালানুক্রমিকভাবে

মোটামুটি তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করা যায় –



(১) আদি যুগ ঃ – ৭০০ / ৯৫০ থেকে ১৩৫০ / ১৪০০ খ্রিঃ পর্যন্ত। অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দি পর্যন্ত।

(২) মধ্য যুগ ঃ – ১৩৫০ / ১৪০০ থেকে ১৭৬০ /১৮০০ খ্রিঃ অর্থাৎ মোটামুটি চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত । মধ্যযুগ দুটি ভাগে বিভক্ত – আদি-মধ্য ও অন্ত্য-মধ্য

(৩) আধুনিক যুগ ঃ – ১৮০০ খ্রিঃ থেকে আজ পর্যন্ত। এই সময়কালকে অনেকগুলি উপবিভাগে ভাগ করা যেতে পারে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে গদ্যের সূচনা ধরে আধুনিক যুগ শুরু আবার কল্লোলকে কেন্দ্র করে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যের প্রকৃত আধুনিকতা শুরু এই সূত্রে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি সময় সীমা ধরা যেতে পারে। আবার ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের পর বাংলা সাহিত্যের উপর সব থেকে বড় আঘাত আসে। ঢাকা এবং কলকাতাকে কেন্দ্র করে একই ভাষা ব্যবহার করে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হচ্ছিল তার একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা গেল। অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তান বা পূর্ববাংলার সাহিত্য হল মুসলমান সমাজ পটভূমিতে লেখা যেখানে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি অন্যদিকে পশ্চিমবাংলার সাহিত্যে পটভূমি হিন্দু সমাজ এবং তৎসম শব্দ ব্যবহারে সংযম দেখা যায়। আবার পূর্ববাংলা ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ হওয়ার পর সেখানের সাহিত্যে মুক্তির হাওয়া লাগে। বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাজনে এই বিষয়গুলিকেও মনে রাখা দরকার।

দেখা যাচ্ছে, দশম শতাব্দি থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য আদিযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। মধ্যযুগে আবার দীর্ঘ সময় ধরে সাহিত্য রচিত হয়েছিল বলে এই যুগের প্রথমদিকে ও শেষদিকে ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য দেখা যায়। আবার আধুনিক যুগ গদ্য দিয়ে শুরু হলেও পরে দেশবিভাজন, সাহিত্যের ভাব ও ভাষার বিবর্তন ধরে এই বিভাজনকে বিভিন্ন উপবিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বিশেষ করে দেশ বিভাজনের পর বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা প্রয়োগের ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়। বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্থানের অধীনে থাকার

সময় উর্দুর শব্দের ব্যবহার বাড়ে। এইসূত্রে নতুন স্তর বিভাজনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যদি ও উপভাষার স্তর বিভাগ অনেকটাই এই পার্থক্য রেখা টেনেছে। আবার চলিত রীতি ও সাধু রীতির মাধ্যমে আধুনিক ভাষার একটা বিভাজন রেখা স্পষ্ট। বিষয় ও ভাষা বিবর্তনের সূত্র ধরে আধুনিক যুগকে এইভাবে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে–

আধুনিক
(১৮০০ – আজ)
|
১৮০০ – ১৯২৩ (কল্লোল)
|
১৯২৩ – ১৯৪৭ (স্বাধীনতা)
|
১৯৪৭ – আজ

✧ সাহিত্য নিদর্শন ঃ

আদি যুগ

আদি যুগেই চর্যাগীতি লিখিত হয়। এই গ্রন্থের মূল বুনিয়াদ বাংলা ভাষার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও প্রচুর শৌরসেনি অপভ্রংশ ও প্রান্তীয় অঞ্চলের (অর্থাৎ অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলি, নেপালি) কিছু কিছু শব্দ এর ভাষার মধ্যে গৃহীত হয়েছে। সে যাই হোক চর্যাগীতিগুলিতে আদি বাংলার সমাজ জীবন ও বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক মৌলিক তথ্য আছে, যা অন্য কোথাও মেলে না। কবিত্বের দিক থেকে গীতিগুলি উৎকৃষ্ট এবং এতে শিল্পচাতুর্য বর্তমান। তাই সঙ্গতভাবেই চর্যাগীতিগুলিকে আদি বাংলার একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আদিযুগের কোনো উপ-বিভাগ করা হয় নি। তবে 'নব চর্যাপদ'কে ধরলে এই সীমা আরও বাড়িয়ে ধরতে হয়।

মধ্যযুগ

মধ্যযুগ পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত বিস্তৃত। তুর্কি বিজয় ও তার

আগে থেকে বাংলাদেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে প্রায় দু'শ বছর ধরে তেমন কোন বিশেষ সাহিত্য লিখিত হয় নি। এই সময়কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকে 'বন্ধ্যাযুগ' বা 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এমত আধুনিক যুগের সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা মেনে নেন নি। আসলে এই সময় কিছু কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছিল তবে সেগুলি একালে এসে পৌঁছায়নি। মধ্যযুগের বিস্তৃত সময়কালের জন্যে এই যুগের সাহিত্যকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে--

১) আদি-মধ্যযুগ (১৩৫০/১৪০০ থেকে ১৫০০)

২) অন্ত-মধ্যযুগ (১৫০১ থেকে ১৭৬০/১৮০০)

আদি-মধ্য যুগের অন্যতম সাহিত্য নিদর্শন হল বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এই সময় থেকে বাংলা ভাষায় দু-একটি আরবি-ফারসি শব্দ প্রবেশ করতে শুরু করে। যেমন মজুরি, মজুরিয়ানা ইত্যাদি।

মধ্যযুগেই আবির্ভূত শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, ভক্ত, ভাবুক, ধর্মপ্রচারক ও ধর্মবেত্তা। তিনি শুধু মধ্যযুগেই নন সমস্ত আধুনিক যুগকেও এমনভাবে প্রভাবিত করেছেন যা পৃথিবীর সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিরল নিদর্শন। সেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তারই নামে চিহ্নিত করে সাহিত্যের বিভাগ করতে চেয়েছেন। এইসূত্রে চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দি হল প্রাক্-চৈতন্য যুগ। পরবর্তীকাল চৈতন্যযুগ। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে সাহিত্যে ছিল দেবদেবীর প্রাধান্য। কিন্তু চৈতন্যের আবির্ভাব সমগ্র বাংলার সমাজ নয় সাহিত্যকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর প্রেমধর্ম ও ভক্তিধর্ম সমগ্র নবদ্বীপ তথা সমগ্র ভারতকে প্রেমমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মানুষের মনে দেবদেবীর ভয়ের স্থানে জন্ম নেয় প্রেমের মাহাত্ম্য। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ বিখ্যাত পদকর্তাগণ তাঁদের উন্নত লেখনীর দ্বারা রচনা করতে থাকেন রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক পদ। রচিত হয় বাৎসল্যরস অবলম্বনে বৈষ্ণব পদাবলী, টপ্পা, পাঁচালি, আখড়া, বাউলগান, যাত্রাগান ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্যের জীবনী নিয়ে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন কবির লেখা চৈতন্যমঙ্গলকাব্য। বাংলা ভাষায় বৃন্দাবন দাস লিখেছিলেন 'চৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাস লিখেছিলেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' ইত্যাদি। এরপর অনুবাদ হতে থাকে রামায়ণ (কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালী'), মহাভারত (কাশীদাসী মহাভারত) প্রভৃতি পুরাণ কাব্য। এছাড়া বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচিত হতে থাকে। যেমন -- ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, সৃষ্টি হয় শাক্তপদাবলি, সেখানে দেবদেবীর ভয়াবহতার স্থানে প্রাধান্য পায় মানব চরিত্রের বিভিন্ন লীলাখেলা আধুনিকতার ইঙ্গিত বহন করেছিল।

আধুনিক যুগ

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দির পর থেকে। আধুনিক যুগেই মধ্যযুগের পদাবলি -- পাঁচালি ও দেব-দেবীর লীলাকীর্তন ছেড়ে বাঙালি সাহিত্যিকরা

মাটির বুকে নামলেন। মর্ত্যবাসী মানব জীবনের অপার বিস্ময় উপলব্ধি করলেন। মানবজীবনের অশ্রু বেদনা ও পুলকানুভূতি পূর্ণ বাস্তব কাহিনি এই যুগের মানুষের কাছে অধিকতর স্বীকৃত হল। আর এইখানেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ব্যবধান। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় মানসিকতার যথার্থ আধুনিক হল।

উনবিংশ শতাব্দির একটি বড় আবিষ্কার হল মুদ্রণযন্ত্র। হাতে লেখা পুথির বদলে পুস্তক ছাপা হতে থাকে। শুরু হল গদ্য রচনার ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দিতেই শুরু হয় বাংলা নাটক, উপন্যাস, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য প্রভৃতি। তবে এই পর্বের সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় কিংবদন্তী হলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ শতকের প্রথম দিকেই সৃষ্টি হয় তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'গীতাঞ্জলি'। তাছাড়া গদ্যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম অনস্বীকার্য। লেখকগণ এই যুগে গদ্যরীতিতে সামাজিক উপাদান নিয়ে তাদের সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন। পরে পরেই নজরুল, মোহিতলালকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল বলে গ্রহণ করতে হবে।

রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা সাহিত্যে নবীনের দল নবযুগের সূচনা করার জন্য তাঁর জীবিতকালেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হল 'কল্লোল' পত্রিকা। পাশ্চাত্য প্রভাবে সাহিত্যের পরিবর্তন আনার স্বাভাবিক প্রেরণায় এবং রবীন্দ্রনাথের রোমান্স ও অধ্যাত্মবাদের আদর্শ থেকে সাহিত্যকে বাস্তবতর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত কবার ইচ্ছায়, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, স্নিগ্ধ পৃথিবীর ভ্রমরের গুঞ্জন ছেড়ে নবীন সাহিত্যিকেরা বাস্তবের কঠিন কঠোর মাটিতে এসে দাঁড়ালেন। বুদ্ধদেব বসু সর্বপ্রথম দৃঢ়তার সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে নতুন কাব্যসাধনার নান্দীপাঠ করেছিলেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যাঁরা যথার্থভাবে নতুন দিগন্ত খুলেছিলেন তাঁরা হলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাছাড়া অমিয় কুমার চক্রবর্তী, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শামসুর রাহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বহু আধুনিক লেখক কেবল তাঁদের রচনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে চলেছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয় বাংলাদেশের লেখকেরা যেমন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ইত্যাদি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের হাল ধরেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নাট্যাভিনয় ও নাট্যকলার উন্নতি হয়েছে। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র প্রমুখ সমাজ পরিপেক্ষিতে অবলম্বনে করে কখনোও বা ধূসর ইতিহাসে ফিরে গিয়ে গতযুগের সাহিত্যধারাকে অনুসরণ করে চলেছেন। কোনো কোনো দুঃসাহসী লেখক সম্পূর্ণ অপরিচিত পথে অজ্ঞাত অভিজ্ঞতায় ঝাঁপ দিয়ে একধরণের উপন্যাস লিখেছেন এবং আধুনিক সমাজে তার যথেষ্ট চাহিদাও দেখা গেছে। তাছাড়া আজকাল নিজস্ব অভিজ্ঞতা তথা বিকারোন্মত্ত

কল্পনার অতিরঞ্জন, নিষিদ্ধ বস্তুর বেআব্রু বর্ণনা, কিছু ছদ্মবেশি বৈরাগ্যকে অবলম্বন করে, কিছু ভ্রমণ বিষয়ক রচনা সৃষ্টি করে এক শ্রেণির পাঠকের করতালি লাভের চেষ্টা করছেন। তবে এ ধরনের সাহিত্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান।

সাম্প্রতিক ছোটো গল্পেও কয়েকজন তরুণ লেখক প্রথমে কিছুটা নতুনত্ব দেখিয়েছিলেন এবং কিছুটা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তবে এতদিন ছোটোগল্পে যাঁর ছিল একাধিপত্য আজ সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই পুরানো হয়েছে।

প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনাতেই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রম্যরচনার আতিশয্যের বিষয়টিও এই প্রসঙ্গে ভুলে থাকা যায় না। নাটকে ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সাহিত্য ধারার এই পরিবর্তনগুলি এই গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে আলোচিত হবে।

গদ্যের দিক থেকে সাধু ও চলিত গদ্যের বিকাশ ঘটে। আবার আঞ্চলিক রূপকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ভাষায় আঞ্চলিক রূপ গুরুত্ব পেয়েছে।

✧ চর্যাগীতির ভাষা ঃ আদি বাংলা ✧

মাগধি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। শুধু বাংলা নয়, মৈথিলি, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি পূর্ব ভারতের ভাষাগুলির অব্যবহিত জননি হল মাগধি অপভ্রংশ। সেই অর্থে এরা বাংলার সমগোত্রীয়। এই কারণে ভাষাগত বিচারে চর্যার সাহিত্যিক উত্তরাধিকার দাবি করেন উক্ত ভাষা সম্প্রদায়। অপর পক্ষে চর্যাগীতির ভাষার মূল কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে শৌরসেনি অপভ্রংশের উপর। হিন্দি ভাষার সৃষ্টি এই শৌরসেনি অপভ্রংশ থেকেই। তাই হিন্দিভাষীরাও চর্যার উপর দাবি প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং আদি সাহিত্য ধরে চর্যাগীতিকে তাদের পাঠ্যসূচিতে রেখেছে। ডঃ সুকুমার সেন নানা যুক্তি ও তথ্যসহযোগে হিন্দির দাবি নাকচ করেন। আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত গ্রন্থ থেকে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগীতির উপর বাঙালির দাবি প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় ক্রিয়ার শেষে 'র' থাকে ওড়িয়ায় থাকে 'ড়'। এই প্রভাবের জন্য ২নং চর্যায় গাইড়, 'সমাইড়' দেখে শাস্ত্রী মহাশয় গানটিকে ওড়িয়া ভাষার বলেছেন। কিন্তু ডঃ সেনের মতে বিশুদ্ধ পাঠ হবে 'গাইউ', 'সমাইউ' আবার 'র' দ্বারা ষষ্ঠীর পদ গঠন ; 'ইল', ইব প্রত্যয় দ্বারা অতীত ভবিষ্যতের ক্রিয়াগঠন, দুই ভাষার সাধারণ বিশেষত্ব হলেও কেবল বাংলায় অ-কারান্ত শব্দের 'র', 'এর' হয় —যার দৃষ্টান্ত চর্যায় আছে। তাছাড়া দ্বাদশ- ত্রয়োদশ শতাব্দির পূর্বে ওড়িয়া বাংলাদেশের উপভাষা হিসাবে গণ্য হত।

✧ অসমিয়ার দাবি খণ্ডন ঃ

ষষ্ঠী-সপ্তমী বিভক্তি, অতীত ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ বাংলার সঙ্গে অসমিয়ার মিল আছে — এসব লক্ষণ চর্যায় আছে। কিন্তু '-র', -'ত' বিভক্তি যোগে বাংলা শব্দের

যে রূপান্তর ঘটে তা অসমীয়ায় নেই কিন্তু চর্যায় আছে যেমন 'ডোম্বী-এর সঙ্গে' (১৯ নং)। চর্যায় আছে — 'ন বুঝসি (১৫নং) 'ন জীবমি (৪নং) — অসমিয়ায় 'ন' ক্রিয়াপদের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। বাংলা গদ্যে এমনটা হয় না, কবিতায় এর ব্যতিক্রমী প্রয়োগ আছে।

✧ মৈথিলির দাবি খণ্ডন ঃ

মৈথিলি ভাষার কয়েকটি ক্রিয়াপদ চর্যায় পাওয়া গেছে। 'ক' এবং 'কো' যোগে ষষ্ঠীর পদ গঠন, 'অল', 'অব' যোগে অতীত ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ গঠন মৈথিলিতে আছে, কিন্তু চর্যায় নেই।

✧ হিন্দির দাবি খণ্ডন ঃ

হিন্দির প্রাক্তন শৌরসেনি অপভ্রংশ পূর্বভারতের লোকজীবনে সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান বাহন ছিল। সুতরাং হিন্দির সঙ্গে যোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে 'ক' 'কো' যোগে ষষ্ঠীর পদ গঠন , 'অল' 'অব' যোগে অতীত ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ গঠন হিন্দিতে থাকলেও চর্যায় নেই।

সুতরাং অন্যান্য ভাষার দাবি ততখানি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাচীনকালের বৃহত্তর বঙ্গের এমনকি বহির্বঙ্গের বিচিত্র ছাপ থাকাটা অসম্ভব নয়। চর্যায় ব্যবহৃত অন্যভাষার উপাদানগুলিকে আগন্তুক ধরা হয়।

✧ বাংলার দাবি ঃ

বিষয়গত ও ভাষাগত নানা দিক দিয়ে আজ প্রমাণিত হয়েছে যে চর্যাগীতির ভাষা বাংলা।

বিষয়গত প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঃ

১. চর্যাগীতিগুলি রচনার সময় গৌড়বঙ্গের 'বজ্রাযান' শাখা ছিল 'করুণা' ও 'প্রজ্ঞা'-র যুক্তাসন। চর্যাগীতিরও দার্শনিকতত্ত্বে এটি প্রতিফলিত।

২. দশম-দ্বাদশ শতাব্দিতে বঙ্গে অধিকাংশ বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। চট্টগ্রাম, সোমপুর, দেবীকোট, বিক্রমপুরী বিহার, রাঢ়ের পাণ্ডুবিহার ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। সর্বত্র বহু তন্ত্রগ্রন্থ-টিকা লিখিত হয়েছে। এই সূত্রে বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়া সংগীতগুলি এই স্থানে রচিত হওয়া অসম্ভব নয়।

৩. চর্যার রচয়িতারা গৌড়বঙ্গে জন্মেছিলেন। হিন্দি ভাষার দাবিদার রাহুল সাংকৃত্যায়ন জানিয়েছেন লুইপা রাজা ধর্মপালের সচিব ছিলেন। পণ্ডিত তারানাথের মতে শবরীপা ছিলেন বঙ্গের এক নাট্যাচার্য এবং ডোম্বীপা ছিলেন ত্রিপুরার রাজা। বাংলাদেশে প্রচলিত গোপীচন্দ্রের গানের বিশিষ্ট ব্যক্তি কাহ্নপা ও চর্যার কাহ্নপা-

এর অনেক মিল আছে। সুতরাং চর্যা বাঙালির নিজস্ব সম্পদ, কবিরা বাঙালি।

৪. চর্যাগীতির একাধিক কবিতায় 'বঙ্গাল' (৪৯ নং) 'বঙ্গ' (৩৯নং), বঙ্গালি (৪৩ নং) 'পঁউআ' বা পদ্মা (৪৯) নদীর নাম ; জাতি হিসাবে ডোম, চণ্ডাল, তাঁতি তাম্বুলি, শুড়ি, গোয়ালা-র নাম পাওয়া যায়। ১৭ নং চর্যায় বঙ্গের নিজস্ব সম্পদ সারি গানের কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং গৌড়-বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে চর্যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যায়।

✧ **বিষয়গত পরোক্ষ প্রমাণ ঃ**

১. বাংলার জ্যোৎস্নালোকিত আকাশ, বৃক্ষ, প্রাণবন্ত মানবসমাজ, পশুপাখি, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ ইত্যাদির কথায় চর্যাগীতি সমৃদ্ধ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী-খাল-বিল-নৌকা-দাঁড় পাল-মাঝি-সাঁকোর কথা আছে।

২. তিনটি গানে এসেছে হাতির প্রাধান্য। সে সময় বাংলাদেশে হাতি ছিল চতুরঙ্গ শক্তির প্রধান অঙ্গ। ১৬নং চর্যায় হাতি বাঁধার থাম 'খম্বঠাণা'র উল্লেখ আছে। চর্যাগীতিগুলি গৌড়বাংলায় রচিত বলেই এমন উপমা এসেছে।

৩. গৌড়বঙ্গ চিরকাল তন্ত্রের দেশ — বাঙালির ধর্মীয় ও লোকায়ত সাহিত্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যার বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের মিলন লক্ষ করা যায়। সহজিয়া ভাবেই ঈশ্বরসাধনা করতে চায় বাঙালি—"বাঙালী ও বাংলার ধর্ম চির সহজিয়া। চর্যাগীতিগুলিও সেই সহজ মতের বাহক।" (চর্যাগীতির ভূমিকা ঃ জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী)। সুতরাং বাংলাদেশের পটভূমিকাতে চর্যাগীতিগুলি রচিত হয়েছে।

✧ **ভাষাগত প্রমাণ ঃ**

১. চর্যার নিজস্ব সম্পদ বাংলা পদ ও ইড়িয়মগুলি। বাংলার শব্দরূপ হিসাবে 'সুখ দুখেতেঁ', 'পাটের আস', 'হাড়ীত ভাত নাহি' ইত্যাদি নানা শব্দ চর্যায় আছে।

২. চর্যায় ব্যবহৃত কয়েকটি প্রবাদ-প্রবচন কেবল বাংলাদেশেই প্রচলিত এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীমঙ্গলেও এগুলির ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন, ক) - অপণা মাংসে হরিণা বৈরী (৬ নং চর্যা)

- আপনার মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
- জগৎ হৈল বৈরী আপনার মাংসে (কবিকঙ্কন চণ্ডীমঙ্গল)

খ) - বর সুণ গোহালী কিমো দুঠ বলন্দেঁ (৩৯ নং চর্যা)

তুলনীয়— দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো (আধুনিক)

৩. চর্যার সম্বন্ধ পদে — '-এর', '-অর', সম্প্রদানে '-রে', অধিকরণে '-ত', '-তেঁ' বিভক্তি ; অনুসর্গ হিসাবে 'অন্তর', 'সাঙ্গ' প্রভৃতি ; অতীতে 'ইল' ও ভবিষ্যতে 'ইব'; অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি হিসাবে ইআ, ইলে; কর্মবাচ্যে 'ইঅ'; মৌলিক

অস্ত্যর্থক ধাতু 'আছ্' ,'থাক্' এর ব্যবহার বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

৪. সংস্কৃতের মতো বাংলার হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য নেই। চর্যায়ও তাই। যেমন — চীএ (১নং) চিঅ (৪০ নং) 'ই' ও 'ঈ' এর তফাৎ নেই উচ্চারণে।

৫. চর্যায় জ-য, ণ-ন, শ-ষ-স, র-ড় এর উচ্চারণে স্থান গত পার্থক্য বাংলার মতো নেই। যেমন—

শবর (২৮ নং)	ষহজে (২৭ নং)	নাবী (৮নং)
সবর (২৮ নং),	সহজে (৪২ নং)	ণাবী (১৩ নং) ইত্যাদি।

৬. বাংলার মতো চর্যায় ব্যঞ্জন ধ্বনির দ্বিত্বকরণ আছে। যেমন রত্তো(১৯)-রত চ্ছাড়ী (৬নং) —ছাড়ী ইত্যাদি।

৭. য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি প্রয়োগ আছে। নিয়ড্ডি (নিকটে), আয়াতি > আবই।

৮. বাংলার মতো ক্রিয়াহীন বাক্য চর্যায় আছে। 'কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল' (১নং।

৯. আধুনিক বাংলার কর্ম-কর্তৃ বাচ্যের অবিকল প্রতিরূপ চর্যাগানগুলিতে আছে। যেমন — 'ডমরু, বাজএ বীরনাদে (১১নং)।

১০. অসমাপিকার সঙ্গে সমাপিকা অথবা বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যোগে বাংলায় যৌগিক বা সংযোগ মূলক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। এর উদাহরণ চর্যাতেও পাওয়া যায় — যেমন -'নিদ গেল' (২নং)।

সুতরাং এই সব যুক্তি তথ্য প্রমাণে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, চর্যাগীতি একান্তই বাংলাদেশ তথা বাঙালির সম্পদ। সুতরাং চর্যাগীতির ভাষা আদি বাংলা ভাষা।

✧ প্রাচীন বাংলা ✧

✧ কালসীমা ঃ

প্রাচীন বাংলা বলতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যাগীতিগুলিকে বোঝায়। এগুলির রচনাকাল আনুমানিক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। শহীদুল্লাহ এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতো পণ্ডিতরা মনে করেছেন যে চর্যাগীতির রচনাকাল আরো কিছুটা আগে। অর্থাৎ তারা অষ্টম শতাব্দি থেকে চর্যার রচনাকাল ধরতে চান। তবে সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি পণ্ডিতেরা চর্যার রচন'কালটিকে দশম-দ্বাদশ শতাব্দির মধ্যেই বলে উল্লেখ করেছেন। আদি-মধ্য বাংলার সূচনা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে। ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল হয় তাহলে প্রাচীন বাংলার সময়সীমা ৯০০ থেকে বা তার একটু আগে থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরাই যুক্তিযুক্ত। আবার অনেকে মনে করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সেক্ষেত্রে সময় সীমা বাড়ে। আবিষ্কৃত 'নবচর্যাপদ'কে ধরলে সময়সীমা আরও বাড়াতে হয়।

✧ **শব্দভাণ্ডার :**

চর্যাগীতির শব্দভাণ্ডারে দেশি ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যা বেশি তাই তা জনবোধ্য ছিল। ১১ সংখ্যক পদটিতে মোট ৪৭ টি শব্দের মধ্যে ১৬ টি তৎসম এবং ৩টি অর্ধতৎসম। অর্থাৎ তৎসম শব্দের মোট শতকরা ভাগ হল ৪০ ; এবং দেশে ও তদ্ভব হল শতকরা ৬০ ভাগ। তবে প্রতিটি চর্যায় এমন ভাগ আছে তা বলা যাবে না। ভাষার কিছু উদাহরণ দেওয়া যায় –

দেশি	তৎসম	অর্ধতৎসম	তদ্ভব	অপভ্রংশ
খুন্টি ,ডোম্বী	তরঙ্গ ,ভব	পরান ,নিচিত	ছান্দ, ধাম	কা আ, থিব

✧ **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :**

বিভাজ্য ধ্বনি :

১) ধ্বনির উচ্চারণরীতি ছিল মোটামুটি অন্ত্য-মধ্য ভারতীয় আর্যের অনুরূপ। সাধারণভাবে 'অ' এর উচ্চারণ আধুনিকের মতো সংবৃত নয়। আধুনিক হিন্দিতে 'অ' এর যে বিবৃত উচ্চারণ অনেকটা সেরকম হত।

২) পদান্তে স্বরের উচ্চারণ ছিল। যেমন 'সমাহিঅ'।

৩) আবার কোথাও সন্নিহিত স্বরদুটির সংকোচন হয়ে একস্বরে পরিণত হয়েছে। বাহিত > বাহিঅ > বাহী।

৪) সমযুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। পর্বত > পব্বত > পাবত । তবে অপভ্রংশের রীতি অনুযায়ী কোথাও আবার যুগ্ম ব্যঞ্জন রয়ে গেছে বা যুগ্ম ব্যঞ্জন একক হওয়ার সত্ত্বেও পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয় নি। যেমন – ফাড্ডিঅ, বট্টই ইত্যাদি।

৫) নাসিক্য যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়েছে ; আবার কোথাও হয় নি। যেমন–
হয়েছে – ছান্দ, বান্ধ,
হয়নি – অন্ধারী, পঞ্চ ইত্যাদি।

৬) (-এন) বিভক্তিজাত নাসিক্যব্যঞ্জন সানুনাসিক ছিল। মাঝেঁ, খালেঁ ইত্যাদি।

৭) বিশেষ ধরণের সন্ধি প্রবণতা ছিল – পূর্বস্বর লোপ পেলেও অন্য স্বরটি রক্ষিত ছিল – কাহ্ন + ইল > কাহ্নিল, পট + এর > পাটের।

অবিভাজ্য ধ্বনি :

১) সুর না থাকলেও অবিভাজ্য ধ্বনি হিসাবে ঝোঁক ছিল। আদ্য ও অনাদ্য দু'ধরণের ঝোঁক ছিল –

আদ্য ঝোঁকে পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হত — পক্ষ > পাখ
অনাদ্য ঝোঁকে অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হত — পক্ষ > পাখা

✧ **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

ক) **শব্দরূপ ঃ**

বচন ঃ

নাম শব্দরূপে একবচন বহুবচন ভেদ লুপ্ত হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝাতে সাধারণত পূর্বে সংখ্যাবাচক শব্দ অথবা অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝাতে বহুত্ববাচক শব্দ আগে পরে বসিয়ে অথবা বিশেষণের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বহুবচন নির্দেশিত হত। শব্দের রূপান্তর হত না।

১) সংখ্যাবাচক — পঞ্চবি ডাল।

২) বহুত্ববাচক আগে বা পরে বসিয়ে — 'বিদুজন'(জন), 'সঅলধাম'(সঅল)।

৩) বিশেষণের পুনারাবৃত্তি ঘটিয়ে — 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত'।

সর্বনামে শুধু উত্তমপুরুষ ও মধ্যমপুরুষেই একবচন ও বহুবচন পার্থক্য ছিল। যেমন — উত্তমপুরুষ একবচন — হঁউ, হাঁউ বহুবচনে — আম্‌হে

মধ্যম পুরুষ একবচন — তু, তই, তঁই বহুবচনে — তুম্‌হে

কিন্তু পার্থক্য সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। বহুবচনও একবচন রূপে ব্যবহৃত হত।

লিঙ্গ ঃ

ক) আধুনিক নব্য ভারতীয় আর্যের মধ্যে মাগধি গোষ্ঠির ভাষাগুলি ছাড়া অন্যত্র ঐতিহ্যগত লিঙ্গভেদ রক্ষিত আছে। যেমন — চণ্ডাল — চণ্ডালী।

খ) লিঙ্গগত সামঞ্জস্য দেখা যায় বিশেষণের ক্ষেত্রে পইঠেল, গরাহক।

গ) 'র' কারন্ত সম্বন্ধ পদের ক্ষেত্রেও লিঙ্গগত সামঞ্জস্য রক্ষিত। যেমন — 'হাড়েরি মালী'।

ঙ) নিষ্ঠাগত ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সামঞ্জস্য রক্ষিত — 'জিতেল ভববল'।

কারক বিভক্তি ঃ

বিভক্তির বিচারে চর্যায় কারক তিনটি। ক) কর্তা-কর্ম (খ) করণ-অধিকরণ (গ) সম্বন্ধ। উক্তকর্তা (কর্তৃবাচ্যের কর্তা) ও মুখ্য কর্মে কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হত না।

কর্তা — 'ভনই কাহ্ন'

কর্ম — 'গুরু পুচ্ছিঅ জান'

অনুক্ত কর্তায় (-এন > এঁ / এ) + বিভক্তি — 'কালি এঁ বাট'

গৌণ কর্ম ও সম্প্রদানে (-ক, কে, রে) বিভক্তি — 'রসানেরে কংখা'

করণে (-তন > এঁ / এ) বিভক্তি — 'কাহরি নাবেঁ'

অধিকরণে (-ই, -এ, হি, -ও) বিভক্তি — 'হাড়িত ভাত নাহি'। করণ ও অধিকরণে মিল থাকায় করণে অধিকরণে বিভক্তি এবং অধিকরণে করণের বিভক্তি হত। স্থান-কাল অবস্থানগত অর্থসাম্য হেতু উৎস, নির্দেশক অপাদানকারকে অপভ্রংশ থেকে আগত 'হু' বিভক্তির পরিবর্তে অধিকরণের বিভক্তি ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা গেল — 'জামে কাম কি কামে জাম।'

অনুসর্গ ঃ

বিভক্তি ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় বিভক্তির কাজ চালানোর জন্য অনুসর্গ বা অনুসর্গ স্থানীয় সহায়ক শব্দের ব্যবহার হতে শুরু করে। যেমন — "অধরাতি ভর কমল বিকসিউ"। 'ভর' এখানে ব্যাপ্তি বাচক হিসাবে এসেছে।

খ) **ধাতুরূপ ঃ**

কাল ধাতুর রূপান্তর কাল বাচক।

অতীত কাল — অতীত কাল বোঝানো হত —

১) প্রাচীন নিষ্ঠা প্রত্যয়ের সাহায্যে 'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল'।

২) 'ই', 'ইল' প্রত্যয়ের সাহায্যে — 'সোনে ভরিলী'।

এগুলি লিঙ্গ অনুসারী ছিল।

ভবিষ্যত কাল — ভবিষ্যত কাল বোঝাতে বাংলার মতো 'ই (ব)' ব্যবহার হতো। মন 'হোইব পরগামী'।

অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন ঃ

ক) শতৃপ্রত্যয় (অন্ত) যুক্ত পদে করণ অধিকরণের 'এ' বিভক্তি হতো। যেমন — 'মই এথু বুড়ন্তে'

খ) 'ইল' অন্ত পদে 'এঁ / এ' বিভক্তি যোগে — 'সাঙ্কমত চড়িলে'।

গ) নিষ্ঠা প্রত্যয়জাত 'ই' বা 'ই' -অ স্বতঃ ই অথবা স্বার্থিক 'আ' যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করতো — 'গুরু পুচ্ছিঅ জান'।

যৌগিক ক্রিয়াপদ ঃ

বাংলাভাষার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ যৌগিক ক্রিয়া চর্যা গীতিতেও ছিল।

ক) বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ যুক্ত — 'নিদ গেল'।

খ) 'ইয়' অন্ত্য অসমাপিকার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যোগে — 'টুটি গেলি'।

গ) 'অন' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যের সঙ্গে 'ধরণ ন জাই'।

✧ **বাক্যগঠন বৈশিষ্ট্য ঃ**

চর্যাগীতি পদ্য ছন্দে লেখা গান। পদ্য হলেও এর মধ্যে বাক্যবিন্যাস রীতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায় —

(i) প্রাচীন কর্মভাববাচ্যের প্রয়োগ ছিল — 'নাব ন ভেলা' পরে আবার

ভাববচনের সঙ্গে √যা যোগে নতুন করে কর্মভাববাচ্য হয় — 'কহন ন জাই'।

(ii) নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসতো — 'ধরণ ন জাই'

(iii) বাক্যে দৈর্ঘ সুনির্দিষ্ট ছিল না।

✧ ছন্দগত বৈশিষ্ট্য :

চর্যাগীতিতে চউপঈ ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এর একচরণে মাত্রা সংখ্যা ১৬। তবে পাদাকুলক ছন্দের (৪+৪+৪+৪) ব্যবহার কম নয়। যেমন-

দুলি দুহি পিটা / ধরণ ন জাই

আবার বেশ কয়েকটি চর্যাগীতি ২৭ মাত্রাসংখ্যাতেও পাওয়া গেছে। যেমন —

রাউতু ভণই কট / ভুসুকু ভণই কট / সঅলা আইল সহাব।
জই তো মূঢ়া / অচ্ছসি ভান্তি / পুচ্ছতু সদ গুরু-পাব ॥

✧ মধ্য বাংলা ✧

✧ কালসীমা :

তুর্কি আক্রমণের পর থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগের বাংলার সূচনা এবং এর সমাপ্তিকাল অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ পর্যন্ত। তবে যথার্থ সাহিত্যিক নিদর্শনের দিক দিয়ে বিচার করলে এই ভাষার কালসীমা ১৩৫০খ্রিঃ থেকে ১৭৬০খ্রিঃ পর্যন্ত ধরাই উচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আনুমানিক রচনাকাল ডঃ সুকুমার সেনের মতে আঃ ১৩৫০-১৪৫০খ্রিঃ। আর ভারতচন্দ্রর মৃত্যু ১৭৬০খ্রিঃ — এই হিসাবেই সময়সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। এই সময় সীমায় ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে মূলতঃ চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে। তাই বিষয়গত ও ভাষাগত পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে এই কালসীমাকে দুটি উপ-স্তরে বিভাজিত করা হয়—

স্তরনাম	সময়সীমা	প্রধান সাহিত্যিক নিদর্শন
১. আদি-মধ্য বাংলা	১৩৫০খ্রিঃ-১৫০০খ্রিঃ	১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-বড়ু চণ্ডীদাস ২. শ্রীকৃষ্ণবিজয় -মালাধর বসু ৩. বৈষ্ণব পদ - চণ্ডীদাস ৪. শ্রীরাম পাঁচালী- কৃত্তিবাস, ইত্যাদি।
২। অন্ত্য-মধ্য বাংলা	১৫০১খ্রিঃ-১৮০০খ্রিঃ	১. পদাবলী-জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি। ২. চৈতন্য জীবনী-চৈতন্যভাগবত,

চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল ইত্যাদি।
৩. মঙ্গল কাব্য-মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি।

✧ শব্দভাণ্ডার :

সেনবংশের রাজারা সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই রাজাদের প্রভাবে সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার বৃদ্ধি হয় এবং সংস্কৃতভাষা চর্চা চলতে থাকে। তুর্কি আক্রমণের পরে শাসক ও শাসনের প্রয়োজন আরবি-ফারসি এবং প্রচলিত ধারায় অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার হয়। তবে তুলনায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি এবং বিদেশি আরবি-ফারসির ব্যবহার নগণ্য। কারণ রচয়িতারা অধিকাংশ ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত।

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। বর্ণ-বিভাজনের উপর ভিত্তি করে বিভাজ্য ও যখন বিভাজন করা যায় না তখন অবিভাজ্য ধ্বনি।

অবিভাজ্য ধ্বনি :

চর্যাগীতিতে আদ্য ও অনাদ্য দু'রকমের শ্বাসাঘাত ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আদ্য শ্বাসাঘাত প্রবল হয়ে উঠে –'ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।'

বিভাজ্য ধ্বনি :

১. ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'আ - কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি সাধারণ লক্ষণ। যেমন বড়াই, আউলাইল। কিন্তু ডঃ রামেশ্বর'শ এতে সংশয় প্রকাশ করেছেন, তাঁর মতে এই স্বরসংযোগ পরে বংলায় যৌগিক স্বরের সৃষ্টি করেছে। যেমন 'পাএ পেলাইলো তোর'।
২. পদান্ত 'অ' লোপ পেতে শুরু করে। যেমন– 'তাহার হাথে' > তাহাহথে।
৩. হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য ছিল না। যেমন– 'দুতি' /'দূতি', উজল/ ঊজল।
৪. 'ন'এবং 'ণ', 'য'এবং 'জ' এর পার্থক্য ছিল না। যেমন– নাল / ণাল; জত / যত।
৫. 'ল' স্থলে 'ন' এবং 'ন' স্থলে 'ল' হয়েছে। যেমন– লাল / নাল; ননী / লুনী।
৬. হ্ - কার যুক্ত নাসিক্যব্যঞ্জন থেকে 'হ্' লোপের ফলে সরলতা। যেমন–আহ্মি > আমি।
৭. 'ইআ' - অন্ত্য অসমাপিকার সানুনাসিকতা লক্ষ করা যায় । যেমন–'অচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কাহ্ন।'
৮. 'ঋ' ধ্বনি 'রি' হয়েছে। যেমন– কৃপাণ > কিরিপান।

৯. নাসিক্যব্যঞ্জনে সরলতা দেখা যায়। যেমন— ঝম্প > ঝাঁপ, অঞ্চল > আঁচল; গ্রন্থে উভয়ের ব্যবহার আছে।

১০. শ্রুতিধ্বনি দেখা যায়। যেমন, য়-শ্রুতি — 'বুয়িলেঁ', ব-শ্রুতি — 'বাঁওন, হ্-শ্রতি — 'নহুলী'।

✧ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

শব্দরূপ ঃ

প্রাচীন বাংলা চর্যাগীতির অনেক রূপতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি প্রায় রক্ষিত আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।

লিঙ্গ ঃ

বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের লিঙ্গ সামঞ্জস্য এবং লিঙ্গভেদ উভয়ই দেখা যায়। যেমন— 'মুগধী বড়ায়ি', 'গেলী রাহী', 'গোআলিনী গেলা'।

বচন ঃ

একবচন ও বহুবচনের প্রয়োগ আছে। বহুবচন করার জন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করা হত।

অ) সর্বনাম পদে 'রা' যোগে। যেমন — আহ্মারা, তোহ্মারা।

আ) বহুত্ববাচক শব্দের 'সব' পরেও শব্দ বসিয়ে। 'যত কিছু বোলোঁ মোন্ত্রঁ সব পরমানে।

ই) বিশেষণের পুনরাবৃত্তি করে। যেমন — 'বড় বড় গাছের'।

ঈ) কর্তৃপদের পরে 'গণ' বসিয়ে। যেমন — 'পিকগণে', দেবাগণ'।

কারক ও বিভক্তি ঃ

সাত কারক বর্তমান।

(অ) কর্তৃ কারকে শূন্য বিভক্তি — 'কুয়িলী কাঢ়ে রাএ'।

(আ) কর্ম করকে শূন্য বিভক্তি — 'হনুমান মহাবীর হৈলা সারথী '।

(ই) গৌন কর্ম ও সম্প্রদানে -ক, -কে, -রে বিভক্তি — কংসকে বুয়িল।

(ঈ) অধিকরণে -ত, -তে, -এ বিভক্তি — 'সিসতে সিন্দুর '।

(উ) করণে '-এ', -এঁ বিভক্তি — 'দুইকেশ দিল নারায়ণে'।

(ঊ) সম্বন্ধে -এর, -কের বিভক্তি — 'দেবের সুমতি' ।

অনুসর্গ ঃ কারক বাচক অনুসর্গের সংখ্যা বেড়েছে। ' যথা থাকি ডাক দিআঁ'।

খ) ধাতুরূপ ঃ

ক্রিয়াপদ ঃ ধাতু , কালবাচক প্রত্যয় ও পুরুষ বাচক বিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদ গঠন করা হত। ধাতুর সঙ্গে -ই,-ইআঁ, -ক, -ইতে, - ইলে যোগে অসমপিকা ক্রিয়া গঠিত হত।

পুরুষঃ তিন পুরুষই বর্তমান। উত্তম পুরুষে সর্বনাম ছিল মোঁ < আহ্মে, মধ্যম পুরুষে তোঁ < তোহ্মে।

কাল ঃ (অ) বর্তমান কালের বিভক্তি -ওঁ,-ন্তো,- আওঁ, -ই। যেমন— 'উড়ি পড়ি জাঁও'।

(আ) অতীত কালের বিভক্তি -ইল, -লোঁ। যেমন— 'পথ হারাইল'।

(ই) ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি -বোঁ, -বেঁ, -বে। যেমন- জাইবোঁ , পাইবেঁ, আসিবে।

✧ বাক্য গঠন বৈশিষ্ট্য ঃ

চর্যাগীতির মতো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বা 'শ্রীরামপাঁচালী' বা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এগুলি পদ্য-ছন্দে লেখা। তবে ভাষা বিশ্লেষণে পদ্যের মধ্যেই গদ্যের গঠন হয় । ছন্দের প্রয়োজনে কর্তা-ক্রিয়া-কর্মের অবস্থানের তারতম্য ঘটেছে। তবু ক্রিয়া-অন্ত্য বাক্যের অভাব নেই। যেমন – ' শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

✧ ছন্দগত বৈশিষ্ট্য ঃ

মূলত পয়ার ছন্দে লেখা। পাদাকুলকের এক মাত্রা লুপ্ত হয়ে কোথাও ১৪ মাত্রা হয়েছে। পয়ার ছাড়া ত্রিপদী , চৌপদী, একাবলী ছন্দের ব্যবহার আছে। পয়ার – "এ ধন যৌবন বড়ায়ি / সবঈ আসার"। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চার রকমের ত্রিপদী ছন্দ ছাড়া কোনো কোনো পদে আবার দ্বিপদী ও ত্রিপদীর মিশ্রণ ঘটেছে। অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলা বৃত্ত ছন্দরীতিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি লেখা। এই রীতির বিচিত্র রূপগুলি হল – একপদী (৮ বা ১০), দ্বিপদী (৮ + ৬), ত্রিপদী (৬ + ৬ +৪) বা (৮ + ৮ + ১০) চৌপদী (৮ + ৮ + ৮ + ৬), একাবলী (১১) ইত্যাদি।

একপদী – যোগী যোগ চিন্তে যেহ্ন মনে।
কাহ্নাঞিঁ ছাড়ী না জানো মো আনে।। ১০

দ্বিপদী – পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ। ৮ + ৬
মেদনী বিদার দেউ পসিঁআঁ লুকাওঁ।। ৮ + ৬

ত্রিপদী – সোঞঁরী কাহ্নের বাণী।
না রহে মোর পরাণী।
চেতন নাহিক মোর দেহে। ৮ + ৮ + ১০

চৌপদী – যে ডালে করো মো ভরে।
সে ডালে ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে ।
নাহি হেন ডাল যাত।
করো বিসরামে। ৮ + ৮ + ৮ + ৬

✧ অন্ত্য-মধ্য বাংলা ✧

✧ কালসীমা ঃ

তুর্কি আক্রমণের পর থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মধ্যবাংলা পর্বটির সূচনা হয়। এর শেষ সীমা অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত। মধ্যবাংলার ভাষার স্তরকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে –

মধ্য বাংলা

আদি-মধ্য বাংলা	অন্ত্য-মধ্য বাংলা
(আঃ ১৩৫০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)	(১৫০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)

সুতরাং অন্ত্য-মধ্য বাংলার ভাষার স্তরে কালসীমা বা সময়সীমা হলো ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। অনেক ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত আবার এই সময়সীমা কে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এগিযে নিয়ে যেতে চান।

✧ সাহিত্য নিদর্শন ঃ

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি কবিদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য বৃন্দাবন দাসের রচিত 'চৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ইত্যাদি চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যগুলি এই ভাষার স্তরের সাহিত্যিক নিদর্শন। আরাকানের বোমাণ্টিক গাথা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, সৃষ্টি হয় শাক্তপদাবলি, সেখানে দেবদেবীর ভয়াবহতার স্থানে প্রাধান্য পায় মানব চরিত্রের বিভিন্ন লীলাখেলায় আধুনিকতার ইঙ্গিত বহন করেছিল।

✧ শব্দভাণ্ডার ঃ

আদি-মধ্যবাংলার তুলনায় বিদেশি শব্দের অর্থাৎ আরবি, ফারসি, পুর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরাজি ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার এই ভাষার স্তরে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন –'গজব করিলে তুমি আজব কথায়।' (ভারতচন্দ্র) শাসনের সূত্র ধরে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর ফলে বংলা ভাষা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দ এই ভাষার স্তরে সাহিত্যিক নিদর্শনগুলিতে দেখা যায়।

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ধ্বনিতাত্ত্বিক ভাষা বৈশিষ্ট্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় – (১) অবিভাজ্য ধ্বনি অর্থাৎ যাকে ভেঙে দেখানো যায় না। (২) বিভাজ্য ধ্বনি অর্থাৎ যাকে স্বরধ্বনি ও

ব্যঞ্জনধ্বনিতে বিভক্ত করে দেখানো যায়।

অবিভাজ্য ধ্বনি : –

আদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকায় পদের মধ্যে ও অন্তে (শেষে) 'অ'-কারের লোপ ঘটেছে। যেমন – পাগলা > পাগ্‌লা (মধ্য 'অ' লোপ)। 'হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আসন।' উদ্ধৃত অংশ্যে 'বাপ' ও 'আসন' শব্দ দুটির শেষে 'অ' এর উচ্চারণ হয় না।

বিভাজ্য ধ্বনি : –

১. পদান্তে একক ব্যঞ্জনের পরে 'অ' লোপ। যেমন – 'কোনের ভিতর কুলবধূ।' এখানে 'ভিতর' শব্দে 'অ' লোপ হয়েছে।
২. অপিনিহিতি ও বিপর্যাসের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন – 'শাক বাইগন মূলা।'
৩. নূতন কথ্য ধ্বনি 'অ্যা' এর উদ্ভব হলো। যেমন – 'গঞ্জিকা রাখ্যাছি বান্ধি।'
৪. 'হ' ধ্বনি লোপ। যেমন – কাহ্ন > কানু, আহ্মি > আমি ।
৫. শ্রুতিধ্বনি লক্ষ করা যায়। যেমন – সৈন্য > সহিন্য ('হ' শ্রুতি)
৬. যৌগিক স্বরের মৌলিক স্বর-পরিণতি দেখা যায়। যেমন – নাটুয়া > নেটো ।

✧ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

শব্দ-রূপ :

লিঙ্গ : – বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়া ও বিশেষ্য পদের যে লিঙ্গান্তর ঘটত তা লোপ পেল।

বচন : – 'রা' যোগে কর্তৃকারকে বহুবচন এবং -গুলা, -গুলি যোগে নির্দেশক বহুবচনের প্রয়োগ হলো। যেমন– 'পদ নখে পড়ে আছে তার কত গুলা।'

কারক ও বিভক্তি : – ষষ্ঠীতে 'র' এবং সপ্তমীতে 'এ', 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন – র – রাধার লাগিয়া, এ – 'উইচারা খাই বনে জাতিতে ভালুক।'

অনুসর্গ : – অনুসর্গের তেমন পরিবর্তন ঘটে নি, কেবল সংখ্যায় বেড়েছে।

ধাতুরূপ :

কাল : – ১) 'ইল' যোগে অতীত কাল এবং 'ইত' যোগে ভবিষ্যৎ কাল বোঝানো হতো। উত্তমপুরুষের সদ্য অতীত বোঝাতে 'লাম্' এর প্রয়োগ ছিল।

২) অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে 'আছ্' যোগে যৌগিক কাল গঠন করা হতো। যেমন – 'রাখ্যাছি'।

ক্রিয়াপদ : – 'নাম' ধাতুর ব্যবহার ছিল। যেমন– নমস্কারিল, সান্তাইব।

পুরুষ : – তেমন একটা পরিবর্তন ঘটে নি। অর্থাৎ আদি-মধ্য বাংলাভাষার স্তরের অনুরূপ ছিল।

✧ বাক্যগঠন বৈশিষ্ট্য ঃ

অন্ত্য-মধ্য ভাষার স্তরে অধিকাংশ রচনায় কাব্যছন্দে বা পদ্য ছন্দে রচিত। এবং অধিকাংশই গেয়-সাহিত্য। একমাত্র অ-গেয় সাহিত্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' হলেও সেটিও পদ্যে রচিত। তবে অষ্টাদশ শতাব্দিতে কিছু কিছু দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র পাওয়া গেছে যেগুলি গদ্যে রচিত। কথ্য ভাষায় রচিত এই গদ্যগুলিতে ছেদ বা বিরাম চিহ্ন নেই। তবে বিরাম চিহ্ন বসিয়ে নিলে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার বিন্যাস রীতিটিকে বুঝতে পারা যায়।

✧ ছন্দগত বৈশিষ্ট্য ঃ

মঙ্গলকাব্য, চৈতন্য-জীবনী কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য এগুলি সবই প্রায় পয়ার ছন্দে লেখা। দ্বিপদী ও ত্রিপদী ছন্দে এগুলি রচিত। বৈষ্ণব পদাবলিতে দ্বিপদী ও ত্রিপদী ছাড়া চৌপদী ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। একটি ত্রিপদী ছন্দের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে –

"একে দেখি আতি   চিতের আরতি
পহিলে না ছিল এত।" (জ্ঞানদাস)

✧ আদি-মধ্য ও অন্ত্য-মধ্যবাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা ✧

বাংলা ভাষাকে তার উৎস, বিকাশ ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করলে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়– প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা ও আধুনিক বাংলা। মধ্য বাংলাকে আবার দুটি উপস্তরে ভাগ করা হয়েছে –

মধ্যবাংলা

আদি-মধ্য	অন্ত্য -মধ্য
(১৩৫০-১৫০০খ্রিঃ)	(১৫০১ – ১৮০০ খ্রিঃ)

এই স্তরবিভাজন অনেকটাই অনুমান নির্ভর। তবে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যর অনুসন্ধান ও তার ফলের উপর ভিত্তি করে এরূপ কালসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক তুলনা ঃ

মধ্য বাংলার দুটি স্তর আদি-মধ্য ও অন্ত্য-মধ্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামুলক আলোচনায় যেগুলি গুরুত্ব দেব, সেগুলি হল –

শ্বাসাঘাত ঃ

প্রাচীন বাংলায় আদিস্বরে শ্বাসাঘাত এবং অন্তস্বরে শ্বাসাঘাত দুই-ই ছিল।
আদিতে শ্বাসাঘাত — এড়িএউ ছান্দক বান্ধ পাটের আস (চর্যা ১নং) , - ছান্দক
অন্ত্যে শ্বাসাঘাত — অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী (৬নং), সকল > সঅল।
আদি-মধ্যবাংলায় আদ্যশ্বাসাঘাত দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য স্বরলোপ ঘটে।
যেমন সজল > সজল্ (পদান্ত 'অ' লুপ্ত) । অন্ত্য-মধ্য বাংলাতে তাই আছে।

উদ্বৃত্ত স্বর ঃ

প্রাচীন বাংলায় উদ্বৃত্ত স্বর রক্ষিত আছে। অথবা কোথাও কোথাও একস্বরে পরিণত হয়েছে — 'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই' আদি-মধ্য বাংলায় 'আ' ও 'উ' ক্ষীণ উচ্চারিত হয়েছে এবং অন্ত্য-মধ্য বাংলায় দ্বিস্বরে পরিণত হয়েছে। আদি-মধ্য বাংলা — অপর > অবর > আঅর (উদ্বৃত্ত স্বর রক্ষিত)। অন্ত্য-মধ্য বাংলা— জীবন > জীউ (বৈষ্ণব পদাবলী) ।

নাসিক্য ধ্বনি ঃ

প্রাচীন বাংলা নাসিক্য ধ্বনিযুক্ত ব্যঞ্জন সরল হলে নাসিক্যধ্বনি ক্ষীণ হয়ে অনুনাসিক ধ্বনিতে পরিণত হয়।
প্রাচীন বাংলা — 'দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী (৫নং), মধ্যেন > মাঝেঁ
আদি-মধ্য বাংলায — মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ হয়েছে । যেমন— কৃষ্ণ > কাহ্ন > কানু ; আহ্মি > আমি, আদি-মধ্যের শিষ ধ্বনি ষ > হ , চক্ষ > চাহ এবং 'হ্' -এর সরলীকরণ ঘটে 'ভ' হল। যেমন — অস্মদ > আমি > আহ্মি
অন্ত্য- মধ্য বাংলায় মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনি ব্যাপকভাবে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন, কাহ্ন > কানু।

অপিনিহিতি,অভিশ্রুতি,স্বরসঙ্গতি ঃ

প্রাচীন বাংলায় অপিনিহিতি বা তথাকথিত স্বরসঙ্গতি নেই। আদি-মধ্য বাংলায় অপিনিহিতির উদাহরণ পাওয়া যায় । যেমন করিয়া > কইরা।
অন্ত্য-মধ্য বাংলায় অভিশ্রুতি ছিল —রাখিয়া > রাইখা >রেখে। বাংলায় অভিশ্রুতি হল স্বরসংগতি এবং সন্ধির মিশ্র ফল।

✧ রূপতাত্ত্বিক তুলনা ঃ

বিভক্তি ঃ

প্রাচীন বাংলায় কর্তৃ কারকে বিভক্তিহীনতা লক্ষ করা যায়, যেমন - চঞ্চল চিএ পইঠো কাল (শূন্য বিভক্তি) । কর্ম কারকে শূন্য বিভক্তি- সসুরা নিদ গেল। করণ কারকে -এঁ বিভক্তি — মতিএঁ ঠাকুরক । অধিকরণে -তেঁ বিভক্তি — সুখদুখেতেঁ ; -এর, -আর, -র বিভক্তির দ্বারা সম্বন্ধপদ নিষ্পন্ন হত যেমন 'রুখের তেন্তলি'।

আদি-মধ্য বাংলায় কর্তা ও কর্মে বিভক্তিহীনতা বজায় ছিল। এই স্তরে গৌণ কর্ম ও সম্প্রদানে -কে,-রে, বিভক্তি ছিল। যেমন — 'সাপেরে করিয়া বিষদান'। প্রাচীন বাংলায় ও আদি-মধ্য বাংলায় -ইঅ বিভক্তি ছিল কিন্তু অন্ত্য-মধ্য বাংলায় তা লুপ্ত হয়েছে। অন্ত্য-মধ্য বাংলায় প্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে -রা বিভক্তি; নির্দেশক বহুবচনের ক্ষেত্রে -গুলি, গুলা; তীর্যক কারকের ক্ষেত্রে -দি,-দিগ ইত্যাদি বিভক্তির ব্যবহার হয়েছে। সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষে -ইলাঙ্, -ইলাম্ ; সাধারণ ভবিষ্যতে উত্তম পুরুষে -ইব বিভক্তি লক্ষ করা গেছে।

অনুসর্গ ঃ

প্রাচীন বাংলায় অনুসর্গের ব্যবহার ছিল। যেমন — তোহার অন্তরে আদি-মধ্য বাংলায় অনুসর্গের (কারক বাচক) ব্যবহার শুরু হল। যেমন — আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী ।অন্ত-মধ্য বাংলাতেও অনুসর্গের ব্যবহার ছিল ,যেমন-- বাথান হইতে সঙ্গে সুরভি লইয়া (মৈমনসিংহ গীতিকা)।

বাচ্য ঃ

প্রাচীন বাংলায় অতীত কালে -ই,-ইল এবং ভবিষ্যত কালে -ইব এর প্রয়োগ ছিল, যেমন — মুই বুঝিল , করিব নিবাস ইত্যাদি । আদি-মধ্য বাংলায় -ইল যোগে ভবিষ্যৎ কাল বোঝান হত, যেমন-- শুনিলো , করিবো । অন্ত্য-মধ্য বাংলায় এই একই প্রয়োগ আছে।

যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কাল ঃ

প্রাচীন বাংলায় যৌগিক কালের উদাহরণ না থাকলেও যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন — নিদ গেল , টুটি গেলি । আদি-মধ্য বাংলায় 'আছ্' ধাতু যোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করা হয়, যেমন-- লইছে, কর‍্যাছে । অন্ত্য-মধ্য বাংলায় 'আছ্'ধাতু যোগে যৌগিক ক্রিয়া ও কালের বহুল প্রয়োগ চলছে ।

লিঙ্গ ঃ

প্রাচীন বাংলায় কর্তার লিঙ্গ ভেদ অনুসারে ক্রিয়ার লিঙ্গ ভেদ হত। যেমন— 'সোনে ভরিতী করুণা নাবী' এখানে 'নাবী' স্ত্রীলিঙ্গ বলে। 'ভরিতী' স্ত্রী লিঙ্গ হয়েছে। ক্লীব লিঙ্গ নেই। বিশেষ্য স্ত্রী লিঙ্গ হলে বিশেষণও স্ত্রী লিঙ্গ হয়। যেমন নিশি আন্ধারী।

আদি-মধ্য বাংলায় লিঙ্গ সকর্মক ও অকর্মক অনুযায়ী এবং কর্তার যে লিঙ্গ ক্রিয়ারও সেই লিঙ্গ। যেমন 'চলিলী রাহী'। অন্ত্য-মধ্য বাংলায় কর্তার লিঙ্গের প্রভাব ক্রিয়া বিশেষ্য এবং বিশেষণে প্রভাব পড়ে।

✧ ছন্দগত বৈশিষ্ট্য ঃ

অপভ্রংশ স্তরে প্রধান ছন্দ ছিল মাত্রাবৃত্ত ও পাদাকুলক। মাত্রা সংখ্যা ছিল ১৬।

প্রাচীন বাংলা অর্থাৎ চর্যাগীতিতে তা ১৫ মাত্রায় পরিণত হল। আদি-মধ্য বাংলায় আরও একমাত্রা কমে গিয়ে পয়ারের ১৪ মাত্রা রূপ ধারণ করে। অন্ত্য-মধ্য বাংলায় পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হল। এছাড়া একাবলী ও ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়।

✧ আধুনিক বাংলা ✧

✧ কালসীমা ঃ

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মিশন ও প্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। এই সময় থেকেই আধুনিক বাংলার শুরু। সুকুমার সেনের মতে —

> " অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ হইতে বাঙ্গালার আধুনিক স্তরের আরম্ভ।"

রামেশ্বর শ' মনে করেন —

> " মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। এই বছরটিতে আমরা বাংলা ভাষায় মধ্যযুগের সমাপ্তি ও অধুনিক যুগের সূচনা হয় বলতে পারি।"

তবে যথার্থ বিবর্তন ধরলে ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই শুরু এর শেষ সীমা বলা হয়েছে আজ পর্যন্ত। তবে স্বাধীনতার পর দেশ বিভাজন অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় সাহিত্য বিবর্তনের গতি প্রকৃতির কিছুটা পার্থক্য ঘটেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে একসময় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ প্রচুর ঘটেছে। তাই ১৮০১ থেকে আজ পর্যন্ত সময়কালকে কয়েকটি পর্বে আলাদা করে দেখলে ভালো হয়।

✧ সাহিত্য নিদর্শন ঃ

উনবিংশ শতাব্দিতেই শুরু হয় বাংলা প্রবন্ধ , নাটক, উপন্যাস, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য প্রভৃতি। তবে এই পর্বের সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় কিংবদন্তী হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া বিদ্যাসাগর , বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম অনস্বীকার্য। নজরুল বা মোহিতলালকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি বলে গ্রহণ করতে হবে।

বুদ্ধদেব বসু সর্বপ্রথম দৃঢ়তার সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে নতুন কাব্যসাধনার নান্দীপাঠ করেছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যাঁরা যথার্থভাবে নতুন দিগন্ত খুলে তারা হলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাছাড়া অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রিনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদিরা স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নাট্যাভিনয় ও নাট্যকলার উন্নতি হয়েছে। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত ইত্যাদি থেকে শুরু করে আজকের যুগে গৌতম হালদার, ব্রাত্য বসু ইত্যাদি নতুন ধারার সূচনা করেছেন। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ প্রমুখ সমাজ পরিপেক্ষিতে অবলম্বনে করে কখনোও বা ধূসর ইতিহাসে ফিরে গিয়ে গতযুগের সাহিত্যধারাকে অনুসরণ করে চলেছেন। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবীর পাশাপাশি তসলিমা নাসরিন, তিলোত্তমা মজুমদার, জয়া মিত্র ইত্যাদি লেখিকা তাঁদের রচনাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

গদ্যের দিক থেকে সাধু ও চলিত গদ্যের বিকাশ ঘটে। আবার আঞ্চলিক রূপকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ভাষায় আঞ্চলিক রূপ গুরুত্ব পেয়েছে।

✧ শব্দভাণ্ডার ঃ

কথ্যভাষার বহু শব্দ আধুনিক বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। যেমন জলো, পটো ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাব্দিতে যেখানে আরবি- ফারসি শব্দের ব্যবহার বেশি ছিল সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইংবাজি শব্দের প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন লাট, কাব, লণ্ঠন, চেয়ার, বেঞ্চ, সমন, মোবাইল, ফোন, টি.ভি. ইত্যাদি। আবার বিশ্বায়নের সূত্র ধরে অতি সম্প্রতি কিছু কিছু নতুন শব্দ ভুবনীকরণ,বিশ্বায়িত ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। শিল্পায়নের সূত্র ধরে এসেছে — লাগাতার, ঘেরাও, বন্‌ধ ইত্যাদি। গদ্যরীতির জন্য প্রথমদিকে তৎসম শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও পরে অবশ্য তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ বেড়েছে।

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

অবিভাজ্য ধ্বনি ঃ —

আদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ায় পদের মধ্যে ও অন্তে (শেষে) 'অ'-কারের লোপ ঘটেছে। যেমন — পাগলা > পাগ্‌লা (মধ্য 'অ' লোপ) যেমন — পাগ্‌লা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন ... । স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্বের আদ্য অক্ষরে অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে।

বিভাজ্য ধ্বনি ঃ —

১) পদান্তে একক ব্যঞ্জনের পরে 'অ' লোপ। যেমন — ঘরের ভিতর বাবা আছেন।
২) অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ফলে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে।

যেমন — করিয়া > কইর‍্যা > করে ।

৩) অন্ত্য- মধ্য বাংলায় যে নূতন কথ্য ধ্বনি 'অ্যা' এর উদ্ভব হলো, তার ব্যবহার আধুনিক বাংলায় বেশি।

৪) 'হ্' ধ্বনি লোপ। যেমন — আহ্মি > আমি। আধুনিক বাংলায়ও আছে।

৫) শ্রুতিধ্বনি দেখা যায়। যেমন — মাএর >মায়ের।

৬) যৌগিক স্বরের মৌলিক স্বর-পরিণতি লক্ষ করা যায়। যেমন — নাটুয়া > নেটো।

৭) চলিত রীতিতে স্বরসঙ্গতির ব্যপক ব্যবহার ঘটেছে। যেমন — দেশী > দিশি ।

✧ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

শব্দ-রূপ ঃ

লিঙ্গ ঃ — বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়া ও বিশেষ্য পদের যে লিঙ্গান্তর ঘটত তা মধ্য বাংলাতেই লোপ পেয়েছিল । তবে আধুনিক বাংলায় পুলিঙ্গ - স্ত্রী লিঙ্গ ভেদ স্পষ্ট । ক্লীব লিঙ্গের ব্যবহারও আছে ।

বচন ঃ — 'রা' যোগে কর্তৃকারকে বহুবচন এবং -গুলা, -গুলি যোগে নির্দেশক বহুবচনের প্রয়োগ তো ছিলই তার সঙ্গে -দিগা, -দিগের,-গো এর ব্যবহার দেখা গেল। যেমন আমাদিগের, আমাগো ইত্যাদি।

কারক ও বিভক্তি ঃ — সংস্কৃতকে অনুসরণ করে ছয়টি কারক মানা হয় । তবে আধুনিক বাংলায় চারটি কারকই যথেষ্ট। সম্বন্ধ ও সম্বোধন কে পদ বলা হচ্ছে।

অনুসর্গ ঃ — অনুসর্গের তেমন পরিবর্তন ঘটে নি। দ্বারা, দিয়া ইত্যাদি অনুসর্গ হিসাবে ব্যবহৃত। কারকবাচক অনুসর্গের ব্যবহার বেড়েছে।

অব্যয় ঃ — সংযোজক 'এবং' আর 'ও' এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

ধাতুরূপ ঃ

কাল ঃ — প্রথমদিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদে স্বার্থিক - ক প্রত্যয়ের যোগ ঘটেছিল। বর্তমান , অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল স্পষ্ট।

ক্রিয়াপদ ঃ — সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন গান করা, ধ্যান করা, জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি। অসমপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে একাধিক বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করা হয়েছে।

যেমন — ক) খুশ্ স্কুল গেল। খ) খুশ্ পড়া করল। গ) খুশ্ বাড়ি ফিরল।

একবাক্যে — খুশ্ স্কুল গিয়ে পড়া করে বাড়ি ফিরল।

সাধু রীতিতে ক্রিয়াপদগুলি দীর্ঘ আর চলিত রীতিতে ক্রিয়াপদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত। যেমন করিয়াছিলে — করেছিলে , বলিয়াছিলে — বলেছিলে , করিয়া — করে ইত্যাদি।

পুরুষ ঃ — তেমন একটা পরিবর্তন ঘটে নি। অর্থাৎ আদি-মধ্য বাংলা ভাষা

স্তরের অনুরূপ ছিল। আধুনিক বাংলায় উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ — এই তিন প্রকার পুরুষই আছে।

✧ বাক্যগঠন বৈশিষ্ট্য ঃ

আধুনিক বাংলায় বাক্যের প্রধান দুটি উপাদান হল — ক) উদ্দেশ্য খ) বিধেয়। পদের স্বাভাবিক ক্রমটি কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। তবে অতি সম্প্রতি এই রীতি যথার্থ মেনে চলা হয় না। আধুনিক বাংলার বাক্যগঠনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নঞর্থক অব্যয় না,নাই,নি সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন — 'সত্যবতী সত্য ভঙ্গ করেন নি।' তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। আবার অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে এই অব্যয়গুলি বসে । যেমন— 'সত্যবতী সত্য ভঙ্গ না করে চিরকাল সৎপথে থেকেছেন।' ভাষার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করার জন্য একাধিক সরল বাক্যকে সংযোজক অব্যয় দিয়ে যৌগিকবাক্য ও পদ বৃদ্ধি করে জটিল বাক্য করার রীতি আছে। গঠনগত দিক থেকে বাক্য হয়েছে সরল, জটিল ও যৌগিক।

✧ ছন্দগত বৈশিষ্ট্য ঃ

ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। মধ্য বাংলায় কেবল অক্ষরবৃত্তের নানারূপ ছিল। আধুনিক বাংলায় জন্ম নিল মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ। তাছাড়া ছন্দের বৈচিত্র্য হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ, মুক্তক ছন্দ, গদ্য ছন্দ এসেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো কবিরা সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় প্রয়োগ করে বৈচিত্র্য এনেছেন। এসেছে বাংলা সনেট।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ —

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু , চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?

(মেঘনাদবধ কাব্য ঃ প্রথম সর্গ)

মুক্তক ছন্দ —

হে মুরারি, বুঝিতে না পারি,
পদানত অরি,
তবে কেন বিষণ্ণ তোমারে হেরি ?

(জনা নাটকে বৃষকেতু)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ —

| | | | | | | | || | | | |
কাঁপে তনুবায়ু / কামনায় থরো / থরো। ৬ + ৬ + ২

| | || | | || | | | | ||
কামনার টানে / সংহত গ্লেসি ঃ য়ার। ৬ + ৬ + ২

|| | | || | || | || | |
হালকা হাওয়ায় / হৃদয় আমার / ধরো, ৬ + ৬ + ২

| || | || || | | | || | || | ||
হে দূর্‌দেশের / বিশ্ববিজয়ী / দীপ্ত ঘোড় সও ঃ য়ার। ৬ + ৬ + ৬ + ২

(ঘোড়সওয়ার)

গদ্য ছন্দ —

কাছে এল পূজার চিঠি
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রং
হাওয়া উঠেছে শিশিরে শিরশিরিয়ে।

(পুনশ্চ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তবে এখানেই থেমে গেলে চলবে না। উপভাষার কথা মাথায় রেখে স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্থান ও উর্দু ভাষার প্রভাবের কথা মনে রেখে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষার আলাদা স্তর ধরে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান চালাতে হবে।

বাংলা সাধুভাষা ও চলিতভাষা

✧ দুই রীতির জন্ম ও বিবর্তন ✧

ভাষা জন্ম থেকে বিবর্তনের পথে বৃহত্তর মানুষের মুখের ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। পাণিনি যত সংস্কারই করুন না কেন একদিন লোকমুখের ভাষাকে নিয়ে প্রাকৃত ভাষার জন্ম হল। আদি বাংলা হিসাবে আমরা যে চর্যাগীতির কথা জেনেছি তাও লোক মুখের ভাষা অর্থাৎ চলিত বাংলা। ১৮০০ সালে বাংলা গদ্য জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার স্পষ্ট দুটি রীতি লক্ষ করা গেল। সম্ভবত রামমোহন রায় তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)-এ প্রথম 'সাধুভাষা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সাধুভাষা বলতে তিনি 'সংস্কৃত বুৎপন্ন','সংস্কৃতমূলক', 'সংস্কৃতানুসারিণী' ভাষাকেই বুঝিয়েছেন। এই সাধুভাষার পরিচয় দিতে গিয়ে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন –

> .... with its forms belonging to Middle Bengali, and its vocabulary highly Sanskritised, it could only be compared to a 'Modern English' with a Chaucerian grammar and a super Johnsonian vocabulary, if such a thing could be conceived.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁকে অনুসরণ করে অনেকে সাধুভাষাকে সাহিত্যের ভাষা (Literary Bengali) এবং মানুষের মুখের ভাষা রীতিকে চলিত ভাষা (Standard Colloquial) বলেছেন। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন –

> কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা ; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা।

একই বাংলা ভাষায় এই দুটি রীতি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কতৃক গদ্যরীতির ভাবনা । বাংলা গদ্যরীতি কেমন হবে এই লক্ষ্যে উইলিয়াম কেরি পণ্ডিত ও মুনশীদের ডাকলেন। মধ্য বাংলায় ভাষার সহজ রীতি প্রতিষ্ঠা পেলেও পণ্ডিতকুলের প্রাধান্যে সাধুরীতি অর্থাৎ সংস্কৃত অনুকরণ প্রাধান্য পেল। পাশাপাশি ক্ষীণ ধারায় চলিত রীতিও চলতে থাকে । সাধুরীতির প্রাথমিক রূপটি মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায়

পাওয়া যায়। এই ধারার উত্তর পুরুষরা হলেন রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর,বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি মহানব্যক্তিরা। আবার রামরাম বসু চলিত রীতিকে প্রাধান্য দিয়ে গদ্যচর্চা করেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে কেরি, ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ ইত্যাদিরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার এই দুই ধারার মিলন ঘটালেন প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। শুরু হল আদর্শ চলিত।

সাধুরীতি	চলিতরীতি
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার	রামরাম বসু
রামমোহন	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগর	প্যারীচাঁদ মিত্র
বঙ্কিমচন্দ্র	কালীপ্রসন্ন সিংহ

বিবেকানন্দ
|
রবীন্দ্রনাথ
|
প্রমথ চৌধুরী
(সবুজ পত্র)

✧ সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য ✧

সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা আর মুখের ভাষা এক হয় না। তবুও মানুষের মুখের ভাষাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আধুনিক বাংলা ভাষাতে সাহিত্য রচনার দুটি রীতি চালু আছে একটি হল 'সাধুভাষা', অন্যটি হল 'চলিত ভাষা'। শব্দ ব্যবহার পদের আকৃতি রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি ইত্যাদিতে উভয় ভাষার মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দেখা যায়।

✧ শব্দব্যবহারে পার্থক্য :–

i) সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল শব্দ ব্যবহারে। সাধুভাষার শব্দ প্রয়োগে তৎসম শব্দের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। অন্যদিকে চলিত ভাষার

তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি শব্দ এমনকি আঞ্চলিক উচ্চারণকে গুরুত্ব দিয়ে শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন — সাধু — শ্রী, চলিত — ছিরি।

ii) সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার বেশি সাধুভাষায়, চলিত ভাষায় কম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে — ' অস্তাচলগমনোদ্যগী', নীলনীরদমালায় , বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত ইত্যাদি।

iii) সাধুভাষার গাম্ভীর্য ও আভিজাত্যের সঙ্গে কথ্যরীতির ইডিয়াম ব্যবহার খাপ খায় না। কিন্তু চলিত ভাষার কথ্য প্রবাদ, প্রবচন ও বিশিষ্টার্থক বাক্য ব্যবহারে ভাষা জীবন্ত হয়ে উঠে।

iv) ধ্বনি পরিবর্তন জনিত শব্দগুলি অর্থাৎ স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ইত্যাদি গুরুত্ব পায় কিন্তু পরবর্তীকালে সাধু ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন জনিত শব্দগুলিকে বর্জন করা হয়।

✧ রূপতত্ত্বগত পার্থক্য ঃ —

i) সাধুভাষাকে ক্রিয়াপদগুলির দীর্ঘরূপ বা পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু চলিত ভাষার এর সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন —

সাধু	চলিত	
করিতেছিলাম	করছিলাম	
করিতেছে	করছে	ইত্যাদি।

ii) সাধুভাষার সর্বনাম পদের দীর্ঘরূপ ব্যবহৃত হয় কিন্তু চলিত ভাষার এর সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত। যেমন —

সাধু	চলিত	
তাহারা	তারা	
যাহাদিগকে	যাদেরকে	ইত্যাদি।

iii) যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধুভাষার বেশি, চলিত ভাষায় কম। চলিত ভাষায় মৌলিক ক্রিয়া দিয়ে কাজ চালানো হয়। যেমন —

সাধু	চলিত	
শ্রবণ করিয়া	শুনে	ইত্যাদি।

iv) অনুসর্গ ব্যবহারে সাধু চলিত পার্থক্য আছে।

সাধু	চলিত	
দ্বারা	দিয়ে	
সহিত	সঙ্গে	ইত্যাদি।

v) সাধুভাষায় তির্যক কারকের বহুবচনে শব্দের সঙ্গে 'দিগ' প্রত্যয় যোগ করে তার সঙ্গে বিভক্তি যোগ করা হয়। চলিতে 'দিগ' স্থলে 'দের ' ব্যবহৃত হয়। যেমন —

সাধু	চলিত
আমাদিগকে	আমাদের
রামেদিগের	রামেদের

vi) সাধুভাষায় অতীত ও ভবিষ্যৎকালে অনেক সময় (বিদ্যাসাগরে গদ্যে) স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হতো, কিন্তু চলিতে তা বর্জিত হয়। যেমন –

সাধু	চলিত
হইবেক	হবে

vii) সাধুভাষায় ল-জাত ক্রিয়া যেমন– লয়, লইবে ইত্যাদি স্থানে চলিত ভাষায় না-জাত ক্রিয়ার ব্যবহার হয়। যেমন –

সাধু	চলিত	
লইবে	নেবে / লেবে	
লইতেছে	নিচ্ছে / লিচ্ছে	ইত্যাদি।

✧ **বাক্যরীতিগত পার্থক্য ঃ**

i) সাধু ভাষায় পদক্রম বিন্যাস রীতি কঠোরভাবে অনুসৃত হয় কিন্তু চলিত ভাষায় তা সর্বদা মানা হয় না। যেমন–

সাধু	চলিত
রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে গমন করিলেন।	বনে গেলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।
লক্ষ্মণের অগ্রে রাম বিলাপ করিলেন।	বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।

ii) সাধু ভাষায় সাধারণত জটিল ও যৌগিক বাক্যের ব্যবহারের ফলে বাক্য দীর্ঘ হয়। কিন্তু চলিতে বাক্য গঠন সরল তাই বাক্য সাধারণত দীর্ঘ হয় না।

iii) সংস্কৃতরীতি অনুসরণ করে সাধুভাষায় বাক্য গঠন করা হয়, কিন্তু চলিতে কথ্য ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ায় বাক্য গঠনে নতুনত্ব এসেছে।

iv) সুকুমার সেন বলেছেন – "সাধুভাষায় বহুভাষণ (Periphrasis) প্রশংসিত, চলিতভাষায় মিত ভাষণই সমাদৃত।"

শেষে বলতে পারি নিয়মের জালে আবদ্ধ থাকায় সাধুভাষা বর্তমানে আনুষ্ঠানিক ও কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হয়েছে। দু-একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, প্রচার অনুষ্ঠান, নিমন্ত্রণ পত্রে বেঁচে আছে। অন্যদিকে চলিত ভাষা কথ্যরীতির অনুসারী বলে তা জীবন্ত ও মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি।

পারস্পরিক রূপান্তর ঃ –

সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তরের নিয়ম ঃ – (১) তৎসম শব্দের পরিবর্তে বহু শ্রুত তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের ব্যবহার করতে হয়।

ক) বিশেষ্য পদের ক্ষেত্রে ঃ –

তৎসম, সংস্কৃত পদের পরিবর্তে অর্ধ তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, প্রতি শব্দের ব্যবহার আবশ্যিক । মস্তক > মাথা, নৃত্য > নাচ, ভূমি > ভুঁই (জমি) ইত্যাদি।

খ) বিশেষণ পদের ক্ষেত্রে ঃ –

অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা উচিত। স্বর্ণিল > সোনালী, তাম্রাভ > তামাটে, বাহির > বার, অন্তর > অন্দর ইত্যাদি।

গ) সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে ঃ –

মধ্যযুগীয় সর্বনাম পদের স্থানে ধ্বনি পরিবর্তন জাত আধুনিক রূপ ব্যবহার্য্য। যেমন – ত্বদীয় > তোমার, তদীয় > তার, তাহারা > তারা ইত্যাদি।

ঘ) অব্যয় পদের ক্ষেত্রে ঃ –

সংস্কৃত অব্যয় পদের স্থানে তার পরিবর্তিত আধুনিক তদ্ভব রূপ বা আধুনিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়। অনুসর্গ অব্যয়ের তদ্ভব রূপ ও অভিশ্রুতি নিয়ন্ত্রণ রূপ ব্যবহৃত হওয়া চাই। – তথাপি > তবুও, বরঞ্চ > বরং, এবং > আর, অথবা > বা, দ্বারা > দিয়া, হইতে > হতে, অপেক্ষা > চেয়ে।

ঙ) ক্রিয়া পদের ক্ষেত্রে ঃ –

সাধু ভাষার ক্রিয়া পদকে (সমাপিকা ও অসমাপিকা) অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, স্বরলোপ ও বর্ণ লোপ ইত্যাদি ধ্বনি পরিবর্তন জাত চলিত ভাষার ক্রিয়া পদে রূপান্তরিত করতে হবে। যৌগিক ও সংযোগমূলক ক্রিয়াকে অনুরূপ ভাবে কখনো চলিত ভাষার ক্রিয়াপদে। কখনো বাংলা (দেশি) ক্রিয়া পদে সংক্ষেপিত আকারে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করা উচিত।

অভিশ্রুতি – করিয়া > করে, (স্বরসঙ্গতি) নাহি/নাই >নেই, বলিও > বলা। স্বরসংক্ষেপ ও বর্ণলোপ – ডাকিতেছিল > ডাকছিল, বহিতেছিল > বইছিল। যৌগিক ক্রিয়া – হাঁটিয়া যাইতে হইল > হেঁটে যেতে হল, (সংযোগ মূলক ক্রিয়া) ভ্রমণ করিলাম > বেড়লাম, প্রবেশ করিলাম > ঢুকলাম ইত্যাদি।

চ) ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করতে হয়। শ্রুতি মাধুর্যের দিকে দৃষ্টি রেখে বাক্যের অন্তরগত পদকে ইচ্ছামত সাজানো যেতে পারে।

ছ) প্রত্যয় নিস্পন্ন, সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদের পরিবর্তে তদ্ভব শব্দ অপেক্ষাকৃত সহজ – তৎসম শব্দ (বহু প্রচলিত) ব্যবহার করা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে সমাসটিকে ভেঙে দিতে হয়।

✧ সূত্রাকারে চলিত থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তর প্রয়োজনীয় নির্দেশ ঃ –

১) তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, শব্দের স্থানে তৎসম শব্দ ব্যবহার করতে হয়।

২) চলিত ভাষায় বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের বদলে সমার্থবোধক তৎসম শব্দ ব্যবহার

করা প্রয়োজন। সে ডুব মেরেছে > সে আত্মগোপন করিয়াছে।

৩) ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ ব্যবহার করতে হয়।

৪) পদ বিন্যাস পদ্ধতি মেনে চলতে হয়।

৫) জটিল শব্দের সরলীকরণও করা যায়।

✧ দ্বিবাচন বা দ্বিরীতিতত্ত্ব বা দ্বিভাষিক রীতি ✧

অধিকাংশ সমাজেই দু রকমের কোড বা ভাষার প্রচলন আছে। এর মধ্যে একটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি আছে যা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন উচ্চ রূপ বলেই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠে এবং আর একটি বাড়ির লোকজনের কথাবার্তায়, বন্ধুর সঙ্গে আড্ডায় , রান্নাঘরে চর্চিত হয় বলেই তা নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন নিম্ন রূপ । যেখানে এই দুরকম ভাষাই চালু আছে , পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষ বলে থাকে তাকেই বলে দ্বিবাচন।

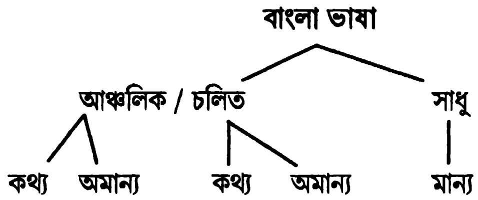
বর্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্ চার্ল্স্.এ.ফার্গুসন্ ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর চারটি বৃহত্তর ভাষা সম্প্রদায় অর্থাৎ গ্রিক, সুইস-জার্মান, আরবি, হেইতি-ক্রেওল -এর ভাষিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'Diglossia' (১৯২৫) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, " অনেক ভাষা অঞ্চলে ভাষাগত পরিস্থিতির কারণে কোন ভাষার দু'টি রূপ বা রীতি স্বীকৃত হ'য়ে থাকে — তাদের একটি ব্যবহৃত হয় সাহিত্যে, লেখায় এবং বিদ্বৎসমাজে, বক্তৃতা- আলোচনা প্রভৃতিতে, অপরটি ব্যবহৃত হয় দৈনন্দিন জীবনের কথোপকথন ও সামাজিক যোগাযোগে।" ভাষার এই দ্বিরূপের ব্যবহারকে দ্বিবাচন বা Diglossia বলে।

ফার্গুসনের ভাষায় —

> Diglossia is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of language, there is a divergent, hightly codified variety, the vehicle of a large and respectable body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation.

ফার্গুসনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ভাষার দুটি রূপ — একটি বিধিগ্রাহ্য মান্যরূপ আর একটি হল বিধিবাহ্য স্থানিয় রূপ। আরবি ভাষাভাষীরা এই দ্বিবাচন ব্যবহার করে । তারা বাড়িতে যে ভাষা ব্যবহার করে অফিস- কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তা করে না। এর উপর ভিত্তি করে ভাষা ব্যবহারের দ্বিবাচনিক ভাবনাটি গড়ে উঠেছে। যেমন আমরা

বাড়িতে মান্যরূপ ব্যবহার করি না। একটি চার্টে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে –



চারটি ভাষা সম্প্রদায় অর্থাৎ গ্রিক,সুইস-জার্মান, আরবি এবং হেইতি-ক্রেওল – এদের মান্যরূপ এবং বর্তমান। যেমন ধ্রুপদী আরবি প্রাচীন ভাষা, কথ্য-আরবি আধুনিক ভাষা আবার হেইতি-ক্রেওলের কথিত হেইতি নিম্নমূলীয় বা অমান্যরূপ, সেখানের উচ্চমূলীয় ব্য মান্যরূপ হল ফরাসি। এই ভাষাগুলিতে মান্যরূপে এবং অমান্য রূপের পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন গ্রিক ভাষিক পরিস্থিতিতে 'মদ' শব্দের দুটি রূপ – একটি 'inos ' যেটি হোটেলের বা রেস্তোরাঁ মেনুতে ব্যবহৃত, কিন্তু বেয়ারাকে খাবার অর্ডার দিতে গেলে বলতে হয় ' krasi '।

ফার্গুসন্ দ্বিবাচনের ধারণা দেবার পরে বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানীরা কেউ কেউ মনে করেন যে, সাধু ও চলিতের সম্পর্ক হল দ্বিবাচনিক। আবার কেউ কেউ বলেন সাধু-চলিত নয়; চলিত এবং উপভাষার সম্পর্ক দ্বিবাচনিক। উদয় নারায়ণ সিং চলিত-সাধুর সম্পর্ক দ্বিবাচনিক ধরে দিল্লীর বাঙালিদের উপর একটি সমীক্ষাজাত ফল প্রকাশ করেছেন। তবে এ গবেষণা পূর্ণ নয় কারণ তিনি চলিত ও সাধু সম্পর্কে বাঙালিদের মনোভাব লক্ষ করেছেন। মনোভাব ও ভাষিক পরিস্থিতি এক নয়। তাঁকে অনুসরণ করে সুহাস চট্টোপাধ্যায় মনে করেছিলেন যে বাংলা ভাষাতেও দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়াটি আছে। বাংলা ভাষায় এই রূপের অস্তিত্ব বজায় আছে, কিন্তু দুই রূপের মধ্যে বিভাজনগত সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। ফারগুসেনের তত্ত্বানুযায়ী বাংলা সাধু-চলিতকে দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায় ফেলা যায় কিনা দেখতে হবে।

ফার্গুসন্ দ্বিবাচনের নয়টি সূত্র ও তার মূল্যায়ন ঃ

১. নির্বাহন বা বিশেষ ব্যবহার ঃ

ফার্গুসনের মতে দ্বিবাচনের প্রথম ও মৌল শর্ত হল নির্বাহনগত বিভাজন। একই সমাজে উচ্চরূপ আর নিম্নরূপ ব্যবহৃত হয় যেমন বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বেতার-টেলিভিশনে, কবিতা পাঠের আসরে , রাজনৈতিক বক্তৃতায় অনেকটাই ভাষার অনুশাসন মেনে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ঘরোয়া আলাপ আলোচনায় সর্বদা তা মানা হয় না।

ফার্‌গুসন্‌ কথিত কোন স্পষ্ট বিভাজন রেখা বাংলা সাধু-চলিতে নেই। পশ্চিমবঙ্গে একটি সংবাদপত্রে (আনন্দবাজার)-র সম্পাদকীয় কেবল সাধু, বাকি চলিতএবং বাংলাদেশের প্রভাতী সংবাদ পত্র (দৈনিক বাংলা)-এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধে চলিত বাকি সর্বত্রই সাধুর ব্যবহার, আবার বিয়ের কার্ডে সাধুভাষার ব্যবহার কিন্তু বিয়েবাড়িতে অবিরাম চলিতের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাচীনেরা অনেকেই সাধু ব্যবহারের পক্ষপাতী, আবার কেউ চলিতের প্রতি দুর্বল। আবার দুইয়ের মিশ্র ব্যবহারও আছে। তবে বাংলা সর্বত্র এই পার্থক্য রক্ষা করতে পারে নি।

২. ব্যাকরণগত ঃ

ফার্‌গুসনের ধারণা অনুয়ায়ী ব্যাকরণ মেনে উচ্চ রূপে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়ে নিম্নরূপে তা করা হয় না। তিনি আরবি ভাষা থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে ধ্রুপদী আরবিতে বিশেষ্যের তিনটে কারক আছে, কিন্তু কথ্য আরবিতে তা একেবারেই নেই। বাংলা সাধু-চলিতে এমটা প্রায় নেই বললেই চলে।

আবার ভাষাবিদ্‌ দেখিয়েছেন সাধু এবং চলিতের ক্ষেত্রে আংশিক ব্যাকরণগত পার্থক্য আছে। যেমন কিছু সর্বনাম, অব্যয় এবং ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে। দুটি রূপের কিছু সমাজভাষা বৈজ্ঞানিক সঙ্গতিসূত্র আছে যা ভাষাকে মেনে চলতেই হয়। 'শবদাহ' আর 'মরা পোড়া' ধরনের কিছু উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে উদাহরণ দিয়েছেন তা হল — 'উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল এইটে থেকেই সর্পবংশ ধ্বংসের উৎপত্তি।' এবং বলেছেন — 'এর ক্রিয়া কটাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধু ভাষার ভঙ্গি দিলেই কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।'

৩. শব্দভাণ্ডার ঃ

ফার্‌গুসন গ্রিক , আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে উচ্চরূপ ও নিম্নরূপের পার্থকে দেখিয়েছেন। যেমন — গ্রিক ভাষায় 'গৃহ' বোঝাতে উচ্চরূপে বলা হয় 'ikos' আর নিম্নরূপে 'spiti'। বাংলা শব্দভাণ্ডারে একসময় এই পার্থক্য করা হত।

যেমন — সাধুরূপে — আমি প্রত্যহ স্নান করি।

চলিতরূপে — আমি প্রতিদিন গা ধুই।

সাধু এবং চলিতের শব্দগত বিভাজন রেখা অল্প কিছু শব্দের ক্ষেত্রে স্পষ্ট। যেমন,

সাধু	চলিত
হইতে	হতে
সহিত	সাথে ইত্যাদি।

৪. আয়ত্তি ঃ

ফার্‌গুসনের মতে বয়স্ক লোকেরা কথা বলার সময় দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া চালিয়ে

যায়। যখন তারা অন্য বয়স্ক লোকের সঙ্গে কথা বলে তখন এক আর শিশুদের সঙ্গে বলার সময় আর এক। আবার শিশুরা ভাষা আয়ত্ব করার সময় নিম্নরূপের সঙ্গেই পরিচিত হয়, পরে তারা বিদ্যালয় যেতে শুরু করলে আস্তে আস্তে ভাষার উচ্চরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়। এদিক থেকে বিচার করলে সাঁওতাল ও বোড়ো শিশুদের দ্বিভাষিক বলতে হয়।

৫. উচ্চারণ ঃ

ফার্‌গুসন গ্রিক ভাষা থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে ভাষার উচ্চরূপ ও নিম্নরূপের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে ধ্বনিতত্ত্বে ভেদ রেখা টানা খুব শক্ত। বাংলায় ভাষার নিম্নরূপে শ্বাসাঘাত, বল, সুর , ঝোঁক , টান ইত্যাদি অবিভাজ্য ধ্বনিকে অস্বীকার করা যায় না।

৬. স্থায়িত্ব ঃ

ফার্‌গুসনের মতে দ্বিবাচন হল একটা সুস্থিত পরিস্থিতি, যা টিকে থাকে কয়েকশো বছর ধরে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত সাধু-চলিতের কোন দ্বিবাচনিক সম্পর্ক নেই। তবে তর্কের খাতিরে ঐতিহাসিক বিভাজন ছিল, একথা মেনে নিলে তা যে বিলীন – তা মানতেই হয়। অতএব বাংলা ভাষায় মান্য-অমান্য ভেদ নেই তাই দ্বিবাচনও নেই।

৭. মান্যরূপ ঃ

ফার্‌গুসনের মতে উচ্চরূপে ব্যাকরণশাস্ত্রের ঐতিহ্য বর্তমান। ভাষার এই উচ্চরূপকে অনুসরণ করে ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। সাধুর উপর ভিত্তি করে বাংলা ব্যাকরণ তৈরি হয়। পরবর্তীকালে ইংরাজ 'সাহেবজাত গণের শিক্ষার্থে' ব্যাকরণ লেখা হয়। ফলে আদিকাল থেকেই বাংলা ব্যাকরণ হল সাধু-চলিতের ব্যাকরণ -- অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট রূপের ব্যাকরণ নেই। একমাত্র সুকুমার সেন প্রকৃত অর্থে চলিত বাংলা ব্যাকরণ লেখার চেষ্টা করেছিলেন।

পড়ার সময় সাধু বৈধ কিন্তু সাধুর উচ্চারণ চলিত থেকে আলাদা এটা বলা যাবে না। এর থেকে এটা মনে করার কোন অবকাশ নেই যে, সাধু যথেষ্ট মান্যরীতি নয়, সাধু এবং চলিত উভয়ই যথোচিত মান্যয়ীত। কথ্যভাষার মান্যায়ন একটি সচল প্রক্রিয়া এবং নমনীয় সুস্থিত। তবে বর্তমানে সাধু মান্যয়ীত হয়ে থেমে গেছে আর চলিত মান্যায়নের পথে।

৮. মর্যাদার প্রশ্ন ঃ

উচ্চ আর নিম্নরূপ থেকেই সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটি আসে। এমন অনেক ভাষা-সম্প্রদায় আছে যেখানে ভাষার নিম্নরূপের কোন অস্তিত্ব নেই। আরবি ভাষাতে ভাষার ধ্রুপদী রূপটিই প্রযোজ্য। বাংলায় মানুষের মর্যাদার প্রশ্নে এমনটি হয় না।

৯. সাহিত্যিক উত্তরাধিকার ঃ

ফার্‌গুসন ভাষার উচ্চরূপের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন এই রূপেই সাহিত্য রচিত হয় বেশি। বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সাহিত্যিক উত্তরাধিকার সাধুর যেমন আছে তেমনি দুইয়ের মিশ্র ব্যবহারও আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় দেখিয়েছিলেন সাধুকে আশ্রয় করে যেমন সাহিত্য রচনা করা যায়, তেমনি কথ্যভাষাও সাহিত্যের মাধ্যম হতে পারে। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বিমিশ্র চলিতকে সাহিত্যের মাধ্যম করলেন। উনবিংশ শতাব্দিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রসাহিত্যে চলিতকে স্থান দিয়েছিলেন। ১৯১৪ খ্রিঃ 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রমথ চৌধুরী চলিত (আদর্শ চলিত) ভাষা প্রচারের দায়িত্ব নিলেন। এটা ঠিক যে সাধু আজ ব্রাত্য, অথচ একদিন উচ্চরূপ বা মান্যরূপের সাম্রাজ্যে সে ছিল অধিশ্বর।

ফার্‌গুসন বলেছিলেন নয়টি শর্তপূরণ হলে, তবেই দ্বিবাচন হবে। আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে সাধু-চলিত দ্বিবাচনের এই নয়টি সূত্রকে পূর্ণ করে না। হয়তো কোন শর্তের সঙ্গে কিছু মিল থাকতেই পারে, তাছাড়া সাধু এবং চলিত উচ্চ বা নিম্ন কোন রূপই নয়। তবে যাদের মাতৃভাষা সাঁওতালি ও বাংলা তারা এর মধ্যে পড়তে পারে।

দ্বিবাচনিক ধারণাকে যদি গ্রহণ করি তা হলে বাংলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে নিম্নরূপ বলতে হবে ; আর সাধু হবে উচ্চরূপ। কারণ উচ্চরূপ কারো মাতৃভাষা নয়। প্রশ্ন হয়, তাহলে চলিতের জায়গা কোথা হবে ? অথচ চলিত হল কথ্যভাষা, মান্যভাষা এবং লেখ্যভাষা। আবার সাধারণ ভাষা উচ্চবুলিও হতে পারে না। আজকের সামাজিক উপভাষা গবেষণায় এই বিভাজনের প্রশ্নটি অবান্তর । সুতরাং বাংলা ভাষায় দ্বিবাচনিক পরিস্থিতিতে নেই।

উপভাষা

ষোড়শ শতাব্দিতে ইংরাজি ভাষায় প্রথম dialect (উপভাষা) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কথা বলার স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও ধরণই হল উপভাষা । উপভাষাকে সাধু ভাষার বিকৃতরূপ বলে মনে করা হত। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এ ধারণা বদলাতে শুরু করল। ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের উপর ভিত্তি করে উপভাষার গঠন ও বিশ্লেষণে ভাষাবিদ্‌রা এগিয়ে এলেন। প্রথম উপভাষার মানচিত্র প্রস্তুত করেন জার্মান ভাষাবিদ্ জর্জ ওয়েংকার। তিনি বিদ্যালয় শিক্ষকদের সহায়তায় প্রশ্নমালার মাধ্যমে উপভাষা সংগ্রহ করেন। পরে ফরাসি ভাষাবিদ্ জুল গিলিয়েগাঁ আরও ব্যাপকভাবে গবেষণা করে একটি অনুসরণযোগ্য মানচিত্র তৈরি করেন।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ভিয়েনায় 'ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেস' অধিবেশনে ভারতে ভাষা ও উপভাষা জরিপের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজ,বার্মা,হায়দ্রাবাদ ও মহিশুর বাদে অন্যান্য অঞ্চল জরিপ করে জর্জ ক্যাম্পবেল একটি শব্দসূচি তৈরি করেন। এর উপর ভিত্তি করে জর্জ গ্রিয়ার্সন ভারতের ভাষাকে ২৩১ টি ভাষা এবং ৭৪৪ টি উপভাষা অঞ্চলে ভাগ করেন। পরে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে আদমশুমারী রিপোর্টের সাহায্যে তিনি 'Linguistic Survey of India ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১১ খণ্ডে রচিত গ্রন্থে কথ্য ভাষাগুলির নমুমা সংগ্রহ করা হয়েছে। যার মধ্যে বাংলা উপভাষা সম্পর্কিত আলোচনাও আছে।

বাংলা ভাষায় প্রথম উপভাষা সংগ্রহ করেন পর্তুগিজ ধর্মযাজক মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও। ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার উপভাষা নিয়ে ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'ভোকাবুলারিও এম্ ইদিওমা বেন্‌গোল্লা ও পর্তুগীজ ' নামক একটি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ,ভেদ' গ্রন্থেও উপভাষার ব্যবহার আছে।

✧ উপভাষার সংজ্ঞা ✧

বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনি সমষ্টি ব্যবহৃত হতে থাকে। কোন নির্দিষ্ট ধ্বনি সমষ্টি ব্যবহার করে এরূপ জনমগুলিকে বলা হয় ভাষাসম্প্রদায় বা Speech community। কোন ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষারূপ হল উপভাষা বা Dialects. কোন ভাষা সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশি হলে উপভাষা সৃষ্টি হয়। বেশি লোক থাকলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মেশার সুযোগ না পাওয়ায় বিশেষ ধ্বনি সমষ্টি ব্যবহারকারী মানুষ গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে অথবা পার্শ্ববর্তী অন্য ভাষার প্রভাবে ভাষা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে।

উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভাষাবিদ্‌রা বলেছেন –

সুকুমার সেন –

কোন ভাষাসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষাছাঁদকে উপভাষা (Dialect) বলে।

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য –

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে গড়া 'ভাষাগুচ্ছ'কে উপভাষা বা dialect বলা হয়।

রফিকুল ইসলাম –

উপভাষা প্রধানত ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা রূপভেদ .....

কালাম মনজুর মোরশেদ –

উপভাষা হচ্ছে চলিত ভাষার একটা উপরূপ, যা চলিত ভাষার চেয়ে কম ভাষাভাষীদের অঞ্চলে নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

রামেশ্বর শ' –

উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা (standard language) বা সাহিত্যিক ভাষার (literary language) ধ্বনিগত,রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য আছে; এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে, অথচ পার্থক্যটা যেন এত বেশী না হয় যাতে আঞ্চলিক রূপগুলি এক-একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে উঠে।

Mc. David Jr.

A Dialect is simply an habitual variety of a language, set off from other such varieties by a complex of features of pronunciation, grammar or vocabulary.

Merio A Pei & Frank Gaynor --

A Specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation gramatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a destinct entity. yet not sufficientily distinct from other dialects of the language, to be regerded as a different language.

সমস্ত প্রকার সংজ্ঞাগুলির মধ্যে রামেশ্বর শ' বিস্তারিতভাবে উপভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। একই ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে একই ধ্বনি ব্যবহারের মধ্য আর সীমাবদ্ধ থাকে না তখনই ভাষা পার্থক্যে উপভাষার সৃষ্টি হয়। উপভাষা যেহেতু লোকসমাজের ভাষা তাই এর সজীবতা বেশি। তাই ম্যাক্সমুলার বলেছেন – " The real and natural life of language is its dialects".

✧ উপভাষা সৃষ্টির কারণ ✧

১. ভাষা ব্যবহারকারী জন-সমষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি।
২. পার্শ্ববর্তী অন্য ভাষার প্রভাব ।
৩. ভৌগোলিক ও সামাজিক ব্যবধান।
৪. সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক পার্থক্য।
৫. বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ।

✧ ভাষা ও উপভাষা ✧

ভাষা আঞ্চলিক পার্থক্যেই উপভাষা হচ্ছে। আবার উপভাষা ব্যবহারকারির সংখ্যা বৃদ্ধি হলে তা থেকে যে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠি পরিচিত লাভ করছে তখন সেই উপভাষা আবার ভাষা হয়ে যাচ্ছে। যেমন বাংলা ও অসমিয়া একই ভাষার অন্তর্ভুক্ত দুটি উপভাষা ছিল, কিন্তু আজ দুটোই স্বতন্ত্র ভাষা। সুতরাং ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য আপেক্ষিক মাত্র। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় ধ্বনি ব্যবহারের পার্থক্যে উপভাষা হচ্ছে। আবার উপভাষার জনসংখ্যা বাড়লে আবার তা ভাষা হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ভাষার ক্রম পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারাটি অব্যাহত। উপভাষা দুই প্রকার – (ক) সাহিত্যিক উপভাষা (খ) সামাজিক উপভাষা।

✧ বাংলা উপভাষার শ্রেণিবিভাগ ✧

গ্রিয়ার্সনের বিভাজন ঃ

'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে উপভাষার শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে গ্রিয়ার্সন

..... the colloquial dialect varies from place to place. Its change is gradual. Every few miles some new word for a common implement, or some new form of grammatical expression may be detected by an acute ear. As the native say, the language changes every ten kos.

গ্রিয়ার্সন বাংলা ভাষার উপভাষাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন - প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। এই দুই বিভাগে কোন্ কোন্ জেলা পড়ছে তাও জানিয়েছেন। ছকে দেখানো যায় —

গ্রিয়ার্সনের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষা

- পাশ্চাত্য
  - দক্ষিণ-পশ্চিম: মধ্য মেদিনীপুর (বাংলা ও উড়িয়ার মিশ্রণ)
  - পশ্চিম: বর্ধমান (পশ্চিম), বাঁকুড়া, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, কোঞ্ঝার, লোহাডাঙ্গা (সারাকি), মালপাহাড়িয়া (খাড়িয়াঠারা)
  - কেন্দ্রীয়: কলিকাতা, হাওড়া, তমলুক, ঘাটাল (মেদিনীপুর), নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কাটোয়া (পূর্ব বর্ধমান), কুষ্টিয়া
  - উত্তর: দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, রাজবংশী (বাহে), পাবনা, পূর্ব মালদহ, কোঁচ, সিরিপুরিয়া (পূর্ণিয়া জেলার উত্তর পূর্বে)
- প্রাচ্য
  - পূর্বকেন্দ্রিক: খুলনা, যশোর, ফরিদপুর (দক্ষিণ বাদে)
  - পূর্ববঙ্গীয়: ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা বা কুমিল্লা, বাখরগঞ্জ, ফবিদপুর দক্ষিণ, সিলেট (হাজংসহ), কাছাড়
  - দক্ষিণ-পূর্ব: চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, আরাকান, রোসাং
  - দক্ষিণ-পশ্চিম: পার্বত্য-চট্টগ্রামের চাকমা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেণিবিভাগ
মাগধী-প্রাকৃত ও অপভ্রংশের বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় প্রচলিত রূপ

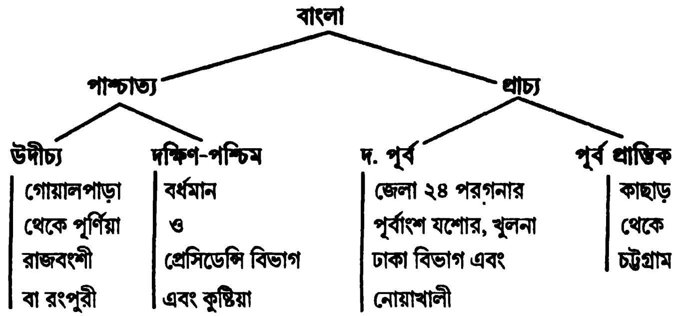
- **রাঢ়**
  - **দক্ষিণ পশ্চিম**
    - উড়িষ্যা
    - দ. প. বঙ্গীয় (দ. প. মেদিনীপুর)
- **রাঢ় বা প্রাকৃত প. বঙ্গীয়**
  - **পাশ্চাত্য** (প্রত্যন্ত পশ্চিম): সাঁওতাল পরগনা, প. বীরভূম, প. বর্ধমান, বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম, হাওড়া, উ. মেদিনীপুর
  - **প্রাচ্য** (প./কেন্দ্রীয় মান কথ্য বাংলা): মুর্শিদাবাদ, প. নদীয়া, পূ. বর্ধমান, পূ. বীরভূম, পূ. মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগনা (কলিকাতাসহ)
- **বরেন্দ্র**
  - **উত্তর কেন্দ্রীয় বঙ্গ** (বঙ্গ প্রভাবিত): মালদহ, দ. দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া
- **কামরূপ**
  - **প্রাচ্য**: আসামী
  - **পাশ্চাত্য**: উত্তরবঙ্গীয়, জলপাইগুড়ি, পূ. পূর্ণিয়া, দ. দার্জিলিং, দিনাজপুর, কোচবিহার, রংপুর, প. গোয়ালপাড়া
- **বঙ্গ**
  - **প./দ. প. বঙ্গ**: ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, উ. পূ. নদীয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, সন্দ্বীপ, উ. প. সিলেট
  - **পূ./দ.বঙ্গ**: পূ, সিলেট, কাছাড় (মায়াং), ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম (চাকমা)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেণিবিভাগ :

পূর্বের পৃষ্ঠায় আমরা সুনীতিবাবুর বিভাজনকে ছকে দেখিয়েছি। তিনি তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে বাংলা উপভাষাকে উক্ত চারটি ভাগে ভাগ করে তার আঞ্চলিক ক্ষেত্রগুলি দেখিয়েছেন।

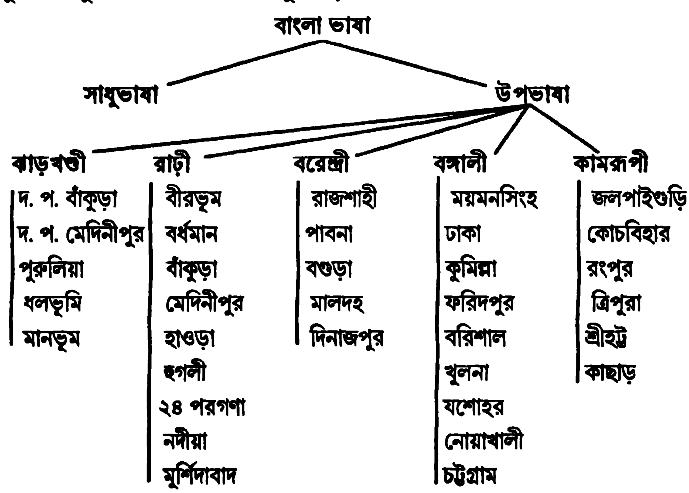
মুহম্মদ শহীদুল্লাহের শ্রেণিবিভাগ :

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উপভাষা বিভাজনে গ্রিয়ার্সনের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভাগকে মেনে নিয়ে সুনীতিবাবুর নামগুলো ব্যবহার করেছেন।



সুকুমার সেনের শ্রেণিবিভাগ :

ভৌগোলিক জরিপ যথাযথ হয়নি এই আক্ষেপ করে সুকুমার সেন উপভাষা চর্চায় সুনীতিবাবুর শ্রেণিবিভাগকে একটু বাড়িয়ে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন।



পরেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা উপভাষা শ্রেণিবিন্যাস :

'বাঙলা ভাষা পরিক্রমা' গ্রন্থে পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে পরেশবাবুর বিভাগ -

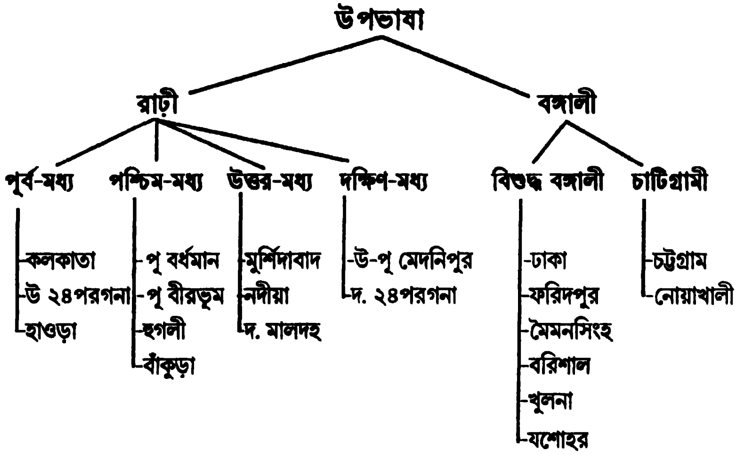
পরেশচন্দ্র মজুমদারের শ্রেণিবিন্যাস

প্রত্ন- বাঙলা

- পাশ্চাত্য/গৌড়ী
  - রাঢ়ী (পশ্চিমা)
    - পশ্চিম-মধ্য কেন্দ্রীয় (আদর্শ কথ্য): কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, পূ. মেদিনীপুর, পূ. বীরভূম পূ. বর্ধমান প. নদীয়া কুষ্টিয়া মুর্শিদাবাদ
    - প্রত্যন্ত পশ্চিমা: সাঁওতালপরগণা, বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম, উ. মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান
  - ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রান্তিক)
    - দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর, ধলভূম, মানভূম
  - বরেন্দ্রী (উত্তর-মধ্যা উদীচ্য)
    - মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া
  - মধ্যপূর্বী
    - যশোর, খুলনা, দক্ষিণ-পূর্বাংশ ছাড়া ফরিদপুর
- প্রাচ্য-বঙ্গীয়
  - পূর্বদেশীয়
    - নোয়াখালী
    - হাজং (ময়মনসিংহ)
    - শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, কাছাড়, মনিপুর (বিষ্ণুপুরিয়া)
  - দক্ষিণ-পূর্বী
    - চট্টগ্রাম
    - আকিয়াব জেলার উত্তরাংশ
    - উ.প. শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা, বাখরগঞ্জ, সন্দীপ
    - চাকমা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)
  - পশ্চিমা ও দক্ষিণ পশ্চিম

রামেশ্বর শ'-এর শ্রেণিবিভাগ :

রামেশ্বর শ'-এর মতে বাংলার সমস্ত উপভাষাগুলির মধ্যে রাঢ়ি ও বঙ্গালি প্রধান। দুই বঙ্গের প্রধান দুটি উপভাষাকে আরও উপ-বিভাগে ভাগ করেছেন। উপবিভাগের আঞ্চলিক পার্থক্যকে তিনি বিভাষা বলতে চান। এই বিভাষা অনুযায়ী বিভাগগুলি হল -



✧ উপভাষার সর্বমান্য প্রকারভেদ ✧

ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও পদক্রমের ভিত্তিতে বাংলা উপভাষাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — (১) পাশ্চাত্য উপভাষা (২) প্রাচ্য উপভাষা।

পাশ্চাত্য উপভাষা :

এই উপভাষাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. **রাঢ়ি :** — মধ্য পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া, কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এই উপভাষাভুক্ত অঞ্চল।

খ. **বরেন্দ্রি :** — মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহি এবং পাবনা অঞ্চলের ভাষা।

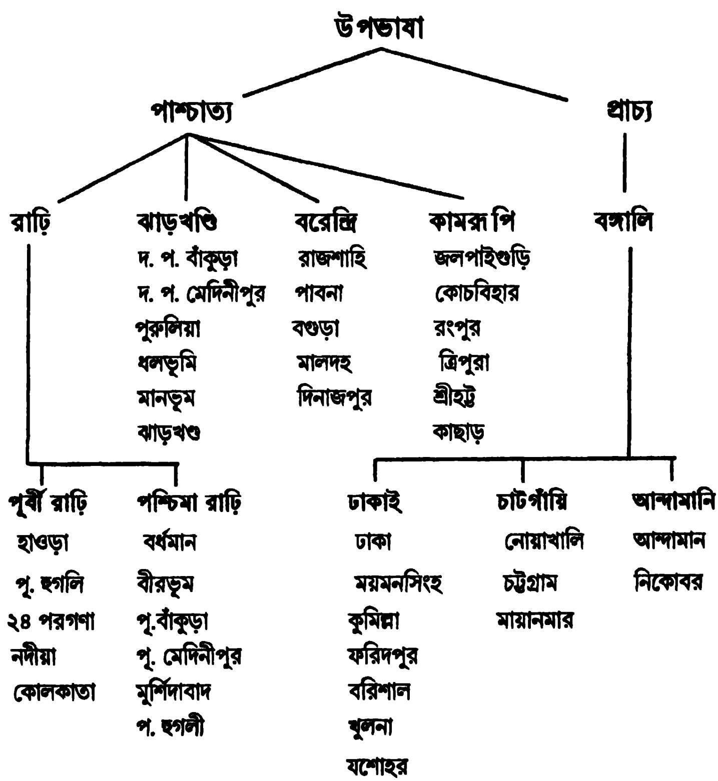
গ. **ঝাড়খণ্ডি :** — বিহারের কিছু অংশ অর্থাৎ মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশ ,দক্ষিণ পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ পশ্চিম মোদিনীপুর এই অঞ্চলভুক্ত।

ঘ. **কামরূপি :** — উত্তর-পূর্ব বঙ্গ অর্থাৎ জলপাইগুডি, রংপুর, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এই অঞ্চলভুক্ত।

প্রাচ্য উপভাষা :

বঙ্গালি - পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এই অঞ্চলভুক্ত।

উপভাষা নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। বিশেষ করে রাঢ় বঙ্গের পূর্ব প্রান্ত আর পশ্চিম প্রান্তের উপভাষা সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আর এক নয়। অঞ্চলভেদে পার্থক্য ঘটেছে। রাঢ়ি উপভাষাকে তাই দুটি আলাদা উপভাষা অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া যায়। বঙ্গালি উপভাষা অঞ্চল সুবিস্তৃত । প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য আলাদা ধরে একে আমরা ঢাকাই, চাটগাঁয়ি ও আন্দামানি এই তিনভাগে ভাগ করে নিতে পারি। উপভাষাগুলিকে এইভাবেই বিভাজিত করা যেতে পারে—



✧ উপভাষাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ✧

✧ রাঢ়ি উপভাষার বৈশিষ্ট্য :

দুর্গাপুর থেকে হাওড়া গামী মেইন ট্রেন লাইনের দুই দিককে কেন্দ্র করে বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি, হাওড়া, কোলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনার কিছু অংশ এই

ভাষার অন্তর্ভুক্ত। এই উপভাষার উপর ভিত্তি করে আদর্শ চলিত ভাষা তৈরি হয়েছে। বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এই উপভাষা অঞ্চলটিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি — পশ্চিমা রাঢ়ি ও পূর্বী রাঢ়ি । পশ্চিমা রাঢ়ি বলতে আমরা বর্ধমান , বীরভূম, পশ্চিম হুগলি, পূর্ব বাঁকুড়া , পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এই সীমাক্ষেত্রকে বোঝাচ্ছি। আর পূর্ব রাঢ়ি বলতে পূর্ব হুগলি , হাওড়া, কোলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদীয়া — এই সীমাক্ষেত্রকে বোঝাচ্ছি। আলাদা করে তাদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখানো হলেও তাদের ব্যবহারগত মিল অনেক। অর্থাৎ উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যই রাঢ়ির জন্য প্রযোজ্য।

পশ্চিমা রাঢ়ির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ —

১. রাঢ়ি উপভাষাতে অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির জন্য স্বরধ্বনিতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন — করিয়া > করে, বিলাতি > বিলিতি।

২. শব্দমধ্যস্থ নাসিক্যধ্বনি লুপ্ত হয়ে পূর্ব ধ্বনিকে আনুনাসিক করেছে। যেমন — চন্দ্র > চাঁদ। কোথাও আবার স্বতোনাসিক্যীভবনও দেখা যায়। যেমন — হাসপাতাল > হাঁসপাতাল, হাসি > হাঁসি ইত্যাদি।

৩. ই, উ, ক্ষ, য-ফলা ব্যঞ্জন এর পূর্ববর্তী 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' হয়। যেমন — লক্ষ্য > লোক্‌খো , অতি > ওতি।

৪. শব্দের মধ্যে অঘোষ বর্ণ ঘোষবৎ উচ্চারিত হয়। যেমন — কাক > কাগ্‌, শাক > শাগ।

৫. আদি স্বরে শ্বাসাঘাত থাকার ফলে কোন কোন শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ হয়েছে। যেমন — বাঘ > বাগ্‌, দুধ > দুদ্‌।

৬. কোন কোন স্থানে 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন — লুচি > নুচি।

৭. 'ন' কোথাও কোথাও 'ল' উচ্চারিত হয়। যেমন — নাও > লাও , নীল > লীল।

৮. 'চ' বর্গ এবং 'ড়' , 'ঢ়' এর উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকে।

৯. 'এ' অনেকক্ষেত্রে 'অ্যা' উচ্চারিত। যেমন — খেলা > খ্যালা, দেখ > দ্যাখ ।

১০. অপিনিহিতি উচ্চারণ যে একেবারেই নেই বলা যাবে না। বর্ধমান শহর ঘেঁষা দামোদরের দক্ষিণে রায়না ব্লকে মাছখাণ্ডা, বেলসার ইত্যাদি বেশ কয়েকটি গ্রামে উচ্চারিত। তবে ব্যাপক আকারে নয়। যেমন — করিয়া > কইরা , মেরে > মেইরে ।

পশ্চিমা রাঢ়ির রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ —

১. তির্যক কারকের বহুবচনে 'দের' বিভক্তির ব্যবহার আছে। যেমন — আমাদের, ছেলেদের সঙ্গে। গৌণ কর্ম, সম্প্রদান ও অধিকরণ কারকে যথাক্রমে 'কে' , 'তে'

বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন — 'তাকে দাও', 'ঘরেতে ভ্রমর এল।

২. বর্তমান কালের উত্তম পুরুষে 'ই' বিভক্তি। যেমন — আমি করি।

৩. প্রথম পুরুষে সামান্য অতীতে অকর্মক ক্রিয়াপদে 'ল' এবং সকর্মক ক্রিয়াপদে 'লে' বিভক্তি। যেমন সে গেল, কিন্তু তাকে টাকা দিলে।

৪. সদ্য অতীতের উত্তম পুরুষে 'লুম্' ব্যবহার । যেমন — খেলুম্, বললুম্।

৫. ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষে 'ইবে' এবং উত্তম পুরুষে 'ইব' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন — করিবে, করিব।

৬. মৌলিক ক্রিয়াপদে 'ই' অন্ত্য অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা অসম্পন্ন কাল এবং 'ইয়া' অন্ত্য অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন কাল বোঝান হয়। যেমন — করিছে > করছে, করিয়াছিল > করেছিল।

৭. মূল ধাতুর সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে এবং ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়। যেমন, কর্ + ছি = করছি।

পূর্বী রাঢ়ির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ —

১. পূর্ব রাঢ়ি উপভাষাতে শব্দের আরম্ভে 'ই 'এবং 'উ' যথাক্রমে 'এ' এবং'ও' হয়েছে। যেমন — নিয়ম > নেয়ম , উপর > ওপর ।

২. 'আ' কোথাও কোথাও 'অ্যা' উচ্চারিত হয়েছে। যেমন — গাঁজা > গ্যাঁজা, ঝাঁটা > ঝ্যাঁটা ইত্যাদি।

৩. স্বরসঙ্গতি দেখা যায়। যেমন — ফুলরি > ফুলুরি , কুণ্ডলি > কুণ্ডুলি।

৪. শব্দের মধ্যে অঘোষ বর্ণ ঘোষবৎ উচ্চারিত হয়। যেমন — বাক্ > বাগ্।

৫. আদি স্বরে শ্বাসাঘাত থাকার ফলে কোন কোন শব্দের মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ হয়েছে। যেমন — বন্ধ > বন্দ , মাঝি > মাজি।

৬. কোন কোন স্থানে 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন — লেলিয়ে > নেলিয়ে, ল্যাঠা > ন্যাটা ইত্যাদি ।

৭. 'ন' কোথাও কোথাও 'ল' উচ্চারিত হয়। যেমন — টাকার নোট > টাকার লোট, নুন > লুন।

৮. স্বরভক্তি লক্ষ্যণীয় । যেমন — ভদ্রলোক > ভদ্দরলোক ইত্যাদি।

৯. শব্দস্থিত স্বরধ্বনির পরে নাসিক্য ব্যঞ্জন থাকলে অনেক সময় তার পরিবর্তন ঘটেছে । যেমন — সুন্দর > সোন্দর, বাসন মাজা > বাসুন মাজা, আম > আঁব ইত্যাদি ।

১০. স্বর ও ব্যঞ্জনের লোপ দেখা যায়। যেমন — শোভাবাজার > স'বাজার , বেহালা > ব্যায়ালা ।

পূর্ব রাঢ়ির রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ —

১. সকর্মক ক্রিয়ায় 'এ' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন — 'মুখেতে বললে তুমি একথা'।
২. বর্তমান কালের উত্তম পুরুষে 'ই' বিভক্তি। যেমন — আমি পড়ি।
৩. প্রথম পুরুষে সামান্য অতীতে অকর্মক ক্রিয়াপদে 'ল' এবং সকর্মক ক্রিয়াপদে 'লে' বিভক্তি। যেমন 'সে গেল', কিন্তু 'তাকে কথা দিলে'।
৪. সদ্য ভবিষ্যতে উত্তম পুরুষে 'তুম্'-এর ব্যবহার। যেমন -- খেতুম্, বলতুম্,ভাবতুম্।
৫. সদ্য বর্তমানে উত্তম পুরুষে 'নু'-এর ব্যবহার। যেমন — খেনু, দিনু ইত্যাদি।
৬. ক্রিয়াপদের বিকল্প ধাতুরূপে একই সঙ্গে ডোবাবে / ডুবুবে, পিছাবে / পিছুবে, মেশানো / মিশুনো ইত্যাদির ব্যবহার আছে।
৭. অকর্মক ক্রিয়ায় 'ও' বিভক্তি। যেমন — সে বললো।

✧ **বঙ্গালি উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ**

বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে উচ্চারিত হয় বলে এই উপভাষারও বিভাজন রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর নিয়ে 'ঢাকাই'; নোয়াখালি, চট্টগ্রাম নিয়ে 'চাটগাঁই' এবং আন্দামান ও নিকোবর নিয়ে 'আন্দামানি' — এই তিনটি ভাগে আমরা বঙ্গালি উপভাষা অঞ্চলকে বিভক্ত করতে চাই।

আন্দামানি উপভাষার চাটগাঁয়ি উপভাষাতে প্রচুর হিন্দি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আন্দামানে বাংলা বাক্যে ঢুকে গেছে হিন্দি ক্রিয়াপদ। যেমন — পতা (খোঁজ) -লোকটা কোথায় পতা কর। ডেলেছেন - আপনি ভোট ডেলেছেন (দিয়েছেন) চাটগাঁয়ি ভাষায় যেমন — বায়গন (বেগুন), কুত্তা (কুকুর), কাউয়া (কাক), ভৈস (মহিষ) ইত্যাদি। চাটগাঁয়ি উপভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যা বাংলা ভাষাভাষিদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা। যেমন — খোন্দতী (গর্ভবতী), চ্যাতভ্যাত (বাস্তবজ্ঞান), উন্নতলা (সরু) পীনাইড়গা (হিংসুটে), চেতাচেতি (রাগারাগি), রেনা (দেখা) ইত্যাদি। আবার ঢাকাই উপভাষা অঞ্চলে উর্দু শব্দের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ —

১. বঙ্গালি উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অপিনিহিতি। যেমন ক্ষ, হ্ম, ঞ্জ, 'য' ফলা যুক্ত শব্দেও অপিনিহিতি রক্ষিত। যেমন করিয়া > কইরা, বাক্য > বাইক্ক।
২. সম্পৃক্ত 'এ', 'ই' এর বিকৃত 'অ্যা' হিসাবে উচ্চারণ দেখা যায়। যেমন — অ্যাক, দ্যাশ, দ্যাখ।

৩. 'ও' স্থানে 'উ' উচ্চারণ। যেমন — কোন > কুন।
৪. নাসিক্যব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পায়নি। যেমন — চন্দ্র > চান।
৫. শ্বাসাঘাতের ফলে ব্যঞ্জন লোপ এবং মহাপ্রাণহীনতা লক্ষ করা যায়। যেমন — ভাত > বাত, ভাই > বাই।
৬. মহাপ্রাণ ধ্বনি 'চ' বর্গের সৃষ্ট ধ্বনি বঙ্গালিতে উষ্ম ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন ছ > স (খেয়েছে > খাইসে)।
৭. 'য়', 'ড়' তাড়িত ধ্বনি দুটির 'র' ধ্বনিতে পরিণত। যেমন — বড় > বর।
৮. 'শ', 'স' এর স্থানে 'হ' ধ্বনির উচ্চারণ আছে। যেমন — শালা > হালা।
৯. 'ট', 'ঠ' স্থানে ড এর উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন — দুইটি > দুইডা, সেইঠা > হেইডা।
১০. শ্বাসাঘাতের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ —

১. কর্তৃকারকে 'এ' -এর, গৌণকর্মে সম্প্রদানে 'রে', অধিকরণে তে, ত, সম্বন্ধে 'গো' হয়। যেমন — বাপে মারছে। আমাগো বাড়ি।
২. গদ্যেব ক্ষেত্রে অতীতে 'লাম্' বিভক্তি। যেমন — আমি খাইলাম্।
৩. মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি হল 'বা'। যেমন — তুমি যাবা না।
৪. উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হয় উম্, মু। যেমন — আমি খেলুম্ না। আমি যামু।
৫. করণ কারকে লগে, সাথে, অপাদানে লুন, থানে, থন প্রভৃতি উপসর্গের ব্যবহার আছে। যেমন — আমি তার লগে এডা করুম্।
৬. অতীতকালের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নঞর্থক অব্যয় 'নাই'। যেমন — তুমি যাবা নাই।
৭. চট্টগ্রাম অঞ্চলে নঞর্থক অব্যয় 'ন' ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন — ন আসিল।
৮. অসমাপিকার সাহায্যে গঠিত যৌগিকক্রিয়ার সম্পন্ন কালের মূল ক্রিয়াটি আগে বসে এবং অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন — সে গ্যাচে গা। (গিয়া > গা)
৯. চাটগাঁয়িতে দূরে কাউকে ডাকার জন্য হিন্দির মতো নামের শেষে '-ইয়া' যোগ করা হয়। যেমন — পার্বতী > পার্বতীয়া।
১০. চাটগাঁয়িতে সম্মান দেওয়ার জন্য সর্বনাম পদ হিসাবে 'তাইন', 'হেতাইন' ইত্যাদি [illegible] প্রয়োগ [illegible]। যেমন - কুটুম্ব আইছে, হেতাইন খাইছে নি ?

বাক্যের উদাহরণ — হালার মাচ্ ধইরা জুত নাই।

ঝাড়খণ্ডি উপভাষা ঃ

বৃহত্তর বঙ্গের অরণ্য অংশের নাম ছিল জঙ্গলমহল। শাসনের সুবিধার জন্য ব্রিটিশ

সরকার মানভূম্ , ধলভূম্ ইত্যাদি অঞ্চলে ভাগ করে নেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে হলেও এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ বাংলা ভাষাভাষি। এই উপভাষা অঞ্চলটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, পুরুলিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ধলভূম, মানভূম অঞ্চলে বিস্তারিত। তবে বর্তমান ঝাড়খণ্ড প্রদেশের সমগ্র অঞ্চল নয়। এক সময় ঝাড়খণ্ডিকে পশ্চিমা রাঢ়ি বলা হত। এই উপভাষায় প্রচুর অষ্ট্রিক শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন – ডহর, ডাঙ্গা, মারাং, জাহের, ডিঙ্গর , কচা ইত্যাদি।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ –

১. অনুনাসিক ধ্বনির অস্থানে আগম এবং প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় । যেমন – যাঁইছে, কঁইরেছে ,খাঁয়েছে ইত্যাদি।

২. স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রয়োগ আছে। যেমন – চাঁ, হাঁতে ইত্যাদি।

৩. পদমধ্যস্থিত অল্পপ্রাণের মহাপ্রাণতা প্রাপ্তি। যেমন – দুপুর > দুফুর।

৪. অনেক স্থানে অপিনিহিতি রক্ষিত। যেমন – কাল > কাইল > কাইল।

৫. 'ন' স্থানে 'ল' -এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন – নয় > লয়।

৬. 'হ' যুক্ত ধ্বনির মহাপ্রাণ রূপ দেখা যায়। যেমন – আমাকে > হামাকে ।

৭. 'অ'-কারের 'ও'-কার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন – লোক > লক , ছোট > ছট , চোর > চর ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ –

১. অনুসর্গহীন সম্প্রদান কারকের ব্যবহার। যেমন – জলকে চল।

২. নামধাতুর প্রাধান্য– দিনটা দগ্ধাচ্ছে ; পুকুরের জল গাঁধাচ্ছে।

৩. 'আছ্' ধাতুর স্থানে 'বট্' ধাতু। যেমন – কে বটে ?

৪. ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' – করবেক, যাবেক।

৫. বহুবচনে ওড়িয়ার প্রভাবে মন্ বা মেন্ প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন – তাঁদের > তারমন্‌কার।

বাক্যের উদাহরণ – বাপের বেটা বটি টাঁগি উঁচায় বাঁচ্যে থাইকব যদিন বাঁচ্যে আছি।

✧ বরেন্দ্রি উপভাষা –

গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা ও পুরাতন মালদা – এই চারটি থানা এলাকাকে স্থানিয় মানুষেরা ' বরিন্দ' বলে। 'বরিন্দ' শব্দ থেকেই 'বরেন্দ্র' শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। তবে বরেন্দ্রি উপভাষা অঞ্চল আরও বিস্তৃত। এর সীমা মালদা, দিনাজপুর , রাজশাহী , বগুড়া , পাবনা পর্যন্ত । দিনাজপুর অঞ্চলের ভাষাকে 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে গ্রিয়ার্সন বলেছেন ' রাজবংশী ডায়ালেক্ট'। বলা হয় নাকি রাঢ়ি এবং

বরেন্দ্রি আগে এক রকমই ছিল, পরে একদিকে বঙ্গালি ও অন্যদিকে বিহারির প্রভাবে রাঢ়ি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আবার কেউ কেউ এ ভাষার সঙ্গে পালি ও প্রাকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে মনে করেছেন।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ –

১. এই উপভাষায় শব্দের পূর্বস্বরের 'অ' উচ্চারিত হয় 'আ' হিসাবে। যেমন – কথা > কাথা, অতিশয় > আতিশয় ইত্যাদি।

২. স্বরধ্বনি ও অনুনাসিক স্বর অনেকটা অপরিবর্তিত আছে। যেমন-- চাঁদ ফাঁদ। তবে শব্দের মধ্য ও অন্ত্যে রাঢ়ির মতো প্রায়ই অল্পপ্রাণ থেকে গেছে। যেমন -- বাঘ > বাগ্।

৩. অন্তঃশ্বাসমূলক মহাপ্রাণতার প্রভাবে উচ্চস্বর কণ্ঠমূলীয় হয়। যেমন – হুঁকা > হংকা।

৪. শ্বাসাঘাতের কোন সুনির্দিষ্ট স্থান নেই।

৫. ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ শুধু পদের আদিতে থাকে। যেমন -- ভাত > বাত।

৬. 'জ' কার '*z*' এর মত উচ্চারণে পরিণত হযেছে।

৭. কখনো অ > র, এবং র > অ হয়েছে। যথা - 'আমবাবুদের রাম বাগান।'

৮. 'অ্যা' ধ্বনির আগমন ঘয়েছে। যেমন – অ্যাক, দ্যান।
অল্পপ্রাণ উচ্চারণে মহাপ্রাণ হয। যেমন -- সেবা > সেভা।

৯. যুগ্মব্যঞ্জন ধ্বনিব ক্ষেত্রে মহাপ্রাণ অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয়। যেমন – ভিক্ষারী > বিক্ষারী।

১০. ক্রিয়া পদের শেষে চ-বর্গিয় ধ্বনিগুলি ঘৃষ্টতালব্য হিসাবে উচ্চারিত হয়। যেমন – করছে > কোরিসু।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ –

১. সপ্তমীতে 'ত' বিভক্তি – হাঁড়িতে বাত নাই।

২. ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'গোর' – আমাগোর।

৩. অতীতকালের উত্তম পুরুষে লাম্-এর প্রয়োগ আছে। যেমন – খেলাম্। ভবিষ্যৎকালে 'মু' -এর প্রয়োগ আছে। যেমন -- যামু।

৪. ষষ্ঠী ও তির্যক কারকের বহুবচনে 'দের', 'গুণা'র প্রয়োগ আছে।

৫. ক্রিয়াপদে বিভক্তি ব্যবহারে একবচন ও বহুবচনে ভিন্নরূপ দেখা যায়। যেমন – আমি করি > মুই করু বা কোরহু, আমরা করি > হামারা কোরি বা কোরছি।

৬. বহুবচনে 'লা' বিভক্তির ব্যবহার আছে। যেমন – গোরু > গোরুলা।

৭. সম্বোধনে অনেক সময় পুরুষবাচক পদের আগে 'রে' এবং স্ত্রীবাচক পদের আগে 'হে' বসে।

৮. নঞর্থক ক্রিয়ায় ক্রিয়াপদের আগে 'না' বসে। যেমন — মুঁই এ কাজ না করিম্।

৯. সর্বনাম পদে উত্তম পুরুষে 'মুই', 'হামি, 'মোক্ ' ; মধ্যম পুরুষে 'তোক' প্রথম পুরুষে ' অমা', 'অহর' ইত্যাদির ব্যবহার আছে।

✧ কামরূপি উপভাষা —

কামরূপ ছিল আহোমদের রাজত্ব। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা এটা দখল করে নাম দিলেন আসাম। পরে আসামের মধ্যে ঢুকে গেল বাংলাভাষী শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া। অসমীয়া ভাষা প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় পিছিয়ে গেল বাংলা। কামরূপ থেকেই কামরূপি শব্দের জন্ম। শব্দটি প্রথম সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। এই উপভাষা অঞ্চল দক্ষিণ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত । এই উপভাষায় বরেন্দ্রি ও বঙ্গালির প্রভাব পড়েছে। ত্রিপুরার ভাষাও এই উপভাষা অঞ্চলভুক্ত। এই উপভাষার মধ্যে 'কামতাপুরি'-কে অনেকেই স্বতন্ত্র উপভাষার মর্যাদা দিতে চান। যদিও কামতাপুরি আন্দোলনের নেতৃত্ব মনে করেন কামতাপুরি থেকেই বাংলা ও অসমিয়া ভাষা জন্মলাভ করেছে। কামতাপুরির এই দাবিকে অবশ্য বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা মেনে নেন নি।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ —

১. অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির তেমন প্রয়োগ নেই।

২. বঙ্গালির প্রভাবে অপিনিহিতি থেকে গেছে।

৩. অনুনাসিক বর্ণের লোপপ্রবণতা।

৪. শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নেই। শব্দের মধ্য ও অন্ত্য সর্বত্র পড়েছে।

৫. ড় > র ; জ, চ, শ যথাক্রমে Z, ৎ, স এবং হ্ হয়েছে।

৬. পদের আদিতেই ঘোষবৎ মহাপ্রাণের অবস্থান। কিন্তু অন্যত্র থাকলে তৃতীয় বর্ণে পরিণত। যেমন — ঝাঁঝ, কিন্তু, মাঝ > মাইজ।

৭. পদের আদিতে 'র' অনেক সময় লোপ পেয়েছে। যেমন— রাতি > আতি।

৮. পদের আদিতে 'অ' শ্বাসাঘাতের দরুণ কখনো কখনো 'আ' হয়েছে। যেমন — অতি > আতি ।

৯. কখনো 'ন' হয়েছে 'ল' আবার কখনো 'ল' হয়েছে 'ন'। যেমন — সিনান > সিলান , লাউ > নাউ।

১০. 'ও' কখনো কখনো 'উ' হয়েছে। যেমন — তোমার > তুমার।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ —

১. সামান্য অতীতে উত্তমপুরুষে 'নু' এবং প্রথম পুরুষে '-ইল' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন — কন্নু, কহিল ইত্যাদি। উত্তম পুরুষে অতীতকালে ইলুম, হুঁ, ইমুঁ। ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষে 'ম', 'মু' এবং মধ্যমপুরুষের 'উ' বিভক্তি। যেমন — যামু, করলু। উত্তমপুরুষে একবচনের সর্বনাম হল 'মুই', 'হাম'।

২. গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকে 'কে' বিভক্তি। সপ্তমীতে 'ত' বিভক্তি।

৩. তির্যক কারকের বহুবচনে '-গুলা' ব্যবহার।

৪. নঞর্থক বাক্যে ক্রিয়াপদের পূর্বে 'ন' ব্যবহার। যেমন — না লেখিম্।

✧ কেন্দ্রিয় উপভাষা হিসাবে রাঢ়ির মান্যতা ✧

ডঃ নির্মল দাশ অবস্থান অনুযায়ী বাংলা উপভাষাগুলিকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করেছেন — ক) কেন্দ্রিয় উপভাষা খ) প্রান্তিয় উপভাষা।

যে উপভাষা সমস্ত প্রান্তিয় উপভাষার কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং সমস্ত প্রান্তিয় উপভাষাকে প্রভাবিত করে, তাকে কেন্দ্রিয় উপভাষা বলে। এই সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে রাঢ়ি উপভাষাই বাংলার কেন্দ্রিয় উপভাষা। অন্য উপভাষাগুলি অর্থাৎ বঙ্গালি, বরেন্দ্রি, কামরূপি, ঝাড়খণ্ডি হল প্রান্তিয় উপভাষা।

যে যে কারণে রাঢ়ি বাংলার কেন্দ্রিয় উপভাষা হিসেবে মান্যতা লাভ করেছে —

১. **রাজনৈতিক কারণ ঃ**

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে অন্যান্য দূরবর্তী অঞ্চলের জনগণ রাজনৈতিক কারণে রাজধানী কোলকাতায় আসতে থাকে। ফলে এই অঞ্চলের ভাষা অর্থাৎ রাঢ়ি ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে এবং বেশিসংখ্যক মানুষ এই ভাষাকে গুরুত্ব দেয়।

২. **অর্থনৈতিক কারণ ঃ**

কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের পীঠস্থান হওয়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষেরা জীবিকা ও বাণিজ্যের তাগিদে কোলকাতা আসে এবং কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা অর্থাৎ রাঢ়ি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৩. **সাংস্কৃতিক কারণ ঃ**

কোলকাতা পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পীঠস্থান। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নাট্যমঞ্চ ইত্যাদির কারণে এখানে সংস্কৃতিপ্রেমি মানুষের আগমন ঘটে। ক্রমে ক্রমে এই সংস্কৃতি গ্রামাঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও রাঢ়ি অন্যান্য উপভাষা অঞ্চলের আদর্শ হয়ে ওঠে।

৪. **সামাজিক কারণ ঃ**
রাঢ়ি বা কোলকাতার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে এগিয়ে থাকায় তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রভৃতিও অন্যান্য উপভাষা অঞ্চলের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

৫. **ভৌগোলিক কারণ ঃ**
অবস্থানগত দিক দিয়ে এই উপভাষা বাংলার কেন্দ্রে অবস্থান করার ফলে সহজেই অন্যান্য প্রান্তিয় উপভাষাগুলির উপর প্রভাব ফেলতে পেরেছে।

উপরোক্ত কারণেই রাঢ়ি কেন্দ্রিয় উপভাষা হিসেবে মান্যতা লাভ করেছে। অনেকেই মনে করেন এই মান্যতায় অন্যান্য উপভাষাকে বিশেষ করে বঙ্গালিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে বঙ্গালির লেখা ও প্রচার এমনকি রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানেও রাঢ়িকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই রাঢ়িই কেন্দ্রিয় উপভাষা।

✧ উপভাষা নিরূপণে ক্ষেত্র সমীক্ষা ✧

উপভাষা সংগ্রহের পূর্বে উপভাষা অঞ্চল নির্বাচন করা প্রয়োজন। কারণ উপভাষীয় অঞ্চলেই উপভাষার বৈচিত্র থাকে। বিশেষ করে যে অঞ্চলে পূর্বে কোন জরিপ করা হয় নি সেই অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে তথ্য সংগ্রহ করে উপভাষার বিভিন্ন দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়। উপভাষা ব্যবহারকারী ও উপভাষা সংগ্রহকারী উভয়ের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ চলতে থাকে।

উপভাষা নিরুপণের ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রথমেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে একটি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়। যাকে বলা হয় উপভাষার মানচিত্র। এই ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা হয় যে বিশিষ্ট ধরণের উচ্চারণ রীতি বা শব্দ বা প্রয়োগবিধি। কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে এবং এই সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে একটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়। তার জন্যে দেখতে হয় একটা বিশেষ ধরণের উচ্চারণ বা ভাষারীতি বিশেষ করে ধ্বনির ব্যবহার কোন জায়গায় এসে থেমে যাচ্ছে। এই থেমে যাওয়ার পর থেকেই অন্য এলাকার শুরু। উপভাষার আলোচনায় এই বিশেষ বিশেষ স্থানগুলিকে ভাষাতত্ত্ববিদেরা বিশেষ নামে চিহ্নিত করেছেন। উপভাষা নির্ণয়ের বিভিন্ন অঞ্চলগুলি হল –

✧ কেন্দ্রিয় অঞ্চল ঃ

উপভাষা সমীক্ষার সময় দেখা যায় যে, একটা অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষা প্রচলিত থাকলেও অন্য একটা অঞ্চলের উপভাষার প্রভাব অসম্ভব নয়। একটা প্রধান উপভাষা অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যখন অন্যের অনুসরণযোগ্য হয়ে উঠে তখন তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। তাই এর সংজ্ঞা দিতে

গেয়ে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ বলেছেন — "একটা অঞ্চলের উপভাষা যখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন যেখান থেকে পরিবর্তন শুরু হয়, সেই অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় অঞ্চল (Focal Area) বলে।"

✧ সন্ধি অঞ্চল ঃ

দুটি উপভাষা অঞ্চল পাশাপাশি থাকার ফলে সংযোগ স্থলে একে অপরের প্রভাবে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এই অঞ্চলটিকে সন্ধি অঞ্চল বলে। মোরশেদের সংজ্ঞা অনুযায়ী — " অনেক সময় পূর্ণ সংজ্ঞাকৃত উপভাষা অঞ্চল থাকলেও পাশাপাশি অবস্থিত দুই বা তার বেশি উপভাষী অঞ্চলের উপভাষাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই শ্রেণির উপভাষী অঞ্চলকে সন্ধি অঞ্চল (Transition Area) বলে।" বঙ্গালি উপভাষায় চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির সীমান্তবর্তী মীরেশ্বরাই অঞ্চলটি হল সন্ধি অঞ্চল। রাঢ়ি ও বঙ্গালির সন্ধি অঞ্চলে নদীয়ার পূর্ব সীমান্তটিকে সন্ধি অঞ্চল বলা যেতে পারে।

✧ পুরানিদর্শন অঞ্চল ঃ

ক্ষেত্র-সমীক্ষায় পুরানিদর্শন অঞ্চলটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মূলত ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার জন্য এই ধরণের বিচিত্র অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। এই উপভাষীয় অঞ্চল উপভাষার মর্যাদার অভাবের জন্য অন্য উপভাষীয় অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং তার জন্য সেই অঞ্চলে উপভাষার প্রাচীন রূপ বজায় থাকে অথবা ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানগুলি সর্বত্র সমানভাবে বিস্তারলাভে অক্ষম হয়, তবে সেই অঞ্চলকে পুরানিদর্শন অঞ্চল (Relic Area) বলে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত কিছু গ্রাম এই অঞ্চলভূক্ত।

✧ প্রভাব জনিত পরিবর্তন ঃ

পার্শ্ববর্তি অঞ্চলের উপভাষার প্রভাব অন্য অঞ্চলে পড়লে উপভাষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তাদের তিনটি ভাগে ভাগ কার যায়--

১. সংস্তর ঃ

ভাষা নদীর স্রোতের মতোই ক্রম পরিবর্তনশীল। ভাষার বহিরাগত পরিবর্তনের ফলে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তখন সেই অঞ্চলটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এই বিষয়টিকে উপভাষা তত্ত্বে সংস্তর বলা হয়। যেমন চট্টগ্রামের উপভাষায় বাংলার সঙ্গে আরবি ও ফারসির বৈশিষ্ট্য এবং আরাকান অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এমনভাবে মিশে গেছে যে, একে আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

২. **অধিঃস্তর ঃ**

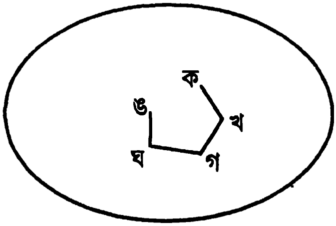
একটি ভাষার বৈশিষ্ট্য যখন আর একটি ভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন উভয়ের মিশ্রণে যে নতুন উপভাষা অঞ্চল এর সৃষ্টি হয়, তখন তাকে অধিঃস্তর বলে। যেমন অসম অঞ্চলের উপর বাংলা ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে কামতাপুরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রাজবংশিরা বলছে তাদের উপর বাংলাভাষা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৩. **অধঃস্তর ঃ**

ভাষা ব্যবহারে মাত্রাগত পার্থক্যের জন্য ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি Link language -এর প্রয়োজন হয়। পরে একটি অঞ্চলের মানুষ যখন সব কিছু ব্যবহার করতে শুরু করে, তখন সেই পরিবর্তনটিকে অধঃস্তর বলে। যেমন 'আমার আর ভাবাভাবির Seen নেই।' ইংরাজির প্রতি আবেগবশতই 'Seen' শব্দটি Link language হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অনেকেই বলেন — ' এসব এখনকার যুগে চলেবেল।' চলার উপযোগী এই বোঝাতে ইংরাজি 'বেল' যুক্ত হয়েছে।

✧ **সমশব্দ গণ্ডিরেখা ঃ**

ক্ষেত্র সমীক্ষায় উপভাষা জরিপের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে আদর্শ ভাষায় কতকগুলি জিনিসের নাম তালিকা বদ্ধ করে, সেই অঞ্চলের মানুষ জিনিসটিকে কি বলে তা জেনে নিতে হয়। যতদূর সীমা পর্যন্ত বিন্দু বসিয়ে বিন্দুগুলিকে যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায়। তাকে সমশব্দ গণ্ডিরেখা বলে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে কতকগুলি গ্রামে কেরসিন তেলকে 'গোঁধা তেল' বলা হয়। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় এই সমশব্দ অঞ্চলটিকে সমশব্দ গণ্ডীরেখায় দেখানো যেতে পারে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ হল সমশব্দ গণ্ডিরেখা।



✧ **সমধ্বনি গণ্ডিরেখা ঃ**

যেসব অঞ্চলে কোন একটি বিশেষ ধ্বনির বা কোন ধ্বনি বিশিষ্ট উচ্চারণ প্রচলিত

সেই অঞ্চলটিকে মানচিত্র বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করে যে রেখাটি পাওয়া যায় তকে সমধ্বনি গণ্ডিরেখা বলে। যেমন বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে (পুরুলিয়া ঘেঁষা) 'তরকারি' শব্দের 'ত' ধ্বনিটির উচ্চারণ 'তো' অর্থাৎ তোরকারি। উপরের চিত্রে রেখাটি অনুরূপভাবে দেখানো যেতে পারে।

✧ সমরূপ গণ্ডিরেখা ঃ

ক্রিয়ার কোন বিশিষ্ট রূপ বা শব্দের কোন বিশিষ্ট রূপ কিংবা কোন বিশিষ্ট বিভক্তি বা প্রত্যয় যেসব অঞ্চলে প্রচলিত, সেই অঞ্চলগুলিকে মানচিত্রে বিন্দু দিয়ে যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে সমরূপ গণ্ডিরেখা বলে। বর্ধমান শহর ঘেঁষা দামোদর নদীর দক্ষিণে রায়না ব্লক পলেমপুর, মাছ খাণ্ডা, খালেরপুল কয়রাপুর ইত্যাদি গ্রামগুলিতে 'করিয়া' —এই সমাপিকা ক্রিয়া বিশিষ্ট রূপ 'কইর‍্যা' পাওয়া যায়। মানচিত্রে রেখাটি দেখানো যেতে পারে।

✧ সমন্বয়ী গণ্ডিরেখা ঃ

দুটি ভিন্ন শব্দ কোনো কোনো অঞ্চলে সমন্বয় রূপে ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলটিকে মানচিত্রে রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। এই রেখাটিকে সমন্বয়ী গণ্ডিরেখা বলে। যেমন ঝাড়খণ্ডি উপভাষায় বিশেষ করে পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমাপিকা ক্রিয়ার আগে নঞর্থক অব্যয় বসে। উদা - 'যাবে না' এর পরিবর্তে ' না যাবে' বলা।

✧ সমার্থ গণ্ডিরেখা ঃ

একটা বিশেষ শব্দ একটা বিশেষ অর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয় যে অঞ্চলে, সেই অঞ্চলটিকে মানচিত্রে বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করে যে রেখাটি পাওয়া যায়, তাকে সমার্থ গণ্ডিরেখা বলে। যেমন বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ, রায়না ও মেমারি ব্লকে বাড়ির পিছনের দিক বোঝাতে 'পাঁদার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

✧ ভৌগোলিক মানদণ্ড কী বিজ্ঞান সম্মত ঃ

আজেকের ভারতবর্ষের প্রদেশ বিভাজন ভাষার ভিত্তিতেই হয়েছিল। উপভাষার ক্ষেত্রেও তাই। তবে মনে রাখতে হবে উপভাষা নির্বাচনে ভৌগোলিক মানদণ্ড সর্বদা বিজ্ঞান সম্মত নয়। কারণ একটি উপভাষা অঞ্চল নির্দিষ্ট করা হলেও দেখা যায় অন্য একটি উপভাষা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য আর একটি উপভাষা অঞ্চলে বিদ্যমান। যেমন — রাঢ়ি উপভাষা অঞ্চলে বিশেষ করে বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে বেশ কয়েকটি গ্রামে বঙ্গালি উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে অপিনিহিতি উচ্চারণ বর্তমান।

✧ ক্ষেত্র সমীক্ষার উদ্দেশ্য ✧

ক) উপভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ।
খ) ভাষাতত্ত্বের ক্রমবিকাশটিকে লক্ষ করা অর্থাৎ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক রূপটিকে জানা যায়।
গ) তথ্য গবেষণা ও সমস্যাকে সূত্রবদ্ধ করা।
ঘ) ভাষার প্রয়োগগত দিকটিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ করা।
ঙ) সমাজের উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত এই সামাজিকস্তর বিন্যাসটিও উঠে আসে।
চ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপভাষার মানচিত্র নির্মাণ করা।
ছ) বিভিন্ন উপভাষা অঞ্চলের মধ্যে কোন্‌টি আদর্শ হিসাবে বেশি মানুষ গ্রহণ করছে।

✧ ক্ষেত্র সমীক্ষার উপাদান ✧

উপভাষা ভৌগোলিক সমীক্ষা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল-

১। ম্যাপ / মানচিত্র
২। টেপ্‌রেকর্ডার
৩। লেখন কাগজ
৪। প্রশ্ন সমীক্ষা
৫। সংগ্রাহক

মানচিত্র ঃ

অঞ্চলভিত্তিক মানচিত্র নিয়ে কোন্ কোন্ অঞ্চলেএকই শব্দের সমার্থক শব্দ প্রচলিত তার সীমানা নির্দেশ করতে হবে। উপভাষা সংগ্রাহকদের হাতে থাকবে মানচিত্র যার মাধ্যমে তিনি জানতে পারবেন কোন্ অঞ্চলের উপাদান তিনি সংগ্রহ করছেন।

টেপ্‌রেকর্ডার ঃ

ভাষা সংগ্রহে টেপ্‌রেকর্ডার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমি ভাষা সংগ্রহ করছি এটা বুঝতে পারলে সেই ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষ তার স্বাভাবিক উচ্চারণ করবে না। সেক্ষেত্রে ঝগড়ার সময়, বৈঠকখানায়, মেয়েদের ঘরোয়া আলাপে এই যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই উচ্চারণ ভিত্তিক ভাষা সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়া সংগ্রহ করা ভাষাগুলি বাড়িতে বার বার চালিয়ে যথাযথ লেখার সুবিধা হয়।

লেখন কাগজ ঃ

লেখন কাগজ সংগ্রহকারীর কাছে সর্বদাই থাকবে। হঠাৎ হঠাৎ নতুন শব্দ পেলে যাতে তিনি নোট করে রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে প্যাড বা ডাইরি ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন সমীক্ষা ঃ

ভাষা সংগ্রহের সুবিধার জন্য সেই অঞ্চলের মানুষ, জীবজন্তু, পোষাক-পরিচ্ছদ, পেশাগত বৃত্তি, খেলাধূলা, ওজন-পরিমাপ, ধর্মীয়, পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত , কৃষিসংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ের আদর্শ চলিত শব্দগুলির সমশব্দ কি ব্যবহার করে তা জানা প্রয়োজন। তাছাড়া ছোট ছোট কিছু বাক্যকেও নেওয়া যেতে পারে।

সংগ্রাহক ঃ

সংগ্রাহকেরা বিভিন্ন ধরনের হবেন—

ক) শিক্ষা অনুযায়ী — অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, শিক্ষিত (গ্রাজুয়েট)

খ) বয়স অনুযায়ী — যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ।

গ) ধর্ম অনুযায়ী — হিন্দু, মুসলমান, অঞ্চলের অন্য ধর্মীয় মানুষ ।

ঘ) লিঙ্গ অনুযায়ী — পুরুষ, নারী।

হ্যান্স কুরাত সংগ্রাহকদের এইভাবে বিভক্ত করেছে —

ক. প্রথম শ্রেণি ঃ অল্পশিক্ষিত, লিখতে পড়তে সক্ষম, বয়স— ৫০-৭০ বছর

খ. দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ মোটামুটি শিক্ষিত, হাইস্কুল পাশ, বয়স— ৪০-৫০ বছর

গ. তৃতীয় শ্রেণি ঃ শিক্ষিত, কলেজ পাশ, বয়স — ২৫-৪০ বছর

তবে এরা পুরুষ নারী যে কেউ হতে পারে। তবে উপভাষা সংগ্রাহককে অবশ্যই সেই উপভাষা অঞ্চলের মানুষ হতে হবে। সংগ্রাহক হবেন কর্মঠ, উদ্যোগী, ও কৌতূহলী। উপভাষায় ক্ষেত্র সমীক্ষায় সংগ্রাহক নির্বাচন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। একজন গবেষকের নির্দেশে জেলা ভিত্তিক সংগ্রাহক থাকবে এবং তাদের নির্দেশে সংগ্রাহকরা গ্রাম ভিত্তিক সমীক্ষা চালাবেন। এই ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকেই বিভিন্ন প্রকার সামাজিক উপভাষাগুলি সংগ্রহ করা হয়। মনে রাখতে হবে ভাষা সংগ্রহের কাজ যথাযথ হলে তার মধ্য দিয়ে একটা অঞ্চলের বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসকে জানা যাবে।

✧ একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা ও তার উপাত্ত সংগ্রহ ✧

ক্ষেত্র সমীক্ষার স্থান ঃ বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার উখরিদ অঞ্চল।

বিষয় ঃ মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র্য শব্দ প্রয়োগ

দামোদর নদীর দক্ষিণদিকে বর্ধমান জেলার দক্ষিণপ্রান্ত সীমা-অঞ্চল খণ্ডঘোষ ব্লকের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে । এটা ঠিক যে সংগৃহীত শব্দের মধ্যে কিছু শব্দ হিন্দুরাও ব্যবহার করে। তবে মুসলিম সমাজ থেকে বিশেষ ভাষা সংগ্রহ করে বিচার বিশ্লেষণ করলে তাদের ভাষা-সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Sociolinguistic character)-গুলি লক্ষ করা যায় এবং তাদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে

ভাষার কোন স্বাতন্ত্র্য আছে কিনা তাও দেখনো যায়। নাকি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি দ্রুত ওই অঞ্চলের হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। নাকি মূলতঃ হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি মিশে একটি নতুন মিশ্র সংস্কৃতি উৎপন্ন হচ্ছে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করেছি তার কয়েকটি বিভাগ তুলে ধরা যেতে পারে –

পারিবারিক সম্পর্ক

আপা – দিদি	খালা – মাসীমা
ফুপা – পিসেমশাই	খালু – মেসোমশাই
ফুপু – পিসিমা	ভাবী – বৌদি
নোনদাই – ননদের বর	বিয়ান্ – ছেলে বা মেয়ের শাশুড়ি
চা শাশুড়ী – চাসতো শাশুড়ী	চাচা – বাবার ভাই
চা শ্বশুর – চাচা শ্বশুর	চাচী – কাকিমা / জেঠিমা
নানা – মায়ের বাবা	মামু- মামা
নানী – মায়ের মা	দাদো – বাবার বাবা
সোমদ্‌বাপ – বৈবাহিক সূত্রে বাবা	দাদী – বাবার মা
সোমদ্‌মা – বৈবাহিক সূত্রে পাওয়া মা	ভাজ্ – জা
বুবু – দিদি	বেটি – ফুপু/পিসিমা
বাঁদী – ঝি	লাতিন্ – নাতনী
বিবি – বৌ	বাগাল্ – চাকর
দামাদ্ – স্বামী	দোলা ভাই – জামাই দাদা
ভাতার্ – স্বামী	বৌসিন্ – ভাই এর বৌ
মাগ্ – বৌ	বুন্ – বোন (ছোট বড় দুই)
বাওয়াজী – বাবা	বোনাই – বোনের স্বামী

ধর্মপালন বিষয়ক ভাষা

মুরিদ্ –	শিষ্য	জিয়ারত্ – কবরে বসে দোয়া
মতওয়ালী –	মসজিদ-পরিচালক	গিবত্ – খারাপ সমালোচনা করা
কাতার্ –	সারি	জামাত্ – সমাবেশ
তবলিক্ –	পৌছে দেওয়া	দাওয়াত্ – নিমন্ত্রণ
দরুদ্ –	ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক মন্ত্র	পরেজগার্ – বিধিবদ্ধ ধর্ম পালনকারী
মোনাজত্ –	হাত তুলে প্রার্থনা	মুসুল্লি – যারা মসজিদে নামাজ পড়েন
জায়নামাজ –	নামাজ পড়া পাটি	আখেরাত্ – শেষ রাত
দোয়া –	মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা	মোসাফা – হ্যাণ্ডসেক

মুদ্দার্ — মৃত
তওবা — ঘৃণ্য
মালেকুল মউত — ঈশ্বর নির্দেশিত মৃত্যু
মোয়াজ্জেম্ — আজন দেন যিনি
রেহেল্ — কাষ্ঠ নির্মিত বই রাখা আসবাব
জায়নামাজ — মৃত ব্যক্তির জন্য যে নামাজ
সেজ্‌দা — মাথা নত করা ভঙ্গী
গজব্ — ঝামেলা
বেহেস্ত — স্বর্গ
হালাল্ — বৈধ
মিশকিন্ — অন্নবস্ত্রহীন
তস্‌বি — জপমালা
ওয়াদা — কথা দেওয়া
হেব্‌জো — অনুশীলন
মরাহাজা — মরা ইত্যাদি
জানকবোচ্ — মৃত্যু হওয়া
হুরী — স্বর্গের সুন্দরী নারী
পরী — সুন্দরী নারী
সুর্মা — চোখে দেওয়া মাটি
রওজা — পীরের কবর্
কায়দা — আরবিভাষার প্রথম পাঠ
জাকাত্ — উদ্বৃত্ত অংশ দান
কসম্ — দিব্বি
হাজাম্ — খতনা দেন যিনি
ঈদ্‌গা — ঈদের নামাজ পড়া হয় যেখানে
নেকি — পূণ্য
জলসা — ধর্মপ্রচার সভা
দিন মোহর — বিবাহে পাত্রীকে ঘোষিত অর্থ
রুহ — প্রাণ
আজাব্ — কবরে শাস্তি
কাফন্ — মৃতের বস্ত্র
ফরজ্ — বিধিসম্মত
ওয়াক্ত — সময়

তবিয়ত্ — শারীরিক অবস্থা
তেলায়ত — পাঠ করা
হারাম্ — ঘৃণ্য
কামেল্ — চাওয়া পাওয়ার ঊর্দ্ধে যিনি
এতিম্ — পিতৃমাতৃহীন
তৌফিক্ — ভালো করুন
আলেম্ — শাস্ত্রীয় পণ্ডিত
জান্নাৎ — শ্রেষ্ঠ স্বর্গ
গজল্ — প্রেম সঙ্গীত
মশিবত্ — ঝামেলা
মিলাদ্ — ধর্মীয় অনুষ্ঠান
কাজানামাজ্ — যে নামাজ পড়তে বাকি আছে।
নসিব্ — ভাগ্য
দোজখ্ — নরক
মস্‌লা — নিয়মকানুন
জিন্ — শাস্ত্র কথিত আগুন থেকে তৈরি অন্য জাতের মানুষ
হাজি — মক্কা মদিনা তীর্থ করেছেন যিনি
আস্তানা — পীরের অবস্থান
শরীয়ত্ — ইসলামী আইন
ফেত্‌রা — দান
মুল্লা — মোল্লা
মুসল্‌মানী — খতনা
গোরস্থান্ — কবরস্থান
গুনাহ্ — পাপ
রোজ-কেয়ামত্ — ইসলাম শাস্ত্রানুযায়ী মৃতদের শেষ বিচারের দিন
বেশরম্ — নির্লজ্জ
মাজার — সমাধিস্থান
না-জায়েজ — অবৈধ
ফজর — ভোরের নামাজের সময়
উজু — জল দিয়ে হাত পা ধোয়া

কৃষি সংক্রান্ত

লাখেরাজ্ — নিষ্কর জমি	কেলেশ্ জমি — দো জমি
জোল্ জমি — জলাভূমি	ডাঙ্গা জমি — জলসেচ কম
পাই — সারি	হালা — গোছা
হুঁটুনো — ধান আঁটি বাঁধা	গাদা দেওয়া — ধানের আটি জড়ো করা
লাড়া — খড়	ইস্ — লাঙ্গলের লম্বা অংশ
গুলাড়া — ধান গাছের জমি সংলগ্ন গোড়া	বোঁটা — লাঙ্গলের হাতল
ফাল্ — লোহার ফলা	জুয়াল্ — বাঁশ বা কাঠের তৈরি
জুতি — গরু জুরতে দড়ি	রোন্দ্খিল্ — চাকা আঁটকানো খিল
লপ্কা — বাঁশের গাড়ির শেষ অংশ	মোম্ড়া — গরুর গাড়ির প্রথম অংশ
সলিকাঠি — জোয়ালের সঙ্গে গরুকে আটকে রাখার কাঠি	ঘাই — আলের মধ্য অংশে নালা
	ঘসি — শুকনো গোবর
হেলে গরু — চাষের জন্য গরু	সেদ্বাই — চাকায় তেল দেওয়ার জন্য বাঁশ
ল্যাদ্না — সরু মজবুত লাঠি	
লিরেন্ — আগাছা পরিস্কার	জিরেন্ — বিশ্রাম
আড়া — মাছ ধরা ডোবা	পয়ের্ — আল ছাপিয়ে জল যাওয়া
নিঙ্গে — যেটা দিয়ে দুই চাকা যুক্ত থাকে	আঙ্রো — দড়ি আঁটকানো আঁকশি
আড্চাল — ইস ও লাঙলের সংযোগ স্থলে থাকে	লাঙ্লা ডোর — লাঙ্গল বাঁধা ডোর
মগ্রা কাঠি — গাড়ির সামনে কাঠ	তাড়া — সরু লাঠি
পাই — চাকার অংশ	হাল — চাকার লৌহ বেড়
আড়া — গোরুর গাড়ির চাকার স্পোক	গোঁজ — গরু বাঁধা লাঠি
হালপাঁচন — গরু তাড়ানো লাঠি	ঢ্যারা — শনে দড়ি পাকানো যন্ত্র
নামি — দেরিতে ফসল বোনা	আগচটকা — তাড়াতাড়ি বীজ বপন
আওড়া — ফাক করা	গুনচুঁচ — বড় ছুঁচ (বস্তা সেলাই করা)
বাকারি — চেরাই বাঁশ	গুঁজি — ছোট গোঁজ / খোঁপার কাঁটা
খেত্ — জমি	হেঁসুয়া — পাতলা কাটারি
লাদ্ — গোবর	দনা — গরুর খাবার দেওয়ার জায়গা
লেদি — ঘুঁটে	চটান্ — খেলার মাঠ
সিজে ভাপা — ধান সিদ্ধ ও বাষ্পীভূত করা	ঘোগ্ — ফুটো (আল)
উঁপরা — ওকড়া, লতা গুল্ম	চুবি — জাব > জুবি > চুবি
জুয়াল্ — গাড়ির যে অংশে গরু জোড়া হয়	রোয়া — বপন করা
শিমুল্ — জুয়ালের ফুটোয় দড়ি আঁটকানো খিল	ছানি — কাটা খড়
আল্ তোলা — আল বাঁধা	ছিঁচা — জল সেচন

রান্না ও খাদ্য সংক্রান্ত

সেহরী — রোজায় ভোরে খাওয়া
মরিচ্ — লঙ্কা
গোস্ — মাংস
ন্যাংচা — ল্যাংচা
গোসেভাতে — বিরানী
কিমা — কুচিকুচি মাংস
খেজ্‌রি — খেঁচুরী
ধুঁকি — ভাপা পিঠে
সিমপিঠে — D আকৃতির তাল পিঠে
চিতুই পিটে — ফোড়পিঠে
তাল্ ধুমসো — তাল পিঠে
খুরাকি — প্রয়োজনীয় খাবার
জ্বালুন — জ্বালানী
খুর্মা — খেজুর
পোলাও — পলান্ন
চুলো — উনান
এ্যলটে গ্যাছে — বাসি গন্ধযুক্ত হওয়া
লাগ্‌ড়ি — নাড়া কাঠি
ট্যাঙা — টক
ভোক্ — খিদে
ভাদ্‌ঘর — ভাত খাবার ঘর
জোলিস্ — প্রাক্ পিঠে
সুরো — ঝোল
হামাল্‌দিস্তা — পেষণ যন্ত্র
পানি — জল
বদ্‌না — গাড়ু
সিক্‌রেট — সিগারেট
জবাই — কাটা
হালুয়া — সুজি ও চিনির মিশ্রণ
মনোক্কা — শুকনো বড় আঙুর
পাকান্ — চালের আটার তৈরি
ডিংলা — কুমড়ো

বয়জা — ডিম
হল্‌দি — হলুদ
মাচ্ — মাছ
নুচি — লুচি
কাবাব্ — শিকে গরম করা মাংস
কুর্‌মা — মিষ্টি রান্না
মারুফা — জাউ
গোঁজা — আটা ও তিল ছাঁই দেওয়া পিঠে
সরুচিক্‌লি — পিঠে
কল্‌পিটে — চাল আটার সিমাই
এঁকে — একপ্রকার পায়স
সম্‌বড়া — পাঁচ ফোড়ন
আসুদা — পেট ভরে খাওয়া
স্নিপ্‌চি — হাত ধোয়া পাত্র
স্টব্ — স্টোভ
আণ্ডা — ডিম
উস্‌কাটি — উনুনে দেওয়া লাঠি
খেনু — খেলাম
গ্যেল্ — গিলে নে
লুলো — নুলো
খুমীর — আটা ও জল
বাবুই ঝাঁক — চালের আটার পায়স
নোড়া — তালের পিঠে
তরাসা — কাটা
জাম্‌বাটি — বড় বাটি
কাদ্‌লা মাছ — কাতলা মাছ
বোনানো — কাটা
পিয়াস্ — তৃষ্ণা
তন্দুরী — রুটি
সিগ্‌মে — ভুঁড়ি
চোস্তা — ভুঁড়ির সরু নল
ফুরুলি — ফুলুরি

বিবিধ

খান্‌কা — বৈঠকখানা
ইজার — পায়জামা
দরমা — হাঁস মুরগির ঘর
আস্‌নাই — প্রেম
সুর্মা — চোখে দেওয়া মাটি
মাল্‌সী — মাটির ঢাকা
ঢাকন্‌ — বাঁট ওয়ালা ঢাকা
মোলায়েম্‌ — কোমল ও মসৃণ
মহফিল্‌ — আসর
লুকসান্‌ — নুকসান
খেদ্‌মত্‌ — সেবা
কচালা — নিংগড়ানো
হেমান্‌ — বেইমান
মেহনত্‌ — পরিশ্রম
নাস্তা — জলখাবার
অগেরাহ্য — সম্মান না দেওয়া
হিকমত্‌ — ক্ষমতা
হাল্লকি — হয়রান
হরদম্‌ — অনবরত
সরেস্‌ — শ্রেষ্ঠ
মহল্‌ — ভবন
রুহু — প্রাণ
ব্যাবারা — খারাপ
ডাঁহা — হুবহু
মেচানো — সমান করা
গা'ধুয়া — স্নান করা
বোঙা — বর্বর
গোঁজ — গরু বাঁধা খুঁটো
আজারা — পোষাক খোলা
হামাল্‌চে — ডাকছে
ঝনাক্‌ - সশব্দে ফেলা
দস্তর্‌খানা — যে কাপড় বিছিয়ে খাওয়া হয়

দলিজ্‌ — বৈঠকখানা
সর্‌কে — পিছলে যাওয়া
এগ্‌নে — আঙিনা
কোঁচড়্‌ — কোমরের কাপড়
সিঁথন্‌ — বিছানার মাথার দিক্‌
টাপা — বাঁশের টোপা
সেরেফ্‌ — কেবল
মুসফির্‌ — পথিক
মঞ্জিল্‌ — প্রাসাদ
বার্‌দার্‌ — সন্তানসম্ভবা
গুনাহ্‌গার্‌ — পাপী
খেতেরা — প্রহরা
সেওন্‌ — সেলাই
আখেরে — শেষে
মুসুল্লি — ঢেঁকির দিস্তা
গড় — ঢেঁকির গর্ত
হিস্‌সা — অংশ
হদিস্‌ — সন্ধান
সিনে — বক্ষঃস্থল
মুদ্দৎ — নির্দিষ্ট সময়
মহল্লা — পাড়া
লায়েক্‌ — সাবালক
তহবন্‌ — লুঙ্গী
বুচো — ছোট
উব্‌জানো — ছাপিয়ে পড়া
সিলিপ্‌চি — হাত ধোয়া পাত্র
নম্প — বাতি
পাঁদাড় — বাড়ির পিছন
ঝোঁক্‌মারি — আক্ষেপ
ঝিম্‌মারা — অলসভাব
হাঁকার — চিৎকার
ধোয়া-পাগ্‌লা — ধুয়ে পরিষ্কার করা

ছড়া

১. আহাম্মকের এক, যে জমিকে রাখে ব্যাঁক।
আহাম্মকের দুই, যে চালে চাপায় পুঁই।
আহাম্মকের তিন, যে পৌষ মাসে করে ঋণ।
আহাম্মকের চার, যে বোয়ের কথায় মাকে ধরে দেয় মার।
আহাম্মকের পাঁচ, যে পরের পুকুরে ছাড়ে মাছ।
আহাম্মকের ছয়, যে ঘর-জামায়ে রয়।
আহাম্মকের সাত, যে গরুর খায় চাঁট।
আহাম্মকের আট, যে করে আইমাদারী ঠাট।
আহাম্মকের নয়, যে বৌকে ঘরে রেখে বিদেশে রয়।
আহাম্মকের দশ, যে স্বামীর নাই কোনো রসকস।

২. ওঁয়াড়ী ডুবুডুবু খেজুরহাটি ভাসে।
সোনার এনাল নগর দাঁড়িয়ে হাসে।।

প্রবাদে

১. খানায় আগে দাঙ্গায় পিছে।
২. ছেলে আকালে ঢেঁকি বগলে।
৩. ইদে খেয়ে বক্‌রিদে লেয়ে।
৪. রাজার ঘরের ছুঁরি এক বিয়ানে বুড়ি।
৫. কাঠ খাবে আংড়া হাগবে।

ধাঁধা

১. ধর ধর কাজললতা
বাঁট নাই তো ধরবো কোথা। — উত্তর ঃ ডিম
২. মাথা কাটা পানিতে ভাসা
শোন রে বোকা শোন। — উত্তর ঃ শন
৩. ছোট বেলায় প্যান পিন্দা
বড় বেলায় ন্যাংটো। — উত্তর ঃ বাঁশ

৪. আল্লার কি কুদরৎ,
লাঠির ভিতর সরবৎ। — উত্তর ঃ আখ

এইসব ভাষা ও শব্দমণ্ডলী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল অবশ্যই আছে তবে এর মধ্য অনেক শব্দ পাশাপাশি অবস্থানকারী হিন্দুরাও প্রয়োগ করে। শব্দগুলির মধ্য দিয়ে একটা সামাজিক ও ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামো অবশ্য ধরা পড়ে।

সামাজিক উপভাষা

✧ ভাষা ও সমাজ ✧

সমাজ সংগঠনের ভিত্তি যদি সামাজিক চুক্তি হয়ে থাকে তবে ভাষা সেই চুক্তি সংগঠনে, প্রচারে, প্রসারে প্রধান ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীকে শান্ত রাখার জন্য, যত চুক্তি হয়েছে এমনকি আমেরিকা-ভারত পরমাণু চুক্তি পর্যন্ত সেখানে প্রচারের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বীকৃত ভাষাগুলি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে চলেছে। এই প্রচারের লক্ষ্য আর যাই হোক না কেন, সুস্থির সমাজ সংগঠন করা এর একটা লক্ষ্য। শুধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই নয় আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও ভাষা বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। তাই সামাজিক মিলনের বাহন হল ভাষা। তাই আদান প্রদান করার জন্যই ভাষা গণ্ডি অতিক্রম করে। 'রিক্সা' জাপানি শব্দ হলেও আমাদের প্রয়োজন মেটাতে তার চাকা থেমে যায় না। আবার জনরোষ সামলাতে চৌরাস্তার মোড়ে পুলিশকে লাঠিচার্য করতে হয়, যা ইংরাজি অভিধানে 'Lathicharge' হিসাবে স্থান পেয়েছে।

রুজি-রোজগার, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা আর্থ-সামাজিক পার্থক্য থাকার জন্য ভাষা ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। দেশি, বিদেশি শব্দ মূল, শব্দের বিভক্তি, অন্য উপভাষার শব্দ, আঞ্চলিক ভাষায় মিশে পার্থক্য সৃষ্টি করে। প্রতিটি মানুষ এমনকি স্ত্রী পুরুষ ব্যবধানে, আবার একটি মানুষ বিভিন্ন বয়সে অর্থাৎ শিশু যুবক বৃদ্ধ ইত্যাদি সময়ে ভিন্ন ভাষা প্রয়োগ করে।

ভাষা হল মনের বাহন। 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাব অবস্থিত তথা বাক্য প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।' মনের ভাব প্রকাশ অর্থাৎ মনের গভীরে ভাব জন্মালে তার অনুরূপ একটি বাক্য কাঠামো রচনা করে তা প্রকাশ করা এই মনের ভিতর কাঠামো রচনাকে নোয়াম চমস্কি deep structure বলেছেন। এটি বাক্যে রাগ, ভালবাসা, হতাশা, ঘৃণা, স্নেহ, মায়া-মমতা ইত্যাদি ভাবের প্রকাশক রূপে ব্যবহৃত হয়।

বাবার মৃত্যুর খবর সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছাচ্ছে বিভিন্নভাবে অর্থাৎ ব্যবহৃত বাক্যগুলির Surface structure এ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন —

বন্ধু বান্ধবদের আড্ডাস্থলে পুত্রের উক্তি — 'আমার বাপটা চলে গেল।'

শ্রদ্ধেয় কোন ব্যক্তির কাছে — 'আমার বাবা মারা গেছেন।'

শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্রে — "আমার পিতৃদেব পরলোক গমন করেছেন।"

বাক্য তিনটির মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য আছে. অর্থাৎ সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য হেতু ভাষা ব্যবহারেরও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

তাহলে মনের ভাবকে ভাষার রূপ দিলাম ঠিকই কিন্তু তা শোনাচ্ছি কাকে ? না আমারই আশে পাশের জীবকে। জীবের মধ্যে মানুষই প্রধান। কোথায় শোনাচ্ছি ? না কোন বিশেষ জন সমাজে। জনসমাজের আগে বিশেষ কথাটা কোন সম্প্রদায় অর্থে সুনীতিবাবু অবশ্য প্রয়োগ করেন নি কারণ তখন এত বিশেষের যুগ ছিল না বা সম্প্রদায়গত ভাবনা মানুষকে ভাবাতো না। তাহলে বিশেষ জনসমাজ বলতে ভাষাবিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্র সীমার জনসমাজকে বোঝাতে চেয়েছেন।

সংজ্ঞানুযায়ী ভাষায় স্বতন্ত্রভাবের শব্দ সমষ্টিও স্থান পাবে। অর্থাৎ এই গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহারকারীদের কথাবার্তা ও ভাষা নামে পরিচিত হবে। ব্যবহারকারীরা যদি পৃথক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হয় তা হলে তাদের ভাষাও সাম্প্রদায়িক। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশের জন্য তারা সর্বদা স্বতন্ত্র ভাষার প্রয়োগ করতে পারে না। পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষাকেও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ভাষাকে অ-সাম্প্রদায়িক হতে হয়। যেমন কোন মুসলমান বুজুর্গ ব্যক্তি বাংলায় বাস করে তার কোরাণের ভাষা ব্যবহার করে জীবনে অতিবাহিত করতে পারবে না। তাকে তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, অন্যান্য বিদেশি ভাষা গ্রহণ করে অ-সাম্প্রদায়িক হতে বাধ্য হতে হয়।

সুনীতিবাবা তাঁর ভাষার সংজ্ঞায় 'জন সমাজ' বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর জনসমাজ আসলে বাংলাভাষা-ভাষী জনসমাজ বা চীনা-ভাষী সমাজ বা অন্য প্রধান ভাষাকেন্দ্রিক জনসমাজ।

বাংলাভাষী জনসমাজ ও বাংলা ভাষার আলোচনা আমাদের বাংলা ভাষা বিজ্ঞানে অনেকখানি নগরকেন্দ্রিক শিষ্ট ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাংলার হাজার হাজার 'নিস্তেল নিস্তেজ' গ্রামকেন্দ্রিক ভাষা ও গোষ্ঠিকে নিয়ে আলোচনা ততখানি প্রসারিত হয় নি। গ্রাম কেন্দ্রিক ভাষা বলতে কাঠামোগত পার্থক্য না থাকলেও ধ্বনি শব্দের পার্থক্য জেলার প্রান্ত বা উপভাষার প্রান্ত সীমাগুলিতে দেখা যায়। আবার একই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস তাদের ধর্ম বিভিন্ন হওয়ায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পাল-পার্বনে আচার-ব্যবহারে, সংস্কারে শব্দ ব্যবহারের পার্থক্য দেখা যায়। অর্থাৎ ধ্বনি শব্দ ব্যবহারে ভাষা সাম্প্রদায়িক হলেও কাঠামো বিচারে সে অসাম্প্রদায়িক।

সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠগুলির ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সেই সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সংস্কার ইত্যাদি নানা রূপ। তাই ভাষা ও সমাজ অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

আমরা বাসে ট্রামে নিত্য কথার ফুলঝুড়ি লক্ষ করছি। কথা শুনে, একটু সচেতন ব্যক্তি মাত্রই বলতে পারবেন, বক্তা কোন অঞ্চলের বাংলাভাষী লোক, যদি বলে, সামনে নাঁববো কলকাতা বা তার আশেপাশের অঞ্চলের লোক। আর যদি শোনেন 'সামনে নামব' তাহলে বাঁকুড়া বর্ধমানের লোক। আর যদি কৃত্রিমতার জন্য একদম বুঝতে না পারেন, বক্তা কোন অঞ্চলের বা তার মাতৃভাষা কি তবে পেটে সজোরে দু কিল মারুন, দেখবেন গড়গড় করে সে তার সামাজিক অবস্থান থেকে ভাষাগুলো বলে চলেছে।

মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিকরা বর্ধমানে বসে কেরসিন তেলকে বলে 'গাঁধা তেল'। ভাষা শুনে শিক্ষিত না অশিক্ষিত তাও বলা যায় –

শিক্ষিতের জিজ্ঞাসা – কোথায় যাচ্ছ ?

অশিক্ষিতের জিজ্ঞাসা – কুথায় যাচ্ছো ?

ব্যতিক্রম অবশ্য থাকতে পারে। তবে ভাষা ব্যবহারে ব্যক্তির ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন জানা যায় কে মুসলমান, কে হিন্দু এই পার্থক্য।

ভৌগোলিক ও সামাজিক পার্থক্য থাকার জন্য একটি ভাষায় একাধিক ইউনিট লক্ষ করা যায়। যাদেরকে আমরা উপভাষা বলি। বাংলা থেকে একদিন ওড়িয়া ও অসমিয়া বিভক্ত হয় এবং পড়ে থাকা বাংলা ভাষা আবার রাঢ়ি, বঙ্গালি, বরেন্দ্রি, ঝাড়খণ্ডি, কামরূপি এই প্রধান পাঁচ উপভাষায় বিভক্ত। আবার রাঢ়ি উপভাষা সীমানাভুক্ত, সব অঞ্চলের ভাষা ও হুবহু এক নয়। এই রকম এক একটি উপভাষার মধ্যেও যে নানা আঞ্চলিক পৃথকরূপ গড়ে উঠে তাকে বিভাষা বা sub-dialect বলে।

বিভাগ উৎপত্তির মূলে আছে সেই অঞ্চলের মানুষের রুজি-রোজগার, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা আর্থ-সামাজিক কাঠামো। দেশি, বিদেশি শব্দ, মূল শব্দের বিকৃতি, অন্য উপভাষার শব্দ, এই আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে মিশ্রিত হয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করে। প্রতিটি মানুষের এমনকি স্ত্রী পুরুষ ব্যবধানে ও বিভাষা ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। একটি মানুষ আবার বিভিন্ন বয়স যেমন শিশু, যুবক, বৃদ্ধ ইত্যাদি সময়ে ভিন্ন ভাষা প্রয়োগ করে। বিভাজ্য ধ্বনি বা segmental phoneme এর পার্থক্য না থাকলেও অবিভাজ্য ধ্বনি বা suprasegmental phoneme এ তফাৎ দেখা যায়। অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারে একটা সীমা দেখা যায়।

প্রশ্ন দেখা দেয়, ভাষার এই সীমা নির্ধারণ করা কি সম্ভব ? যদি বলি সম্ভব তাহলে বাংলা ভাষায় আরবি, ইংরাজি শব্দ-সাগর পেরিয়ে এল কি করে অথবা জাপানি, বর্মি, চীনা, পর্তুগিজ শব্দই বা এল কিভাবে ? আসলে সাম্রাজ্য বিস্তার, ব্যবসা বাণিজ্য ধর্ম বিস্তার ইত্যাদি নানা কারণে মানুষের পারস্পরিক লেনদেন ঘটে। আর এই সামাজিক মিলনের বাহন হল ভাষা। ভাষার আদান প্রদান তাই গণ্ডী অতিক্রম করে।

পাঁচু মোড়লের ছেলে নিউইয়ার্কে চাকরি করে তার সন্তান জন্মাল শিশু নিউইয়ার্কে বড় হতে শুরু করলে Amirican colloquial এর সঙ্গে পরিচিত হবে। অর্থাৎ যে

সমাজে শিশু বড় হয় সেই সমাজের ভাষার সংকেতগুলি সে গ্রহণ করবে। এদেশে শিশুটি বেড়াতে এসে, বাজারে ফল খেতে চাইলে, চেরি ফল চাইবে, কুল নয়। অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারে জৈব বৃত্তির তাগিদ লক্ষ করা যায়। সমাজ যেমন তার অস্তিত্বের জন্য ভাষার উপর নির্ভরশীল, তেমনি, ভাষা ও তার প্রবহমানতার জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল।

"The life and growth of language" গ্রন্থের লেখক আমেরিকান ভাষা বিজ্ঞানী উইলিয়াম ডাইট হুইট্‌নি বলেছেন – "Language is a social Institution" কোন অঞ্চলের মানুষকে পূর্ণভাবে জানার জন্য ভাষা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

ওই অঞ্চলের সম্প্রদায়ের ভাষা study করি। এই সম্প্রদায়গত উপলব্ধিকে অনুবাদ করা যথার্থ ধরতে পারেন না বলেই অনুবাদে আসল সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায় না। তাই সার্বিক ঐক্য কথাটি হালকা লাগে। একটি মাত্র রাষ্ট্র ভাষা গড়ে তোলা ও সুদূর কল্পনা মাত্র। সাম্প্রদায়িক বিষয়টা থেকেই যায় তা হল বিচ্ছেদের একটি প্রধান অস্ত্র।

✧ সমাজভাষাবিজ্ঞান ✧

'সমাজভাষাবিজ্ঞান' শব্দটির আক্ষকির অর্থ সমাজের ভাষার বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা। অর্থাৎ সমাজভাষাবিজ্ঞান হলো এমন এক ভাষাবিষয়ক গ্রন্থ যেখানে বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ থেকে বিভিন্ন মানুষের মুখের ভাষা সংগ্রহ করে ভাষা ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়। হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যাভার সি. কারি প্রথম ভাষা ও সমাজের সম্পর্কের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে—

> "... social functions and significations of speech factors offer a prolific field of research ... The field is now designated sociolinguistics..."।

পরবর্তীকালে ব্রাইট, ফিশম্যান, আরভিন-ট্রিপ, গ্রিমশ, ট্রাডগিল ইত্যাদি ভাষাবিদ্ এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলায় মৃণাল নাথ, পবিত্র সরকার এ নিয়ে যথাযথ ভাবনা চিন্তা করেছেন। ইংরাজিতে সমাজভাষাবিজ্ঞানকে বলা হয় 'Sociolinguistics' বা 'Sociology of Language'। এর বিভিন্ন বিভাগের কথা বলতে গিয়ে ব্রাইট বলেছেন এগুলি হবে –

ক. বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

খ. সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান

গ. প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানকে সমাজের বৃহত্তর স্তরে ছড়িয়ে দিয়ে এটিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি –

ক. অন্তরঙ্গ খ. বহিঃরঙ্গ

ভাষাবিজ্ঞান

- অন্তরঙ্গ
  - ধ্বনিবিজ্ঞান (phonetics)
  - ধ্বনিতত্ত্ব (phonology)
  - রূপতত্ত্ব (morphology)
  - বাক্যতত্ত্ব (syntax)
  - শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)
- বহিঃরঙ্গ
  - সমাজভাষাবিজ্ঞান
  - মনোভাষাবিজ্ঞান
  - নৃভাষাবিজ্ঞান
  - ফলিতভাষাবিজ্ঞান
  - ইত্যাদি।

✧ বিভিন্ন প্রকার সমাজোপভাষা ✧

✧ বিবাহ বিষয়ে দুই মুসলমান নারীর সংলাপ ঃ-

১ম ঃ কি গ্যা বেটির বিয়ে লাগলো।

২য ঃ আঁটকুড়িরা ভাঙ্গিয়ে দিয়চে, মা।

১ম ঃ কি হোয়লো।

২য় ঃ ভালোখাকিরা বলে এয়েচে বেটি দুলাভাইয়ের ঠেঁয়ে আচে। ঘর জ্বালানী, পাড়াজ্বালানীরা জানকে জ্বালিযে দিলে।

১ম ঃ কুতায় সম্পর্ক হয়েলো।

২য় ঃ আমার নোনোদের ব্যাটার লেগে।

✧ আত্মীয় বিয়োগে দুই মুসলমান নারীর সংলাপ ঃ

১ম ঃ প্যাটে কিল্ মেরে পরে থেকেছে তবু কারু ঠেঁয়ে দুমুটো চাল চাই নি।

২য় ঃ আঁই আঁই কি হলো গ্যা।

১ম ঃ কুনো দিন ঝগড়া ঝাঁটি করেছো দেকেচো।

২য় ঃ খোদাজান খোদা তুলে লিয়েচে। সকাল সকাল মরমই ভালো। গুয়ে মুতে মাকামাকি হত্যি হয় না। লাতি-ঝাঁটা খেতে হয় না।

১ম ঃ হুঁ ছোট ব্যাটার বিয়েটা দিয়ে যেতে পারলে ভাল হোত।

২য় ঃ কখন জান গেহলো গ্যা।

১ম ঃ মাজ রেতে বড় তারাটা যখন মাথা সোজা একটু হিলেচে।

২য় ঃ জান-কবচের সময় ব্যাটাগোনো মুখে পানি দিতে পেরেহল।

১ম ঃ ছোট বেটিটা পারে নি। জামাইটা আসতে দেয় নি।

২য় ঃ আনোয়ার ওই একটা হারামি জামাই করে গ্যাচে।

✧ আত্মীয়ের কান্না ঃ

ও বুন গো কুতা গেলি গো — কি হয়েল গ্যা ? পোড়ে ছ্যালো ? আঁই আঁই কি হলো গ্যা। ও মজিবর ও বাবু কি করলি র‍্যা। বুন বোশেক মাসে আমার বাড়ি গেয়লো, তখন জানলে ছাড়তুম না বুন — ও বুন — ও বুন আমার কাউকে দু কতা চড়িয়ে বলে নি — ও বুন —

(এবার নিজের দুঃখকথা কান্নায় জুড়ে দেয়)

এমনি ছিরাবনে ব্যাটা আমার চলে গ্যালো ও ব্যাটা — মাঠে ঘুনি রাকতে যেয়ে কাল্‌সাপে খেলোরে ও ব্যাটা। রুজায় রুজায় ঝগড়া করে ব্যাটাকে আমার বাঁচতে দিলে না, ও ব্যাটা —

✧ স্বামীর প্রহারে স্ত্রীর বিলাপ ঃ

ও বাপরে, ও বাপ — এ কুন জল্লাদের পাল্লায় আমাকে দিলি রে বাপ্ —
বিয়ে দিতে যদি এ্যাত কষ্ট ছ্যাল আঁতুর ঘরে নুন দিয়ে টিপে মেরে দিস্ নি ক্যানে বাপ্ —
জাহান্নেমে আমাকে রেতে দিনে মেরে মেরে কালশিটে ফেলে দিলে বাপ্ —
শাউড়ী খান্‌কি বেটাকে লাগিয়ে লাগিয়ে আমার জেবন্‌টা দোজক্ করে দিলে বাপ্ —
সবার মরণ হয় আমার ক্যানে হয় না বাপ্ —
মঞ্জুরের মা প্যাটের অসুকে মরল আমর মরণ হয় না ক্যানে বাপ্ —
কত সুখে ভাতারের ঘর করবো মনে করেহনু বাপ্ —

✧ রকের ভাষা ঃ

ফেগ্‌লু (গুরুত্বহীন), চোট্ লেগেছে (আঘাত লেগেছে), ভ্যানতারা মাড়িস্ না (আজেবাজে বকিস না) , ঘ্যাম্ (গুরুত্বপূর্ণ) , খোমা (মুখ) , কিচাইন্ (জট পাকিয়ে যাওয়া) , কেস্ (খবর) , সেন্টু (সেন্টিমেন্ট) , কেটে পড় (চলে যা) , ঝাকাস্ (চকচকে), ইউনিক্ ইউনিক্ (দারুন দারুন), জিও জিও (বেঁচে থাকো) ইত্যাদি। এই ভাষাই ব্যবহৃত হচ্ছে দুই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পরীক্ষার্থীর মধ্যে।

✧ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে দুই বন্ধুর সংলাপ ঃ

বিপ্লব ঃ এই জালি কেমন পরীক্ষা দিলি। আওয়াজ দে, আওয়াজ দে।

প্রকাশ ঃ বলিস্‌না একটা কোশ্চেন কিচাইন করে দিয়েছি. না হলে ক্লাসিক হোতো।

বিপ্লব ঃ যাক্ ল্যাঙ্ খেয়ে উঠে আবার লড়ে গেলি এই সৌভাগ্য। পারিস্ও।

প্রকাশ ঃ হ্যাঁরে তোর মতো ভেড়ুয়া হয়ে আর থাক্তে পারলাম কই। কেমন্ ঝাড়্লি ?

বিপ্লব ঃ ঝুল্ ঝুল্।

প্রকাশ ঃ আমি জানতুম এই পেঁপে চোর্টা ঝোলাবে।

বিপ্লব ঃ পড়ায় তো পাত্তি। আর পড়ে কি করবি ?

প্রকাশ ঃ কেন টোটো কোম্পানীর ম্যানেজার হবি। না হলে এম. বি. বি. এস. হবি।

বিপ্লব ঃ তোর তো আবার ও পাড়া যাওয়া আছে। যাবি নাকি? দেখ্ দেখ্ একটা বি. হন্স ভয়েস চেঞ্জ হলে আরও ফাইভ হবে।

প্রকাশ ঃ আরে না। ইউনিক্ ইউনিক্। কঠিন বলেছিস্।

বিপ্লব ঃ এক্সেলেন্টো বল।

প্রকাশ ঃ এই আবার পোরশু আছে না। কেমন পিপারেসন্।

বিপ্লব ঃ ভাল্লাগে না আর, কবে থেকে পরীক্ষা দিচ্ছি। পোরশু ভালো না হলে চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাব।

প্রকাশ ঃ চিরকাল তো বিধবা হয়ে রইলি। এনার্জি পাবি কুত্ থেকে। আরে পার্কে একটা পেয়াব দ্যাখ।

বিপ্লব ঃ আরে না। পারি না, পারি না।

প্রকাশ ঃ জিও বন্ধু আমার মতো নৌকা উল্টে ফেলিস্ না। এই আসি রে। সোমেনের রুমে সন্ধার ঠেকে আসিস।

বিপ্লব আর প্রকাশ এম. এ. পাট টু পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিল হোস্টেলে। তারা আমাদের উপহার দিল এই কয়েকটা ডায়ালোগ। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই ডায়ালোগ থেকে সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের ভাবনার উপাদান থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানীদের ভাবনার বিষয়টা একটু বেশি। বেশি এই কারণে এ কোন ভাষায় কথা বলছে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্ররা। এটা নতুন উপভাষা, না মিশ্র ভাষা ? না সংকেত ভাষা ?

আমরা বলি এটা ভবিষ্য-চিন্তাধারী হতাশা আক্রান্ত যুব-ছাত্রদের জগাখেঁচুরী ভষা। ভাষা বিজ্ঞানীরা অবশ্য অন্য কোন নাম দিলেও দিতে পারেন।

✧ অপরাধ জগতের ভাষা ঃ

খুন, জখম, রাহাজানি, পাকেটমারী, কয়লা পাচার ইত্যাদি কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তারাই অপরাধি আর তাদের ব্যবহৃত ভাষাই হল অপরাধ জগতের ভাষা। ভক্তিপ্রাসদ মল্লিক এই ধরণের সামাজিক উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। এই প্রকার ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উদাহরণও দিয়েছেন। যেমন — কমলি (ধর্ষণ), আলু (হাতবোমা), কলম (দরজা-

জানলা , ও চাবিভাঙ্গার বিশেষ ধরণের বাঁকানো রড), ছললা (আংটি) , বাওয়াল (শিক্ষা দেওয়া) ইত্যাদি। আজকাল একটি নতুন শব্দ পাচ্ছি 'সুপারি' অর্থাৎ খুনের জন্য অগ্রিম টাকা নেওয়া ।

✧ দুই সমাজ বিরোধীর সংলাপ ঃ

ছট্টু ঃ এ্যাই পাতি কোথায় চল্‌লি। আয় চা পিয়ে যা।

বোতল ঃ পেট্রল ভরবি থালে যাব।

ছট্টু ঃ আরে দর্শন দে না। আয় বস্, রাস্তার দিকে লাইট ফেল।

বোতল ঃ ঠাণ্ডা।

ছট্টুলাল ঃ তো ডাঁশা কোথায় মিল্‌বে বে।

বোতল ঃ শ্লা গোটা, বাংলা বেচে তো সংসার চালাস্ দিমাক্ ভাঁজব টিকটিকি আমার কাছে ঘাটায় না।

ছট্টুলাল ঃ আর তুই কিবে ? শ্লা কেপ্‌মার। নকস্য ছোড়্।

বোতল ঃ আরে ছোড় ইয়ার। তুকে একটা খপ্পর দি কাল ইয়াসিন কাঁকন পড়েছে। এবার সালার রাখি বন্‌ধন হোবে। শ্লা বোসন্‌লাল হয়ে মজা লুট ছ্যালো এবার ফিতে অপারেশন করতে পার। দে একটা ক্যালকাটা পুলিশ দে।

ছট্টু ঃ ধুস্ বেঙ্গল পুলিস্ পাস্‌না আবার সিপি। নে বেঙ্গল খা।

বোতল ঃ সিদিনে অ্যাকশ্যান কেমন হলো।

ছট্টু ঃ আর বলিস্ না দুটো লেবু ঝাড়তে হল। লাল দা খুব ধুমকা-ধোমকি করল। শ্লা সবুজদের বাজারে আরাম ছিল।

বোতল ঃ যা বলিস্ একটা একটা কোরে যা হাপিস্ হচ্ছে।

ছট্টু ঃ হুই হুই হুই গর্মী হ্যায়, কাঁহা হ্যায় তলা মে .... চল্লিরে।

কিন্তু প্রশ্ন এরা এই ভাষা পেল কোথায় ? সেই মধ্য যুগের সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতায় যখন যৌনতা, খুনোখুনি খানিকটা অবাধ ছিল তখন তো এক শ্রেণি এর সুযোগ নিতে হাতছাড়া করে নি। তা তারা তৈরি করল ভিলেন টাইপের কতকগুলি লোক যাদের নেগেটিভ ক্যারেক্টার বলা যায়। সমাজ পরিবর্তনে এরা একদিন নতুন নাম পেল। এদের নাম সমাজ বিরোধী। কেউ বলে অ্যান্টি-সোসাল যাদের জীবন ও ভাষা ওই অপ সংস্কৃতি টাইপের, যাদের বড় আমি অপেক্ষা ছোট আমির দাপট বেশি। যারা আসলে পশুশক্তির বিকাশ ঘটায়, পাশবিক বলে আমরা তাদের ঘৃণা করি।

কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে। প্রশ্নটা হল — ওদের পাশবিক করল কে ? আমরা ? না আমাদের জিন্ ?

✧ গাল্‌-বাকানের ভাষা ✧

গাল-বাকনের এমন কতকগুলি শব্দ আছে কম-বেশি অধিকাংশ অঞ্চলে প্রযুক্ত হয়। আবার এক অঞ্চলে প্রযুক্ত একটা শব্দ অন্য অঞ্চলে গালাগালের ভাষা বলে মনে হতে পারে। মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে রান্নাঘরে ভাত বাড়ার সময় যে ছোট্ট পিড়ি ব্যবহার করা হয় তাকে 'গাঁড়কাট ' বলা হয়। শব্দটি শুনে আপনার অশ্লীল মনে হতে পারে। 'ক্যালানো' শব্দটা সব অঞ্চলে প্রচলিত নয়। শব্দটা শুনলেই গালাগাল মনে হয়। কিন্তু এমন উপভাষা অঞ্চল আছে যেখানে প্রহার অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আমরা খবরের কাগজে দেখেছি একজন শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে শব্দটি প্রয়োগ করে কি বিপদেই না পড়েছিলেন। অথচ শিক্ষক প্রহার অর্থেই প্রয়োগ করেছিলেন। বাংলা ভাষার সূচনা চর্যাগীতি থেকেই 'বাগু' শব্দের মধ্য দিয়ে আমরা অ-শিষ্ট শব্দের উদাহরণ পাচ্ছি।

প্রচলিত অর্থে গালাগাল দেওয়াকে 'মুখ খারাপ' করা বলে। এক সময় এই ধরণের শব্দ প্রয়োগ কেবলমাত্র বস্তিতেই হত কিন্তু আজ ছাত্রদের মধ্যে কলেজ স্তরেও প্রযুক্ত হচ্ছে । 'শ্লা', 'ল্যাওড়া' ইত্যাদি দু-চারটি শব্দ তো অচিরেই নিপাত বা অব্যয় হিসাবে বাক্যতত্ত্বে স্থান করে নেবে বলে মনে হয়। গালাগালে ব্যবহৃত ভাষাগুলোকে নানা ভাগে ভাগ করে এর সমাজ ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা যেতে পারে।

গাল-বাকানের শ্রেণি বিভাগ –

ক. ব্যবহারিক

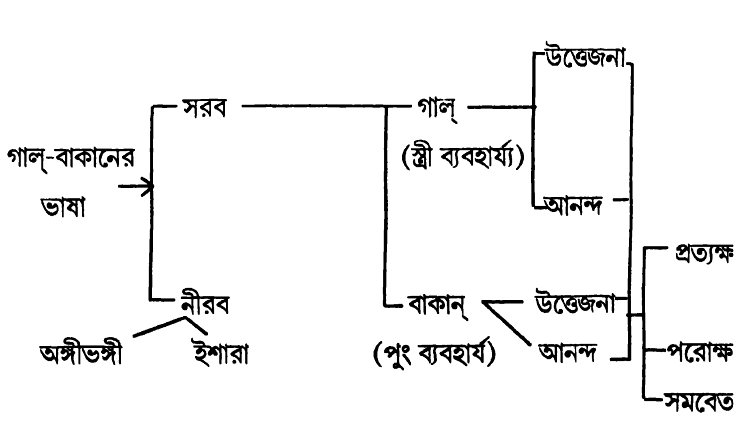
খ ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থান অনুযায়ী

গ. কারণ অনুযায়ী

ঘ. শব্দভাণ্ডারে অবস্থান অনুযায়ী

ঙ. উৎস অনুযায়ী

✧ ব্যবহারিক ✧



✧ উত্তেজনা প্রকাশক ঃ

বাক্‌যন্ত্রে উচ্চারিত 'গাল্-বাকানে' র ভাষাগুলি হল 'সরব' পর্যায়ের। রাগ্, হিংসা ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ করতে এই অঞ্চলের লোক্ সাধারণ এই ভাষাগুলি ব্যবহার করে। বাংলা গালি > গাল্। বাক্‌যন্ত্রে উচ্চারণ ছাড়াও অঙ্গীভঙ্গী এবং ইশারার মাধ্যমে তথা কথিত মন্দ বিষয়কে উত্থাপন করা হয়। এগুলি হল নীরব 'গাল্-বাকান্'।

সরব গাল্-বাকানকে আমরা দুভাগে ভাগ কবতে পারি –

ক. পুরুষ উচ্চারিত

খ. নারী উচ্চারিত্

ক. গাল্ ঃ

স্ত্রীলোকের কণ্ঠে উচ্চারিত মন্দ শব্দ শব্দগুচ্ছ ও বাক্যসমূহকে 'গাল্' বলা হচ্ছে। এগুলি উচ্চারণ কালে মেয়েরা এর সঙ্গে অঙ্গীভঙ্গীও করে। অর্থাৎ উচ্চারণের সঙ্গে নাচের অঙ্গসঞ্চালনও চলতে থাকে। রাগের প্রকাশ তীব্র হলে এই অবস্থা লক্ষ কবা যায়। অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের মেয়েরা, আর্থিক অনটনে পড়ে থাকা ক্ষেতমজুরের স্ত্রী লোকেরা ঝগড়ার সময় উক্তি-প্রত্যুক্তি কালে বিষয়ে গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য বাক্-যুদ্ধের সঙ্গে নীরব গাল যুক্ত করে। পরিণতিতে চুলোচুলি ও হাতাহাতি দেখা যায়।

ব্যবহৃত গাল্ ঃ

ভালখাকি, আঁটকুড়ি, তোর ব্যাটার মাতা খাই ইত্যাদি।

ভাষা বিশ্লেষণ ঃ

ভালখাকি ঃ

এটি শ্লেষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 'ভালখাকি' এর সাধারণ আক্ষরিক অর্থ যে ভাল ভাল খাবার ভক্ষণ করে। কিন্তু এখানে অর্থের অপকর্ষ ঘটেছে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের যা ভাল সেগুলি নষ্টের কারণ যেন প্রতিপক্ষ নিজে হয়। বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে এই গাল্ উঠে আসে।

আঁটকুড়ি ঃ

শব্দটির আক্ষরিক অর্থ সন্তানহীনা, বন্ধ্যা।

আঁটকুড়ি = আঁট + কুড়ি

আঁট অর্থাৎ বন্ধন > বন্ধ্যা

কুঁড়ি > কুড়ি অর্থাৎ বন্ধ ফুল > বন্ধ্যা।

শব্দটি প্রায় সমার্থক যুগ্ম শব্দ।

অর্থাৎ প্রতিপক্ষ সন্তান সন্ততি বিস্তারের মাধ্যমে পারিবারিক আনন্দ যেন না পায়। শব্দটি প্রকৃত অর্থ না জেনেও প্রয়োগ করা হয়। চার ছেলের মা প্রতিপক্ষ হলেও তার উদ্দেশ্যে এই শব্দবাণ ছোঁড়া হয়।

বেদোর পয়দাস ঃ

শব্দটির আক্ষরিক অর্থ অবৈধ জন্ম

বেদো + পয়দাস

ফারসি বে + সং দাঁড়া — তুলনীয় ফারসি বদরাহ্ > বেদাঁড়া

অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী / নিয়ম বহির্ভূত > বেদো

ফারসি পয়দা (জন্ম, জন্মদান) > পয়দাস (ব্যঞ্জনাগম) প্রতিপক্ষের বৈধ জন্ম হলেও অবৈধ জন্ম তার উপর আরোপ করা হয়।

তোর ভাতারের মাতা খাই ঃ

সং ভৃ > ভর্তা (স্বামী, পতি) > ভাতার, মাথা > মাতা (অল্পপ্রাণিত)।

মাথা আক্ষরিক অর্থে খাওয়া নয়। মাথা খাওয়া অর্থাৎ আমার দ্বারা প্রতিপক্ষের পালনকারী সুখদাত্রী যেন মারা যায়। উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের প্রধান অবলম্বন যেন নষ্ট হয়।

সমাজতত্ত্ব ঃ

মজুর , ক্ষেতমজুরের স্ত্রী, বিধবা, কর্মহীন ব্যক্তির স্ত্রী কন্যারা মূলতঃ আর্থিক অনটনেব কবলে পরে অপরের সুখ সহ্য করতে না পারার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ 'গাল্' দিয়ে থাকে। আর্থিক অবস্থা ভাল এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে গাল্ দেওয়ার রেওয়াজ কম। এছাড়া বৃদ্ধা কিছু সহায়সম্বলহীনা মহিলা থাকেন যারা তাদের দুঃখের প্রতিবাদকে 'গাল্' এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। অনেক সময় শব্দগুলো উচ্চারণ করে স্বতস্ফূর্তভাবে। যা শুনে অন্যজনের কাছে গালাগাল মনে হতে পারে কিন্তু সেই অর্থে বক্তা প্রয়োগ করছে না। অর্থাৎ কথার মাত্রা হিসাবেও সেগুলি ব্যবহার্য।

খ. বাকান্ ঃ

পুরুষ কণ্ঠে উচ্চারিত মন্দশব্দ শব্দগুচ্ছ ও বাক্যসমূহকে 'বাকান' বলা হয়। শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'ব্যাখ্যান' > বাখান অর্থাৎ প্রশংসা করা। কিন্তু শব্দটির অর্থের অবনতি হয়েছে। বাখান > বাকান্ অর্থাৎ অ-শিষ্ট ভাষায় নিন্দা করা। রাগ বৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক হারে ভাষা অশ্লীল উত্তেজক হয় এবং অঙ্গীভঙ্গীও লক্ষ কবা যায়, শেষে লাঠালাঠি হয়। তবে মেয়েদের তুলনায় অঙ্গীভঙ্গী কম। বৃদ্ধরা তাদের শক্তিহীনতার অবলম্বন লাঠিকে হাতে তুলে আনুভূমিক রেখে বাকানে অংশ গ্রহণ করে। অভিজাত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অপেক্ষা নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব ভূমিহীনদের মধ্যে 'বাকান' বেশি লক্ষ করা যায়।

ব্যবহৃত বাকান ঃ

'বাঞ্চৎ', 'চুতিয়া', 'বেরিয়ে আয় শালা' ইত্যাদি।

ভাষা বিশ্লেষণ ঃ

বাঞ্চৎ ঃ

শব্দটি কেউ কেউ 'ভাঞ্চৎ'ও বলে থাকে।

ভান + চৎ > ভাঞ্চৎ > বাঞ্চৎ (অল্পপ্রাণিভবন)

সং ভা + অন = ভান অর্থাৎ ছল, কৃত্রিম আচরণ চ্যুত অর্থাৎ ভ্রষ্ট > চৎ এটি বিভিন্নার্থক যুগ্ম শব্দ। প্রতিপক্ষের উপর আরোপ করা হয় তাই আরোপিত বাকান্। হিন্দি বাইঞ্চৎ < বহিন (বোন) + চৎ, অর্থাৎ বোনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে যে; বঙ্গালি উপভাষায় বাইঞ্চৎ।

চুতিয়া ঃ

চ্যুত > চুতি + আ (প্রত্যয়) > চুতিয়া অর্থাৎ ভ্রষ্ট যে ব্যক্তি।

বেরিয়ে আয় শালা ঃ

তীব্র রাগে প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্ব যুধের আহ্বান করে। ক্ষমতার লড়াইএর আহ্বান জানায় সর্বসমক্ষে। deep structure এর বাক্যটি হল -- (তুই) বেরিয়ে আয় শালা। সং শ্যালক > শালা (পত্নীর ভাই) অর্থাৎ কাল্পনিকভাবে প্রতিপক্ষের সহদরার প্রতি অবৈধ ইঙ্গিত করে বা সম্পর্ক পাতানোর কথা বলা হয়।

সমাজ ভাবনা ঃ

. প্রতিপক্ষের চরিত্রের দোষাবলী জন সমক্ষে তুলে ধরার লক্ষে শব্দগুলি প্রয়োগ করে। প্রতিপক্ষের মাতৃস্থানীয়দের প্রতি কটূক্তি করে তাদের উত্তেজিত করতে চায়। বিষয় সম্পত্তি, ক্ষয়ক্ষতি, মারামারি হলে রাগ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বাকানের ব্যবহার হয়। যার উপর প্রয়োগ করা হয় তার সঙ্গে প্রায়ই এর বাস্তব মিল থাকে না।

✧ **আনন্দ প্রকাশক ঃ**

১. গাল্ ঃ

'দুর ছিনাল', 'এই গোলামের বেটি', গলার চরা সুর থাকলেই এগুলি ঝগড়ায় ব্যবহৃত আবার মুখে হাসি ও গলায় নরম সুর থাকলে এগুলি আনন্দ প্রকাশক গাল্। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ রাগ করে না। যদিও উদ্দেশ্য ইয়ার্কির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে রাগানো।

দুর ছিনাল ঃ

দুর্ + ছিনাল -- 'দুর' অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত। সং, ছিন্ন (মূল থেকে বিচ্ছিন্ন) + আ = ছিন্না (স্ত্রী লিঙ্গ)। সং ছিন্না > প্রাকৃত ছিন্নাল (ব্যঞ্জনাগম) > বাংলা ছিনাল। আক্ষরিক অর্থ 'কুলটা' কিন্তু বাচ্ছা মেয়ের ক্ষেত্রেও এটি প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ বাস্তব সম্পর্ক বর্জিত, আরোপিত গাল।

এই গোলামের বেটি ঃ

deep structure-এ বাক্যটি (তুই হলি) গোলামের বেটি। 'গোলাম' আরবি শব্দ, বেটি হিন্দি শব্দ। অর্থা চাকরের মেয়ে।

সমাজ ভাবনা ঃ

পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধির সহায়ক এই গালগুলি। ঠাট্টা ইয়ার্কীর মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে।

২.বাকান্ ঃ

'এই শালী আমাকে লিকে নিকে করবি', 'ক্ষ্যাপা শালা'— এই ধরণের স্নেহ ভালবাসা প্রকাশক বাকান্ পুরুষেরা প্রকাশ করে।

লিকে ঃ

আরবি নিকাহ্ (মুসলমান শাস্ত্র মতে বিবাহ) > নিকা > লিকে (দ্বিতীয় বিবাহ অর্থে প্রযোজ্য)। মুসলমানদের মধ্যে লিকে করার প্রচলন এখনো আছে। ৬০ বছরের বুড়োর সঙ্গে ১৪ বছরের মেয়ের লিকে দেওয়ার ঘটনা আমরা খবরের কাগজ খুললে প্রায়ই পাই।

সরব গাল বাকান্গুলোকে ব্যবহারের দিক থেকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় -

১. প্রত্যক্ষ ঃ

পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হলেন, সংখ্যায় যথাক্রমে এক-এক। একের বিপক্ষে অপরের সামনাসামনি অশিষ্ট ভাষা ব্যবহারে লড়াইকে প্রত্যক্ষ গাল বাকান বলা যেতে পারে। এটি উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক। অনুন্নত শ্রেণিরা এই প্রয়োগ বেশি করে।

২. পরোক্ষ ঃ

সামনা সামনি লড়াইয়ে অসমর্থরা অপর ব্যক্তির (আড়কাঠি) মারফৎ লড়াই চালায়। একে বলে পরোক্ষ গাল্-বাকান্ বলে। এক্ষেত্রে পক্ষ-বিপক্ষ যা বলে তার থেকেও বেশী করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে শোনান হয়। সমাজে নিম্ন আর্থিক কাঠামোর মানুষ অপেক্ষা উচ্চমধ্যবিত্ত বা অভিজাতরা এই পরোক্ষ লড়াই করে থাকে।

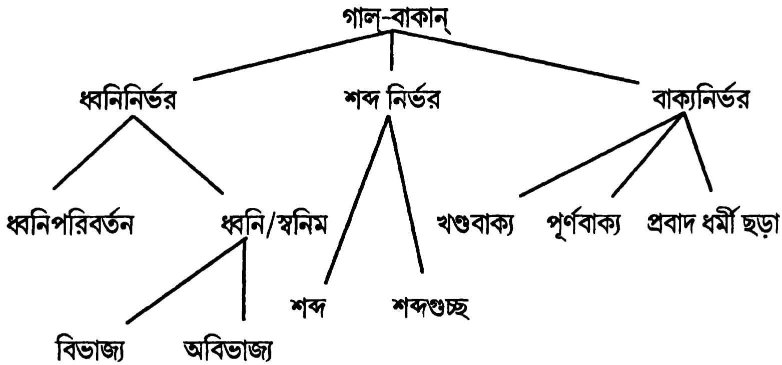
৩. সমবেত ঃ

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লড়াই বাড়াবাড়ি হলে দুই পক্ষই আত্মীয় স্বজন নিয়ে দলগত লড়াই চালায়। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে এ লড়াই রাজনৈতিক লড়াই-এ রূপ নেয়। অনেক সময় পরিবার গ্রাম ছাড়িয়ে এ লড়াই আঞ্চলিক রূপ নিতে পারে।

সমাজভাবনা ঃ

অনুন্নত (আর্থিক-শিক্ষায়) বা প্রত্যক্ষ এবং শিক্ষিত ও আর্থিক অবস্থা যাদের ভাল তারা পরোক্ষ লড়াই যুক্ত তবে সমবেত লড়াই গরীব বড়লোক সবাইকে সামনা সামনি হাজির করে। সমবেত লড়াই মীমাংসায় পঞ্চায়েত ভূমিকা নেয়। তবে বিপরীত পার্টির মধ্যে হলে থানা-পুলিশ-কোর্ট পর্যন্তও গিয়ে থাকে।

✧ ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থান অনুযায়ী ✧



ক. ধ্বনিনির্ভর ঃ

ধ্বনি রূপান্তর ও বিভাজ্য অবিভাজ্য ধ্বনির সঙ্গে যে গাল বাকান্‌গুলি যুক্ত এদের ধ্বনির নির্ভর গাল্-বাকান্ বলছি। পারিবারিক ঝগড়া, বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা কমবয়স্ককে তিরস্কার এবং ঝগড়া মারামারির সূচনায় এই ধরণের গাল্-বাকানের ব্যবহার দেখা যায়। আদর জানাতেও এর ব্যবহার ঘটে । এর দুটি রূপ —

১.ধ্বনি পরিবর্তন ঃ

প্রতিপক্ষকে অবজ্ঞা করে বা ভালবাসা জানাতে তাক্ষণিক মুহূর্তে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটান হয়। এগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিনামের বিকৃতি ঘটায়। পুং নামের সঙ্গে আ, উ,এ -কার যুক্ত হয়ে স্ত্রী নামের সঙ্গে 'ই', 'ঈ'কার যুক্ত করে ভালোকে মন্দ করা হয়, তবে অঞ্চলে প্রয়োগ কম। তাছাড়া সব নামকে বিকৃত করা যায় না।

পুং নাম			স্ত্রী নাম
আলো	আলা	নাসিমা	নাস্‌মী
কালো	কালা	হাজেরা	হাজেরী
ফকির	ফকরে	গুলবাহার	গুলবাহারী
হাসিব	হাসিবে	মমতাজ	মমতাজি

স্ত্রী পুরুষের ক্ষেত্রে একই শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটিয়ে গাল্‌কে ব্যবহার করা হয়।

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
ভালোখেকো	ভালখাকি (ও > ই)	আঁটকুড়ো	আঁটকুড়ি (ও > ই)
ছুঁচো মুখো	ছুচোমুখি (ও > ই)	বেদো	বেদি (ও > ই)

২. ধ্বনি নির্ভর ঃ

গাল্‌-বাকানের বাক্‌ প্রবাহে বিশ্লেষণ করে তার অংশরূপে যে সব ধ্বনিগত উপাদান পাওয়া যায় তাদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেগুলির স্পষ্ট পৃথক পৃথক একক আছে সেগুলি হল বিভাজ্য ধ্বনি নির্ভর। আর যে গুলিকে স্পষ্ট পৃথক এককে ভাগ করা যায় না সেগুলি হল অবিভাজ্য ধ্বনি নির্ভর।

বিভাজ্য ঃ

গাল্‌	বাকান্‌
তোর ব্যাটার মাতা খাই।	ওরে শালার ব্যাটা শালা।
ভাঙ্গলে একক হিসাবে পাই –	
ত্‌ + ও + র্‌ ব্‌ +অ্যা+ ট্‌ +আ+র্‌	ও+ র+ এ শ্‌+ আ+ ল্‌+ আ+ র্‌
ম্‌ +আ+ ত্‌ + অ খ্‌+ আ+ ই	ব্‌+অ্যা+ ট্‌+আ শ্‌+ আ+ ল+ আ

অবিভাজ্য ঃ

সুরের একটা প্রবাহ উচ্চারণে শোনা যায় গোড়ায় সুরের প্রবাহ তীব্র থাকে, পরে তা ক্ষীণ হয়ে যায়। যেমন - তো-ও-র ব্যাটা-আ-র মা-তা খাই।

খ. শব্দ নির্ভর ঃ

প্রতিপক্ষের চারিত্রিক ও শারীরিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের বর্ণনাকে কুৎসিত করে তাঁকে রাগিয়ে তোলার জন্য ও নিজের রাগ মেটানোর জন্য যে শব্দ ও শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করা হয় সেগুলি শব্দ ও শব্দগুচ্ছ নির্ভর গাল্‌-বাকান্‌ বলছি। এগুলি দুই ধরণের শিষ্ট ও নিষিদ্ধ শব্দ ও শব্দগুচ্ছ নির্ভর। বর্ণনা নির্ভর বলে এগুলি বর্ণনামূলক বা descriptive পর্যায়ে পড়ে। তবে শিষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছগুলি যতখানি বাস্তব নির্ভর নিষিদ্ধ শব্দগুলি ততখানি বাস্তব নির্ভর নয়। শব্দগুলির বেশির ভাগই আরোপিত। শিষ্ট শব্দগুলি তিন ভাগ – (১) চরিত্র সম্পর্কিত (২) অঙ্গ সম্পর্কিত (৩) উপমা জাতীয়।

শিষ্ট শব্দ ও শব্দগুচ্ছ ঃ

চারিত্র সম্পর্কিত ঃ

	স্ত্রী লিঙ্গ	পুং লিঙ্গ	উভয় লিঙ্গ
শব্দ	নেংটি হারামী	ন্যাংটা হারাম	বেইমান ফাজিল
শব্দগুচ্ছ	নিমকহারামী হারামজাদী	নিমকহারাম হারামজাদা	এঁচোড়ে পাকা

অঙ্গ সম্পর্কিত ঃ

	স্ত্রী লিঙ্গ	পুং লিঙ্গ	উভয় লিঙ্গ
শব্দ	গেঁড়ী শুঁকটি	গেঁড়া শুঁকটে	দেঁতো
শব্দগুচ্ছ	চোক্‌খাকী সিনে খাকী	চোক্ খেকো সিনে খেকো	

উপমাজাতীয় ঃ

	স্ত্রী বাচক	পুং বাচক	উভয়
শব্দ	পাঁঠী কুত্তী	পাঁঠা কুত্তা	গাধা শুয়োর, শিকুনি
শব্দগুচ্ছ	আমড়া চোকি আদিকালের দাদী লাট সাহেবের ব্যেটি	আমড়া চোকো আদিকালের দাদো লাটসাহেবেব ব্যাটা	বাদুড় চুষা বুদ্ধির ঢেঁকি পিলে খচ্চর

গ. বাক্যনির্ভর ঃ

ছড়া কেটে , প্রবাদ - ধাঁধা প্রয়োগ করে, টানা ও একক সংলাপ প্রযোগ করেও গালাগাল দেওয়া হয় , এগুলিকে বাক্যনিভব বলছি।

১. ছড়া কেটে ঃ

১ ও ছুঁড়ি তুই যাস্‌না খালে খালে
চিংড়ি মাছ ধরবে তোর বালে।

২. কিবা মাগীর রূপ তামাসা
নাং খেতে চায় ফুলবাতাসা।
দেবে মশায় ল্যাটাই চরকা
বার করি তোমার ফুলবাতাসা।

২. প্রবাদে ঃ

১. . . . ফুটিয়ে খেতে নুন নাই, কলমি শাগে আদা ।

২. লোকের ভালো করতে গেলেই পোঁদে বাঁশ, হাতে হারিকেন।

৩. গালাগালের টানা সংলাপে পক্ষ-বিপক্ষের বিচিত্র বাক্যের ব্যবহার ঃ

পক্ষ ঃ আঁটকুড়ী ভালোখাকি — তোর ব্যাটার মাতা খাই — তোর ভাতারের মাতা খাই- ন্যাং করুনী, ছিনাল — বেয়ুশী — প্যায়ারখাকি — সিনেখাকি।

প্রতিপক্ষ ঃ ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বল করিনি। কুরানে হাত দিয়ে পশ্চিম মুয়ে বলছি করিনি। প্যাটা ধরা ছেলের গায়ে তুই ক্যানে হাত দিবি লো ছিনাল।

ভাতার খাকি।

পক্ষ ঃ তু ছেলের গায়ে হাত দিছিস্। হারামি - খানকি — বেদোর পয়দাস। ফন্নাকে বলগা— গাঁড়মারানী — চুদনী উলাউটি-- তোকে ফাটা কবরে দিয়ে আসবো।

প্রতিপক্ষ ঃ তোকে শালুক গড়ে দিয়ে আসবো। তোর মতো নাড় করে বেড়াইনা। বারোভাতারী — তোর মতো ধুয়ানী খাচ্ছি যে। নাং করা পয়সায় সংসার চালাই না। ন্যাকা মারানী। খানকির ঝি। তোর ঘরে মরা বেরুক।

পক্ষ ঃ তোর ঘরে কলেরা হোক। বেদোর বাচ্ছা -- ঢ্যামনা মাগী -- রাণ্ডাবী। শুয়োরের পয়দাস — ফন্নাখাকি যা পঞ্চায়েত তোর নাং হয় — তোর সাদ্গুষ্টি হয়।

প্রতিপক্ষ ঃ মুখে মুখে চোব্ড়া করছিস্। নিজের পোঁদ আল্গা। চালুনি পোঁদ ঝরঝর করে চালুনি ছুঁচের বিচার করে।

৪. একক-সংলাপ ঃ-

১. তোর ব্যাটার মাতা খাই। তোর ভাতারের মাতা খাই॥
তোর ভালোর মাতা খাই। তোর ভালোর মাতা খাই॥

২. পিরতলায় হাত দিয়ে বল। ছেলের মাতায় হাত দিয়ে বল॥
কুরানে হাত দিয়ে বল। পশ্চিম মুয়ে বল॥

৩. তোর ঘরে মরা বেরুক। তোর ঘরে কলেরা হোক॥
পুকায় তোর . . গির্জগিড় করুক।

✧ কারণ অনুযায়ী ✧

গাল্-বাকান্

- ইচ্ছাকৃত
  - রাগ-ক্রোধ
  - নিন্দা
  - প্রতিবাদ
  - হিংসা
  - অভিশাপ
  - শাসন অবমাননা
  - প্রভূত্ব স্থাপন
- অনিচ্ছাকৃত
  - হতাশা
  - মরাকান্না
  - স্নেহ ভালোবাসা
  - উৎসব
  - ব্যঙ্গ কৌতুক

ক. ইচ্ছাকৃত ঃ

ইচ্ছাকৃত গাল্-বাকান্গুলির কারণের মূলে আছে একটি প্রতিবাদী মানসিকতা এবং দর্শক ও শ্রোতাকে আপন পক্ষে টেনে আনার প্রবল চেষ্টা।

১. **রাগ-ক্রোধ ঃ**

রাগ ও ক্রোধ বৃদ্ধি পেলে গাল্-বাকান্ আসে। বাল্যকালে খেলা নিয়ে ঝগড়া, বন্ধুবান্ধবে তর্ক বিতর্ক, পুকুর ঘাটে সরা ভরা নিয়ে ঝামেলা, খেলায় হার জিত, কাজে মনের অমিল, কেনা বেচায় দরাদরি, হিসাবের ভুল, জায়গা জমি নিয়ে ঝগড়া, বাপ বেটা, মা, বেটি ইত্যাদি আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে সাংসারিক কোন্দোল, রাজনৈতিক আক্রোশ, পঞ্চায়েতের বিচার, ক্যানেলের জল নিয়ে খেতজমিব জল নিয়ে বিরোধ, অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি কারণে রাগ ও ক্রোধের জন্ম হলে গাল্-বাকানের ব্যবহার হয়। উদাহরণ — ' — মারানির ছেলে', '— মারানি ' ইত্যাদি।

২. **নিন্দা ঃ**

শাশুড়ী কর্তৃক বৌ এর নিন্দা অথবা বৌ কর্তৃকশাশুড়ীর নিন্দা প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ থাকলে তার সম্পর্কে নিন্দা থেকেও গাল্-বাকান্ জন্ম নেয়। উদাহরণ — ভালোখাকি।

৩. **প্রতিবাদ ঃ**

শিক্ষক ছাত্রের গায়ে হাত দিলে, বেটাকে বাপ শাসন করলে, ভাগ্য খাবাপ হলে অদৃশ্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্র, ছাত্রী, ভাগ্যহীন পুত্র কন্যারা এই ধরণের গাল্-বাকান্ প্রয়োগ করে। উদাহরণ — 'কুত্তাব বাচ্ছা'।

৪. **হিংসা ঃ**

প্রতিবেশী অথবা আত্মীয়ের উন্নতিতে হিংসা জন্মালে অথবা অপরের সৌন্দর্যে ও হিংসা জন্মালে, নিজে বিধবা বা স্বামী বঞ্চিতা বা বাজে স্বামী হলে, সুখী দম্পতিদের উপর হিংসা হলেও গাল্-বাকান্ জন্ম নেয়।

৫. **অভিশাপ ঃ**

বেটা বাপমাকে বৃদ্ধ বয়সে না দেখলে, অপরের উপকার করার সত্ত্বেও সে ক্ষতি করলে গাল্-বাকান্ বর্ষিত হয়।

৬. **শাসন অবমাননা ঃ**

বেশি জমির মালিক, পুলিশ, পঞ্চায়েত প্রধান, উঠতি মস্তান, আদায়কারী, অত্যাচারীদের রূঢ় ব্যবহারে নিপীড়িতদের ক্ষোভ বৃদ্ধির ফলে গাল্-বাকান্ বর্ষিত হয়।

৭. **প্রভুত্ব স্থাপন ঃ**

বাগাল, চাকর, বাঁধা লোকের উপর জমির মালিক শাসক হিসাবে গাল্-বাকান্ বর্ষণ করে। যেমন — এই শুয়ার কখোন ধরে ডাকছি ... ইত্যাদি।

খ. অনিচ্ছাকৃত গাল বাকান ঃ

বক্তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকস্মিকভাবে এগুলি বেরিয়ে আসে। তাই ইচ্ছাকৃত অপেক্ষা অনিচ্ছাকৃত গাল্-বাকান্গুলি বেশি লোক সংস্কৃত নির্ভর।

১. হতাশা ঃ

বেকার, লেখাপড়া শিখে শহর থেকে ফিরে গ্রামে বসে থাকা যুবক, কাজ না থাকা কৃষি শ্রমিক এরা হালকা চালে বাকান করে থাকে। বুড়িমা ছেলেকে কোন চাকরি-টাকরি দেখতে বললে, হতাশ হয়ে গাল্ দেয়। উদাহরণ – 'ক্যালা হবে, চাকরি হবে', কিংম্বা - — হবে, চাকরি হবে।

২. মরাকান্না ঃ

যুবক সন্তানের আকস্মিক্ মৃত্যুতে মা-কান্নার সময় গাল্ ব্যবহার করেন। উদাঃ – ওরে ব্যাটা . . . ঢুকে গেল রে – এ-এ-এ।

৩. স্নেহ ভালবাসা ঃ

স্নেহ ভালবাসায় আত্মীয় স্বজন বিশেষতঃ দাদো-দাদি, নানা-নানী, শাশুড়ী-ভাজবৌ স্থানীয়রা স্নেহের সম্পর্কে, বন্ধু বান্ধবের প্রীতিমূলক গাল্-বাকান্ করে থাকে। উদা ঃ- 'ওলো ছিনাল', 'আঁটকুড়ির বেটি' ।

৪. উৎসব ঃ

বিবাহ, মুসলমানী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মেয়েরা মজা করতে গিয়ে, সং দেখাতে এই ধরনের গালের ফোয়ারা ছোটায়।

একটা রুমাল নিয়ে সং-দার মেয়ের প্রশ্ন – কত দাম ?

আর এক সং-দার মেয়ের উত্তর — এ্যান্টাকা -পাঁশ্শিকে।

৫. ব্যঙ্গ কৌতুক ঃ

নিষ্কর্মা, বন্ধু বান্ধবের নিজস্ব জগৎ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মধ্যে এই গাল-বাকানগুলি যথার্থ আক্ষরিক অর্থবাহী নয়। উদাঃ- 'যাস্ শালা'।

✧ শব্দভাণ্ডারে অবস্থান অনুযায়ী ✧

বাংলা শব্দভাণ্ডারে গাল্-বাকান্কে এখনো তেমন করে স্থান দিতে পারি নি। তবুও শব্দভাণ্ডারে অবস্থান অনুযায়ী গাল্-বাকান্কে বিভাজিত করা যেতে পারে। কোন ভাষা থেকে এসেছে তার উপর ভিত্তি করে এগুলিকে মুলত তিন শ্রেণিতে বিভক্তি করা যেতে পারে –

১. বিদেশি শব্দ ঃ আরবি (শয়তান), ফারসি (খানকি), ইংরাজি (বাস্টার্ড) ইত্যাদি।
২. দেশি শব্দ ঃ অষ্ট্রিক (ল্যাংড়া), দ্রাবিড় ইত্যাদি।
৩. আঞ্চলিক শব্দ ঃ সংস্কৃতজাত (লক্ষ্মীছাড়া), নিজস্ব বা উদ্ভট (হোঁতকা), অন্য প্রাদেশিক ভাষাজাত(হিন্দি - ইত্যাদি।

✧ উৎস অনুযায়ী ✧

উৎস অনুযায়ী গাল্ বাকান্‌কে পবিত্র সরকার ব্যক্তিবাচক ও বস্তুবাচক এই দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। ব্যক্তিবাচক বলতে — ব্যক্তিনাম (ছেলেকে বাপের নামধরে), শ্রেণি (চোর), গোষ্ঠী (ক্যাওড়া), সম্প্রদায় (যবন), আত্মীয় (শালা), পশুপাখি (শুয়োর), কল্পিত জীব (খবিশ) ইত্যাদি শব্দ ধরে গাল্-বাকান্ বোঝায়। আর বস্তুবাচক বলতে — গোপন অঙ্গ, বস্তু, দ্রব্য ইত্যাদি বোঝায়।

✧ ভাষার লিঙ্গগত বিভাজন ঃ নারীর ভাষা ✧

বাংলা ভাষায় নারী ও পুরুষের ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সামাজিক বিভাগ করা হয়ে থাকে। জীবন আচরণের ধারা ও সামাজিক প্রণালীর অসমতার জন্য নারী ও পুরুষের ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য ঘটে। প্রাচীনকালে পুরুষেরা শিকারে নিয়োজিত থাকত আর নারীরা কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকত। এর ফলে নারী পুরুষের কথোপকথনের বিষয়গত পার্থক্য ছিল। এক সময় নারীরা এমন কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ করত যা পুরুষেরা ব্যবহার করত না। আবার সামাজিক অবস্থানে এমন কতকগুলো শব্দ ছিল যা নারীদের উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া নারীরা নিজেদের কথোপকথনে এমন কতকগুলি সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগ করত যা অপরপক্ষে বোঝা কঠিন ছিল।

মানুষ বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে। সে চরিত্র পুরুষ অথবা নারী হতে পারে। এখানে মূলগত তফাৎ যেমন শারীরিক দিক থেকে তেমনি ভাষার দিক থেকেও এই প্রভেদ ঘটতে পারে। বর্তমানে নাবী পুরুষের সমানাধিকার থাকলেও নারীর মধ্যে একটা অস্বস্তি কাজ করে, নারীর মধ্যে একটা জড়তা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দিক থেকে নারীদের মধ্যে ভাষার ব্যবহারের পার্থক্য ঘটে। তবে আজকাল যে মেয়েরা বাড়ির বাইরে নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত তাদের ক্ষেত্রটা একটু আলাদা। ভাষায় লিঙ্গভেদ আজ সম্ভব হলেও ব্যাপকভাবে নারীরা শিক্ষার অঙ্গনে ও কর্মের জগতে এলে এ বিভেদ লুপ্ত হবে।

✧ লিঙ্গগত বিভাজনের কারণ ঃ

১. নারীর ভাষার রক্ষণশীলতা দেখা যাচ্ছে। এর পিছনে আর একটা কারণ যোগাযোগের অভাব। একটা নির্দিষ্ট এলাকার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার জন্য যে ভাষাগত পরিবর্তন আসছে সেটা তাদের কাছে পৌঁছাছে না।

২. পেশাগত গণ্ডীবদ্ধতা মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। প্রযুক্তিগত বিদ্যায় মেয়েরা এলেও এখনো রাজমিস্ত্রীদের মহিলা জোগাড়ে, মহিলা নৌকা-চালিকা, মহিলা পুরোহিত ইত্যাদি তেমন একটা দেখা যায় না। আবার ঝিয়ের কাজে মেয়েদের ভূমিকাই প্রধান।

৩. পুরুষ প্রধান সমাজে এখনও মেয়েরা কথাবার্তায় শিথিল মনোভাবের পরিচয় দেয়।

৪. সমাজ বিন্যাসে নারী ও পুরুষের অবস্থান গত পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। কারণ একদিকে অধিকাংশ নারী রান্না-খাওয়া, খাওয়া-রান্নার মধ্যে সীমাবদ্ধ; অন্যদিকে পুরুষেরা উন্মুক্ত জগতে বিচরণশীল।

✧ শব্দ প্রয়োগে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য -

১. নারীদের অমঙ্গলসূচক শব্দ ব্যবহারে লিঙ্গগত প্রভেদ দেখা যায় । কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয় না। যেমন — বাড়িতে চাল না থাকলে — চাল বাড়ন্ত, সাপকে বলা হয় 'লতা', ।

২. বিশেষ বিশেষ শব্দ তারা ব্যবহার করবে না। যেমন - স্বামী, শ্বশুর, বড়ঠাকুর, ভাসুরের নাম ব্যবহার করে না। রামায়ণ শব্দে রাম কথাটি আছে এবং স্বামীর নাম রাম হওয়ায় রামায়ণকে বলে 'ফামায়ণ', তুলসীকে বলে 'হরিপাতা'।

৩. বিশেষ ধরণের স্বরাঘাত ও সুরাঘাত ব্যবহার করে। জোরসূচক অব্যয় ব্যবহার হবে না। যেমন, ' যত রাজ্যের ঝামেলা' বা 'রাজ্যের ঝামেলা'।

৪. মেয়েরা দিব্যি কাটতে 'থুরি', 'মাইরি', 'আল্লার কিরে', 'আল্লার কশম', 'মাথার দিব্বি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে যা পুরুষ সমাজে কম ব্যবহৃত হয় ।

৫. অলংকার জাতীয় কিছু শব্দ ব্যবহার করে। যেমন -- 'অ্যাই শুনছো' ইত্যাদি।

৬. শিশু পালনের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কিছু শব্দ আছে। যেমন — 'আমা ছুনু মনি'।

৭. উচ্ছ্বাস প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মেয়েরা বলে মরণ, ধ্যাৎ ,যাঃ, আ মলো যা ইত্যাদি।

৮. বিশেষ কিছু শব্দ যেমন 'ন্যাকামি', 'ঢং' জাতীয় শব্দে মেয়েরা ব্যবহার করে।

৯. পুরুষেরা এমনকিছু নিন্দাসূচক বা গালিগালাজ শব্দ ব্যবহার করে যা নারী সমাজে প্রচলিত নয়। নারীদের গাল পুরুষেরা ব্যবহার করে না। যেমন -- মিনসে, ভালো খাকি, খানকি, ছিনাল, মা মেগো, বাপ ভাতারী, নাং করুনী, বারো ভাতারী, ভাই ভাতারী ইত্যাদি।

১০. নারীরা নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে যা পুরুষের বোধগম্য নয়। যেমন, 'তুই আসবি' এর পরিবর্তে শব্দাংশের আগে 'বো' বসিয়ে বলা হয় — 'বোতু বোই বোআ বোস বোবি'।

স্বভাবতই এই ধরণের কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য নারীর ভাষা পুরুষের ভাষা থেকে আলাদা।

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য —

বিভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে যে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাড়ি ধ্বনি

ব্যবহার করতে শেখে।

১. ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'ল' এর পরিবর্তে 'ন' ধ্বনি উচ্চারণে প্রবণতা আছে। নুচি, নেপ, নুঙ্গি, নোয়া। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামের মহিলারা এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধরে রেখেছে। নাসিক্য ধ্বনি উচ্চারণের প্রবণতা তাদের আছে।

২. সুরতরঙ্গের বৈচিত্র্য এবং বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বরাঘাতের প্রয়োগে অবিভাজ্য ধ্বনি দেখা যায়। যেমন – 'কি রে-এ-এ-এ'।

৩. স্বতঃনাসিক্য ধ্বনির মাত্রা কিছুটা বেশি। যেমন – চঁ না, যাঁবি না। আবার কান্নার সময় নাকি সুর বেড়িয়ে আসে।

✧ রূপতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য –

প্রত্যয় –

১. কিছু কিছু প্রত্যয় নারীরা ব্যবহার করে। যেমন – 'অন্ত' প্রত্যয় যুক্ত শব্দ -বাড়ন্ত, ফুটন্ত।

২. অন্তে স্ত্রী লিঙ্গবাচক শব্দান্ত – লাজন্তি, দেখন্তি।

৩. 'পনা' নামক একটি প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন – বেহায়াপনা, গিন্নিপনা, আদিখ্যেতাপনা, দুরন্তপনা, খবিশপনা ।

৪. 'পানা' নামক প্রত্যয়ের ব্যবহার। যেমন – হাঁড়িপানা, চাঁদপানা ।

৫. 'কি' প্রত্যয়ের হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন – ছেঁচকি, বোটকি, ছোটকি, মুটকি ইত্যাদি ।

৬. 'টি' নামক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে। যেমন – কোলেরটি, খুঁটোটি ইত্যাদি ।

৭. 'ইষ্টি' প্রত্যয়ের ব্যবহার। যেমন – অসন্তুষ্টি।

৮. 'অন' নামক প্রত্যয়ের ব্যবহার। যেমন – চলন্, বলন্।

৯. 'ইন্' নামক প্রত্যয়ের ব্যবহার। যেমন – লাতিন্, পুতিন্।

উপসর্গ ঃ –

'আ' ও 'হা' উপসর্গ ব্যবহার করে। যেমন – আ – আবাগি, আদিখ্যেতা। হা – হাপিত্যেষ, হাভেতে।

সর্বনাম ঃ –

নামকরণের ক্ষেত্রে সর্বনাম জাতীয় শব্দের ব্যবহার বেশি। স্বামীর নামের পরিবর্তে উনি, তিনি, তোমার দাদা, ফলনা, ছেলের বাপ, বিশুর বাবা ইত্যাদি নাম ব্যবহার করে।

সমাস ঃ –

বিভিন্ন ধরণের সমাস ব্যবহার করে। হাভাতে, হাপিত্যেষ ।

অব্যয়ঃ –

সম্বোধনসূচক অব্যয় ব্যবহার করে। যেমন – ওলো, ভাই, গা, মাগি, ছুঁড়ি, মিনসে ইত্যাদি।

✧ বাক্যবিন্যাসগত স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য –

১. সামাজিক পরিবেশে পুরুষেরা মেয়েদের তুলনায় কম কথা বলে। এর পিছনে অবশ্য দ্বিধা সংকোচ কাজ করে। যার ফলে তাদের বাক্য প্রয়োগ অনেক সময় পূর্ণ হয় না। যেমন – দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও একটা ভয় থাকার জন্য স্বামীকে গৃহবধূ জানাচ্ছে – 'বলছিলাম অ্যাকবার মাদের বাড়ি ....'

২. পরোক্ষ উক্তিতে কথা বলতেই পছন্দ করে। যেমন – কারুর সঙ্গে আমার সং নেই।

৩. বাক্যের মধ্যে মেয়েরা বহুল প্রচলিত বাক্যাংশ প্রয়োগ করে। যেমন – ম্যা গো, আ মোলো যা, বাবারে বাবা, ধুৎ তেরিকা, খবিশ্ কোথাকার , দুর ছাই , দূর দূর , আঁই আঁই ইত্যাদি।

৪. বাক্যে সংশয়সূচক শব্দ প্রয়োগ করে। যেমন – মনে হয়, সম্ভবত, শুনছিলাম, কী জানি হয়তো ইত্যাদি।

৫. ছড়া এবং প্রবচনের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন –

ছড়া – সারাদিন গেল আলো ঝলে
আর সন্ধ্যের পোঁদে লম্প জালে।

প্রবাদ –

ক) যে মাগী রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে।

খ) রাজার ঘরের ছুরি এক বিয়ানে বুড়ি।

গ) চলতে জানে না আই ডাগর, রাস্তাকে বলে হ্যাটোর ড্যাগোর।

সুতরাং ভাষায় লিঙ্গগত বিভাজন অসম্ভব নয়। তবে পুরুষেরাও তাদের ভাষা নিচ্ছে । শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার ঘটলে ক্রমশ এই বিভাজনের রেখাটি অস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

✧ আন্তর্জাতিক বর্ণমালা ✧

✧ লিপি থেকে বর্ণ :

আদিমকালে সেই পাথরের যুগ থেকে শুরু করে মানুষ যুগ যুগ ধরে ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে যে চিহ্ন বা প্রতীক বা ভাষার মাধ্যম ব্যবহার করে তাকেই লিপি বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন লিপিমালা তৈরি হয়েছে। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সুকুমার সেন এই লিপি বিবর্তনের পাঁচটি ভাগের কথা বলেছেন। এগুলি হল -- (ক) ক্যুইপু অর্থাৎ গ্রন্থিলিখন, (খ) চিত্রলিপি ও ভাবলিপি, (গ) শব্দলিপি, (ঘ) অক্ষরলিপি এবং (ঙ) ধ্বনিলিপি। ডেভিড্ ডিরিঙ্গার তাঁর 'The Alphabets' গ্রন্থে লিপির আবিষ্কার এবং পৃথিবীর সব ভাষার লিপির ইতিহাস তৈরি করেছেন। মানুষের প্রচেষ্টার ফলেই 'ভোলাপ্যুক', 'এস্‌পেরান্তো' প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রচেষ্টার অগ্রগতিতে রোমিয় লিপি এবং আন্তর্জাতিক ধ্বনি লিপি বা বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছে।

✧ রোমিয় বর্ণমালা :

খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দিতে এট্রুস্কান বর্ণমালা থেকে রোমান বর্ণমালাব জন্ম। এই রোমান বা ল্যাটিন বর্ণমালা থেকেই আধুনিক রোমিয়লিপি বিকাশ লাভ করেছে। এই বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য আলাদা আলাদা লিপির ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় লিপি তৈরির আগে পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল রোমান লিপিতে তাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি ১৭৪৩ সালে লিসবন শহর থেকে ছাপিয়ে ছিলেন। আধুনিক যুগে প্রতি বর্ণীকরণের ভিত্তিতেই বাংলা থেকে রোমিয় লিপির রূপান্তরিত করা হয়। যেমন - 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' -এর রোমীয় লিপি হল — Rabîndranāth Ṭhākur কিন্তু রোমিয় লিপিতে উচ্চারণ অনুযায়ী রূপান্তর হল না তাই আন্তর্জাতিক ধ্বনি লিপির উৎপত্তি।

✧ রোমিয় বর্ণমালা ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার তুলনা :

(ক) রোমিয় বর্ণমালা থেকে নেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার বর্ণগুলি।

(খ) ইংরাজি ভাষা এখন যে লিপিতে লেখা হয় সেটিই হল রোমিয় লিপি। কিন্তু রোমিয় লিপি দিয়ে সব বর্ণ লেখা যায় না বলে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় কিছু গ্রিক বর্ণও ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) রোমিয় লিপিতে বর্ণান্তর করি। কিন্তু আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় বা IPA তে প্রকৃত উচ্চারণের উপর ভিত্তি করে IPA (International Phonetic Alphabets) তে রূপান্তরিত করা হয়। যেমন, 'চেয়ার'— রোমিয় বর্ণমালায়-(চ্ + এ + য় + আ + র্ + অ)

= ceyāra কিন্তু IPA তে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়– / ceear /

(ঘ) একইভাবে ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে রোমিয় বর্ণমালায় প্রথম বর্ণ ইংরাজি বর্ণের মতো ক্যাপিটেল লেটার হয়। কিন্তু IP A তে তা স্মল লেটার থাকে যেমন – রবীন্দ্রনাথ। রোমিয় বর্ণমালায় এটা হবে – (র্ + অ + ব্ + ঈ + ন্ + দ্ + র্ + অ + ন্ + আ + থ্) Rabîndranath, কিন্তু IPA তে এটি হবে – / robindronat[h]/

রোমিয় লিপি

বাংলা বর্ণ	রোমিয় লিপি	বাংলা বর্ণ	রোমিয় লিপি	বাংলা বর্ণ	রোমিয় লিপি
অ	a	ঝ্	jh	ল্	l
আ	ā	ঞ্	ñ	ব্	w / v
ই	i	ট্	ṭ	শ্	ṡ
ঈ	î	ঠ্	ṭh	ষ্	ṣ
উ	u	ড্	ḍ	স্	s
ঊ	ū	ঢ্	ḍh	হ্	h
ঋ	ṛ	ণ্	ṇ	ং	ṅ / ṁ
এ	e / ē	ত্	t	ঃ	h
ঐ	oi / ai	থ	th	ँ	n / ~
ও	o / ō	দ্	d	ড়	ṛ / ḍ / ɽ
ঔ	ou / au	ধ	dh	ঢ়	ṛh / ḍ / ɽh
ক্	k	ন্	n	য়	y
খ্	kh	প্	p		w
গ্	g	ফ্	ph	।	.
ঘ্	gh	ব্	b	,	,
ঙ্	ṅ	ভ্	bh	;	;
চ্	c	ম্	m	‘	‘
ছ্	ch	য্	y / j	’	’
জ্	j	র্	r	-	-
				?	?

✧ রোমিয় বর্ণমালায় রূপান্তর ✧

বাংলা ভাষাকে রোমিয় লিপিতে রূপান্তরিত করতে গেলে প্রথমেই শব্দগুলিকে বর্ণে বিভাজিত করতে হবে। যেমন – তন্ময় – ত্ + অ + ন্ + ম্ + অ + য় = Tanmoy

অনুরূপে—

চণ্ডীদাস	Candîdās
রামমোহন রায়	Rāmmohan Rāy
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	Îswarcandra Vidyāsāgar
মধুসূদন দত্ত	Madhusūdan Datta
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	Dēbendranāth Ṭhākur
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	Rabîndranāth Ṭhākur
বিভূতিভূষণ	Bibhūtibhūṣaṇ
জীবনানন্দ দাশ	Jîbanananda Dāś
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	Subhāṣ Mukhopādhyāy
রাজসিংহ	Rājsinha
কপালকুণ্ডলা	Kāpalkundal
গীতাঞ্জলি	Gîtānjali
গোরা	Gōrā
ঘরেবাইরে	Gharē bāirē
রক্তকরবী	Raktakarabî
ডাকঘর	Dākghar
দেনাপাওনা	Denāpāonā
পথের দাবী	Pather Dābî
পথের পাঁচালী	Pather P̃ācālî
পদ্মানদীর মাঝি	Padamānadîr Mājhi
গণদেবতা	Ganadēbatā
অন্তর্যলী যাত্রা	Antarjalî Jātrā
তিতাস একটি নদীর নাম	Titās ekti nadîr nām
সুবর্ণরেখা	Subarnarēkhā
পূর্বপশ্চিম	Pūrba-pascim
সাতকাহন	Sātkāhan

সত্য ক'রে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।

satya karē kahō morē hē baiṣñab kabi,
kōthā tumi pēyēchilē ēi prēmacchabi,
kōthā tumi śikhechilē ēi prēmagān
birahatāpita. heri kāhār nayañ,
Rādhikar aśru-ā̃nkhi paḍechila manē.

কাব্যের মধ্যে সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না, কঠিন হৃদয়ের কবি তাঁর নায়ক নায়িকার জন্য কত ক্ষয় প্রতিমা গড়িয়া গড়িয়া নির্মমচিত্তে বিসর্জন দেন। কিন্তু তিনি যেখানে কাব্যের প্রয়োজন বুঝিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলেন সেইখানেই কি তাহার সম্পূর্ণ শেষ হয় ?

kābyēr madhyē sakalēr samān adhikār thākite pārē nā. kaṭhin hṛidayēr kabi t̃ār nāyak nāyikār janya kato akhkhay pratimā gaḍiyā gaḍiyā nirmamacittē bisarjan dēn. kintu tini jekhānē kābyēr pryojan bujhiyā nihśeṣ kariyā phēlēn sēikhānēi ki tāhār sampūrna śeṣ hay ?

আমার নাম শ্রী বিনয় মজুমদার।
আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি।
āmār nām srî Binay majumdār.
āmi bardamān bisbabidyālaye poṛi.

✧ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা ✧

ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। এই ধ্বনির বাহক হল লিপি। একসময় ভাষায় ধ্বনি উচ্চারণের উপর ভি ত্তি করে লিপি তৈরি হয়, পরে ধ্বনি উচ্চারণ পৃথক হলেও লিপির পরিবর্তন সর্বদা সম্ভব হয় নি। তাই উচ্চারিত ভাষা ও লিপির মধ্যে ক্রমশ ব্যবধান বাড়তে থাকে। এর ফলে এক ভাষাভাষী মানুষ অন্যভাষা উচ্চারণ করতে গেলে সেই ভাষাভাষী মানুষদের মতো উচ্চারণ করতে পারে না। যেমন, কোন হিন্দিভাষী গায়ক বাংলা গান করতে গেলে তার উচ্চারণ সর্বদা মান্য চলতির মতো নাও হতে পারে। 'এখন আমার বেলা নাহি আর'- মান্য চলিত উচ্চারণে –'অ্যাখন আমার ব্যালা নাহি আর'। তাছাড়া একই ভাষার বর্ণ দিয়ে অন্য ভাষার বর্ণমালাকে যথাযথ প্রকাশ করা যায় না। যেমন বাংলা 'ত',' থ '-কে ইংরাজিতে t, th দিয়ে করলে উচ্চারণ দন্ত ধ্বনির পরিবর্তে মূর্ধন্য ধ্বনি হয়। কিংবা ইংরাজি 'a' ধ্বনি দিয়ে বাংলায় অ, আ, অ্যা, এ -ধ্বনি প্রকাশ করা হয়। এই সূত্রে সত্যজিৎ রায় 'সত্যজিৎ রে' হয়ে পড়েন।

পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষারই নিজস্ব লিপি আছে। মানুষের পক্ষে একসঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত ভাষা তথা লিপিকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অথচ বিভিন্ন ভাষাকে আয়ত্ব করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। এই লক্ষে কৃত্রিম ভাবে সার্বজনীন লিপি সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলেই পাওয়া গেছে 'এস্‌পেরান্ত ' নামক বিশ্বভাষা। এই চেষ্টার অগ্রগতিতে রোমান লিপির (Roman Scripts) উৎপত্তি। কিন্তু রোমান লিপি বানান ভিত্তিক হওয়ায় উচ্চারণগত পার্থক্যটি থেকেই গেল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা International Phonetic Alphabets বা I.P.A- এর সৃষ্টি।

ফ্রান্সে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ধ্বনিবিজ্ঞান -শিক্ষক-সংস্থা ' The Phonetic Teacher's Association প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই সংস্থা থেকেই আন্তর্জাতিক ধ্বনি সংস্থা ' L' Association Phonetique Internationale ' গঠিত হয় এবং তাদের দ্বারা ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা International Phonetic Alphabets -এর পূর্ণাঙ্গ রূপ সৃষ্টি হয়। এই লিপি তৈরিতে রোমান বর্ণমালাকে কিছু কিছু পরিবর্তিত করে লেখা হয়েছে। কিছু গ্রিক বর্ণ নেওয়া হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য

সম্পর্কে বলা হয়েছে —

> One of the original objectives of this organisation was the creation of an alphabet which would have a distinctive symbol for every sound in human speech, and which would supplant the chaos of notations, then in use, by one internationally recognised standard.

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা প্রথম প্রকাশের সময় সমিতি তাদের লিফলেটে এই বর্ণমালা ব্যবহার সম্পর্কে কতগুলি দিক নির্দেশ করেছিল। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী-

ক. আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা রোমিয় অক্ষরে প্রতিস্থাপিত।

খ. প্রয়োগমূলক ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে বর্ণমালা গঠিত।

গ. কোন ভাষা শিক্ষায় অন্য ভাষাভাষীদের দ্বারা সেই অপরিচিত ভাষার উচ্চারণভঙ্গি অনায়াসে আয়ত্তীকরণ সম্ভব।

ঘ. যে ভাষার লিখিত রূপ নেই, সেই ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণ করে বর্ণমালার সাহায্যে লিখিত রূপ দেওয়া সম্ভব।

ঙ. অসংখ্য প্রতীক ও চিহ্নের সাহায্যে কোন ভাষার ধ্বনির বিভিন্ন ধারিক দিক সূক্ষ্মভাবে নির্দেশিত।

চ. ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালা প্রাথমিকভাবে সংযুক্ত পাঠ লেখার কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। বর্ণমালার আকার গঠনে প্রত্যেকটি বর্ণমালার ধ্বনিগত দিকের উপযোগী দিক ছাড়াও মনস্তত্ত্বীয় ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উদ্দেশ্যের দিক লক্ষ করে গঠিত।

ছ. বর্ণমালার গঠন ও ব্যবহার নিম্নলিখিত আদর্শের উপর উপস্থাপিত ঃ

অ. যখন কোন ভাষার দুটো রূপমূল দুটো ধ্বনি একটা রূপমূল থেকে অন্য রূপমূলকে পার্থক্য করার জন্যে ব্যবহৃত হয়, তখন ধ্বনি দুটো কোন রকম বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন ছাড়াই গঠিত। এই উদ্দেশ্য সাধারণভাবে রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করলেও যেখানে রোমান বর্ণমালা অনুপস্থিত, যেখানে সেখানে ধ্বনিত প্রতিরূপ অন্যভাবে নির্মিত হয়েছে।

আ. যখন কোন ভাষার দুটো ধ্বনি শ্রুতিগত দিক থেকে অত্যন্ত কাছাকাছি এবং রূপমূলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির ক্ষমতার অভাব, সেখানে ধ্বনি

দুটো একই বর্ণমালার সাহায্যে নির্দেশিত। সঙ্কীর্ণ প্রতিলিপিতে উক্ত ধ্বনি দুটো স্বতন্ত্র বর্ণমালা বা বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত।

ই. অ-রোমান বর্ণমালা সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্তর্ভূক্ত। সমিতি সেই শ্রেণিব বর্ণমালাই অনুমোদন করেছেন, যেগুলো অন্য বর্ণমালার সঙ্গে সাযুজ্যসাধন করেছে।

ঈ. ধ্বনি ব্যবহারের সমস্ত দিক বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন দ্বাবা নির্দেশ কবা সম্ভব নয় বলে সমিতি শুধুমাত্র ধ্বনিদৈর্ঘ্য, স্বরাঘাত, স্বরতবঙ্গ, মূলধ্বনিব বিশেষ সদস্য প্রভৃতি দিকের ওপর লক্ষ রাখা হয়েছে।

উ. কোন ভাষার ধ্বনিমালা ব্যবহারের দুটো মৌল ধ্বনিতত্ত্বীয় আদর্শেব প্রতি লক্ষ রাখা বাঞ্ছনীয় ; এর মধ্যে প্রথমটাই হল মূলধ্বনিতত্ত্ব এবং দ্বিতীযটা হল স্বরধ্বনিতত্ত্ব। ০

সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত লিফটের স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির জন্যে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত, সে সম্পর্কে উদাহরণের সাহায্যে ধ্বনিগত বিভিন্ন দিক নির্দেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধ্বনির পাশাপাশি বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন, ধ্বনিদৈর্ঘ্য ও স্বরাঘাতের জন্যে ব্যবহৃত চিহ্নে বিভিন্নদিক নির্দেশিত।

সারা পৃথিবীর মানুষ অবশ্য I.P.A -কে আন্তর্জতিক বর্ণমালা বলে মেনে নেন নি। আমেরিকার ধ্বনি বিজ্ঞানিরা যে বর্ণমালা ব্যবহার করেছেন লণ্ডন স্কুলের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। আসলে আমেরিকানরা আন্তর্জাতিক ধ্বনি লিপির নীতি অপেক্ষা ব্যবহারিক সুবিধার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা ধ্বনিলিপি বা Phonetic transcription অপেক্ষা ধ্বনিতা লিপি বা Phonemic transcription -কে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় তাঁদের ব্যবহৃত লিপি আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির অনুরূপ নয়। এ সম্পর্কে গ্লিসন বলেছেন –

> From a purely scientific point of view this problem is trivial. Symbols can be assigned arbitrarily. Some lin guists have certainly exploited this liberty too freely.

তবে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির পরিবর্তন ঘটতেই পারে, কারণ বিভিন্ন ভাষার স্বনিম বিশ্লেষণে নতুন ধ্বনি যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি লিপির সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। লিপ্যন্তর দুই ভাবে হয় –

০ কালাম মনজুর মোরশেদের আধুনিক ভাষাতত্ত্ব থেকে নেওয়া

১) ধ্বনিলিপি বা Phonetic transcription বা সূক্ষ্ম লিপ্যন্তর ঃ

এক্ষেত্রে ধ্বনির যথাযথ রূপ দেখানো হয়। যেমন – ইংরাজিতে C*a* t; ইংরাজি উচ্চারণ 'খ্যাট' তাই ধ্বনিলিপি 'K^{h}æt'।

২) স্বনিম বা ধ্বনিতা লিপি বা Phonemic transcription বা স্থূল লিপ্যন্তর ঃ

এক্ষেত্রে ধ্বনির এক টি মাত্র রূপ ব্যবহৃত হয়। সেই ভাবে লিপ্যন্তর করা হয়। যেমন ইংরাজি 'C*a* t' শব্দ ধ্বনিতা লিপি অনুযায়ী 'Kæt'।

লিপ্যন্তরের এই শ্রেণিবিভাগকে ভিন্ন নামে সরল ও জটিল লিপ্যন্তর বলে।

১) **সরল লিপ্যন্তর ঃ**

প্রতীক ছাড়া কেবলমাত্র বর্ণ ব্যবহার করে এই ধরণের লিপ্যন্তর করা হয়। যেমন, যাই– jʒai

২) **জটিল লিপ্যন্তর ঃ**

এক্ষেত্রে প্রতীক এবং বর্ণ উভয়ই ব্যবহার করে লিপ্যন্তর করা হয়। যেমন, যাই– jʒa̯i

এছাড়া একমাত্রিক ও বহু মাত্রিক লিপ্যন্তর বিভাগ আছে। একমাত্রিকতার ক্ষেত্রে লিপিটিতে অন্যকিছু যোগ করতে হয় না। যেমন – আ = a ; অন্যদিকে বহুমাত্রিক লিপ্যন্তরে একটার সঙ্গে আর একটার প্রতীক যোগ করতে হয়। যেমন, জ– jʒ

Inclusive ও Exclusive বিভাজনের ক্ষেত্রে – সব উচ্চারণ বৈচিত্র্য না মনে রেখে শুধু (মান্য চলিতকে বাদ দিয়ে) নিজের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন লিপিবদ্ধ করে তখন Exclusive লিপ্যন্তর এবং যখন মান্য চলিতের সাধারণ উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে লিপিবদ্ধ করা হয় তখন Inclusive লিপ্যন্তর হয়।

ব্যবহারিক জটিলতার জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই স্বনিম লিপি বা Phonemic Script- কে ব্যবহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে লণ্ডনের – 'International Phonetic Association'-এর ভূতপূর্ব সভাপতি এবং বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'A Bengali Phonetic Readers' গ্রন্থে লিখেছেন–

> .... But it is not necessary in phonetic writing to have separate symbols for each sound, since many of these sounds occur only is special positions in corrected speech and group themselves together with other sounds not occurring in those positions as their variants ..... It is generally necessary to have phonetic symbols for the phoneme only.

তাই সাধারণভাবে ‘ স্বনিমীয় লিপি’ পদ্ধতিকেই গ্রহণ করা হয়।

লণ্ডন গোষ্ঠীর নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে সংশোধন ও পরিমার্জনের পর **১৯২৫** সালে যে রূপটি প্রকাশিত হয়েছিল সেই নির্দেশ এবং সুনীতি বাবুর নির্দেশ অনুযায়ী বাংলা লিপিগুলিকে আন্তর্জাতিক লিপিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবে মান্য চলিত ভাষাভাষী বাঙালির উচ্চারণের উপর ভিত্তি করে, বিদ্যাসাগরিয় বর্ণমালার অনেকগুলি বর্ণকে গ্রহণ করা হয় নি, কারণ বিদ্যাসাগরের বর্ণমালার সবগুলি বর্তমানে বাঙালি উচ্চারণ করে না। যেমন, ‘ই’ এবং ‘ঈ’ এই দুই বর্ণের একটি ‘ই’-এর কেবলমাত্র উচ্চারণ হয়। তাই ‘ঈ’-এর জন্য আলাদা কোন লিপি ব্যবহার করা হয় নি। কিংবা ‘জ’ এবং ‘য’ এদের মধ্যে যে কোন একটিকে নিলেই চলে। উচ্চারণ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলা মৌলিক স্বরবর্ণের সংখ্যা সাতটি ও যৌগিক স্বরের সংখ্যা সতেরটি । আসলে লিপি না থাকলেও আমরা আরও অনেক যৌগিক স্বর উচ্চারণ করি। ব্যঞ্জনের সংখ্যাও কমে গেছে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা তাঁদের মূল্যবান গ্রন্থে যে সমস্ত I.P.A. লিপি ব্যবহার করেছেন তার সবগুলির হুবহু মিল নেই । যেমন ডঃ রামেশ্বর শ’ বাংলা ‘ চ ’ বর্ণের জন্য ‘ c ’ লিপি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অনেকেই মনে করেন ‘ চ ’ হল তালব্য স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন তাই এর আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপিটি হবে ‘cʃ ’ । যে বর্ণগুলির লিপি নিয়ে সমস্যা হয়েছে সেগুলির দুই লিপিই পাশাপাশি দেখানো হল–

বাংলা লিপি	প্রথমরূপ	দ্বিতীয়রূপ	তৃতীয়রূপ
আ	a	ɑ	
চ	c	cʃ	
ছ	c^{h}	cʃ^{h}	
জ	ɟ	ɟʒ	jʒ
ঝ	ɟ^{h}	ɟʒ^{h}	jʒ^{h} / jɦ
স	ʃ	S	
য়	y	ĕ	

ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের লিপ্যন্তরে অবশ্যই যে কোন একটি চিহ্নকে ব্যবহার করবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপে যে চিহ্নগুলিকে দেখানো হয়েছে সেগুলি আধুনিক মতবাদ । তবে এটা মনে রাখতে হবে যে **১৯২৫** সালের পর আর কোন লিপি সংস্কার হয়নি। বাংলা বর্ণের যেমন সংশোধন ও পরিমার্জন দরকার তেমনি আন্তর্জাতিক বর্ণমালার সঙ্গে সংগতি রেখে লিপিগুলিরও সংশোধন প্রয়োজন।

স্বরলিপি –

মৌলিক –

বাংলা লিপি		আন্তর্জাতিক লিপি /I.P.A
ই	=	i
এ	=	e
অ্যা	=	æ
আ	=	ɑ/a
অ	=	ɔ
ও	=	o
উ	=	u

ঈ, ঊ, ঋ, ৯ বাংলা উচ্চারণে নেই তাই ই = ঈ, উ = ঊ, ঋ = রি, ৯ = লি, হয়েছে।।

যৌগিক –

বাংলা লিপি		আন্তর্জাতিক লিপি /I.P.A
ঐ	=	o̯i / oi̯
ঔ	=	o̯ŭ / ou̯

এছাড়া আরও কিছু যৌগিক স্বর (দ্বিস্বর) – আব্দুল হাই এর মতে ৩১ টি, কালাম মনজুর -এর মতে ২৯ টি, সুনীতি বাবুর মতে ২৫ টি) বাঙালি উচ্চারণ করে । যেমন – আই = আ + ই (ai), আও = আ + ও (ao) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন লিপি –

বাংলা লিপি		আন্তর্জাতিক লিপি /I.P.A	বাং লিপি		I.P.A	বাং লিপি		I.P.A
ক্	=	k	প্	=	p	ড়্	=	ɽ
খ্	=	kʰ	ফ্	=	pʰ	ঢ়্	=	ɽʰ
গ্	=	g	ব্	=	b	য়্	=	ĕ / y
ঘ্	=	gʰ/gɦ	ভ্	=	bʰ/bɦ	ৎ	=	t
ঙ্	=	ŋ				ং	=	ŋ
চ্	=	cʃ / c	ম্	=	m	ঃ	=	h
ছ্	=	cʃʰ/ cʰ	র্	=	r	ঁ	=	~
জ্	=	ɟʒ/ɟ/ jʒ						
ঝ্	=	ɟʒʰ/ ɟʰ/ jʒʰ/ jɦ	ল্	=	l			
ট্	=	ʈ	শ্	=	ʃ			
ঠ্	=	ʈʰ	ষ্	=	ʃ			
ড্	=	ɖ						
ঢ্	=	ɖʰ / ɖɦ	স্	=	S / ʃ			
ত্	=	t	হ্	=	h			
থ্	=	tʰ						
দ্	=	d						
ধ্	=	dʰ / dɦ						
ন্	=	n						

লিপ্যন্তর হল পুরোপুরি উচ্চারণ নির্ভর। বাংলা ভাষা বিভিন্ন উপভাষা অঞ্চলে বিভক্ত। প্রধানত পাঁচটি উপভাষা অঞ্চলে যে কোটি কোটি মানুষ আছেন তাদের ভাষা উচ্চারণে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তবে কোলকাতা,হাওড়া,হুগলি,বর্ধমান,নদীয়া জুড়ে মধ্যবর্তী একটা অঞ্চলের মানুষ আদর্শ চলিত বাংলায় কথা বলে। তাদের উচ্চারণের উপর গুরুত্ব দিয়ে লিপ্যন্তর করা হয়েছে। যেমন, 'সাগর' শব্দটির রাঢ়ি উচ্চারণ হল 'সাগোর'। এক্ষেত্রে আমাদেরকে লিপ্যন্তরে উচ্চারিত রূপটিকেই গ্রহন করতে হবে।

কিভাবে অভ্যাস করবো

প্রথম ধাপে কেবলমাত্র ধ্বনির রূপান্তরগুলি অভ্যাস করবো শুধুমাত্র বাংলা লিপির স্থলে ***I.P.A*** লিপিগুলি। যেমন,

শব্দ	*উচ্চারিত রূপ*	*বর্ণ বিভাজন*	***I.P.A***
আম	আম্	আ+ ম্	*a*m

এবার আমরা বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ থেকে শব্দগুলো লক্ষ করবো ঃ –

শব্দ	*উচ্চারিত রূপ*	*বর্ণ বিভাজন*	***I.P.A***
কর	কর্	ক্ + অ + র্	kɔr
জল	জল্	জ্ + অ + ল্	ɟʒɔl
অচল	অচল্	অ + চ্ + অ + ল্	ɔcʃɔl
আদর	আদোর্	আ + দ্ + ও + র্	*a*dor
ইতর	ইতোর্	ই + ত্ + ও + র্	itor
গরল	গরোল্	গ্ + অ + র্ + ও + ল্	gɔrol
লবণ	লবোণ্	ল্ + অ + ব্ + ও + ণ্	lɔ bon
সরল	সরোল্	স্ + অ + র্ + ও + ল্	ʃɔ rol

আ-কার – যোগ (ম + আ = মা)

গান	গান্	গ্ + আ + ন্	gan
নাম	নাম্	ন্ + আ + ম্	nam
মাস	মাস্	ম্ + আ + স্	maʃ
কথা	কথা	ক্ + অ + থ্ + আ	kɔt^{h}a
তারা	তারা	ত্ + আ + র্ + আ	tara
বালক	বালোক্	ব্ + আ + ল্ + ও + ক্	balok
সাহস	সাহোস্	স্ + আ + হ্ + ও + স্	ʃahoʃ
অগাধ	অগাদ্	অ + গ্ + আ + দ্	ɔgad

ই-কার – যোগ (ক + ই = কি)

মণি	মোণি	ম্ + ও + ণ্ + ই	moni
তিন	তিন্	ত্ + ই + ন্	tin
দিন	দিন্	দ্ + ই + ন্	din
যদি	যোদি	য্ + ও + দ্ + ই	ɟʒodi
লিপি	লিপি	ল্ + ই + প + ই	lipi
অতিথি	ওতিথি	ও + ত্ + ই + থ্ + ই	otit^{h}i
কঠিন	কোঠিন্	ক্ + ও + ঠ্ + ই + ন্	koʈ^{h}in
অশনি	অশোনি	অ + শ্ + ও + ন্ + ই	ɔʃoni
গণিত	গোনিত্	গ্ + ও + ন্ + ই + ত্	gonit

ঈ-কার – যোগ (জ + ঈ = জী ; কিন্তু I.P.A জন্য ঈ -কার, ই-কার হবে)

নীল	নিল্	ন্ + ই + ল্	nil
ধনী	ধোনি	ধ্ + ও + ন্ + ই	d^{h}oni
শশী	শোশি	শ্ + ও + শ্ + ই	ʃoʃi

নদী	নোদি	ন্ + ও + দ্ + ই	nodi
শরীর	শোরির্	শ্ + ও + র্ + ই + র্	ʃorir
রজনী	রজোনি	র্ + অ + জ্ + ও + ন্ + ই	rɔɟʒ oni
পদবী	পদোবী	প্ + অ + দ্ + ও + ব্ + ই	pɔ dobi

উ-কার – যোগে **(ক + উ = কু)**

মুখ	মুক্	ম্ + উ + ক্	muk
কুল	কুল্	ক্ + উ + ল্	kul
মধু	মোধু	ম্ + ও + ধ্ + উ	mod^{h}u
সুখ	সুক্	স্ + উ + ক্	ʃuk
কুশল	কুশল্	ক্+ উ + শ্ + অ + ল্	kuʃɔl
চতুর	চোতুর্	চ্ + ও + ত্ + উ + র্	cʃotur
পুতুল	পুতুল্	প্ + উ + ত্ + উ + ল্	putul

ঊ - কার – যোগে **(দ + ঊ = দূ ; কিন্তু I.P.A জন্য ঊ - কার, উ - কার হবে)**

ধূপ	ধুপ্	ধ্ + উ + প্	d^{h}up
দূর	দুর্	দ্ + উ + র্	dur
ভূত	ভুত্	ভ্ + উ + ত্	b^{h}ut
নূতন	নুতন্	ন্ + উ + ত্ + অ + ন্	nutɔn
পূরণ	পুরন্	প্ + উ + র্ + অ + ন্	purɔn
মসূর	মুসুর	ম্ + উ + স্ + উ + র্	muʃur

ঋ - কার – যোগে **(ক + ঋ = কৃ)**

কৃশ	ক্রিশ	ক্ + র্ + ই + শ্ + অ	kriʃɔ
ঘৃত	ঘ্রিত	ঘ্ + র্ + ই + ত্ + অ	g^{h}ritɔ
কৃপণ	কিরিপোন্	ক্ + ই + র্ + ই + প্ + ও + ন্	kripon

আবৃত	আব্‌ব্রিতো	আ+ ব্ + ব্ + র্ + ই + ত্ + ও	abbrito
মসৃণ	মোস্‌স্রিন্	ম্ + ও + স্+ স্ + র্ + ই + ন্	mossrin

এ-কার যোগ (ল + এ = লে)

মেঘ	মেগ্	ম্+এ+গ্	meg
দেশ	দেশ্	দ্+এ+শ্	deʃ
শেষ	শেষ্	শ্+এ+ষ্	ʃeʃ
কেবল	কেবোল্	ক্+এ+ব্+ও + ল্	kebol
লেখক	লেখক্	ল্+এ+খ্+অ +ক্	lekʰɔk
বেতন	বেতোন্	ব্+এ+ত্+ও+ন্	beton
অনেক	অনেক্	অ+ন্+এ+ক্	ɔnek
কয়েক	কয়েক্	ক্+অ+য়্+এ+ক্	kɔĕek
আদেশ	আদেশ্	আ+দ্+এ+শ্	adeʃ

ঐ-কার যোগে (ক + ঐ =কৈ)

তৈল	তৈল	ত্+ঐ+ল্+অ	to͜ilɔ
দৈব	দৈব	দ্+ঐ+ব্+অ	do͜ibɔ
বৈধ	বৈধ	ব্+ঐ+ধ্+অ	bo͜idʰɔ
শৈশব	শৈশব্	শ্+ঐ+শ্ +অ+ব্	ʃo͜iʃɔb
জনৈক	জনৈক	জ্+অ+ন্+ঐ +ক্+অ	ɟʒɔno͜ikɔ
ভৈরব	ভৈরব্	ভ্+ঐ+র্+অ +ব্	bʰo͜irɔb
অবৈধ	অবৈধ	অ+ব্+ঐ+ধ্+ও	ɔbo͜idʰo

ও-কার যোগে (গ + ও = গো)

কোণ	কোন্	ক্+ও+ন্	kon
চোর	চোর্	চ্+ও+র্	cʃor
বোধ	বোদ্	ব্+ও+ধ্	bodʰ
রোগ	রোগ্	র্+ও+গ্	rog

শোক	শোক্	শ্+ও+ক্	ʃok
দোষ	দোশ্	দ্+ও+শ্	doʃ
লোভ	লোভ্	ল্+ও+ভ্	lob^h
গোপন	গোপোন্	গ্+ও+প্+ও+ন্	gopon
রোদন	রোদোন্	র্+ও+দ্+ও+ন্	rodon
আমোদ	আমোদ্	আ+ম্+ও+দ্	*a* mod
কঠোর	কোঠোর্	ক্+ও+ঠ্+ও+র্	koʈ^{h}or
আলোক	আলোক্	আ+ল্+ও+ক্	*a*lok

ঔ-কার যোগে (ম + ঔ =মৌ)

গৌর	গৌর্	গ্+ঔ+র্	go͜ur
লৌহ	লৌহ্	ল্+ঔ+হ্ + অ	lo͜uhɔ
গৌরব	গৌরব্	গ্+ঔ+র্+অ+ব্	go͜urɔb
যৌবন	যৌবন্	য্+ঔ+ব্+ অ+ন্	ɟʒ o͜ubɔn
সৌরভ	সৌরভ্	স্+ঔ+র্+ অ+ভ্	so͜urɔb^h

দুই অক্ষরের মিশ্র শব্দ

পূজা	পুজা	প্+উ+জ্+আ	puɟʒ*a*
নৌকা	নৌকা	ন্+ঔ+ক্+আ	nouk*a*
ভূমি	ভুমি	ভ্+উ+ম্+ই	b^{h}umi
খেলা	খ্যালা	খ্+অ্যা+ল্+আ	k^{h}æl*a*
রীতি	রিতি	র্+ই+ত্+ই	riti
বীণা	বিনা	ব্+ই+ন্+আ	bin*a*

দুই ও তিন অক্ষরের মিশ্র শব্দ

বিনাশ	বিনাশ্	ব্+ই+ন্+আ+শ্	bin*a*ʃ
একাকী	অ্যাকাকি	অ্যা+ক্+আ+ক্+ই	æk*a*ki

পৃথিবী	প্রিথিবি	প্ র্ ই থ্ ই ব্ ই	prit^{h}ibi
নিষেধ	নিশেদ্	ন্ ই শ্ এ দ্	niʃed

তিন ও চার অক্ষরের মিশ্র শব্দ

অবিচার	অবিচার্	অ ব্ ই চ্ আ র্	ɔbicʃar
পরিণাম	পোরিনাম্	প্ ও র্ ই ন্ আ ম্	porinam
অনুমান	ওনুমান্	ও ন্ উ ম্ আ ন্	onuman
পরিতোষ	পোরিতোশ্	প্ ও র্ ই ত্ ও শ্	poritoʃ
আলোচনা	আলোচনা	আ ল্ ও চ্ ও ন্ আ	alocʃona
পরিবার	পোরিবার্	প্ ও র্ ই ব্ আ র্	poribar

চার ও পাঁচ অক্ষরের মিশ্র শব্দ

পরিবেশন	পোরিবেশন্	প্ ও র্ ই ব্ এ শ্ অ ন্	poribeʃɔn
নিরপরাধ	নিরপরাধ্	ন্ ই র্ অ প্ অ র্ আ ধ্	nirɔpɔrad^{h}
অনুমোদন	ওনুমোদোন্	ও ন্ উ ম্ ও দ্ ও ন্	onumodon
নিরভিমান	নিরোভিমান্	ন্ ই র্ ও ভ্ ই ম্ আ ন্	nirob^{h}iman
পারলোকিক	পারোলৌকিক	প্ আ র্ ও ল্ ঔ ক্ ই ক্	paroloukik

ং- যোগে শব্দ (ব + ং = বং)

অংশ	অংশো	অ ঙ শ্ ও	ɔŋʃo
সিংহ	সিংহো	স্ ই ঙ্ হ্ ও	siŋho
বংশ	বংশো	ব্ ঙ্ শ্ ও	bŋʃo
মাংস	মাংসো	ম্ আ ঙ্ স্ ও	maŋso
সংসার	সংসার্	স্ অ ঙ্ স্ আ র্	sɔŋsar
সংবাদ	সংবাদ্	স্ অ ঙ্ ব্ আ দ্	sɔŋbad

ঃ - যোগে শব্দ (আ + ঃ = আঃ)

দুঃখ	দুক্‌খো	দ্ উ ক্ খ্ ও	dukkʰo
নিঃশেষ	নিশ্‌শেশ্	ন্ ই শ্ শ্ এ শ্	niʃʃeʃ
দুঃসময়	দুস্‌সময়	দ্ উ স্ স্ অ ম্ অ য়	dussomɔĕ
নিঃসহায়	নিস্‌সহায়	ন্ ই স্ স্ অ হ্ আ য়	nissɔhaĕ

ঁ-যোগে শব্দ (চ + আঁ = চাঁ)

চাঁদ	চাঁদ্	চ্ আঁ দ্	cʃɑ̃d
পাঁচ	পাঁচ্	প্ আঁ চ্	pɑ̃cʃ
কাঁটা	কাঁটা	ক্ আঁ ট্ আ	kɑ̃ʈɑ
ইঁদুর	ইঁদুর্	ইঁ দ্ উ র্	ĩdur
তেঁতুল	তেতুঁল্	ত্ এ ত্ উঁ ল্	tetũl

এবার আমরা ছোট ছোট বাংলা বাক্যের লিপি পরিবর্তন করবো।

বাংলা বাক্য	উচ্চারিত রূপ	লিপ্যন্তর (I.P.A)
লাল ফুল।	লাল্ ফুল্।	lɑl pʰul
ভাল জল।	ভালো জল্।	bʰɑlo jʒɔl
আমি ভাত খাই।	আমি ভাত্ খাই।	ɑmi bʰɑt kʰɑi̯.

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেবল মাত্র বাংলা লিপির পরিবর্তেআন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা I.P.A কেমন হবে তা দেখিয়েছি। কিন্তু লিপ্যন্তর করতে গেলে কতগুলি নিয়মকে মেনে চলা উচিত।

লিপ্যন্তরিকরণের কয়েকটি নিয়ম ঃ

ক. প্রতিটি স্বতন্ত্র স্বনিমের জন্য একটি মাত্র সংকেত চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। যেমন, 'রাম্' শব্দের তিনটি স্বতন্ত্র স্বনিম হল 'র্', 'আ', 'ম্'-এর লিপ্যন্তর

rɑm

খ. লিপ্যন্তরের পর সমগ্র অংশটিকে দুটি তির্যক রেখায় '/ /' ঘিরে দিতে হবে।

যেমন, রমজান – / rɔmɟʒan / । এক্ষেত্রে শব্দ, শব্দগুচ্ছ, পদ, পদগুচ্ছ, বাক্য, বাক্যাংশ, স্তবক, অনুচ্ছেদ যাই থাকুক না কেন, সমগ্র অংশটি লিপ্যন্তরের পর ঐ তির্যক রেখা ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু উদ্ধৃতি বাক্যের সঙ্গে বক্তা বা লেখকের নাম আলাদা করে দেওয়া থাকলে, সেক্ষেত্রে উদ্ধৃতি বাক্যের জন্য দুটি তির্যক রেখা এবং বক্তা বা লেখকের জন্য আলাদা করে দুটি তির্যক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।

যেমন, "সবার উপরে মানুষ সত্য"

—চণ্ডীদাস

I.P.A– / "sɔbar opore manuʃ sotto"/

– / cʃondidas /

গ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের কোন ব্যক্তি নাম ও স্থান নামের আগে তারকা চিহ্ন * দিতে হবে। এক্ষেত্রে ক্যাপিটেল লেটার দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই।

যেমন, কলকাতা– * / kolkata /

ঘ. যুক্তস্বর এবং যুক্তব্যঞ্জনের শেষ স্বর ও ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ ক্ষীণ হয়। এক্ষেত্রে ঐ ক্ষীণ লিপির উপরে / ˘ / চিহ্নটি দিতে হবে।

যেমন, কণ্ঠ– / kɔnʈ̆ʰo /

ঙ. যৌগিক স্বরধ্বনির জন্য স্বরবর্ণ দুটির তলায় তলবেষ্ঠনি /‿/ দিতে হবে।

যেমন, খাও– / kʰa͜o /

চ. আনুনাসিকতা বোঝাতে ব্যঞ্জন সংলগ্ন স্বরবর্ণের উপর / ˜ / চিহ্নটি দিতে হবে।

যেমন, চাঁদ– / cʃãd /

লিপ্যন্তরের জন্য আরও কতকগুলি নিয়ম মনে রাখতে হবে—

ক. বাংলা উচ্চারণে 'ই' এবং 'ঈ' তফাৎ নেই এক্ষেত্রে একটি মাত্র লিপি ' i ' । অনুরূপ ভাবে 'উ' এবং 'ঊ' এর জন্য একটি লিপি 'u' ব্যবহার করা হয়।

খ. বাংলা উচ্চারণে নূতন একটি স্বর 'অ্যা' উচ্চারিত হয়। এর জন্য ' æ ' লিপি ব্যবহার করা হয়।

গ. বাংলায় 'ঋ' এবং 'ঌ' এর ব্যবহার নেই। ধ্বনিদুটি যথাক্রমে হয়েছে 'রি' এবং 'লি'।

ঘ. দীর্ঘস্বর সর্বদা হ্রস্বস্বরে পরিণত হবে।

ঙ. 'ঙ' এবং 'ং' একইভাবে উচ্চারিত হয়।

চ. 'জ' এবং 'য' একইভাবে উচ্চারিত হয়।

ছ. বাংলায় 'ঞ'-এর উচ্চারণ নেই। কখনো বা এটি আনুনাসিকতায় মিশে গেছে। তাই বর্ণটির জন্য ব্যঞ্জন পরবর্তী স্বরের মাথায় /~/ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

জ. 'ণ'-এর উচ্চারণ 'ন'-তে পরিণত।

ঝ 'শ', 'ষ' এবং 'স' এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ 'শ'। তবে কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন 'স'-এর উচ্চারণ পার্থক্য রাঢ়ি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আছে। তাই 'স'-এর জন্য আলাদা লিপি ' s ' ব্যবহার করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সমস্ত নিয়মগুলিকে অনুসরণ করে কিছু বাংলা শব্দের লিপ্যন্তর করা হল —

বাংলা শব্দ	উচ্চারিত রূপ	I.P.A লিপি
রবীন্দ্রনাথ	রোবিন্‌দ্রোনাথ্	robindronɑt^h
বিবেকানন্দ	বিবেকানন্‌দো	bibekɑnɔndo
ভারতবর্ষ	ভারোত্‌বর্‌শো	b^{h}ɑrotbɔrʃo
কলকাতা	কোল্‌কাতা	kolkɑtɑ
মবারক	মোবারক্	mobɑrɔk
বিদ্যাসাগর	বিদ্‌দাসাগোর্	biddɑsɑgor
দিল্লি	দিল্‌লি	dilli
বিপ্লব	বিপ্‌প্লব্	bipplɔb
স্বীকার	সিকার্	sikɑr
শুক্রবার	শুক্‌ক্রোবার্	ʃukkrobɑr

ভাষাতত্ত্ব	ভাশাতত্‌তো	bʰɑʃɑtɔtto
বর্ধমান	বর্‌ধোমান্‌	bɔrdʰomɑn
আনন্দবাজার	আনোন্‌দোবাজার্‌	ɑnondobɑɟʒɑr
বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্‌শোবিদ্‌দালয়্‌	biʃʃobiddɑlɔĕ
প্রবোধচন্দ্রিকা	প্রোবোদ্‌চন্‌দ্রিকা	probodcʃɔndrikɑ
চক্রবর্তী	চক্‌ক্রোবোর্‌তি	cʃɔkroborti
মুখোপাধ্যায়	মুখোপাদ্‌ধায়্‌	mukʰopɑddʰɑĕ
ভট্টাচার্য	ভট্‌টাচার্‌জো	bʰɔʈʈɑcʃɑrɟʒo
বিদ্যালঙ্কার	বিদ্‌দালঙ্‌কার্‌	biddɑlɔŋkɑr
ধ্বনিতত্ত্ব	ধোনিতত্‌তো	dʰonitɔtto
অভিশ্রুতি	ওভিশ্‌শ্রুতি	obʰiʃʃruti
তত্ত্ববোধিনী	তত্‌তোবোধিনি	tɔttobodʰini
নাসিক্যিভবন	নাসিক্‌কিভবোন্‌	nɑsikkibʰɔbon
মনসামঙ্গল	মোনোসামোঙ্গল্‌	monosɑmongol
চন্দ্রশেখর	চন্‌দ্রোশেখর্‌	cʃɔndroʃekʰɔr
সাহিত্য	সাহিত্‌তো	sɑhitto
মিঠু আচার্য	মিঠু আচার্‌জো	miʈʰu ɑcʃɑrɟʒo
মনীষা চৌধুরী	মোনিশা চউধুরি	moniʃɑ cʃudʰuri
তন্দ্রা ব্যানার্জী	তন্‌দ্রা ব্যানারজি	tɔndrɑ bænɑrɟʒi
অচিন্ত্য	অচিন্‌তো	ɔcʃinto
সুভাষ	সুভাশ্‌	subʰɑʃ
ইন্দ্রানী	ইন্‌দ্রানি	indrɑni
রঞ্জন	রন্‌জোন্‌	rɔnɟʒon
আল্পনা	আল্‌পোনা	ɑlponɑ
রাজশ্রী	রাজশ্‌শ্রি	rɑɟʒoʃʃri
সুকান্ত	সুকান্‌তো	sukɑnto
রাজনীতি	রাজ্‌নিতি	rɑɟʒniti
অন্ধকার	অন্‌ধোকার্‌	ɔndʰokɑr
বিজ্ঞান	বিগগ্যান্‌	biggæn
সঙ্গীতা	সংগিতা	sɔŋgitɑ
বাংলাদেশ	বাঙ্‌লাদেশ্‌	bɑŋladeʃ

অতীশ	অতিশ	ɔtiʃ
সঞ্জয়	সন্জয়্	sɔnjʒɔĕ
মোক্ষ	মোক্খো	mokk^{h}o
অক্ষয়	অক্খয়্	ɔkk^{h} ɔĕ
বিক্রয়	বিক্ক্রয়্	bikkrɔĕ
ম্রিয়মান	ম্রিয়োমান্	mriĕoman
উজ্জ্বল	উজ্জল্	ujʒjʒɔl
জনান্তিক	জনান্তিক্	jʒɔnantik
অপৌরুষেয়তা	অপৌরুষেয়োতা	ɔpouruʃeĕota
চিত্রার্পিত	চিত্রার্পিতো	cʃitrarpito
ক্ষণভঙ্গুর	খনোভোঙ্গুর	k^{h} ɔnob^{ɦ}oŋgur
দুর্দৈব	দুর্দৈবো	durdoi̯bo
অপাংক্তেয়	অপাঙ্তেয়ো	ɔpaŋteĕo
বেতালপঞ্চবিংশতি	বেতাল্পন্চোবিঙ্শোতি	betalpɔncʃobiŋʃoti
বিক্রমোবর্শী	বিক্ক্রমোবোরশি	bikkrɔmoborʃi
প্রজ্ঞাপারমিতা	প্রোগ্গাপারোমিতা	proggaparomita
অপরিহার্য	অপোরিহার্যো	ɔporiharjʒo
অব্যবহার্য	অব্যবোহার্যো	ɔbæboharjʒo
ব্যবহার	ব্যাবোহার	bæbohar
অবিমিশ্রকারিতা	অবিমিস্স্রোকারিতা	ɔbimisʃrokarita
দুর্যোধন	দুর্যোধোন্	durjʒod^{ɦ}on
প্রত্যুৎপন্নমিত্ব	প্রোত্তুত্পন্নোমতিত্তো	prottutpɔnnomotitto
বাহ্যজ্ঞানশূন্য	বাজ্ঝোগ্যানশুন্নো	bajʒjʒ^{ɦ}ogænʃunno
রুদ্ধশ্বাস	রুদ্ধোশাস্	rudd^{ɦ}oʃas
সূর্যকরোজ্জ্বল	সুর্যোকরোজ্জল্	surjʒokɔrojʒjʒɔl
বর্ণোচ্ছটা	বর্নোছটা	bɔrnocʃ^{h}ɔta
হাওয়ায়	হাওয়ায়্	haoĕaĕ
অবাঙমানসগোচর	অবাঙ্মানোসগোচর	ɔbaŋmanosgocʃɔr
গোপীজনপদরেণুবল্লভ	গোপিজনোপদোরেনুবল্লভো	gopijʒɔnopɔdorenubɔllɔb^{ɦ}o
খেদাইলোদূরেকিস্কিন্ধ্যাঅধীপে	খ্যাদাইলোদুরেকিশ্কিন্ধাওধিপে	k^{h}ædailodurekiʃkindaodipe

আমি যত দূরেই যাই	/ɑmi ɟʒɔto durei̯ ɟʒɑi̯
আমার সঙ্গে যায়	ɑmɑr soŋge ɟʒɑĕ
ঢেউয়ের মালা গাঁথা	ɖʰeu̯ĕer mɑlɑ gɑ̃tʰɑ
এক নদীর নাম –	æk nodir nɑm --
আমি যত দূরেই যাই।	ɑmi ɟʒɔto durei̯ ɟʒɑi̯.
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে	ɑmɑr cʃokʰer pɑtɑĕ lege tʰɑke
নিকানো উঠোনে	nikɑno uʈʰone
সারি সারি	sɑri sɑri
লক্ষ্মীর পা	lokkʰir pɑ
আমি যত দূরেই যাই ।	ɑmi ɟʒɔto durei̯ ɟʒɑi̯./

'তুমিই তো এ নিখিলে	/'tumii̯ to e nikʰile
দিকে দিকে লিখে দিলে	dike dike likʰe dile
রসের মুরতি,	rɔser muroti,
তোমারি চঞ্চল সুরে	tomɑri cʃɔncʃɔl sure
স্থিরতার অন্তপুরে	istʰirɔtar ɔntopure
বাণী মূর্তিমতী।'	bɑni murtimoti'/
– যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	-/ɟʒotindronatʰ sengupto/

তোর কপালে কিসের গন্ধ	/tor kɔpɑle kiser gɔndʰo
তুই কদম ফুলের বন্ধু ?	tui̯ kɔ doɔ m pʰuler bondʰu ?
তাই এনেছিস এই ঝাঁঝালো বাদল সন্ধ্যা!	tɑi̯ enecʃʰis ei̯ ɟʒʰɑ̃ɟʒʰɑlo bɑdol sondʰa !
–ঘরে এসো, আমি দরোজা করে দি'বন্ধ।	-gʰɔre eso, ɑmi dɔroɟʒɑ kore di'bondʰo./

আজ সারা দেশ জুড়ে যে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে তার ফলে জাতীয় সংহতির সমূহ সর্বনাশ সমুপস্থিত। মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত। জীবনের সদর্থক ভূমিকার চূড়ান্ত অপহ্নব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্তে যে কবির কণ্ঠে জাতীয় সংহতির শুভ সঙ্গীত শুনতে পাবো তাকেই আমরা-স্বাগত জানাবো।

IPA : জ = ɟ, চ = c

/aɟ ʃara deʃ ɟuɽe ɟe ʃamprodaikɔta o biccʰinnota dekʰa diecʰe tar pʰɔle ɟatio ʃɔŋ hotir ʃɔmuhaʃɔrbonaʃ ʃɔmupoʃtʰit. monuʃ ɔ tter mullobodʰaɟ dull ɔboluɳʈʰito ɟiboner ʃ ɔ d ɔ rʈʰ ɔ k bʰumikar cuɽanto ɔponnɔb lokkʰo k ɔ ra ɟaccʰe. ɟatio ɟiboner ei ʃɔŋkɔʈ muhurte ɟe kobir k ɔ nʈʰe ɟatio ʃɔŋhotir ʃubʰo ʃoŋgit ʃunte pabo takei̯ amra ʃag ɔ to ɟanabo./

আমার বয়স ছিল সতেরো। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে গুরুজনের উদ্বেগভাজন হয়েছি। মেজদাদা তখন আমেদাবাদে জজিয়তি করছেন। ভদ্রঘরের ছেলের মান রক্ষায় উপযুক্ত ইংরেজি যে করে হোক জানা চাই; সেজন্যে আমার বিলেত নির্বাসন ধার্য হয়েছে। মেজদাদার ওখানে কিছুদিন থেকে পত্তন করতে হবে তার প্রথম ভিত, হিতৈষীরা এই স্থির করেছেন।

IPA : জ = ɟʒ, চ = cʃ

/amar bɔĕoʃ cʰilo ʃɔtero. pɔɽaʃunoĕ pʰãki diĕ guruɟoner udbegbʰaɟʒon hoĕcʃʰi. meɟʒdada ʈɔkʰon *amedabade ɟʒɔɟʒiĕti korcʃʰen. bʰɔddrogʰorer cʃʰeler man rokkʰaĕ upoɟʒukto iŋreɟʒi ɟʒe kore hok jana cʃai̯; ʃeɟʒonne amar bilet nirbaʃon dʰarɟʒo hoĕcʃʰe. meɟʒdadar okʰane kicʃʰudin tʰeke pɔtton korte hɔbe tar protʰom bʰit, hitoi̯ʃira ei iʃtʰir korecʃʰen./

'ওটা কিসের ডাক, উল্লাস ? অশ্বত্থ গাছে পেঁচার ডাক ? উচ্ছের ক্ষেত থেকে ঝিল্লিরা ঐ ঝিঁ ঝিঁ করছে। দরজার পাল্লাটা বাতাসে ধড়াস ধড়াস করে পড়ছে, বন্ধ করে দাও। ওটা কি কান্নার শব্দ ?

/otɑ kiʃer dɑk *ullɑʃ? ɔʃʃɔtthɔ (o̰ɓt̰ʰ) gɑcʰe pæ̃cʃɑrdɑk ?
ucʃcʃʰer kʰet tʰeke ɟʒʰillira o̯i jhi jhi korcʃʰe. dɔrjɑr pɑllɑtɑ
bɑtɑʃe dʰɔɣɑs dʰɔɣɑs kore poɣcʃʰe, bɑndʰo kore dɑ̯o.
otɑ ki kɑnnɑr ʃɔbdo ? /

সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি –
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুঃখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।
অমল কোমল চরণকমলে চুমিনু বেদনাভরে–
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে।
অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।

/ se̯i modʰumukʰ, se̯i mriduhɑsi, se̯i sudʰa bʰɔrɑ ɑ̃kʰi-
cʃirodin more hɑsɑlo kɑ̃dɑlo, cʃirodin dilo pʰɑ̃ki.
kʰælɑ koriĕɑcʃʰe niʃidin mor sɔb sukʰe sɔb dukʰe,
e ɔɟʒɑnɑpure dækʰɑ dilo puno se̯i poricʃito mukʰe.
ɔmɔl komɔl cɓrɔnkɔ mole cʃuminu bedonɑbʰore --
bɑdʰɑ nɑ mɑniĕɑ bækul ɔʃʃru poɣite lagilo ɟʒʰore.
ɔporup tɑne bætʰɑ diĕe prɑne bɑɟʒite lɑgilo bɑ̃ʃi.
biɟʒɔn bipul bʰɔbone rɔmoni hɑsite lɑgilo hɑsi./

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে –
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

/kɔnʈʰo *a*m*a*r ruddʰo *a*ɟʒike, b*ã* ʃi sɔŋgithara,
ɔm*a*boʃʃ*a*r k*a*r*a*
lupto korecʃʰe *a*m*a*r bʰubon dussɔponer tɔle,
t*a*i̯ to tom*a*e ʃudʰ*a*i̯ oʃʃruɟʒɔ le
ɟʒ*a*h*a*r*a* tom*a*r biʃ*a*i̯cʃʰe b*a*ĕu, nibʰ*a*i̯cʃʰe tɔbo *a*lo,
tumi ki t*a*der kʰɔm*a* koriĕ*a*cʃʰo, tumi ki beʃecʃʰo bʰ*a*lo. /

চঞ্চল	/cʃɔncʃɔl/
নিঃসহায়	/nissɔhaĕ/
জ্ঞান	/gæn/
বিপ্লব	/bipplɔb/
সংস্কৃতি	/sɔŋskriti/
সংক্রান্তি	/sɔŋkr*a*nti/
সুপ্রভাত	/supprobʰ*a*t/
প্রস্তাব	/prost*a*b/
ভাষাতত্ত্ব	/bʰaʃ*a*tɔtto/
বাংলা	/b*a* ŋl*a*/
জ্যোতিষ্ক	/ɟʒotiʃko/
সংঘমিত্রা	/sɔŋgʰomitr*a*/
ব্যক্তি	/ bekti /
ব্রহ্মা	/brombʰ*a*/
শ্মশান	/ ʃɔʃ*a*n /
ক্যাঙারু	/ kæŋg*a*ru/

পথ দিয়ে আসতে আসতে দেখি নির্মম শিশুর দল
ক'টা ইঁদুবছানা ধ'রে তাদের বলি দিয়ে উল্লাস করছে — কি সরল পৈশাচিকতা!
সৃষ্টির মূলেই যে নির্বিকার নির্মমতা। ......
.... জীবনকে কি ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ?

/pɔtʰ dḭĕe ɑste ɑste dekʰi nirmɔm ʃiʃur dɔl
kɔʈɑ idurcʃʰɑnɑ dʰore tɑder boli diĕe ullɑs korcʃʰe -ki
s ɔ rol poi̯sɑcʃikɔtɑ !
sriʂʈir mulei̯ ɟʒe nirbikar nirmɔmotɑ..........
....ɟʒibonke ki̤ gʰire ɑcʃʰe ekʈi bipul procʃcʃʰɔnno
biddrup ?/

আমি চাই কথাগুলোকে / পায়ের উপর দাঁড় করাতে।
আমাকে কেউ কবি বলুক / আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে / জীবনেব শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।/ আমি যেন আমাব কলমটা
ট্রাক্টরের পাশে / নামিয়ে রেখে বলতে পাবি
এই আমার ছুটি / ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও

— সুভাষ মুখোপাধ্যায়

/ ɑmi cʃɑi̯ kɔtʰɑguloke
pɑĕer opor dɑ̃ɣ kɔrɑte.
ɑmɑke keu̯ kobi boluk
ɑmi cʃɑi̯ nɑ.
kɑ̃dʰe kɑ̃dʰ lɑgiĕe
ɟʒiboner ʃeʃ din porɟʒonto
ɟʒæno ɑmi hẽʈe ɟʒɑi̯
ɑmi ɟʒæno ɑmɑr kɔlomʈɑ
ʈrɑkʈɔrer pɑse / nɑmiĕe rekʰe bolte pɑri
ei ɑmɑr cʃʰuʈi
bʰɑi̯, ɑmɑke ekʈu ɑgun dɑo̯./
*/- Subʰɑʃ mukʰopɑddʰɑĕ./

অনাস্বাদিত পূর্ব	/ ɔnassaditopurbo/
চিঙড়ি	/cʃiŋɽi/
শুক্রবার	/ ʃukkrobar /
বিস্তার	/ bistar /
শ্রী	/ ʃri /
হ্যাঙলা	/ hæŋla /
সিঞ্চন	/ sincɔn /
অক্ষর	/ okkʰor /
দ্বিত্ব	/ ditto /
আষাঢ়	/ aʃaɽʰ /
অভিজ্ঞান	/ obʰiggæn /
অভ্রান্ত	/ ɔbbʰranto /
প্রত্যাশিত	/ prottaʃito /
নির্মাণ	/ nirman /
অভিব্যঞ্জনা	/ obʰibænɟʒona /
নৈঃসঙ্গ্য	/ nois ɔŋgo /
অপরাহ্ন	/ ɔporannho /

নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্য এই দুই-এর সংযোগেই নাট্যকলা। অথবা নাট্যকলা একাধিক কলার সমন্বয়ে সৃষ্টি একটা নতুন শিল্পকলা। অভিনয় ও কাহিনী রচনা তার মধ্যে প্রধান, সে সঙ্গে মঞ্চকারু, দৃশ্যাঙ্কন থেকে রূপসজ্জা, আলোকশিল্পেরও নানা নতুন কলাকৌশল ক্রমে দিনের পর দিন এসে মিশেছে আরও হয়ত মিশবে।

nattoʃala o nattoʃahitto ei dui-er sɔŋɟʒogei nattokɔla. ɔtʰoba nattokɔla ækadʰik kɔlar sɔmonnɔĕ sristi ækta notun ʃilpokɔla. obʰinɔĕ o kahini rɔcʃona tar moddʰe prodʰan, se sɔŋge moncʃokaru, driʃʃaŋkkon, tʰeke rupsɔɟʒɟa, alokʃilpero nana nɔtun kɔlakouʃɔl krome diner pɔr din ese miʃecʃʰe aro hɔĕto miʃbe.

'০১-B.U. –

সাঁওতাল পাড়ায় 'সারি সারজন' হয়ে যায়। অসুস্থ মুখে গ্যাঁজলা ওঠা মেয়েটার ঘরের বাহির বারান্দায় বসে জ্বলন্ত ডিবা উল্টে দিয়ে মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা জারি করে কুদ্‌রা-ভুবন লোধার ধর মুণ্ড দুফাঁক হয়, সোমবারি-শিশুবালা যে যেদিকে পারে দৌড়ায়, লোধপাড়া তছনছ, গুড়গুড়িয়াকে ধরে নিয়ে যায় থানায়। মরণীর ধর্ষণের বিরুদ্ধে কী জেহাদ! আর সোমবারি যে হারিয়ে গেল – হারিয়ে গেল চিরতরে রাইবুর কোল খালি করে তার জন্য কারও কোন যন্ত্রণা নেই, শুধু এক রাইবু ছাড়া।

আ = a

s͂aotal paɽaĕ 'sari sarɟʑon' hoĕe ɟʑaĕ. ɔsustʰo mukʰe g͂æɟʑla oʈʰa meĕeʈar gʰɔrer bahir barandaĕ bose ɟʑɔlonto diba ulte diĕe mrittudnɔder pɔroĕana ɟʑari kore kudra-bʰubon lodʰar dʰɔr mundo dupʰăk h ɔĕ, sombari-sisubala ɟʑe ɟʑedike pare do͜u ɽaĕ, lodʰpa ɽa tɔcʃʰnɔcʃh, gu ɽ gu ɽ ieăke dʰore nieĕ j ʑ aĕ tʰanaĕ mɔronir dɔroʃner biruddʰe ki ɟʑehad ! ar sombari ɟʑe hariĕe gælo- hariĕe gælo cʃirotɔre ra͜ibur kol kʰali kore tar ɟʑonno karo kono ɟʑɔntrona ne͜i, ʃudʰu æk ra͜ibu cʰa ɽ a.

অথবা--

ব্রাহ্মণ – brambʰon	বিজ্ঞান – biggæn
মহীরূহ – mohiruhɔ	বিভ্রান্ত – bibbʰranto
অনাসৃষ্টি – ɔnasriʃʈi	অযাচিত্ত– ɟʑacʃito
সংলাপ – sɔŋlap	শ্রী – sri
জাজ্বল্যমান – ɟʑaɟʑɔlloman	নিষ্কণ্টক – niʃkɔnʈok
বজ্রনির্ঘোষ – bɔɟʑɟʑronirghoʃ	অভিব্যঞ্জনা – obʰibængona,
তদ্ব্যাতিরিক্ত – tɔddatirrikto	তেজস্বী – teɟʑossi
ধ্বন্যাত্মক – dʰonnattok	নিদ্রোত্থিত – niddrottʰito.
ঐক্যতান – o͜ikkotan	কটাক্ষ – kɔʈakkʰo
ছিদ্রান্বেষী – cʃʰiddranneʃi	দুর্নীতিগ্রস্ত – durnitigroʃto

সৌন্দর্য্যের কি মহিমা। মবারক জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আবার সব ভুলিয়া গেল। গর্ব্বিত, স্নেহভাবদর্পে প্রফুল্লা জেব-উন্নিসাকে দেখিলে আর তেমন হইত কিনা, বলা যায় না, কিন্তু সেই জেব-উন্নিসা এখন বিনীতা, দর্পশূন্যা, স্নেহশালিনী, অশ্রুময়ী। মবারকের পূর্ব্বানুরাগ ফিরিয়া আসিল। দরিয়া, দরিয়ায় ভাসিয়া গেল। মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না।

/ ʃoundɔrɟer ki mohima ! mɔbarɔk ɟeb-unniʃake dekʰiĕa abar ʃɔb bʰuliĕa gælo. gorbitɔ, ʃnehobʰabdɔrpe propʰulla ɟeb-unniʃake dekʰile ar tæmno hoito kina,bɔla ɟaĕ na, kintu ʃei ɟeb-unnisʃa ækʰon binita, dɔrpoʃunna, ʃnehoʃalini, oʃrumoĕi. mɔbarɔker purbanurag pʰiriĕa asilo. doriĕa, doriĕaĕ bʰaʃiĕa gælo. monuʃʃo ʃtriɟatir preme ɔndʰo hoile , ar tahar hitahit dʰɔrmadʰɔrmo gæn tʰake na./

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট্‌আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধকরি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে – সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয় ! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে ...।

kintu rɔtoner mone kono tɔtter udɔĕ hoilo na. ʃe ʃei poʃʈ-apiʃ griher caridike kebol ɔʃruɟɔle bʰaʃiĕa gʰuriĕa gʰuriĕa bæɽaitecʰilo. bodʰkori tahar mone kʰin aʃa ɟagitecʰilo, dadababu ɟodi pʰiriĕa aʃe - ʃei bɔndʰɔne poɽiĕa kicʰutei dure ɟaite paritecʰilo na. haĕ buddʰihin manobhridɔĕ ! bʰarnti kicʰutei gʰoce na, ɟuktiʃaʃtrer bidʰan bohu bilɔmbe matʰaĕ probeʃ kɔre.....

'০২- B.U. –

বিভ্রান্ত - /bibʰranto /	অভিজ্ঞ – /obʰiggo/
নিষ্কন্টক /niʃʃkɔntok /	স্তাবক - /stabok/
বিমিশ্র - /bimiʃʃro/	পার্শ্ববর্তিনী - /parʃobortini/
অক্ষয়তৃতীয়া - /ɔkkʰɔĕtritiča/	প্রতিধ্বনি - /protiddʰoni/
অন্তরীক্ষ - /ɔntorikkʰo/	ভ্রূকুঞ্চন - /bʰrukuncʃɔn/
অভিব্যঞ্জনা - /obʰibænɟʒona/	পরিত্যাগ - /porittæg/
সংকর - /ʃɔŋkor/	মুমূর্ষু - /mumurʃu/

যূথি, এখনও বুদ্ধি ভ্রংশ, খেতুর মার কথায় খানিক হাঁ করে রক্তাক্ত আঙুলটি মুখে পুরবে কিনা ভাবতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ – এতাবৎ আপনার মুখে সযত্নে রক্ষিত ছোলাগুলি, যা সে মুখে পুরেই চিবোয় নি, এ কারণে যে চিবোলেই ত শেষ, তাই অতি কৃপণের মতই মুখের একান্তে রেখেছিল এবং হাঁ করে আঙুল মুখে পুরবে, না মুখটা আঙুলের কাছেই নিয়ে যাবে এই বিষম দ্বিধায় অদ্ভুত হাস্যকর অবস্থা তার হয়েছিল –

ɟʒutʰi, ækʰono buddʰibʰrŋʃo, kʰetur mar kɔtʰaĕ kʰanik hã kore rɔktakto ãgulti mukʰe purbe kina bʰabte ɟʒ aoar ʃoŋge ʃoŋge hɔʈʰat-etabot apnar mukʰe sɔɟʒɔtne rokkʰito cʃʰolaguli, ɟʒa ʃemukʰe purei ciboĕ ni, e karone ɟʒe cʃibolei to ʃeʃ, tai oti kriponer motoi mukʰer ækante rekʰecʰilo ebŋhã kore aŋgul mukʰe purbe, na mukʰta aŋguler kacʰei niCĕ ɟʒabe ei biʃom didʰaĕ ɔdbʰut haʃʃokɔr ɔboʃtʰa tar hoĕcʰilo.

গভীর জলের তল থেকে যেমন বুদ্‌বুদ্ উঠে আসে, জমাট অন্ধকারের মাঝ থেকে তেমনি একটু একটু করে মানিকের জ্ঞান ফিরে আসছে। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। বাঁ দিকটা ভারী ভারী লাগছে। হাত দিয়ে দেখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আচ্ছা ব্যাণ্ডেজ কেন ?

gobʰir ɟʒɔler tɔl tʰeke ɟʒ æmon budbud uʈʰease, ɟʒɔmaʈ ɔndʰokarer maɟʒʰ tʰeke temni ekʈu ekʈu kore maniker gæn pʰire ascʃʰe. matʰaʈa ɟʒʰimɟʒʰim korcʃʰe. bãdikʈa bʰari bʰari lagcʃʰe. hat die dækʰe bænɖeɟʒ bãdʰa. acʃcʃʰa bænɖeɟʒ kæno ?

সঙ্কর্ষণ সমদ্দার নিজের অফিস কামরায় গদিমোড়া স্যুইং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছিল, মানে ডাইনে বাঁয়ে চেয়ে পাক খাওয়াচ্ছিল। যখন হাতে কাজ না থাকে, তখন কিছুক্ষণ এভাবে দোল খাওয়া ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। পরপর কয়েকটা অপরাধ কেসের সুষ্ঠু মীমাংসা করে ওর মেজাজ বেশ খোশ। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসাবে সঙ্কর্ষণের এখন দারুণ নামডাক, কলকাতা পুলিশ থেকে শুরু করে দিল্লির হোম ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত জটিল কেসে ওর সাহায্য নিয়েছে। ... (অদৃশ্য সংকেত – মঞ্জিল সেন)

ʃŋkrʃon ʃmaddar niɟʒer ɔpʰiʃ kamraĕ godimora su͜iŋ cʃĕare boʃe dol kʰacʃcʃʰilo,mane ɖa͜ine bãĕe cʃee pak kʰaoĕcʃcʃʰilo. ɟʒkʰon hate kaɟʒ na tʰake, tkʰon kicʃʰukkʰon ebʰabe dol kʰa͜oĕa or obbʰæʃe dãɽie gæcʃʰe. pɔrpɔr kɔĕekta ɔporadʰ keser. ʃuʃʈʰu mimaŋʃa kore or meɟʒaɟʒ beʃ kʰoʃ. praiveʈ inbʰestigetor hiʃabe ʃŋkrʃoner ækʰon darun namdak, kolkata puliʃ tʰeke ʃuru kore dillir hom ɖpartment porɟʒonto ɟʒotil kese or ʃahaɟʒɟʒo niĕcʃʰe. ... (driʃʃo sŋket – monɟʒil ʃen)

এক এক সময় নিজের জীবনটা নিজের কাছেই বড্ড বোঝা মনে হয়। মনে হয় পালিয়ে যাই, কিন্তু যাবই বা কোথায় ? মনে হয় হৃদয় যদি সত্যিই খুলে দেখানো যেত ডাক্তারকে তবে বেশ হত। সাইক্রিয়াটিস্টরাও বার বার একই প্রশ্ন করেন। তাঁরা তো শিক্ষিত কিন্তু একটা ছোট্ট সত্যি কথা তাঁরা বুঝতে চান না– সব 'কেন'-র উত্তর দেওয়া যায় না। কি করলে যে শান্তি পাওয়া যায় তা বুঝতে পারি না। হয়তো আরও কিছুদিন পর আমার অন্তরের আমি কে বুঝতে পারব। জানি না॥

æk æk ʃomĕ niɟʒer ɟʒibonta niɟʒer kacʃʰe͜i bɔɖɖo boɟʒʰa mone hɔĕ. monĕ hɔĕ paliĕe ɟʒa͜i, kintu ɟʒabo͜i ba kotʰaĕ ? mone hɔĕ hridɔĕ ɟʒodi ʃotti͜i kʰule dækʰano ɟʒeto ɖaktarke tɔbe beʃ hoto. sa͜ikri͜aʈisʈra͜o bar bar æki proʃno kɔren. tãra to ʃikkʰito kintu ækʈa cʰoʈʈo ʃotti kɔtʰa tãra buɟʒʰte cʃan na -- ʃɔb ' kæno'r uttor de͜oa ɟʒaĕ na. ki korle ɟʒe ʃanti pa͜oĕa ɟʒaĕ ta buɟʒʰtĕ pari na. hĕto aro kicʃʰudin pɔr amar ɔntorer ami ke buʒʰte parbo ! ɟʒani na॥

"ভারতীয় জীবনে পান একটি বিলাস। পানের শুদ্ধ বাংলা হল তাম্বুল। তাম্বুল বিলাসিতায় বাঙালিরা বোধহয় অদ্বিতীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন – আহারের পর একটি পান খেলে ভালো হয়। মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। পানের রসে হজমের শক্তি থাকে। আয়ুর্বেদে পানের রস একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপান। পানের শুধু তাম্বুল নয় আরও অনেক নাম আছে। হিন্দুস্থানে যা পান, তামিল দেশে তার নাম বেট্টিলী, মহারাষ্ট্রে নাগবেল, গুজরাটে নাগরবালা ইত্যাদি।"

"bʰarotio̯ ɟzibone pan ekti bilaʃ. paner ʃuddʰo baŋla holo tambul. tambul bilaʃitae̯ baŋgalira bodʰhoe̯ ɔdditio̯. sri ramkriʃno bolten, – aharer pɔr ekti pan kʰele bʰalo hoe̯. mukʰer durgɔndʰo dur hoe̯. paner rɔʃe hɔɟzomer ʃokti tʰake. ae̯urbede paner rɔʃ ekti guruttopurno onupan. paner ʃudʰu tambul nɔe̯ aro ɔnek nam acʰe. hindustʰane ɟza pan, tamil deʃe tar nam beʈʈili, mɔharaʃʈre nagbel, guɟzraʈe nagorbala ittadi."

স্বপ্ন সন্ধানী

স্বপ্নের ভেলায় ভেসে চলেছি সুদূরের সন্ধানে
অনিশ্চিত লক্ষ্য, তবুও থামেনি পিয়াসী মন,
সামাজিকতার বন্ধন ছিঁড়ে, কোনও বিপ্লবের উজানে-
লক্ষ্যভ্রষ্টের বিপদ যখন তখন –
নতুনকে আনার অবিরাম প্রচেষ্টা —
কখনও ভগ্ন হৃদয় কখনও সাফল্যের হাসি,
চোখে মুখে অবিশ্রান্ত অতৃপ্তির তেষ্টা
হয়ত বা মগজ কারাগারে হৃদয়ের হবে ফাঁসি !
বিশ্বাসে অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চিরকালীন-
ঘুম ভাঙা দুঃস্বপ্নের চিন্তা,
জেগে পড়া গুমরে ওঠা মন,
যেন কোন বিশ্বাসের হন্তা !
তবুও তো স্বপ্ন দেখা ছাড়িনি আমি,
তবুও তো স্বপ্ন দেখা ছাড়েনি কেউ,
আজ নতুন করে স্বপ্ন দেখার পালা,
বিশ্বাসের রাজ্যে ভাসিয়ে দিয়ে ভেলা।।

ʃɔpno ʃɔndʰani

ʃɔpner bʰælae̮ bʰeʃe cɔlecʰi ʃudurer ʃɔndʰane,
ɔniʃcit lokkʰo, tobuo̮ tʰameni piaʃi mon,
ʃamaɟʒikɔtar bɔndʰon cʰiɽe, konoo bipplɔber uɟʒane–
lokkʰobʰroʃter bipod ɟʒɔkʰon tɔkʰon --
notunke anar obiram procʃeʃta --
kɔkʰono bʰɔgno hridɔe̮ kɔkʰono ʃapʰoller haʃi,
cɔkʰe mukʰe ɔbiʃranto ɔtriptir teʃʈa
hɔetoba mɔgoɟʒ karagare hridɔe̮er hɔbe pʰãʃi !
biʃʃaʃe ɔbiʃʃaʃer dɔndo cirokalin-
gʰum bʰaga duʃʃɔponer cinta,
ɟʒege pɔɽa gumre oʈʰa mon,
ɟʒæno kono biʃʃaʃer hɔnta !
tobuo̮ to ʃɔpno dækʰa cʰaɽini ami,
tobuo̮ to ʃɔpno dækʰa cʰaɽini keu̮,
aɟʒ, notun kore ʃapno dækʰar pala,
biʃʃaʃer raɟʒɟʒe bʰʃaie̮e die̮e bʰæla

'০৩- B.U. –

বিস্ফোরনের অব্যবহিত পরে এক আদেশ নামায় মিত্রপক্ষ সংবাদসংস্থা 'দোমি'কে নিষ্ক্রিয় ও নিয়ন্ত্রিত থাকতে বাধ্য করে। তারপর মাসখানেকের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি তুলেই দেওয়া হয়। ফলে, বোমাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মানব শরীরে কী কী প্রতিক্রিয়া ঘটে তার সঠিক ও বিশদ বিবরণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচারিত হল না। চিকিৎসা শাস্ত্রের পক্ষে মহামূল্য সে তথ্য জানার উপায় আর নেই।

bispʰoroner ɔbbɔbohito pɔre æk adeʃ namae̮ mittropokkʰo soŋbadsŋostʰa 'domik'e niʃkrio̮ o nio̮ntrito tʰakte baddo kɔre . tarpɔr maskʰaneker modde protiʃʈʰanti tulei̮ deo̮a hɔe̮. pʰɔle, bomabɔrʃoner soŋge soŋge manob ʃorire ki ki protikkrie̮ gʰɔte tar sɔʈʰik o biɔʃd bibɔron pritʰibir onnanno deʃe procʃarito holo na. cikitsa ʃasterer pokkʰe mohamuller se tottʰo jʒanar upae̮ ar nei̮.

অকিঞ্চিৎ –/ɔkincʃit/
অনুরূপ –/onurup/
আজানুলম্বিত –/ajʒanulombito/
বাহ্য –/bajʒjʒʰo/
জিজ্ঞাসা –/jʒiggaʃa/
বাঙালীয়ানা –/baŋgaliana/
অনিশ্চয় –/ɔniʃcʃɔĕ/
বিদ্বেষ –/biddeʃ/
স্ত্রৈণ –/stroino/
আহ্নিক –/ahannik/
অঞ্জন –/ ɔnjʒon/
দুঃসহ – / dussɔho /

'০৪- B.U. –

আদি যুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায় হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে সেই স্মরণ বিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদলার কলস্বরে ওই মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

adi jʒuge sriʃtir mukʰe protʰom kɔtʰa jʒegecʃʰilo jʒɔler bʰaʃaĕ haoaĕr kontʰe. lokkʰo koti bɔcʃʰor par hoĕe sei sɔron bissɔroner otit kɔtʰa ajʒ badɔlar kɔlossɔre oi meĕtike ese dak dile. o tai sɔkol bæɽar baire cʃole giĕe hariĕe gælo.

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব - protutpɔnnɔmotitto
স্তাবক - stabok
ধনঞ্জয় - dʰɔnɔnjɔĕ
বিহ্বল - bihabɔl
নিষ্কণ্টক - niʃkɔntɔk
ব্যাকুল - bæ̃kul
জ্ঞান - gæn
ভবিষ্যৎ - bʰobiʃʃɔt
অসহ্য - asojʒjʒʰo
বিস্তর - bistɔr
প্রজ্ঞা - proggã
পরিত্রাণ - porittran
অমৃত - ammrito
চড়ুইভাতি - cʃoruibʰati
ব্রাহ্ম - brambʰo
বিদ্বান - biddan

'০৫- B.U. –

ভারতীয় দর্শন-সংস্কৃতির চেয়েও, এদেশে আসার পর ডরোথির চোখে পড়েছে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। যে-দেশ সংস্কৃতিতে এত উন্নত, সে দেশে এত লোক শিক্ষা-বঞ্চিত থাকে কী করে? তাহলে সে সংস্কৃতির কী দাম আছে ?

bʰarotio dɔrʃon- sɔŋskritir cʃẽẽo, edeʃe asar pɔr dɔrotʰi cʃokʰe porecʃʰe doriddro o ɔʃikkʰa. jʒe- deʃ sɔŋskritite æto unnɔto, se deʃe æto lok ʃikkʰa-bɔncʃito tʰake ki kore ? tahole se sɔŋskritir ki dam acʃʰe ?

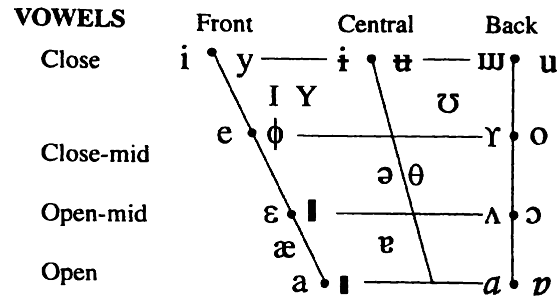
অথবা

বিভ্রান্ত -	bibʰranto	স্তাবক -	stabok
নিষ্কণ্টক -	niʃkɔntɔk	প্রতিবেশিনী -	protibeʃini
অক্ষয়তৃতীয়া -	ɔkkʰɔĕtritiĕa	অনাত্মীয় -	ɔnattio
সরস্বতী -	sɔrɔssoti	প্রতিধ্বনি -	protiddʰoni
বিভীষণ -	bibʰisɔn	পুরস্কার -	purɔskar
অন্তরীক্ষ -	ɔntorikkʰo	পঞ্জিকা -	ponjʒika
মুহূর্ত-	muhurto	দুঃশীল -	duʃʃil
অভিজ্ঞ -	obʰiggo		

’০৬- B.U. — হয এই চাটুয্যের সঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের ঘোরতর কোন শত্রুতা আছে, নচেৎ এই লোকটা আদৌ চাটুয্যেই নয়। কোন ক্ষ্যাপাটে বামুন ! তবু এই ব্যক্তিত্বেব প্রভাবেব সামনে কেমন যেন, সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আর সন্তানেব সম্পর্কে অত বড় অভিশাপ-সদৃশ বাণী !

hɔe ai cʃatujʒjʒer songe lokkʰikant bãɣrujʒjʒer gʰorotɔro kono ʃɔttruta acʃʰĕ, nɔcʃʰet ai lokta adou cʃatujʒjʒei nɔĕ. kono kæpate bamun ! tobu ai bektitter probʰaber samne kæmon jæno, sɔb guliĕe jʒacʃcʃʰe. ar sɔntaner sɔmpɔrake oto bɔɣo obʰiʃap-sɔdriʃʃo bani !

বাউণ্ডুলে -	baundule	দুরধিগম্য -	durodigɔmma
বিচক্ষণ -	bicʃɔkkʰon	বাতায়ন -	bataĕɔn
বিসদৃশ -	bisɔdɹiʃɔ	বাহ্য -	bajʒjʒʰo
বিভীষিকা -	bibʰiʃika	স্থানান্তর -	stʰanantɔr
অপ্রতিরোধ্য -	aprotiroddʰo	পৈশাচিক -	paiʃacʃik
অশ্লীল -	aʃʃilil	সূর্পনখা -	surpɔnɔkʰa
দুঃসহ -	dussɔho	স্যাকরা -	sækra



আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক স্বরবর্ণমালা

CONSONANTS (PULMONIC)

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k g	q G		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	N		
Trill	B			r					R		
Tap or Flap											
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	L			

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক ব্যঞ্জন বর্ণমালা
(১৯৯৬ সালের সংশোধিত রূপ)

✧ এস.এম.এস.-এর ভাষা ✧

'মেসেজ' পাঠানো কথাটি আজকাল পথে ঘাটে খুব চালু। অল্প পয়সা ব্যয়ে সংবাদ প্রেরণের এটি একটি অন্যতম মাধ্যম। মেসেজ বা এস.এম.এস-এর এর পুরো নাম - Satalight Messese Sending। ইংরাজি ভাষায়তো বটেই সরাসরি হিন্দি ভাষাতেও এস.এম.এস. এখন করা যাচ্ছে । কয়েকদিন পর সরাসরি বাংলা ভাষাতেই হয়তো মেসেজ পাঠানো যাবে। কিন্তু লিখতে গিয়ে বাংলা ভাষাভাষিরা তাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুযায়ী লিখতে পারবে কি ? কারণ বাঙালিদের মান্য চলিতের উচ্চারণ আর লিখিত ভাষা প্রয়োগে পার্থক্য আছে । এখন যেমন ইংরাজিতে বাংলা উচ্চারণ লিখতে গিয়ে হোঁচট খেতে হচ্ছে।

মেসেজে পাঠানোর সময় এখনো পর্যন্ত সাধারণভাবে এই লিপি অনুসৃত হচ্ছে —

স্বরধ্বনি ঃ

অ - a	আ - a / aa	ই - i	ঈ - i / ii
উ - u	ঊ - u / uu	ঋ - ri	ঌ - li
এ - e	ঐ - oi	ও - o	ঔ - ou

ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ

ক - k	খ - kh	গ - g	ঘ - gh	ঙ - ng
চ - ch	ছ - chh	জ - j	ঝ - jh	ঞ -
ট - t	ঠ - th	ড - d	ঢ - dh	ণ - n
ত - t	থ - th	দ - d	ধ - dh	ন - n
প - p	ফ - ph	ব - b	ভ - v	ম - m
য - j	র - r	ল - l	ব - b	শ s / sh
ষ - s	স - s	হ - h	ড় - r	ঢ় - r
য় - y	ৎ - t	ং - ng	ঃ - h	ঁ -

অর্থাৎ এস.এম.এস. করতে গিয়ে আমরা বিদ্যাসাগরের বর্ণমালার মধ্যে আলাদা বর্ণ হিসাবে স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়ে মোট ৫২ টির মধ্যে মাত্র ৩৭ টিকে নিয়ে কোন রকম কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আবার স্বরে 'অ',' অ্যা' বলছি অথচ তার জন্য আলাদা কোন ধ্বনি নেই। এই সমস্যার মধ্য দিয়েও আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এবার মোবাইল ফোন থেকে কয়েকটা এস.এম.এস. নিয়ে ভাষা প্রয়োগের সমস্যাগুলোর উপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

এস.এম.এস. - ১

প্রেরক ঃ- ইমানুল হক, চন্দননগর গভঃ কলেজ, অধ্যাপক - বাংলা

বলতে চাইছেন -

শিক্ষক শিক্ষিকারাই জাতির মেরুদণ্ড

— শুভেচ্ছা ইমানুল

এস.এম.এস.-এ লিখছেন —

Shikkhak shikkhikarai Jatir merudando.

– Shubheccha Emanul (5/9/05) 7-38

উত্তরে প্রবীর --

ইমানুল ,

সকালে ট্যাবলেট দুপুরে সিরাপ রাতে ইনজেকস্‌ন এই নিয়েই শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেঁচে আছে।

লিখতে হচ্ছে —

imanul ,

sakale Tablet dupure Sirap rate Injektion ai nie sikkhak-shikkhikar becha ache. (5/9/05) 8-10

ভাষা প্রয়োগ সমস্যা ও সমাধান ঃ

মেসেজ দুটি লিখতে আপাত দৃষ্টিতে কোন ভাষা-সমস্যাই নেই। কিন্তু মেসেজ পড়তে গিয়ে বাঙালিদের সমস্যাতে পড়তে হয়। ইমানুলের মেসেজটিতে 'merudando' শব্দটি ইংরাজি লিপি থেকে বাংলায় পড়ার সময় 'মেরুদাণ্ড'-ও হতে পারে। কারণ ইংরাজির 'a' কখনো 'অ' আবার কখনো 'আ' ধরে আমরা পড়ি। বাংলা ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার খাতিরেই এটা আমাদেরকে করতে হয়। আন্তর্জাতিক ধ্বনি লিপিতে লেখা হলে এটি হত merudɔndo। লেখকের উত্তরে সকালে শব্দটিতে 'স্‌'-এর পর ' অ' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। আবার 'Emanul' বানানটি প্রবীর লিখেছে 'imanul'। 'বেঁচে' শব্দটি মান্য চলিতের উচ্চরণ হয় নি কারণ চন্দ্রবিন্দুকে ইংরাজিতে দেখানো যায় নি।

এস.এম.এস. - ২

প্রেরক ঃ- অলোক ঘড়াই, বয়স ৪০, অধ্যাপক - পদার্থবিদ্যা, কালিম্পং গভঃ কলেজ

বলতে চাইছেন -

সমতলের গরম হলকা পাহাড়ে এলে তাতে কিছু চেনা লোকের ঘামের গন্ধ থাকে যা পাহাড়ে থেকে কিছু নিক পরোক্ষে অনুভব করে। ডাম বাম ভুলে রাম নিয়ে ঝিম মেরে দুর্গার স্বামীর চোখে সেই সব ঘেমো বোকা (২) দের ঘাম ঝরা স্থানগুলো জ্বলে যায় ভেবে আরও রাম নিয়ে তারপর ভালুক চড়িয়ে ডান বামে মজে।

এন.বি. ঃ এই বার্তা তারা পাবে যাদের ঘামের গন্ধ পাহাড়ে আসে না বা যারা বার্তাপ্রেরককে খিস্তি করে ভালোরেসে আবাং প্রেরক ফোন ধরে না।

লিখতে হচ্ছে –

Samataler garam halka pahare ale tate kichu chena loker ghamer gandha thake ja pahare thaka kichhu nik parokhe anubhav kore. dan-bam bhule ram neea jhim mere durgar swamir chokhe sei sab ghemo boka (2) der gham jhara sthangulo jole jaay vebe aaro ram neea tarpara bhaluk charia dan-bame maje.

N.B. · aai barta tara pabe jader ghamer gandha pahare aase na ba jara bartaprerake khistikare bhalobese abang prerak phone dharbe na.

ভাষা প্রয়োগ সমস্যা ও সমাধান ঃ

উপরের মেসেজটিতে ইংরাজি 'a'-কে একই শব্দে কোথাও 'আ' আবার কোথাও 'অ' বা 'এ' ধরা হয়েছে। না ধরলে 'সমতলের' (Sɔmɔtɔler) হচ্ছে 'সামাতালের'; 'গরম' (gɔrom) হচ্ছে 'গারাম'; 'গন্ধ' (gondho) হচ্ছে 'গান্‌ধা'; 'সব'(sɔb) হচ্ছে 'সাব' ইত্যাদি। 'যারা' শব্দে 'য'-এর জন্য 'j'-এর পাশে অতিরিক্ত 'h'- বসানোর কোন যুক্তি নেই। 'যায়' বা 'এই' শব্দের জন্য দুটো করে 'a'- বসানোর প্রয়োজন আছে কি ? এইভাবে লিখলে অনেক সহজ হত – Sɔmɔtɔler gɔrom hɔlka pahare ele tate kichu chena loker ghamer gɔndho thake ja pahare thaka kichu nik pɔrokkhe anubhab kore. .... ইত্যাদি।

এস.এম.এস. - ৩

প্রেরক ঃ- শ্যামা সাঁই , অধ্যাপক জীববিদ্যা, বাগাটি কলেজ, হুগলি

— 14/ 09 / 06 16:56

বলতে চাইছেন -

নিজের পানে চেয়ে বলি আমি কি এতোই দরিদ্র। ভেবে ভেবে যখন আমি ছেড়ে দিয়েছি আশা। খেয়াল হলে দেখি পড়ে আছে আমার দরাজ ভালোবাসা।

লিখতে হচ্ছে –

nijer pane chay bali ami ki atoi daridra. Vabe vabe jokhon ami chare diachi asa.kheal hole dekhi pore ache amar doraj valobasa.

ভাষা প্রয়োগ সমস্যা ও সমাধান ঃ

সচ্ছলভাবে শুরু হলেও এই এস.এম.এস.-টিতে 'চেয়ে' শব্দটি পড়ার সময় এসে হোঁচট খেতে হয়। উচ্চারণে শব্দটি 'চায়'(chay), কিন্তু বক্তা তা বলতে চায় নি, বলতে চাইছেন 'চেয়ে' (ceye)। আবার 'এতোই' শব্দটির উচ্চারণ যথাযথ দেখানো যায় নি। এখানে 'এ'-এর উচ্চারণ মান্য চলিতে 'অ্যা'। তাই এইভাবে লেখার সুযোগ পেলে এস.এম.এসটি বাঙালিদের মনের মতো হত – nijer pane ceye boli ami ki ætoi doriddra. vebe vebe jɔkhon ami cere diechi asa. kheal hole dekhi pore ache amar dɔraj valobasa.

এস.এম.এস. . - ৪

প্রেরক ঃ- সুকান্ত মুখার্জি , শিক্ষিক , মোবারকপুর, বর্ধমান

— 29 / 09 / 06 19:37

বলতে চাইছে -

তুই এখন কোথায় ? মহা সপ্তমীর শুভেচ্ছা গ্রহণ করিস্।

লিখতে হচ্ছে –

tui ekhon kothai ? maha saptamir subechchha grahan karis.

ভাষা প্রয়োগ সমস্যা ও সমাধান ঃ

'এখন' শব্দটি মান্য চলিতে উচ্চারণ অনুযায়ী 'অ্যাখোন্' অথচ এস.এম.এস.এর ভাষায় তা নেই। ' মহা' এবং 'সপ্তমী' শব্দে 'a'-কে একই শব্দে কোথাও 'আ' আবার কোথাও 'অ' ধরতে হচ্ছে। 'করিস্' শব্দটি মেসেজ পড়ার সময় ' কারিস' পড়া হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাক্যটিকে এইভাবে লেখা গেলে সমস্যার সমাধান হয় - tui ækhon kothay ? moha sɔptomir subheccha grohon koris. এখানে অ - ɔ , অ্যা - æ স্বাতন্ত্র্য লিপিতে প্রয়োগ করলে বাক্যটি মান্য চলিতের মতো উচ্চারিত হয়।

এস.এম.এস. . - ৫

প্রেরক ঃ- অনন্যা দত্ত , শিক্ষিকা , ব্যারাকপুর , উত্তর ২৪ পরগনা

— 29 / 09 / 06 10:21

বলতে চাইছে –

পূজাবকাশে কাজ কম করে বৌকে বেশি সময় দিন।

লিখতে হচ্ছে –

Pujabakashe kaj kam kare bouke beshi somoy din.

ভাষা প্রয়োগ সমস্যা ও সমাধান ঃ

'a'-কে 'আ' ধরলে বাক্যের অর্থ বদলে যেতে পারে। 'kam' শব্দটির উচ্চারণ 'কম' হতেও পারে আবার ' কাম' হতেও পারে। কাম পড়লে বাক্যের অর্থ বদলে যায়, সে ক্ষেত্রে বক্তা বলতে চাইছে 'কাজ কাম' করেও বৌকে বেশি সময় দেওয়ার কথা। আর 'কম' ধরলে বলতে চাইছে পূজাবকাশে কাজ কম করে বৌকে বেশি সময় দেওয়ার কথা। আবার বাঙালিদের স্বাভাবিক উচ্চারণে শব্দটি হল 'কোম্' (kom)। আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী বাক্যটি এইভাবে লিখতে হবে – pujabɔkashe kaj kom kore bouke beshi somoy din.

এস.এম.এস. - ৬

প্রেরক ঃ- লক্ষ্মীকান্ত পাল , শিক্ষক, মগরা, হুগলি

— 26 / 08 / 06 10:42

বলতে চাইছে -

শিউলি ঝরা শিশির ভেজা , কেশের বনে ঢাকের বাদ্দি , উতল হাওয়া , শারদীয়ার

মিলন মেলা, সাঙ্গ এখন , তাইতো জানাই শুভ বিজয়া .. এল. কে . পাল।

লিখতে হচ্ছে –

Siuli Jhara sisir veja, kaser bone daker baddi, utal hawa, sarodiar milan mela, sango ekhon, taito janai SUBHA BIJAYA .. L. K. Pal

ভাষা প্রয়োগ সমস্যা ঃ

এই মেসেজটিতে 'শিউলি' এবং 'ঝরা' শব্দদুটির প্রথম বর্ণ বড় হাতের লেখার কোন যুক্তি আছে কি ? শুভ বিজয়া কথাটার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার জন্য ক্যাপিটেল লেটার ব্যবহার করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু ভার বাড়িয়ে লাভ কি ? সহজ করলে হবে এরকম – siuli jhɔra sisir veja, kaser bone ḍhaker baddi, utɔl hawa, sarodi·· milon mæla, sango ækhon, taito janai subho bijɔya . . . ---. l . k . pal .

এস.এম.এস. . - ৭

প্রেরক ঃ- অঞ্জন ঘোষ , ছাত্র , বাংলা অনার্স

লিখতে হচ্ছে –

Chaitra Maser sesh ushnotai 'KALBAISAKI'-r agamaner sathe paila baisakh-r subha agamane apanake janai suswagatam ...& ..&..& ..'1413-r prati. ti prabhat & sandha hock anandamoy,mangolmoy, pabitra o santipurno ; ...!!. Anjan , Hanral, Hooghly. PIN - 712149.

বলতে চাইছে -

চৈত্র মাসের শেষ উষ্ণতায় ' কালবৈশাখী'-র আগমনের সাথে পয়লা বৈশাখের শুভ আগমনে আপনাকে জানাই সুস্বাগতম ... & ..&..& .. '১৪১৩-র প্রীতি। তাই প্রভাত & সন্ধ্যা হোক আনন্দময়, মঙ্গলময়, পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ , .. অঞ্জন , হানরাল , হুগলি । পিন - ৭১২১৪৯ ।

ভাষা প্রয়োগ সমস্যা ঃ

'চৈত্র' শব্দটি পড়তে গিয়ে 'ছৈত্‌রো' (Chaitra) হওয়া অসম্ভব নয়। এটি মান্য

চলিতের উচ্চারণে 'চৈত্‌ত্রো' (caittra)। 'আগমনের' (agamaner) পড়তে গিয়ে 'আগামানের ' হতে পারে; আসলে হবে 'আগোমোনের' (agomoner) । ১-লা কে কথায় রূপ দেওয়া হয়েছে পয়লা কিংবা সংখ্যাগুলোয় (1413) ইংরাজি লিপি অনুসৃত হয়েছে এতে বোধে কোন তারতম্য সৃষ্টি করে না।

এস.এম.এস. . - ৮

প্রেরক ঃ- প্রিয়তোষ কোনার , শিক্ষক , বর্ধমান

বলতে চাইছে -

যে দেশে লোকের নাম ' রমণি ধর কর', সিনেমার না ' লাগান ', টেলকম মিনিষ্টারের পদবী ' মারান', বিস্কুটের নাম ' পার্‌লে মারি' , সে দেশের কি হবে ।

লিখতে হচ্ছে —

Je deshe loker naam 'RAMONI DHAR KAR', Cinemar naam 'LAGAN' , Telecom mnstrer padobi ' MARAN', biscuiter namm 'PARLE MARI', se desher ki habe.

ভাষা প্রয়োগ সমস্যা ঃ

বিশেষ শব্দগুলোকে ক্যাপিটেল লেটারে দেখানো হয়েছে। কিন্তু 'নাম' শব্দের জন্য লেখা হয়েছে 'না-আ-ম' (naam), প্রয়োজনাতিরিক্ত 'a'-এর ব্যবহার যথাযথ নয়। টেলিকম (Telecom) মান্য চলিতের উচ্চারণ অনুযায়ী এস.এম.এস লেখা হয় নি – যথার্থ হত যদি লেখা হত 'Telicom'। মিনিস্টারকে সর্ট ফর্মে করা হয়েছে 'mnstrer' অর্থাৎ দুটো 'ই' বাদ দেওয়া হয়েছে তবে 'টার' অংশটি সংশোধন করে লিখলে এরকম হত - 'mnstar'।

এস.এম.এস. - ৯

প্রেরক ঃ- রিক্তা ও বিজয় , প্রেমিক-প্রেমিকা, শ্যাওড়াফুলি—বর্ধমান ।

বলতে চাইছে -

রিক্তা,

বুকের ভিতর আগলে রাখি মুখ। একটু খানি ভালোবাসা একটু খানি সুখ। বিনি

সুতোর মালায় গেঁথেছি বারবার তুমি যে আমার প্রাণ সখা বন্ধুরে আমার।

— বিজয়

বিজয়,

সারারাত তোমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলাম, বুঝতে পারোনি ? এত শান্তি পেলাম তোমার বুকের উপর মাথা রেখে ঘুমোতে যে কি বলবো...। সারারাত আজীবন তোমার।

— রিক্তা

লিখতে হচ্ছে —

Rikta,

Buker vitar agle rakhi mukh. ektu khani valobasa ektu khani sukh. Bini sutor malai gethechi barbar tumi je amar paran sakha bandhu re amar. -- Bijoy.

Bijoy,

Sararat tomake Jarie dhare suechilam, bujhte paroni ? Ato santi pelam tomar buker upar matha rekhe ghumote je ki balbo.... Sararat ajiban tomar. -- Rikta.

ভাষা প্রয়োগ সমস্যা ও সমাধান :

এ পর্যন্ত যত মেসেজ পাঠানো হয়েছে সংখ্যার দিক থেকে মনে হয় তাতে প্রেমকথাই বেশি আছে। উঠে গেছে প্রেমপত্র লেখা, তার বদলে এস.এম.এস.। তারই একটি আমরা নিয়েছি। 'রিক্তা' শব্দটি উচ্চারণে 'রিক্‌টা' হতে পারে। কারণ এস.এম.এস লেখার সময় 'ত' এবং 'ট' এর কোন আলাদা ইংরাজি লিপি এখনো পর্যন্ত আমরা পাইনি। এই মেসেজে 'গেঁথেছি' শব্দে সানুনাসিকতা প্রকাশ করা হয় নি। বিজয়কে পাঠানো বার্তাটি পড়তে গিয়ে আমরা কীভাবে হোঁচট খেতে পারি দেখুন — " সারারাত তোমাকে জাড়িয়ে ধারে শুএচিলাম, বুঝতে পারোনি ? আত শান্তি পেলাম তোমার বুকের উপার মাথা রেখে ঘুমোতে যে কি বালবো। সারারাত আজীবান তোমার। "

সংশোধন করে এস.এম.এস.-টি এইভাবে লিখলে, মান্য চলিতের উচ্চারণ অনুযায়ী হত — sararat tomake joriye dhore suyechilam, bujhte paroni ? æto santi pelam tomar buker upor matha rekhe ghumote je ki bolbo.... sararat ajibon tomar.

এস.এম.এস. - ১০

প্রেরক ঃ- মিলন ও টুঁই , তাৎক্ষণিক সময়ের সাথি , বর্ধমান।

বলতে চাইছে -

মিলন বলছে -

কৃষ্ণসায়র পার্কে ছটায় ।

লিখছে –

krs. prk 6 tai - me

টুঁই -এর উত্তর –

ও এস্‌ছে হবে না।

লিখছে –

o esche habe ne - tui

ভাষা প্রয়োগ সমস্যা ও সমাধান ঃ

সমাজবিরোধী ও চোরদের কোন এস.এম.এস. এই আলোচনায় দেওয়া গেল না,না হলে দেখতে পাওয়া যেতে কীভাবে মেসেজের মধ্যেই তারা কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। আলোচ্য মেসেজদুটোর বাক্যের গঠন দেখেই বোঝা যায় যে গোপনীয়তার জন্য ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এস.এম.এস. প্রেরকেরা কোড ব্যবহার করছে। মিলন কৃষ্ণসায়র পার্ক (বর্ধমান) - কে লিখছে 'krs. prk'। আর মিলন তার নিজের নামে ব্যবহার করছে 'me'। যদিও 'me' আসলে কে ? - এটা টুঁইদের জানা। টুঁই তার মেসেজে 'o' বলতে তার স্বামীকে বুঝিয়েছে। সে দিল্লিতে থাকে এখন সে বাড়ি এসেছে সুতরাং তার পক্ষে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয়। এস.এম.এস. নিজের নাম লিখেছে ' tui' যা একদিক থেকে তার ও তার 'সাথি'-কে নিরাপদে রাখতে সাহায্য করছে।

✧ আমাদের প্রস্তাব ঃ

বাংলা ভাষার মান্য চলিতের উচ্চারণ (আন্তর্জাতিক ধ্বনি লিপির সাহায্য নিয়ে) অনুযায়ী এস.এম.এস. হতে পারে । এই লিপিতে ক্যাপিটেল বা স্মল লেটারের কোন আলাদা রূপ নেই। অবশ্য মেসেজে ক্যাপিটেল বা স্মল লেটারের অকারণ প্রয়োগ হতেই পারে । গ্রিক ও রোমান লিপি থেকে এগুলি তৈরি করা যায়। কে কখন পাঠাচ্ছে তার সময়, সাল-তারিখ ইত্যাদি লিখনের কাজ সফট্‌ওয়ারের সাহায্যে অটোমেটিক এখনি লেখা হচ্ছে । এই গ্রন্থে আগেই আন্তর্জাতিক লিপিতে বাংলা ভাষার মান্য চলিতে উচ্চারণ পদ্ধতির প্রয়োগ

নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এস.এম. এস.-এর জন্য সমস্ত আন্তর্জাতিক লিপিকে গ্রহণ করার দরকার নেই ।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই একটা নিজস্ব উচ্চারণরীতি আছে যা লিখিত ভাষার সঙ্গে হুবহু মেলে না। রোমীয় বা ইংরাজিতে উচ্চারণ অনুযায়ী সব ভাষাকে ধরা যায় না। বাংলায় মেসেজ পাঠানোর ব্যবস্থা হলেও উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলা লিখতে না পারার একটা সমস্যা থেকেই যাবে। তাই যে সমস্ত কোম্পানিগুলো ফোনের পরিষেবা দিচ্ছে তারা অতি সত্বর এমন সফট্ওয়ার তৈবি করুক, যাতে করে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষ তাদের উচ্চারণ কাঠামোটাকে এস.এম.এস-এ ধরে রাখতে পারে।

এস.এম.এস -এর প্রয়োজনে কোম্পানিগুলো এরকম লিপিমালা তৈরি করুক—

স্বরধ্বনি ঃ

অ - ɔ	আ - a	অ্যা - æ	ই - i	ঈ - i
উ - u	ঊ - u	ঋ - ri	ঌ - li	
এ - e	ঐ - oi	ও - o	ঔ - ou	

ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ

ক - k	খ - kh	গ - g	ঘ - gh	ঙ - ŋ
চ - c	ছ - ch	জ - j	ঝ - jh	ঞ - ~
ট - ʈ	ঠ-ʈh	ড - ɖ	ঢ -ɖh	ণ - n
ত- t	থ - th	দ - d	ধ - dh	ন - n
প - p	ফ - ph	ব - b	ভ - v	ম - m
য - j	র - r	ল - l	ব - b	শ - ʃ
ষ - ʃ	স - s	হ - h	ড় - r	ঢ় - rh
য় - y	ৎ - t	ং - ŋ	ঃ - h	ঁ - ~

'স্পিচলেস' যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হল এই মেসেজ বা 'মোবাইল বার্তা'। মূক ও বধিরদের কাছেও এটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রয়োজনে কয়েকটি মাত্র লিপির পরিবর্তন ঘটালে বাঙালিদের আর মেসেজ লেখা ও পড়ার সমস্যা থাকবে না বলে মনে করি । সহজ সমাধান হিসাবে এই লিপিতে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ থাকছে না। মৌলিক স্বরের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে এস.এম.এস-এ ইংরাজি 'a' কখনোই বাংলা 'এ' নয়; কিংম্বা 'e' কখনোই বাংলা 'ই' নয়। বিদ্যাসাগরের বর্ণমালায় 'অ্যা' নেই , অথচ বাঙালিরা এই ধ্বনি ব্যবহার করে তাই একটি আলাদা লিপি 'æ ' দেখানো হয়েছে ।

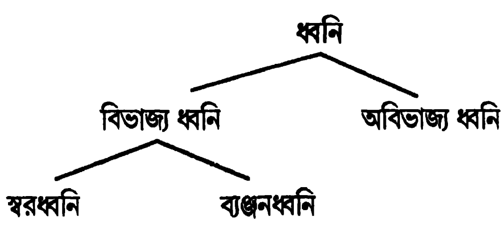
ব্যঞ্জনে অল্পপ্রাণগুলোর সঙ্গে 'h' জুড়ে নিলেই তাকে মহাপ্রাণে রূপ দেওয়া যায়। যেমন - চ - c হলে ছ - ch। অনেকে লিখছেন - চ - ch , ছ - chh ,কিন্তু উচ্চারণগত দিক থেকে এর প্রয়োজন নেই। ট , ঠ , ড , ঢ -এর জন্য আলাদা লিপি দিলে উচ্চারণ মান্যতাকে মেনে চলা হয়। তিনটি শিস্ ধ্বনির ক্ষেত্রে 'শ' এবং 'ষ'-কে এক রেখে 'স'-কে আলাদা লিপিতে করলে বেশি সুবিধা। যদিও রামেশ্বর শ' মনে করেন বাংলা তিনটি শিস্ ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রবণতা 'শ'। 'জ' এবং 'য' কে একটা লিপিতেই দেখানো হযেছে। 'ণ'-র উচ্চারণ 'ন'-তে মিশে গেছে। 'ঞ' এবং চন্দ্রবিন্দুর জন্য আলাদা লিপি প্রয়োগ না করে ব্যঞ্জনের পাশে বসা স্বরের মাথায় উল্লিখিত চিহ্নটি দিলেই কাজ মিটবে। 'র' এবং 'ড়'-কে একটা লিপি 'r' তেই রাখা হয়েছে। বাক্যের শুরুতে বা নামের ক্ষেত্রে ক্যাপিটেল লেটার ব্যবহার করার কোন দরকার নেই। তবে সংখ্যাগুলো ইংরাজি লিপিতে ব্যবহার করলেই চলবে।

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

✧ বাংলা ধ্বনিগুলির উচ্চারণ তত্ত্ব ✧

ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি। গ্রিক ভাষায় 'Phone' শব্দের অর্থ ধ্বনি বা আওয়াজ। ধ্বনি বলতে এখানে বাগ্‌ধ্বনিকে বোঝানো হয়েছে। 'Phone' শব্দের সঙ্গে 'logy' শব্দের যোগে হয়েছে 'Phonology' বা ধ্বনিতত্ত্ব কথাটি এসেছে। মানবভাষায় ব্যবহৃত বাগ্‌ধ্বনিগুলির পদ্ধতি ও বিন্যাস নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা হয় বলেই তা 'ধ্বনিবিজ্ঞান'(Phonetics) নামে খ্যাতিলাভ করেছে। প্রচলিত ধারণা, বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু বাংলা বর্ণমালা আমরা নিয়েছি সরাসরি সংস্কৃত থেকে। অবশ্য উচ্চারণের দিক থেকে প্রধানত প্রাকৃত ভাষাকে অনুসরণ করছি বলেই অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতের সঙ্গে তার মিল নেই। সংস্কৃতে প্রতিটি ধ্বনির জন্য এক একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণের একটি নির্দিষ্ট উচ্চারণ ছিল। প্রাকৃতের যুগে স্বাভাবিক কারণেই ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে উচ্চারণ রীতিতেও পরিবর্তন আসে এবং পরিবর্তিত নিয়মানুযায়ী বর্ণমালাও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত বাংলা ভাষায় উচ্চারণ আরও নিজস্বতা এসেছে।

সমস্ত নির্মাণের মূলে যেমন থাকে একাধিক বস্তু বা ভাবের সংযোগ, তেমনি ভাষার মূল ব্যাপারটিই হল ধ্বনি (Sound)। ধ্বনি হল সেই বাধ্য মৌলিক উপকরণ যা তৈরি করে ভাষা। ধ্বনিই ভাষার ক্ষুদ্রতম একক যা জোড়া দিয়ে পাওয়া যায় শব্দ। ধ্বনির লিখিত রূপকে বলা হয় বর্ণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগে স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়ে ৫২ টি বর্ণ পাওয়া যায়, কিন্তু চলিত বাংলায় উচ্চারিত হয় মাত্র ৪১ টি। এই ৪১ টি বর্ণ বা ধ্বনিকে নিয়েই কাজ করে চলেছে বাংলা ভাষা।



✧ স্বরধ্বনি ✧

✧ সংজ্ঞা ঃ

প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী যে ধ্বনি কারও সাহায্য অর্থাৎ অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে তাকে স্বরধ্বনি বলে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর –

..... স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হইতে পারে ....

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় –

> যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং পূর্ণ- ও পরিস্ফুট-ভাবে উচ্চারিত হয়, এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তাহাকে স্বর-ধ্বনি (Vowel Sound) বলে ;

কিন্তু এই সংজ্ঞা ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই বিশ শতকের চার ও পাঁচের দশক থেকে ভাষাবিজ্ঞানী বাগ্‌যন্ত্রে বায়ুপ্রবাহের উপর গুরুত্ব দিয়ে নতুন যুক্তি পূর্ণ সংজ্ঞা দিতে থাকেন। এই ধারা অনুযায়ী আমরা পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামতকে গুরুত্ব দেব।

Bernard Bloch and George L. Trager --

> A VOWEL is a sound for whose production the oral passage is unobstructed, so that the air current can flow from the lungs to the lips and beyond without being stopped, without having to squeeze through a narrow constriction, without being deflected form the median line of its channel, and without causing any of the supraglottal organs to vibrate ; it is typically but not necessarily voiced.

Daniel Jones --

> A vowel (in normal speech) is defined as a voiced sound in forming which the air issues in a continuos stream through the pharynx and mouth, there being no obstruction and no narrowing such as would audible friction.

Richard --

> a speech sound in which the airstream from the lungs is not blocked in any way in the mouth or throat, and which is usually pronounced with the vibration of the VOCAL CORDS.

পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীদের পথ অনুসরণ করে প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌রা স্বরধ্বনির সংজ্ঞা দিয়েছেন।

আবদুল হাই --

> স্বাভাবিক কথাবার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় কোনো জায়গায় বাধা না পেয়ে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপ না খেয়ে যে ঘোষধ্বনি উদ্গত হয় তাই স্বরধ্বনি।

রামেশ্বর শ' --

> যে ধ্বনির উচ্চারণে মুখবিবরের পথটি এমন বাধামুক্ত থাকে যে, শ্বাসবায়ু ফুসফুস থেকে প্রবাহিত হতে গিয়ে কোথাও কোথাও বাধা পেয়ে আটকে যায় না, অথবা কোথাও সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যে দিয়ে জোর করে বেরোতে গিয়ে ঘর্ষণধ্বনি (friction) সৃষ্টি করে না, অথবা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার সোজা পথে বাধা পেয়ে সামনের পথ ছেড়ে পাশ দিয়ে যাতায়াত করে না, অথবা স্বরযন্ত্রের উপরের কোনো বাগ্‌যন্ত্রকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায় না, তাকেই স্বরধ্বনি (Vowel) বলে।

সহজ কথায়, ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু বের হওয়ার পথে বাগ্‌যন্ত্রের কোথাও বাধা না পেয়ে কেবলমাত্র স্বরতন্ত্রীর কম্পনের ফলে যে ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় সেগুলিই স্বরধ্বনি।

✧ স্বরবর্ণের উদ্ভব ও বিকাশ :

আগেই বলেছি যে সংস্কৃত স্বরবর্ণ উপর ভিত্তি করে বাংলা স্বরবর্ণমালা তৈরি করা হয়েছে। সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণে একটি প্রধান পার্থক্য হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ব্যাপারে লক্ষ করা যায়। সংস্কৃতে কতকগুলি হ্রস্বস্বর ও কতকগুলি দীর্ঘ। অ, উ, ঋ, ঌ -এগুলি হ্রস্বস্বর এবং আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ — এগুলি হল দীর্ঘস্বর। বাংলা উচ্চারণে এই হ্রস্ব, দীর্ঘ ভেদকে মানা হয় না। তবে বাংলার একটা নিজস্ব উচ্চারণরীতি হয়েছে, সেখানে হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ কিছুটা আছে, তবে লেখায় সেটা ধরা পড়ে না।

বাংলা বর্ণমালায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭ টি — ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ, যৌগিক ঐ এবং ঔ এই দুটি হল দ্বিস্বরধ্বনি। স্বরধ্বনির অর্ধব্যঞ্জন হল 'ঋ', 'ঌ' বাংলায় যেটি 'রি', 'লি' রূপে উচ্চারিত হয়। বাংলায় এই সাতটি স্বরধ্বনি ও দুটি দ্বিস্বর ধ্বনির সঙ্গে অতিরিক্ত আরও দ্বিস্বর উচ্চারিত হয়। এগুলির কোন স্বতন্ত্র বর্ণ রূপ নেই । নতুন 'এ্যা' এটির উৎস সপ্তদশ শতাব্দিতে ব্যবহৃত 'এ' কারের বিকৃত উচ্চারণ 'এ্যা' থেকে। 'এ' থেকে 'এ্যা' ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে বলে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ 'অ্যা' না লিখে 'এ্যা' লেখার পক্ষপাতি।

নিম্নে বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল —

ই ঃ

১. সংস্কৃত থেকেই 'ই' ধ্বনির বাংলায় আগমন। সংস্কৃতে স্বতন্ত্র হ্রস্ব স্বর হিসাবেই উচ্চারিত হত।

২. বিদ্যাসাগরীয় বর্ণমালায় 'ই' এবং 'ঈ' থাকলেও আধুনিক বাংলা উচ্চারণের কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। যেমন — 'দিন', 'দীন'। আলাদা অর্থের প্রতিফলন ঘটলেও মৌখিক উচ্চারণে এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা কঠিন।

৩. বাংলায় অন্তত একটি ক্ষেত্রে 'ঈ' দীর্ঘ-উচ্চারণ হয়। 'ক' যখন বিশেষণ বা সর্বনাম রূপে ব্যবহৃত হয় (কী বই, কী খাচ্ছো ?)। বিদেশি শব্দের উচ্চারণে 'ঈ'-কারের উচ্চারণ বহাল একসময় ছিল, যেমন — খ্রীষ্ট । কিন্তু বর্তমানে এ নিয়ম মানা হয় না, যেমন — খ্রিষ্ট। আধুনিক বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘ 'ঈ' নেই।

৪. শ্বাসাঘাতের ফলে কখনো কখনো 'ই' — কারেরও দীর্ঘ উচ্চারণ শোনা যায়। যেমন 'একবার দিন্ তো দেখি।

৫. এটি সংবৃত স্বর।

৬. স্বরচিত্রে এটি সম্মুখ স্বর।

৭. স্বতন্ত্র বর্ণ ছাড়া ' ি '- কার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

এ ঃ

১. ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় ধ্বনিটির উচ্চারণ 'অই' (দেব = দইব)। এই উচ্চারণ আদি বৈদিক যুগেও সম্ভবত বর্তমান ছিল, সংস্কৃতে 'এ'-কারে পরিণত হয়। এটি দীর্ঘস্বর ছিল তবে প্রাকৃতযুগে হ্রস্বস্বর রূপেই উচ্চারিত হত। বাংলায় সাধারণভাবে এর উচ্চারণ হ্রস্ব ।

২. বাংলায় এক সময় হলন্ত বর্ণ থাকলে ' এ ' দীর্ঘ উচ্চারিত হত ।

৩. এটি অর্ধ - সংবৃত স্বর।

৫. স্বরচিত্রে এটি সম্মুখ স্বর।

৬. স্বতন্ত্র বর্ণ ছাড়া ' ে '- কার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

এ্যা ঃ

১. সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে ' এ্যা ' ধ্বনি ছিল না। এমন কি আদি বাংলাতেও এর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

২. বাংলা ভাষার অন্ত্য মধ্যযুগে 'এ' কারের একটা বিকৃত উচ্চারণ এটি সৃষ্টি হয়। আধুনিক কালে 'এ্যা' কারের সাহায্যে এর উচ্চারণ বাংলা 'একটা' বলতে এই বিকৃত 'এ' বা 'এ্যা' উচ্চারিত হয়। এটিও একটি মৌলিক স্বরধ্বনি। কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাকৃতে এই ধ্বনিটি ছিল না।

৩. আধুনিক বাংলায় 'এ্যা ' একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক স্বরধ্বনি। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমালায় স্বীকৃত স্বর এটি।

৪. এটি অর্ধ-বিবৃত স্বর।

৫. স্বরচিত্রে এটি সম্মুখ স্বর।

৬. স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে প্রয়োগ বাংলায় এখনো শুরু হয় নি। তবে ' ্যা '- কার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। পবিত্রবাবু প্রস্তাব দিয়েছেন স্বতন্ত্র বর্ণ 'ᕱ' ও' ɛ' - কার হিসাবে।

আ ঃ

১. সংস্কৃতে মূলত দীর্ঘস্বর হলেও বাংলায় সাধারণভাবে হ্রস্বস্বর রূপেই উচ্চারিত হয়। অবশ্য বাংলার প্রত্নকলাবৃত্ত ছন্দে 'আ'-এর দীর্ঘ উচ্চারণ অব্যাহত আছে। যেমন -- 'কতকাল পরে, বল ভারত রে'।

২. 'আ' কারের পর হসন্ত বর্ণ থাকলে 'আ' দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তবে এই দৈর্ঘ্য পূর্ণ নয়।

৩. 'আ' ধ্বনির প্রচলিত কণ্ঠ্য উচ্চারণ ভাষায় শ্রুত হয়, যেমন -- চাল (চাউল), কিন্তু চাল (চালন)।

৪. এটি বিবৃত স্বর।

৫. স্বরচিত্রে এটি মধ্য ধ্বনি।

৬. স্বতন্ত্র বর্ণ ছাড়া ' া '- কার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

অ ঃ

১. সংস্কৃতে এর উচ্চারণ 'হ্রস্ব' আ। 'আর্জি' শব্দে 'আ' -কার আমরা যেভাবে উচ্চারণ করি 'অ'-এর প্রকৃত উচ্চারণ তাই। পূর্ব ভারত বাদে সমগ্র উত্তর ভারতেই এরূপ উচ্চারণ প্রচলিত।

২. বাংলায় অ-এর আরেকটি উচ্চারণ প্রচলিত আছে, সেটি প্রায় 'ও'-কারের মতো। যেমন — অতি (ওতি), বসু (বোসু). ভাল (ভালো) প্রভৃতি। লেখায় অনেক সময় ও-কার দেওয়া হয় না।

৩. শব্দের অন্ত্যে এবং কখনো কখনো মধ্যেও 'অ' অনেক সময় অনুচ্চারিত থাকে। যেমন — শব্দ অন্ত্যে — জল (জল্), পাগল (পাগল্), আকাশ (আকাশ্) ইত্যাদি।
শব্দ মধ্যে — আরেকটি (আরেক্‌টি) ইত্যাদি।

৪. এটি অর্ধ-বিবৃত স্বর।

৫. স্বরচিত্রে এটি পশ্চাৎ স্বর।

৬. স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে প্রযুক্ত হলেও ব্যঞ্জনের সঙ্গে যোগ করার ক্ষেত্রে '- কার' হিসাবে স্বতন্ত্র কোন চিহ্ন নেই।

ও ঃ

১. এর ইন্দো-ইরানীয়তে উচ্চারণ ছিল 'অউ'। সংস্কৃতে 'ও' দীর্ঘস্বর । বাংলায় সাধারণভাবে হ্রস্ব স্বর হয়। তবে পরে হলন্ত বর্ণ থাকলে দীর্ঘ উচ্চারতি হয়। আধুনিক বাংলায় দীর্ঘরীতি মানা হয় না।

২. রাঢ়ি উপভাষায় 'অ'-কারের যেমন 'ও'-কার উচ্চারণ প্রবণতা আছে। বঙ্গালি উপভাষায় ও-কারের ও তেমনি 'উ-কারের প্রবণতা আছে ।

৩. এটি অর্ধ-সংবৃত স্বর।

৪. স্বরচিত্রে এটি পশ্চাৎ স্বর।

উ ঃ

১. মূল সংস্কৃত থেকেই এর উৎপত্তি ।

২. ই এবং ঈ এর মতই 'উ' এবং 'ঊ'-এর বাংলা উচ্চারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৩. এটি সংবৃত স্বর।

৪. স্বরচিত্রে এটি পশ্চাৎ স্বর।

✧ সন্ধিস্বর বা যৌগিক স্বর

বিদ্যাসাগরীয় বাংলা বর্ণমালায় বারোটি স্বরবর্ণের মধ্যে মৌলিক স্বর সাতটি। এদের পারস্পরিক সংযোগের ফলে অনেকগুলি সন্ধিস্বর বা যৌগিক স্বর বাংলায় প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে দ্বিস্বরধ্বনি অন্তত সংখ্যায় পঁচিশটি (সুনীতিবাবু) এদের মধ্যে 'অই'/'ওই' এর জন্য 'ঐ' এবং অউ/ওউ রে জন্য ঔ — এই পৃথক বর্ণ নির্দিষ্ট আছে। এছাড়া আরও অনেক গুলি দ্বিস্বর বাংলা উচ্চারণে স্বাভাবিক কিন্তু তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন পৃথক বর্ণ নেই। বাংলায় ত্রিস্বরধ্বনি, চতুঃ স্বরধ্বনি, পঞ্চম স্বরধ্বনির কথাও রামেশ্বর শ' বলেছেন। যেমন — আ ই ও (খাইও), আ ও আ এ (খাওয়াতে) ইত্যাদি।

ঐ ঃ

সংস্কৃত বর্ণমালায় এটিকে একক রূপে দেখানো হলেও এটি বস্তুত একটি যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যাক্ষর। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল 'আই' এই জন্য সন্ধিতে (নৈ + অক্ = নাই+ অক্ = নায়ক), তা থেকে বাংলায় অই এবং ওই হয়েছে ।

ঔ ঃ

যৌগিক স্বর হলেও এটি মূলত দ্বিস্বর। সংস্কৃতে 'ঔ' প্রাকৃত স্তরে বর্জিত হয়। তাই সরাসরি সংস্কৃত থেকে এটি বাংলায় আসে নি। শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে -

> বাঙলায় 'অ' বা 'ও-কারের পরবর্তী উদ্বৃত্তস্বর 'উ' মিলিত হ'য়ে নোতুনভাবে 'ঔ' (= অউ, ওউ) সৃষ্টি করেছে।

সংস্কৃত উচ্চারণ 'আউ' থেকে বাংলায় 'অউ' এবং পরিশেষে বাংলায় 'ওউ'।

✧ সানুনাসিক স্বর

স্বরবর্ণের উচ্চারণকালে নিঃশ্বাসবায়ু মুখ দিয়ে বের হবার সময় যদি একই সঙ্গে নাসিকা পথে বের হয়, তবে স্বরধ্বনি সানুনাসিক হয়ে থাকে। বাংলায় (চন্দ্রবিন্দুর) সাহায্যে নাসিক্য ধ্বনিকে লেখায় প্রকাশ করা হয়।

ভাষাবিজ্ঞানী ট্রাস্ক বলেছেন –

> A vowel articulated with the volum lowered and hence accompanied by nasal resonance.

বাংলায় প্রতিটি স্বরই সানুনাসিক হতে পারে। একটি ছকে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি হাজির করা যেতে পারে –

বাংলা স্বর	সানুনাসিক স্বর	শব্দ
ই	ইঁ	ইঁদুর
এ	এঁ	এঁচোড়
এ্যা	এ্যাঁ	প্যাঁক
আ	আঁ	ফাঁকা
অ	অঁ	গঁদ
ও	ওঁ	গোঁড়া
উ	উঁ	মুঁড়ি

বাংলা শব্দে সানুনাসিকতার কারণ

১. সাধারণত নাসিক্যযুক্ত ধ্বনি একক ধ্বনিতে পরিণত হবার কালে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করে তোলে, যেমন দন্ত > দাঁত, হংস > হাঁস, সন্ধ্যা > সাঁঝ ইত্যাদি।

২. অকারণেও অথবা সাদৃশ্য বশত কোনো স্বরের নাসিক্যীভবন হয়, যেমন – ইষ্টক > ইঁট, পুস্তিকা > পুথি > পুঁথি।

৩. শব্দের অন্তস্থিত নাসিক্য ধ্বনি আদি স্বরের শ্বাসাঘাত হেতু কখনো কখনো আদি স্বরে সঞ্চালিত হয়, যথা -- গোস্বামী > গোসাঁই > গোঁসান, সংক্রম > সংকম > সাকোঁ > সাঁকো ইত্যাদি।

✧ অর্ধ-স্বর

সব ব্যঞ্জনই বাগ্‌যন্ত্রে বাধা পেয়ে উচ্চারিত হয় না। অর্থাৎ এমন ব্যঞ্জন আছে যাদের বৈশিষ্ট্য অনেকটাই স্বরের মতো। এই ধরনের ব্যঞ্জনগুলোকে ভাষাবিজ্ঞানীরা অর্ধ-স্বর বলছেন।

Daniel Jones --

> Semi-vowel: a voiced gliding sound in which the speech organs start by producing a vowel of comparatively small prominence and immediately change to a more prominent vowel.

Richard --

> a speech sound ..... which is produced by allowing the from the lungs to move through the mouth and or nose with only very slight friction.

আবদুল হাই –

> বাংলা শব্দের মধ্যে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে কিংবা এক শব্দের শেষে এবং পরবর্তী শব্দের আদিতে পাশাপাশি একই স্বরধ্বনি থাকলে এক সঙ্গে উচ্চারণ করতে গিয়ে বাগ্‌যন্ত্রগুলোর অসুবিধা হয়। সেই অসুবিধা দূর করবার জন্যে যে-সব অস্পষ্ট ধ্বনি উত্থিত হয় সেই gliding ধ্বনিগুলোই তার পরবর্তী স্বরধ্বনি সহযোগে জাত যথার্থ অর্ধস্বরধ্বনি।

পবিত্র সরকার –

> ... যে স্বরধ্বনিগুলির সিলেবল-গঠনেব ক্ষমতা নেই, ববং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিলেবলেব প্রান্তে বসে,– সেগুলি অর্ধ-স্ববধ্বনি।

বাংলায় অর্ধ-স্বরের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে সুনীতিবাবু বলছেন -- অর্ধ- স্বর দুটি - অন্তস্থ – 'ব্' ,'য়্'।

✧ অতিরিক্ত স্বরধ্বনি ঃ

ঋ ঃ

এই দুটি বর্ণকে স্বরবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা নেই। একে 'অর্ধ ব্যঞ্জন' রূপে অভিহিত করাই সঙ্গত। এর মূল উচ্চারণ ছিল 'হ্রস্ব-অ-কারের অন্তর্বতী 'র'। সংস্কৃতে 'পিতৃ' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ 'পিতর্'। আধুনিক বাংলায় এবং উত্তর ভারতে এর উচ্চারণ 'রি' দক্ষিণ ভারতে এবং উড়িষ্যায় 'রু' ।(যেমন – অমৃতাঞ্জন > অম্রুতাঞ্জুন) । ঋ এর ব্যবহার বাংলায় প্রায় নেই তবে প্রথম বর্ণ ধরে বাংলা শব্দ আছে, যেমন – ঋণ। সংস্কৃতে ও কয়েকটি মাত্র শব্দে বর্তমান।

ঌ ঃ

ঋ-এর মতই এটিও অর্ধব্যঞ্জন। বাংলায় এর ব্যবহার নেই, উচ্চারণে এটি 'লি' হয়েছে। সংস্কৃতেও ব্যবহার খুব কম। ইংরাজি Little -কে বাংলায় 'লি ঌ' লিখলে ঌ-কারের প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায়।

✧ মৌলিক স্বরধ্বনি ✧

প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা উদ্ভুত হলেও বাংলা ধ্বনিগুলির বর্ণরূপ দিতে গিয়ে সংস্কৃত বর্ণমালার পূর্ণ রূপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে উচ্চারণ ও বর্ণমালার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ঘটে গেছে। অর্থাৎ সংস্কৃতে বর্ণের যে উচ্চারণ ছিল বাংলা আজ আর তার রূপ নেই। ফলে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগে ১২ টি স্বরবর্ণ থাকলেও এর মধ্যে বাংলায় উচ্চারিত হয় ছয়টি এবং অতিরিক্ত আমরা 'এ্যা' ধ্বনি উচ্চারণ করি। এছাড়া দুটি যৌগিক স্বর ধরে মোট স্বরবর্ণ মালা হওয়া উচিত ৯ টি। তার মধ্যে ধ্বনি হিসাবে যৌগিক স্বর দুটি (যদিও মাত্র দুটি যৌগিক নয়) বাদ দিলে বাংলা ধ্বনির সংখ্যা সাতটি এগুলিকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। এগুলি হল – অ, আ, ই, উ, এ, ও, এ্যা ।

বাংলা স্বরধ্বনি

- মৌলিক
  - প্রচলিত বর্ণমালায় আছে (অ, আ, ই, উ, এ, ও)
  - বর্ণমালায় নেই (এ্যা)
- যৌগিক
  - ঐ, ঔ (এছাড়া আরও ১৯ টি যৌগিক স্বর উচ্চারিত হয়)

✧ **সংজ্ঞা ঃ**

সাধারণভাবে স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ, একক স্বরধ্বনিগুলিই হল মৌলিক স্বরধ্বনি। স্বরধ্বনিকে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

David Abercrombie –

> "A cardinal vowel is a fixed and unchanging reference point, established within the total range of vowel quality, to which any other vowel sound can be directly related."

আবদুল হাই –

> cardinal Vowel বা মৌলিক স্বরধ্বনি কোন এক বিশেষ ভাষার স্বরধ্বনি নয়। এক ভাষার স্বরধ্বনির মধ্যে জিহ্বার অবস্থান বিচার করে, একটির সঙ্গে অন্যটির যেমন পার্থক্য বিচার করা হয় তেমনি ধ্বনিতাত্ত্বিকদের খেয়াল হলো একটি বিশেষ স্বরধ্বনিকে স্বরধ্বনি রেখে। [মুখবিবরের কোন জায়গায় ঘষে দিয়ে ব্যঞ্জন ধ্বনিতে পরিণত না করে কিংবা অতিরিক্ত মুখ বিকৃত ক'রে বাগ্ধ্বনি থেকে তাকে nonsense বা অর্থহীন ধ্বনিতে পরিণত ক'রে (কোন ভাষার ধ্বনি নয় বলে cardinal Vowel যদিও বা অর্থহীন ধ্বনি)]।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ –

> মৌলিক স্বরধ্বনি হচ্ছে নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় নির্দেশক বিন্দু এবং তা স্বরধ্বনির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর সংস্থাপিত।

বাংলাভাষার উচ্চারণ তথা ধ্বনিতত্ত্বে এই মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি গুরুত্ব যথেষ্ট । বিশেষ করে যৌগিকস্বরগুলি এদের উপরই নির্ভরশীল ।

✧ মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা :

বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ক'টি – এ নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

আটটি মতের পক্ষে –

সুকুমার সেন –

> বর্ণমালা অনুসাবে বাঙ্গালায স্ববধ্বনি আটটি – [অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও]

আবদুল হাই –

> আমবা ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও, ও' এবং উ' মোট আটটি স্ববধ্বনি পাই।

সাতটি মতের পক্ষে –

আবুল কালাম মনুজুর মোরশেদ –

> বাংলায় সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এগুলি যথাক্রমে / i e æ a ɔ o u /

পবিত্র সরকার –

> আমাদের মান্য চলিত বাংলায় (Standard Colloquial Bengali) মুখে আমরা সাতটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি – অ, আ, অ্যা, এ, ও, ই, উ।

Puny Sloka Ray --

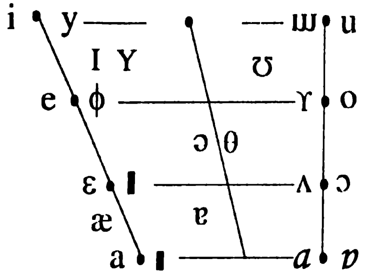
> Oral Vowels. Seven are Dıstinguished : i e æ a ɔ o u

বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য মুখের ভিতরের শূন্যস্থানে ভাষা বিজ্ঞানীরা যে সব কাল্পনিক মাপকাঠি নির্ণয় করেছেন তাদের বিভিন্ন পরিমাপ নির্দেশক বিন্দু থেকে উচ্চারিত হয় মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি। এই উচ্চারণের দিকে লক্ষ রেখে জোন্স স্বরধ্বনিগুলিকে 'Scales of Cardinal Vowels' বলেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক মৌলিক স্বরধ্বনিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন – প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি ও দ্বৈতীয়িক মৌলিক স্বরধ্বনি।

প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি : অগোলকৃত– i e ɛ a ɑ গোলকৃত –ɔ o u

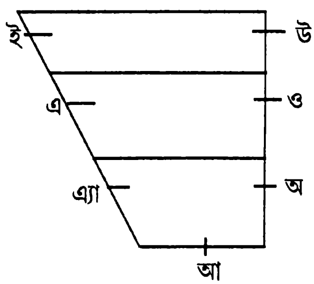
দ্বৈতীয়িক মৌলিক স্বরধ্বনি : অগোলকৃত–y ɸ œ Œ ɒ গোলকৃত – ʌ ɤ ɯ

আন্তর্জাতিক মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে তুলনা করে বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির মানদণ্ড বিচার করা যায় –



আন্তর্জাতিক মৌলিক স্বরচিত্র

(১)



বাংলা মৌলিক স্বরচিত্র

(২)

(১) নং চিত্রে আন্তর্জাতিক মৌলিক স্বরবর্ণের চিত্র মুখগহ্বরের কাল্পনিক আকৃতি হিসেবে ধরা হয়েছে। মৌলিক স্বরধ্বনির মানদণ্ডে বিচার করে বাংলা ভাষার স্বরচিত্র হল (২) নং চিত্র। চিত্রের বামদিকে রেখাটি জিহ্বার সম্মুখ দিকের অবস্থানকে চিহ্নিত করছে এবং ডানদিকেরটি করছে পশ্চাদস্থ অবস্থানকে। অনুরূপভাবে সর্বোচ্চ অনুভূমিক রেখাটা জিহ্বার সর্ব্বোচ্চ অবস্থানের এবং সর্বনিম্নটি জিহ্বার সর্বনিম্ন অবস্থানের দ্যোতক। মধ্যবর্তী রেখাদুটির উপরেরটি জিহ্বার উচ্চ-মধ্য এবং নিচেরটি জিহ্বার নিম্ন-মধ্য অবস্থানকে চিহ্নিত করে। জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থায় নিম্নে শায়িত থাকে। আন্তর্জাতিক মৌলিক স্বরের সংখ্যা ৮টি আর বাংলা মৌলিক স্বরের সংখ্যা ৭টি। কারণ বাংলায় সম্মুখস্থ 'আ'-এর ব্যবহার নেই। আন্তজাতিক স্বরচিত্রে মৌলিক স্বরগুলির অবস্থান রেখার সংযোগস্থল তথা কৌণিক বিন্দুতে। কিন্তু বাংলায় দুই কৌণিক বিন্দুর নিম্ন বিন্দুর দুই-তৃতীয়াংশ উপরে। অবস্থান অনুযায়ী আন্তজার্তিক মৌলিক স্বরগুলি হয় পশ্চাতে অথবা সম্মুখে কিন্তু বাংলায় সম্মুখে, পশ্চাতে এবং মধ্যে। এদিক থেকে বাংলা কিছুটা স্বতন্ত্র।

✧ সূত্রাকারে আন্তর্জাতিক ও বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির তুলনা :

(১) আন্তর্জাতিক স্বরচিত্রে স্বরের অবস্থান কোণিক বিন্দুতে। বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান আন্তর্জাতিকের দুই কৌণিক স্থানের মাঝামাঝি।

(২) আন্তর্জাতিক মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা আটটি। বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা সাতটি।

(৩) আন্তর্জাতিক মৌলিক স্বরে দুটি 'আ' – হ্রস্ব 'আ' এবং দীর্ঘ 'আ'। বাংলা মৌলিক স্বরে একটি মাত্র 'আ'।

(৪) আন্তর্জাতিক মৌলিক স্বরগুলি জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী হয় সেগুলি সম্মুখে

অথবা পশ্চাতে। বাংলা মৌলিক স্বরের ক্ষেত্রে জিহ্বার অবস্থান সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং মধ্যবর্তী।

✧ মৌলিক স্বরের শ্রেণিবিভাগ ঃ

মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখগহ্বরের আকৃতিকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে শ্রুতিগ্রাহ্য বিভিন্ন ধরণের স্বরের সৃষ্টি হয় এবং ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখের ভিতরের বিভিন্ন অংশে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংলগ্ন ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বিভিন্নতা সৃষ্টি করে। উচ্চারক ও উচ্চারণ স্থানের উপর ভিত্তি করে মৌলিক স্বরধ্বনিকে চারভাগে ভাগ করা যায় --

ক) জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী

i) জিহ্বার অগ্র-পশ্চাৎ অবস্থান

ii) জিহ্বার উচ্চ -নীচ অবস্থান

খ) ওষ্ঠের অবস্থান অনুযায়ী

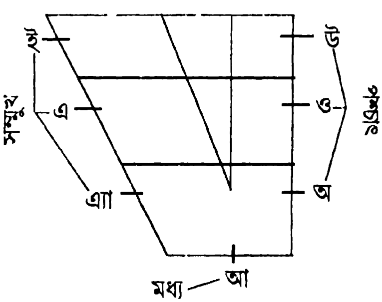
গ) মুখবিবরের ফাঁক অনুযায়ী

ঘ) শ্বাসবায়ুর গতিপথ অনুযায়ী

✧ জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী ঃ

উচ্চারণকালে জিহ্বার **অগ্র-পশ্চাৎ অবস্থান অবস্থান অনুযায়ী** মৌলিক স্বরবর্ণকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন --

সম্মুখ স্বরধ্বনি ঃ যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়, জিব সামনের দিকে এগিয়ে আসে সেই স্বরধ্বনিকে সম্মুখ স্বরধ্বনি বলে। যেমন -- ই, এ, এ্যা।



পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ঃ এই স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিব পিছনে আসেঅর্থাৎ গলার দিকে গুটিয়ে যায়। এগুলি হল উ, ও, অ।

কেন্দ্রিয় স্বরধ্বনি ঃ সম্মুখ স্বর ও পশ্চাৎ স্বরের মাঝামাঝি এর অবস্থান বাংলায় কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনিটি হল 'আ'।

রামেশ্বর শ' স্বরধ্বনি এলাকার মধ্যে জিহ্বার **উচ্চ -নীচ অবস্থান অনুযায়ী** নিম্নলিখিত চারটি অবস্থান চিহ্নিত করেছেন --

উচ্চস্বরধ্বনি ঃ এই স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিব সর্বোচ্চ অবস্থানে বা তার কাছাকাছি থাকে। বাংলায় এগুলি হল ই, উ।

উচ্চ-মধ্য ঃ ধ্বনির উচ্চারণ স্থানের এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে নীচে উচ্চারণ করলে সেগুলি

উচ্চমধ্য স্বরধ্বনি । এগুলি হল এ, ও।

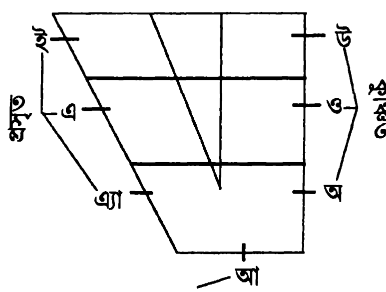
নিম্ন-মধ্য ঃ নিম্ন ধ্বনির উচ্চারণ স্থান থেকে এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে উচ্চারণ করলে সেগুলি নিম্নমধ্য । এগুলি হল এ্যা, অ।

নিম্ন ঃ এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা সর্বনিম্ন স্থানে থাকে বাংলায় এটি হল 'আ'।

✧ ওষ্ঠের অবস্থান অনুযায়ী ঃ

উচ্চারণকালে ওষ্ঠের অবস্থান অনুসারে মৌলিক স্বরবর্ণকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন –

প্রসৃত বা প্রসারিত ঃ ওষ্ঠের দুদিক প্রসারিত করে আমরা যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তাকে বলে প্রসৃত স্বরধ্বনি। বাংলায় এগুলি হল ই, এ, এ্যা।



কুঞ্চিত ঃ ওষ্ঠ প্রসারিত না করে এগুলি উচ্চারিত হয়। যেমন উ, ও, অ।

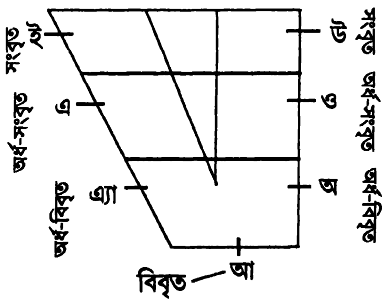
অকুঞ্চিত ঃ কোন কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ প্রসারিত হয় না এগুলিকে অকুঞ্চিত বা স্বাভাবিক বা মধ্যস্থ স্বরধ্বনি বলে। যেমন – 'আ'

✧ মুখবিবরের ফাঁক অনুযায়ী ঃ

উচ্চারণকালে মুখবিবরের ফাঁক অনুসারে মৌলিক স্বরধ্বনিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন –

সংবৃত স্বরধ্বনি ঃ এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় মুখ বিবরের ফাঁক কম থাকে বাংলায় এগুলি হল 'ই' ও 'উ'।

অর্ধ-সংবৃত ঃ জিভ ও চোয়াল দুই তৃতীয়াংশ ভরে থাকে (সংবৃত ও বিবৃতের অবস্থানের সীমায়) এবং এই অবস্থানে 'এ', 'ও' ধ্বনি উচ্চারিত হয়।



অর্ধ বিবৃত ঃ সংবৃতের অবস্থানে বিবৃতের অবস্থানে পর্যন্ত, নীচে থেকে মাত্র এক তৃতীয়াংশ যদি জিভ ও নীচের চোয়াল ভরে থাকে এই অবস্থানে উচ্চারিত হয় এ্যা, অ।

বিবৃত ঃ উচ্চারণের সময় ফাঁক বেশি থাকে বলে বিবৃত। বাংলায় 'আ' হল বিবৃত।

✧ শ্বাসবায়ুর গতিপথ অনুযায়ী ঃ

উপরিউক্ত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও শ্বাসবায়ুর গতিপথ অনুসারে মৌলিক স্বরধ্বনিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

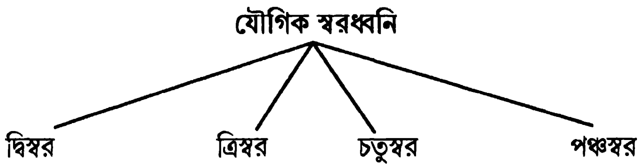
মৌখিক ঃ শ্বাসবায়ু মুখ দিয়ে যাতাযাত করে যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় বাংলায় সব মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি মৌখিক।

অনুনাসিক ঃ শ্বাসবায়ু একই সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে যাতায়াত করে। বাংলা আ এর বিকৃত বা অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। চা > চাঁ (আঁ)।

সুতরাং জিহ্বার উল্লম্ব (Vertical) অনুভূমিক (Horizonal) সম্মুখ, পশ্চাৎ গতি প্রকৃতি, মুখবিবরের ফাঁক ও ওষ্ঠের আকৃতি অনুযায়ী বাংলায় সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি অবস্থান করে।

✧ দ্বিস্বর ✧

ভাষা বিজ্ঞানের অন্যতম বিষয় হল ধ্বনিবিজ্ঞান বা Phonetics। এই ধ্বনি বিজ্ঞান পর্যায়ের অন্যতম অংশ যৌগিক স্বরধ্বনির একটি ভাগ হল দ্বিস্বর ধ্বনি।



বাংলা ভাষা উচ্চারণের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক সরলীকরণ ঘটেছে তাতে দ্বিস্বর ধ্বনির প্রভাব অন্যতম।

✧ সংজ্ঞা ঃ

শ্বাসবায়ুর স্বল্পতম প্রয়াসে দুটি মৌলিক স্বরের একসঙ্গে উচ্চারণ করাকেই দ্বিস্বর বলে। কিংবা একটা পূর্ণস্বর জিহ্বার গতিশীলতা এবং তৎসঞ্জাত একটি পিচ্ছিল ধ্বনি সমস্বরে যে স্বরযৌগ আমরা উচ্চারণ করি তাকে দ্বিস্বর বলি।

সুকুমার সেন –

একটি মাত্র স্বরধ্বনি উচ্চারণে যে প্রযত্ন লাগে তাহার মধ্যে দুইটি স্বরধ্বনি

উচ্চারিত হইয়া গেলে, অর্থাৎ জিহ্বা এক স্বরধ্বনি উচ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়া অপর একটি স্বরধ্বনি উচ্চারণে নিবৃত্ত হইলে, দ্বিস্বরধ্বনি (Diphthong) হয়।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ —

> যদি পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমশ্রেণীর অথবা অসমশ্রেণীর স্বরধ্বনি নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে আক্ষরিক ধ্বনি গঠন করে এবং দ্বিতীয় স্ববধ্বনির তুলনায় প্রথমটা দীর্ঘ ও স্পষ্ট হয় তাহলে এই শ্রেণীর আক্ষবিক স্বরধ্বনিকে দ্বিস্বর ধ্বনি বলা হয়।

✧ বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) এই শ্রেণির ধ্বনি গঠনের ফলে ধ্বনিগত সহজতা দেখা যায়।

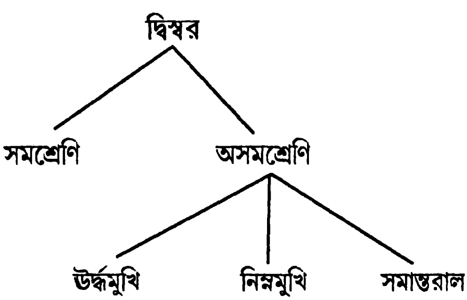
(ii) সাধু বাংলায় রূপমূলস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি চলিত বাংলায় বর্জিত হয়ে দ্বিস্বর গঠন করেছে। যেমন সখী > সই।

(iii) দুটি মৌলিক স্বরের প্রথমটি উচ্চারণ সময় দীর্ঘ এবং স্পষ্ট।

(iv) উচ্চারণ জিহ্বার গতিশীলতার উপর নির্ভরশীল্।

(v) দ্বিতীয় স্বরটির পূর্ণ উচ্চারণ হচ্ছে না বলে এটি পিচ্ছিল ধ্বনি।

✧ শ্রেণিবিভাগ ঃ

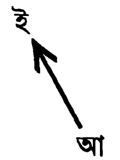


দুটি স্বর একই না ভিন্ন তার উপর ভিত্তি করে দ্বিস্বরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে — সমশ্রেণি ও অসমশ্রেণি। যখন একই শ্রেণির দুটি স্বর পাশাপাশি অবস্থান করে তাকে সমশ্রেণি দ্বিস্বর বলে। যেমন — ইই (দিই)। আবার যখন ভিন্ন শ্রেণির দুটি স্বর পাশাপাশি অবস্থান করে তাকে অসমশ্রেণি দ্বিস্বর বলে। যেমন — ইআ (হিয়া)।

দুই স্বরের উচ্চারণের তারতম্য এবং জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী দ্বিস্বরগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

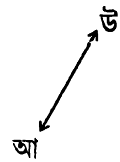
(i) উর্ধ্বমুখী দ্বিস্বর ঃ শ্বাসবায়ুর গতিপথ উর্ধ্বমুখী। যেমন — আ ই (যাই)।

ই হল পিচ্ছিল স্বরধ্বনি



(ii) নিম্নমুখী দ্বিস্বর ঃ শ্বাসবায়ুর গতিপথ নিম্নমুখী। যেমন — আ উ (খাও)

আ স্বরটি পিচ্ছিল স্বরধ্বনি



(iii) সমান্তরাল দ্বিস্বর ঃ শ্বাসবায়ুর গতিপথ সমান্তরাল। যেমন —ই উ (পিউ), উ ই (রুই)



✧ গঠন ও সংখ্যা নির্ণয় ঃ

দ্বিস্বর গঠনের প্রাথমিক শর্তই হল একটি বিশেষ ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে দুটো স্বরধ্বনি পাশাপাশি উচ্চারিত হবে অর্থাৎ একই প্রয়াসে উচ্চারিত হবে। দ্বিস্বরের প্রথম স্বরের প্রাধান্য বেশি, দ্বিতীয়টি পিচ্ছিল। যেমন আও — এখানে 'অ' বেশি প্রাধান্য পেয়েছে 'ও' এর থেকে। দ্বিস্বরের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমালোচকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। দ্বিস্বরের সংখ্যা নির্ণয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন -

ক) বিদ্যাসাগর ও সুকুমার সেন-এর মতে দ্বিস্বরের সংখ্যা দুটি ঐ > ও + ই এবং ঔ > ও + উ।

খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত অনুযায়ী বাংলা ভাষায় দ্বিস্বরের সংখ্যা মোট ২৫ টি।

গ) আব্দুল হাই দ্বিস্বরের সংখ্যা দিয়েছেন ৩১ টি (১৯ টি নিয়মিত এবং ১২ টি অনিয়মিত)

ঘ) আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ বলেছেন ২৯ টি

ঙ) পবিত্র সরকার দ্বিস্বরের সংখ্যা দিয়েছেন ১৭ টি, পরে ১৫ টি

চ) কৃষ্ণা ভট্টাচার্য দ্বিস্বরের সংখ্যা দিয়েছেন ১৯ টি

অনেকের মতে দ্বিস্বরের সংখ্যা হল ১৬ টি

সেগুলির গঠন হল — (সুনীতি বাবুর ২৫ টি দ্বিস্বর অনুযায়ী)

✧ **'ই'-এর দ্বিস্বর গঠনের ক্ষমতাকে ধরে —**

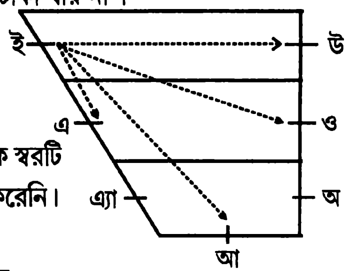
(১) ই এ্ — দিয়ে (দি এ) ঃ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না ।

(২) ই অ্যা — দিয়া, হিয়া, গিয়া (হিআ)

(৩) ই ও্ — নিও

(৪) ই উ্ — শিউলী

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'ই' মৌলিক স্বরটি 'অ' এবং 'অ্যা' এর সঙ্গে দ্বিস্বর গঠন করেনি।



✧ **'এ'-এর দ্বিস্বর গঠনের ক্ষমতাকে ধরে —**

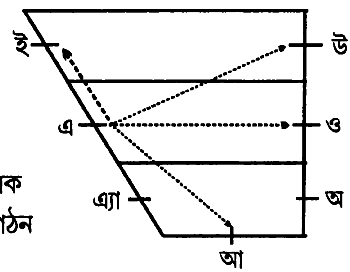
(৫) এ ই্ — নেই

(৬) এ আ্ — খেয়া (খেআ)

(৭) এ ও্ — যেও

(৮) এ উ্ — কেউ, ঢেউ

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'এ' মৌলিক স্বরটি অ এবং 'অ্যা' এর সঙ্গে দ্বিস্বর গঠন করেনি।

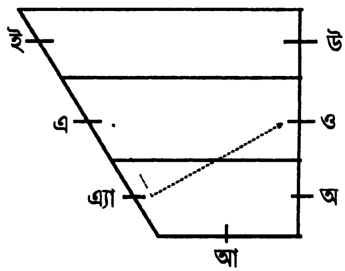


✧ **'এ্যা'-এর দ্বিস্বর গঠনের ক্ষমতাকে ধরে—**

(৯) এ্যা এ্ — ন্যায়, (ন্যাএ)

(১০) এ্যা ও্ — ম্যাও

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'এ্যা' মৌলিক স্বরটিই, আ, অ, উ এর সঙ্গে দ্বিস্বর গঠন করেনি।



✧ **আ -এর দ্বিস্বর গঠনের ক্ষমতাকে ধরে —**

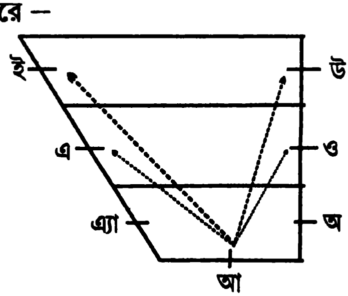
(১১) আ ই্ — যাই

(১২) আ এ্ — আয় (আএ)

(১৩) আ ও্ — খাও

(১৪) আ উ্ — লাউ

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'আ' মৌলিক স্বরটি অ্যা এবং অ এর সঙ্গে দ্বিস্বর গঠন হয়নি।

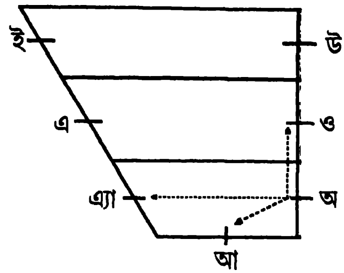


✧ 'অ'-এর দ্বিস্বর গঠনের ক্ষমতাকে ধরে —

(১৫) অ এ্ — ভয়ে (ভএ)

(১৬) অ ও্ — হ্ও

(১৭) অ আ্ — দয়া (দআ)



সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'অ' মৌলিক স্বরটি ই, উ, এ্যা এর সঙ্গে দ্বিস্বর গঠন করেনি।

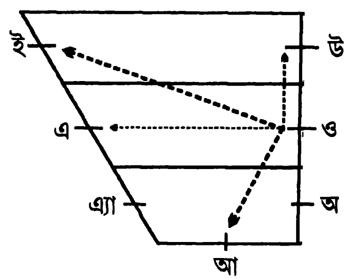
✧ 'ও' -এর দ্বিস্বর গঠনের ক্ষমতাকে ধরে —

(১৮) ও ই্ — বই

(১৯) ও এ্ — লয়ে (লএ)

(২০) ও আ্ — শোয়া (শোআ)

(২১) ও উ্ — মউ



সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'ও' মৌলিক স্বরটি অ এবং এ্যা এর সঙ্গে দ্বিস্বর গঠন করেনি।

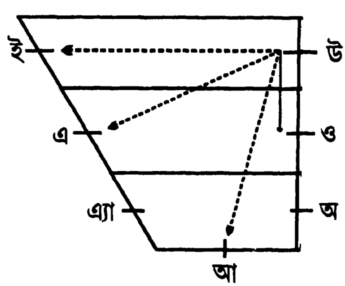
✧ 'উ'-এর দ্বিস্বর গঠনের ক্ষমতাকে ধরে —

(২২) উ ই্ — উই, ধুই

(২৩) উ এ্ — শুয়ে, ধুয়ে (ধুএ)

(২৪) উ আ্ — গুয়া (গুআ)

(২৫) উ ও্ — শুয়ো (শুও)



সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'উ' মৌলিক স্বরটি অ এবং অ্যা এর সঙ্গে যৌগ গঠন করেনি।

সামগ্রিকভাবে সুনীতিবাবু সমশ্রেণির দ্বিস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।

কালাম মনজুর মোরশেদ এই পঁচিশটি দ্বিস্বর ছাড়া আরো ৪ টি দ্বিস্বরের কথা বলেছেন। সেগুলি হল —

(২৬) ই ই্ — নিই

(২৭) ই অ্ — নিয়ন্তা (নিঅন্তা)

(২৮) এএ্ — খেয়ে (খেএ)

(২৯) আ আ্ — ছায়া, বেহায়া (বেহাআ)

২৬, ২৮ এবং ২৯ নং দ্বিস্বরগুলি সমশ্রেণির দ্বিস্বর এবং ২৭ নং অসমশ্রেণিটির কথা সুনীতি বাবু বলেন নি।

আবদুল হাই মোট ৩১ টি দ্বিস্বরের কথা বলেছেন। তার মধ্যে ১৯ টি নিয়মিত এবং ১২ টি অনিয়মিত।

তার দেওয়া অতিরিক্ত দুটি দ্বিস্বর হল –

(৩০) ও ও্ – শোও

(৩১) উ উ্ – কুউ কুউ

কিন্তু ৩০ নং ও ৩১ নং দীর্ঘ ও এবং দীর্ঘ উ বলে মনে হয়। কিন্তু এতগুলি দ্বিস্বর চলিত বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। কোন কোনটি কেবলমাত্র বঙ্গালি উপভাষায় ব্যবহৃত হয়।

আবার কোনটিতে য়- শ্রুতির আগমন ঘটেছে। তাই উক্ত দ্বিস্বরগুলির মধ্যে মাত্র ১৭ টি দ্বিস্বর পবিত্র সরকার গ্রহণ করেছিলেন। সেগুলি হল – (১) ইই্ (২) ইউ্ (৩) উই্ (৪) এই (৫) এউ্ (৬) ওই্ (৭) ওউ্ (৮) ওএ্ (৯) ওও্ (১০) আই্ (১১) আউ্ (১২) এ্যাও্ (১৩) এ্যাএ্ (১৪) আএ্ (১৫) আও্ (১৬) অএ্ (১৭) অও্। তবে নন্দন পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী , ২০০৫) তিনি বলেছেন দ্বিস্বর ১৫ টি । লক্ষ্যণীয় বেশ কয়েকটি দ্বিস্বর লিখতে গিয়ে আমাদেরকে 'য়'-শ্রুতির সাহায্য নিতে হচ্ছে । সেক্ষেত্রে এই ধরনের দ্বিস্বরগুলিকে বাদ দেওয়াই ভাল । তাহলে উল্লেখিত ৩১ টির মধ্যে আমাদের দ্বিস্বরের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ টি । অতি সম্প্রতি বাঙালিরা আরও একটি দ্বিস্বর ব্যবহার করছে সেটি হলো ' এ্যাই ' (এ্যাই যাবি না , এ্যাই শোন ইত্যাদি) । এটিকে ধরলে দ্বিস্বরের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ টি ।

✧ ত্রিস্বর, চতুস্বর, পঞ্চস্বর ঃ

ডঃ রামেশ্বর শ'-এর মতে —বাংলাভাষায় তিনটি স্বরের মিলনে ত্রিস্বর (আউই) = হাউস। চারটি স্বরের মিলনে চতুস্বর (আওআই) = হাওয়াই, এবং পাঁচটি স্বরের মিলনে পঞ্চস্বর (আওআইও) = খাওয়াইও। গঠিত হয়। তবে দ্বিস্বর ছাড়া অন্যগুলি যৌগিক স্বর নয়, কারণ সেগুলির কোনটি ঠিক শ্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় উচ্চারিত হয় না, অর্থাৎ একটি অক্ষরের অন্তর্গত নয়।

✧ অবহিত বা সন্নিহিত স্বরধ্বনির পরিনাম ✧

স্বরধ্বনির পাশাপাশি অবস্থানকে বলে অব্যবহিত বা সন্নিহিত স্বরধ্বনি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে কোন রকম বিরাম ছাড়াই স্বরধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করতে পারত না। সন্ধির নিয়ম অনুসারে ধ্বনি পরিবর্তন ছিল বাধ্যতামূলক। মধ্যভারতীয় আর্যে-র শেষের দিকে প্রাকৃত অপভ্রংশ স্তরে দুটি স্বরের মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে যাওয়ার

ফলে স্বরধ্বনি দুটি ব্যবধান রহিত হয়ে পাশাপাশি এসে যায়। বাংলা সহ নব্য ভারতীয় আর্যে স্বরধ্বনির তিনটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। — (১) শ্রুতিধ্বনি (২) যৌগিক স্বর (৩) একস্বরে পরিণতি।

(১) শ্রুতিধ্বনি ঃ —

'য়', 'র' শ্রুতিধ্বনির সাহায্যে দুটি স্বরধ্বনিকেই রক্ষা করার প্রবণতা মধ্য ভারতীয় আর্যের দ্বিতীয় স্তর থেকেই দেখা যায় বলে আচার্য সুনীতিকুমার অনুমান করেন। কিন্তু প্রমাণের অভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নয়। নব্য ভারতীয় আর্য -এর প্রথম স্তরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 'য়' ও 'ব' বর্ণের শ্রুতিধ্বনি নির্দেশক রূপে ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় এর উদাহরণ পাওয়া যায় নিকট < নিঅড > নিয়ড্ডী, মধ্যবাংলায় এই প্রবণতা থাকলেও আধুনিক বাংলায় শ্রুতিধ্বনি নির্দেশক বর্ণ হিসেবে 'য়', 'র' -কে বর্জন করেছে তাদের পৃথক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে। এদের জন্য বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে 'য়' এবং 'ওয়'।

(২) যৌগিক স্বর ঃ —

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির জন ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত দুটি মাত্র বর্ণ আছে — 'ঐ', 'ঔ'। তবে এছাড়াও বাংলায় আরও যৌগিক স্বর আছে তবে তাদের লেখার জন্য নির্দিষ্ট বর্ণ চিহ্ন নেই। এগুলি দ্বিস্বর জতি। শব্দগুলির ধারাবাহিক পরিবর্তনে সন্নিহিত স্বরধ্বনি দুটি উচ্চারণ যৌগিক স্বরে পরিণত হয়েছে । যেমন —

আই ঃ ভাতৃ > ভাতি > ভাই > ভাই্ (ভ্ আই)

আউ ঃ অলাবু > অলাউ > লাউ > লাউ্ (ল্ আউ)

ওই ঃ সখী > সহী > সোই্ (স্ ওই)

উই ঃ রোহিত > রোহিঅ > রোইঅ > রুই > রুই্ (র্ উই)

ওউ ঃ বধু > বহু > বউ > বোউ্ (ব্ ওউ)

তদ্ভব ছাড়া ও আধুনিক বাংলাতে অনুরূপ ধ্বনি পরিবেশে এই রকম পরিবর্তন স্বরান্ত ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করার সময় দেখা যায় —

$\sqrt{}$যা + এ > ম বাং জাএ > আ. বাং যাএ (যায়) অনুরূপে $\sqrt{}$খা + এ = খাএ, বাংলার মতো যৌগিক স্বর ইংরাজি ও জার্মান ভাষাতে আছে। আবার ফরাসি ভাষায় কোন দ্বিস্বর নেই।

(৩) একস্বরে পরিণতি ঃ —

এক্ষেত্রে স্বর দুটি সন্ধির মতো মিলিত হয়ে অথবা একটি স্বর লুপ্ত হয়ে একস্বরে পরিণত হয়। সুকুমার সেন এর একটি তালিকা দিয়েছেন । যেমন —

অ + অ = অ ঃ **শত > শঅ > শ (শ অ ত অ > শ অ অ > শ অ)**

অ + অ = ও ঃ **সংক্রম > সংকৰঁ > সাংকঅ > সাঁকো**

অ + অ = আ ঃ **কদলক > কঅলঅ > কলা**

অ + আ = আ ঃ রক্ষপাল > রক্খবাল্ > রাক্আল > রাখআল
আ + অ = আ ঃ নারায়ণ > নারাঅণ > নারাণ
আ + আ = আ ঃ ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইঁদারা (মাছ ধরা হয়)
অ + ই = ই ঃ আস্মাভি > অম্হাহি > অম্হই > আম্হে > আম্হি
অ + ই = এ ঃ ভনতি > ভনই > ভনে
অ + উ = ও ঃ চলতু > চলউ > চলু
ই + অ = ঈ ঃ চলিত > চলিঅ > চলী
উ + অ = উ ঃ ভল্লুক > ভল্লুঅ > ভালুঅ > ভালু (ক)
এ + অ = এ ঃ দেবকুল > দেঅউল > দেউল ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুযায়ী যৌগিক স্বরের দ্বিতীয় স্বরটির পূর্ণ উচ্চারণ হয় না। সংস্কৃত থেকে গৃহীত শব্দগুলি সংস্কৃতের মতো উচ্চারিত হত না। উচ্চারিত হলে জটিল হতো ফলে লুপ্ত হয়ে জটিলতা দূর হয় যেমন — চৈত্র > চৌইত্ত > চোত ইত্যাদি।

✧ ব্যবহিত বা অসন্নিহিত স্বরধ্বনি ✧

শব্দে অসন্নিহিত স্বরধ্বনির অবস্থান তিন প্রকার হতে পারে। (১) আদ্য অক্ষরে (২) মধ্যবর্তী অক্ষরে (৩) অন্ত্য অক্ষরে। শব্দে ঝোঁক ব্যবহৃত হতে পারে আদিতে বা অনাদ্যে।

(১) **আদ্য অক্ষরে স্বরের পরিণতি ঃ** —

(ক) আদ্যঅক্ষরের ঝোঁক না পড়ে পরবর্তী অন্য অক্ষরে পড়লে পূর্ববর্তী অক্ষরের স্বর দুর্বল ক্ষীণভাবে উচ্চারিত হতো বলে দীর্ঘ স্বরের স্থানে হ্রস্ব হতো এবং হ্রস্ব স্বর লুপ্ত হতো —
হ্রস্বতা ঃ ভর্ত্তার > ভত্তার > ভাতার , লোপ ঃ অলাবু > অলাউ > লাউ।

(খ) আদ্য অক্ষরে ঝোঁক থাকায় তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা দেখা যায় যেমন — অলক্তক > অলওঅ > অলও > আলতা।
আদ্য অক্ষরে ঝোঁক থাকায় মধ্য বাংলায় কোন কোন ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের অ > আ হয়ে যায়। অভিসার > আভিসারী।

(গ) মধ্য ভারতীয় আর্য -এ যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘতা অন্যান্য বহু নব্য ভারতীয় আর্য মতো বাংলায় একটি লক্ষণ — তপ্ত > তপ্প > তাপ।

(২) **শব্দমধ্যস্থ অক্ষরে স্বরের পরিণতি ঃ**

(ক) **পরবর্তী অক্ষরের স্বর লুপ্ত না হলে মধ্যবর্তী অক্ষরের স্বরলুপ্ত হয়। অনেকে এই প্রবণতার কারণ হিসেবে দ্বিমাত্রিকতা বা স্বাক্ষরতা কে চিহ্নিত করণে। অন্ত্যাক্ষর ঝোঁক যুক্ত হওয়ায় স্বরের দীর্ঘতা ঘটে। মত্তল > মাতল > মাতাল ।**

(খ) পরবর্তী অক্ষরের স্বর লুপ্ত হলে মধ্যবর্তী অক্ষরের স্বর অপরিবর্তিত থাকে। এক্ষেত্রে অদ্য ঝোঁক এবং দ্ব্যক্ষর প্রবণতা দুই সক্রিয়। অর্গল > অগ্গল > আগল।

(গ) মধ্যবর্তী অক্ষরের হ্রস্ব স্বরের পরে যদি মধ্য ভারতীয় আর্য - জতি যুগ্ম ব্যঞ্জন থাকে তাহলে সেই স্বরটি দীর্ঘ হয় এবং পূর্বের নিয়মে অন্ত্যস্বর লুপ্ত হয়। সৌভাগ্য > সোহগ্গ > সোহাগ ।

(৩) **অন্ত্য অক্ষরে স্বরের পরিণতি ঃ**

(ক) অদ্য ঝোঁকের ফলে একক ব্যঞ্জনাশ্রয়ী 'অ' লুপ্ত । হস্ত > হত্থ > হাথ > হাত। মূল শব্দ দু অক্ষরের বেশি হলে অধিকন্তু দ্ব্যক্ষর প্রবণতার ফলে তৎসম শব্দের ও 'অ' লুপ্ত আকাশ, প্রসাদ ইত্যাদি। কিন্তু পদান্তের স্বর যুক্ত ব্যঞ্জনকে আশ্রয় করে থাকলে স্বরের ধ্বনি পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত উচ্চারণ সাপেক্ষ স্বরটি রক্ষিত। রক্ত, ভদ্র ইত্যাদি।

(খ) মূল শব্দের 'আ' যুগ্মব্যঞ্জনের লোপের পর অনেক ক্ষত্রে 'অ' তে পরিনত হয়েছে। বন্যা > বন্না > বান । কিন্তু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

(গ) যুক্ত ব্যঞ্জনাশ্রয়ী 'ই', 'ঈ' এবং 'উ', 'ঊ' মধ্য ভারতীয় আর্য -র যুগ্ম ব্যঞ্জনের একটি নব্য ভারতীয় আর্যতে লুপ্ত হওয়ার পর বহুক্ষেত্রে বিপর্যাসের ফলে পূর্ববর্তী স্বরের সন্নিহিত হয়ে হয় লুপ্ত, নয় সন্ধিবদ্ধ হয়।
লুপ্ত ঃ রাতি > রত্তি > রাইত্ > রাত্
সন্ধিবদ্ধ ঃ ফল্গু > ফগ্গু > ফাগু > ফাউ্‌গ্ ইত্যাদি।

✧ ব্যঞ্জন ✧

বাংলা দুই প্রকার ধ্বনির একটি হল ব্যঞ্জন। সংসদ অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে — ' বৈশিষ্ট্যবোধক লক্ষণ বা চিহ্ন'।

✧ সংজ্ঞা ঃ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় —

> যে ধ্বনি স্বর-ধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট-রূপে উচ্চারিত হইতে পারে না, এবং সাধারণতঃ যে ধ্বনি অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাকে ব্যঞ্জন-ধ্বনি (Consonant Sound) বলে ; যেমন, ক্, চ্, ড্, শ্ ইত্যাদি। এগুলিকে শ্রুতিযোগ্য করিয়া প্রকৃষ্ট-রূপে উচ্চারণ করিতে হইলে, স্বর-ধ্বনির আশ্রয় লইতে হয় ; যেমন, ক (ক্ + অ), কা (ক্ + আ), অক্ (অ + ক্), কি (ক্ + ই), চি (চ্ + ই) ইত্যাদি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ –

> যাহা স্বরের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাহাকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।
> .... ফুসফুস-নির্গত বাতাস গলনালী, মুখবিবর কিংবা মুখের বাইরে (ঠোঁটে) বাধা পাওয়ার কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপ খাওয়ার ফলে যে-সব ধ্বনি উদ্‌গত হয় সেগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি।

ব্যঞ্জনের এই সংজ্ঞা ত্রুটিমুক্ত নয়, কারণ স্বর উচ্চরণে ব্যঞ্জনের আবশ্যিকতার প্রয়োজন নেই, বায়ুপ্রবাহই সেখানে প্রধান। আবার ব্যঞ্জনের উচ্চারণে স্বর আসতেই পারে তাই বলে স্বরের সাহায্য না হলে ব্যঞ্জন উচ্চারিত হতে পারে না একথাও ঠিক নয়। আন্তর্জাতিক লিপিমালায় বাংলা ব্যঞ্জনকে স্বরবিচ্ছিন্ন করেই দেখানো হয়েছে। তাই পরবর্তীকালে ভাষাবিদ্‌রা নতুনভাবে বিষয়টি ভেবেছেন।

আবদুল হাই –

> স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলার সময়ে ফুসফুস-নির্গত বাতাস গলনালী, মুখবিবর কিংবা মুখের বাইরে (ঠোঁটে) বাধা পাওয়ার কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খাওয়ার ফলে যে-সব ধ্বনি উদ্গত হয় সেগুলোই ব্যঞ্জনধ্বনি।

রফিকুল ইসলাম --

> ....ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মুখবিবরে বা ঠোঁটে জিহ্বার সাহায্যে বাধার সৃষ্টি হয়।

মনজুর মোরশেদ –

> ... ব্যঞ্জনধ্বনি গঠনের সময় শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ উৎপাদিত হয় এবং সেই সঙ্গে ফুসফুস থেকে বাতাস বেরুনোর সময় বিভিন্ন বাক-প্রতঙ্গের সংস্পর্শের জন্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং বাতাস ঘষা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

Jack et al. Richards –

> **Consonant**
> a speech sound where the air stream from the lungs is either completely blocked (STOP), partially blocked (LATERAL), or where the opening is narrowing that the air escapes with audible friction (FRICATIVE). With some consonants (NASAL) the airstream is blocked in the mouth but allowed to escape through the nose.

P. H. Matthews –

> In phonetic terms, most consonants are sound in whose production the flow of air is obstructed at some point in the mouth, throat, or larynx, at least sufficiently to cause a audible friction : i. e. they produced with a degree of stricture than open approximation.

আধুনিক মত অনুসরণ করে বলা যায় যে, ব্যঞ্জনধ্বনি হল বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত সেই শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনিগুলি যেগুলি মুখবিবরে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বায়ুপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে উচ্চারিত হয়।

✧ শ্রেণিবিভাগ ✧

উচ্চারণ স্থান ও প্রকৃতি , কম্পন এবং বের হওয়া বায়ুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে বাংলা ব্যঞ্জনকে শ্রেণি বিভক্ত করা হয়েছে।

✧ উচ্চারণ স্থান ও প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ ঃ

ব্যঞ্জনের উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী এগুলিকে আট ভাগে ভাগ করা যায়।

i. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ঃ স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি

ii. উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী ঃ

ক. নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি

খ. ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি

গ. কম্পনজাত ব্যঞ্জন ধ্বনি

ঘ. তাড়নজাত ব্যঞ্জন ধ্বনি

ঙ. ঘর্ষণজাত বা শিস ব্যঞ্জন ধ্বনি

চ. পার্শ্বিক ঘর্ষণজাত ব্যঞ্জন ধ্বনি

ছ. নৈকট্যমূলক ব্যঞ্জন ধ্বনি

স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ

ফুসফুস থেকে বাতাস বের হওয়ার পথে তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বাধা পেয়ে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। বাতাস যে যে স্থানে অবরুদ্ধ হচ্ছে সেই স্থানকে ধরে এগুলিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে –

১. **কণ্ঠ ধ্বনি বা জিহ্বামূলীয় ঃ** দুটো ঠোঁটের মতো দেখতে স্বরতন্ত্রীর সংকোচনে বায়ুরুদ্ধ হয়ে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি

হল -- ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

২. তালব্য ধ্বনি বা প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঃ জিবের অগ্রভাগ তালুতে স্পর্শ করে এই প্রকার ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এগুলিকে অনেকেই ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন বলেছেন। এই প্রকার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি হল —চ, ছ, জ, ঝ।

৩. মূর্ধা ধ্বনি বা দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ঃ জিবের অগ্রভাগ উল্টিয়ে কোমল তালুর কাছাকাছি স্পর্শ করে যে ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি হল — ট, ঠ, ড, ঢ।

৪. দন্তমূলীয় ধ্বনি ঃ জিবের অগ্রভাগ দাঁতের গোড়ার মাড়িতে ঠেকিয়ে যে ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি হল — ত, থ, দ, ধ, ন।

৫. ওষ্ঠ ধ্বনি ঃ দুটি ওষ্ঠ একত্রিত হয়ে বায়ুপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে এই প্রকার ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি হল —প, ফ, ব, ভ, ম।

ক. নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ

বায়ুপ্রবাহ প্রথমে মুখে বাধা পেয়ে পরে নাক ও মুখ উভয় দিকে বের হয়ে এই প্রকার ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি হল — ঙ, ন, ম।

খ. ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ

ঘৃষ্ট ধ্বনি আসলে স্পর্শ ধ্বনির একটি অংশ। তবে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় বায়ুপ্রবাহ জিব ও তালুর ঘর্ষণে বের হয়ে আসে বলে এগুলিকে ঘৃষ্ট ধ্বনি বলা হয়। পবিত্র সরকারের মতে এই প্রকার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি হল — চ, ছ, জ, ঝ।

গ. কম্পনজাত ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ

ফুসফুস থেকে বায়ুপ্রবাহ মুখ দিয়ে বের হওয়ার সময় জিভের কোন অংশ ও আলজিভ দ্রুত ও ঘন কম্পনের ফলে এই প্রকার ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ব্যঞ্জন ধ্বনিটি হল — র।

ঘ. তাড়নজাত ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ

ফুসফুস থেকে বায়ুপ্রবাহ মুখবিবরে বাধা পেয়ে জিবের অগ্রভাগ কোমল তালুতে স্পর্শ করে এই প্রকার ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি হল — ড়, ঢ়।

ঙ. ঘর্ষণজাত বা শিস ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ

ফুসফুস থেকে বায়ুপ্রবাহ বের হওয়ার পথে জিবের মধ্যভাগ তালুতে স্পর্শ করে যে ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি হল — শ, স, হ।

চ. পার্শ্বিক ঘর্ষণজাত বা তরল ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ

ফুসফুস থেকে বায়ুপ্রবাহ মুখবিবরে আসার পর জিবের অগ্রভাগ দাঁতের মাড়িতে লেগে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ব্যঞ্জনধ্বনিটি হল — ল।

ছ. নৈকট্যমূলক ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিতে থাকলেও যে ব্যঞ্জনগুলি স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়ের বৈশিষ্ট্য পালন করে সেগুলি হল নৈকট্যমূলক ধ্বনি। এই ধ্বনিগুলিকে আমরা অর্ধস্বর বলেছি। বাংলায় এই ধ্বনি দুটি হল — য়, ব (অন্তস্থ)।

✧ কম্পন অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ ঃ

স্বরতন্ত্রির কম্পন অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. ঘোষ ব্যঞ্জন ঃ কণ্ঠমূলে বায়ুর কম্পন অপেক্ষাকৃত কম হলে তাকে ঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন — গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ড, ঢ, (ড়, ঢ়), দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, য, র, ল, হ।

২. অঘোষ ব্যঞ্জন ঃ উচ্চকণ্ঠে বায়ুর কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি হলে তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন — ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ, শ, ষ, স।

✧ বায়ুর পরিমাণ অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ ঃ

ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় আমরা কতটা পরিমাণ বাতাস ফুসফুস থেকে বের করছি তার উপর ভিত্তি করে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন ঃ বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ অল্প। অতিরিক্ত শ্বাস বায়ুর প্রয়োজন হয় না। যেমন — ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব।

২. মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ঃ বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ বেশি। অতিরিক্ত শ্বাসবায়ু (হ) -র প্রয়োজন হয়। যেমন — খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ।

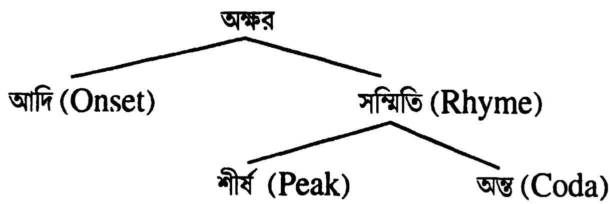
✧ যুক্তব্যঞ্জন ✧

✧ সংজ্ঞা ঃ

আবদুল হাই বলেছেন — "দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি নিশ্বাসের একই প্রয়াসে এবং উচ্চারকদ্বয়ের সজোর পেশী সঞ্চালনের ফলে উচ্চারিত হ'লে তারা আপন বৈশিষ্ট্যেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি রূপে নিজেদের আসন চিহ্নিত ক'রে নেয়।" অর্থাৎ দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি নিঃশ্বাসের একই প্রয়োসে এবং উচ্চারকদ্বয়ের সজোর পেশি সঞ্চালনের ফলে আপন বৈশিষ্ট্য উচ্চারিত হলে তাকে যুক্তব্যঞ্জন বলে। যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে দুটি ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বরধ্বনির উচ্চারণ হয় না। শ্বাসবায়ুর স্বল্পতম প্রয়োসে যতগুলি ব্যঞ্জন উচ্চারণ করতে পারি, সেগুলি হল যুক্তব্যঞ্জন।

✧ যুক্তব্যঞ্জন নিরুপণে অক্ষরের প্রয়োজনীয়তা ঃ

সাম্প্রতিক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় অক্ষরে বা দল গুরত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে। সেক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জনের আলোচনায় অক্ষরের গঠনকে উপেক্ষা করা যায় না। ধ্বনিবিজ্ঞানের এখনকার নির্দেশ অনুযায়ী একটি অক্ষরের গঠন এইরকম —



বাংলা ভাষায় অক্ষরের মূল বৈশিষ্ট্য হল-

১) আদি অংশে সর্বোচ্চ তিনটি ব্যঞ্জন থাকতে পারে।

২) অন্তে সর্বোচ্চ দুটি ব্যঞ্জন থাকে।

৩) শির্ষে সর্বদাই থাকবে স্বরধ্বনি।

৪) শির্ষ অর্থাৎ স্বরধ্বনি, একটি অক্ষরে অবশ্যই থাকবে।

৫) বাংলা অক্ষরের আদি ও অন্তে ব্যঞ্জন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাংলা অক্ষরের সামগ্রিক প্রতীক চেহারাটি এই রকম

   ১) স্ব = ও

   ২) স্ব ব্য = আম্

   ৩) ব্য স্ব ব্য = রাম্

   ৪) ব্য ব্য স্ব = শ্রী

   ৫) ব্য ব্য ব্য স্ব = স্ত্রী

   ৬) ব্য স্ব ব্য ব্য = মার্চ

উল্লেখিত উদাহরণে ৪, ৫, ৬ নং নমুনায় এক অক্ষরে একাধিক যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার ঘটেছে। আবার একটি অক্ষরের অন্ত্য ও পরের অক্ষরের আদি মিলেও যুক্তব্যঞ্জন তৈরি করে। সুতরাং যুক্তব্যঞ্জন নিরূপণে অক্ষরের প্রয়োজনীয়তা আছে।

✧ যুক্তব্যঞ্জন ও লগ্নব্যঞ্জনের মধ্যে পার্থক্য ঃ

আপাত দৃষ্টিতে যে ব্যঞ্জনগুলি ছাপাখানার টাইপ অনুযায়ী যুক্তব্যঞ্জন কিন্তু উচ্চারণ করলে যখন তারা দুটি অক্ষরে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তাদের লগ্ন ব্যঞ্জন বলে। যেমন — মিত্র > মিত্তির (অর্ধ তৎসম) — উচ্চারণ অনুযায়ী মিত্ + তির্ । লগ্ন ব্যঞ্জনগুলি আসলে এটি শ্রুতি-যুক্তব্যঞ্জন। লগ্ন ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে যে দুটি অক্ষর ভেঙে যায় তাদের প্রথম সদস্য ও

অক্ষরের অন্ত (Coda) আর দ্বিতীয় সদস্য পরের অক্ষরের আদি বা Onset -এর ভূমিকা পালন করে।

লগ্নব্যঞ্জন ও যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্যটি হল এদের ধ্বনির প্রতিরূপ ঠিক এক রকম নয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন — আম্র = আম্ + ম্রো (র-ফলা যুক্ত ম এর দ্বিত্ব ঘটেছে) কিন্তু আমরা = আম্ + রা (এক্ষেত্রে র-ফলা না থাকায় ম এর দ্বিত্ব ঘটেনি) সুতরাং লগ্নব্যঞ্জন ও যুক্তব্যঞ্জনের ধর্ম বাংলায় এক নয়।

লগ্নব্যঞ্জন শুধু যে পদের মাঝে থাকবে তা নয়। টানা সংলাপের ক্ষেত্রে একপদ থেকে আর এক পদের মধ্যবর্তী স্থানে স্বরধ্বনির উচ্চারণ না থাকলেও লগ্নব্যঞ্জন তৈরি হয়। তাই বাংলাতে তিন বা চার সদস্যের লগ্নব্যঞ্জন পাওয়া যায়।

✧ বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের গঠন ও প্রকারভেদ ঃ

বাংলা লিপিতে যুক্তব্যঞ্জনের সংখ্যা কম নেই। অতি সম্প্রতি এর লিপি রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। ঠিক যুক্ত আকারে না লিখে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তলায় তলায় লেখার কথা বলা হচ্ছে। আমরা লিপির আলোচনা শেষে এর ইংগিত দিয়েছি। সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষায় উচ্চারিত যুক্তব্যঞ্জনের দুটি রূপ আছে —

শ্রুতি যুক্তব্যঞ্জন — অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি করে যখন শব্দ উচ্চারিত হয় তখন অনেক ব্যঞ্জন পাশাপাশি উচ্চারিত হয় এবং যুক্তব্যঞ্জন সৃষ্টি করে। যেমন‘আস্‌বে’ শব্দে ‘স’ ও ‘ব’ যুক্তরূপে উচ্চারিত হয় । যেমন — ‘আস্বে’(আসবে)।

দৃষ্টি যুক্তব্যঞ্জন — বাংলায় লেখন পদ্ধতি অনুসারে আমরা সমবর্গীয় অথবা ভিন্ন বর্গীয় যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রয়োগ করি। যেমন দ + ম (পদ্ম), ক + ত (ভক্ত) ইত্যাদি।

✧ অবস্থান অনুযায়ী যুক্তব্যঞ্জন তিন প্রকার —

শব্দে ব্যঞ্জনের অবস্থান অনুযায়ী যুক্তব্যঞ্জন তিন প্রকার — (১) আদি যুক্তব্যঞ্জন (২) মধ্য যুক্তব্যঞ্জন (৩) অন্ত যুক্তব্যঞ্জন।

আদি যুক্তব্যঞ্জন —

(ক) তিন সদস্য (ব্য ব্য ব্য) ঃ

স্পৃ — স্পৃহা , স্ট্র — স্ট্রাইক , স্ত্র্‌ — স্ত্রী , স্ক্রু — স্ক্রু

‘ব্য’ বলতে ব্যঞ্জনকে বোঝানো হয়েছে ।এরূপ তিন সদস্যের যুক্তব্যঞ্জনের সংখ্যা ৪ টি। এদের গঠন বৈশিষ্ট্য হল —

(i) প্রথম সদস্য শিস্ (স)

(ii) দ্বিতীয় সদস্য {অঘোষ ও অল্পপ্রাণ-স্পৃষ্টব্যঞ্জন(ত, প, ক, ট)}

(iii) তৃতীয় সদস্য তরল ব্যঞ্জন (র)

(খ) দুই সদস্য (ব্য ব্য)

ক্র্ — ক্রম	ট্র্ — ট্রাম,	প্র্ — প্রাণ,	মৃ — মৃত	স্ত্ — স্তব
ক্ল্ — ক্লোনিং	ড্র্ — ড্রাম	প্ল্ — প্লাবন	ম্ল্ — ম্লান	স্থ্ — স্থাপন
খ্র্ — খ্রিষ্টাব্দ	ত্র্ — ত্রাণ	ফ্র্ — ফ্রক,	শ্র্ — শ্রী	স্ন্ — স্নান
গ্র্ — গ্রাম	থ্র্ — থ্রি	ফ্ল্ — ফ্লু	শ্ল্ — শ্লীল	স্প্— স্পেশাল
গ্ল্ — গ্লানি	দ্র্ — দ্রবণ,	ব্র্ — ব্রণ	স্ক্ — স্কন্দ	স্ফ্ — স্ফূরণ
ঘ্র্ — ঘ্রাণ	ধ্র্ — ধ্রুব	ব্ল্ — ব্লাক	স্খ্ — স্খলন	
নৃ — নৃত্য	ভ্র্ — ভ্রম	স্ট্ — স্টীম	স্ম — স্মিতা	

দুই সদস্যের যুক্তব্যঞ্জনের সংখ্যা মোট ৩৩ টি। এদের গঠন বৈশিষ্ট্য হল —

(১) প্রথম সদস্য স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন হলে পরের সদস্য র অথবা ল হবে।

(২) প্রথম সদস্য উষ্ম (হ) ব্যঞ্জন হলে পরের সদস্য র হবে।

(৩) প্রথম সদস্য শিস্ (স) ব্যঞ্জন হলে পরের সদস্য তরল বা স্পৃষ্ট হবে।

(৪) প্রথম সদস্য নাসিক্য (ম) ব্যঞ্জন হলে পরের সদস্য তরল হবে।

(৫) প্রথম সদস্য ন হলে পরের সদস্য র হবে।

(৬) প্রথম সদস্য শিস্ (শ, ষ) হলে পরের সদস্য নাসিক্য হবে।

মধ্য যুক্তব্যঞ্জন —

দৃষ্টি এবং শ্রুতি উভয় ক্ষেত্রেই বাংলা শব্দভাণ্ডারে মধ্য যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার হয়। যেমন — ব্যঞ্জন, টেন্টন, ইত্যাদি। শ্রুতি হিসাবে যেমন বলেও ইত্যাদি। মধ্য যুক্তব্যঞ্জনের অনেকগুলিই হল লগ্নব্যঞ্জন। এদের গঠন বৈশিষ্ট্য—

১. দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি পাশাপাশি বসে না, বসলে আগের অক্ষরটি অল্পপ্রাণ হয়ে যায়।

২. তৎসম শব্দের মাঝে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে এবং যদি পরের সদস্য 'র' অথবা 'ল' হয় তাহলে প্রথম সদস্য দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয় এবং দ্বিত্ব প্রাপ্ত সদস্যটি প্রথম অক্ষরের শেষে অবস্থান করে।

অন্ত যুক্তব্যঞ্জন —

কৃতঋণ এবং বিদেশি ভাষার শব্দ যেগুলি বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে, সেগুলিতে শব্দ শেষে যুক্তব্যঞ্জন দেখা যায় যেমন — ঙ্ + ক্ (ব্যঙ্ক), র্ + চ্ (মার্চ), ন্ + ট্ (প্যান্ট) ইত্যাদি।

এদের গঠন বৈশিষ্ট্য —

(i) বাংলায় আগত বিদেশি শব্দগুলি অন্ত্যব্যঞ্জন যুক্ত, শেষে স্বর উচ্চারিত হয় না।

(ii) তদ্ভব বাংলায় অন্ত্য যুক্তব্যঞ্জন নেই।

✧ স্বনিম / ধ্বনিতা / ধ্বনিমূলক / ধ্বনিমূল / মূলধ্বনি ✧

✧ সংজ্ঞা ঃ

Trubetzkoy --

> A Phoneme is a phonological unit which cannot be broken down into any smallar phonological units. By phonemic units should be understood each member of a phonemic contrast. A phonemic contrast is any sound contrast which, in the language in question, can be used as a means of differentiating intellectual meaning.

রামেশ্বর শ'—

> যেসব ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত এককের মধ্যে পারস্পরিক স্বনিমীয় বা মূলধ্বনিগত বিবোধ (phonemic contrast) থাকে সেই ধ্বনিগত এককগুলির প্রত্যেকটিকে ধ্বনিতা বা স্বনিম (phoneme) বলে।

মূলধ্বনি হল, কোন ভাষার ক্ষুদ্রতম একক, যার নিজস্ব কোন অর্থ নেই কিন্তু অর্থপ্রকাশে সাহায্য করে এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে পরিবর্তিত হয়। ত্রুবেৎস্‌কয় -এর মতে ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত এককের মধ্যে পারস্পরিক মূলধ্বনিগত যে বিরোধ থাকে, সেই ধ্বনিগত এককগুলির প্রত্যেকটিকে ধ্বনিতা বা স্বনিম বলে। এই ধ্বনি এককগুলির মধ্যে আছে 'একগুচ্ছ বিমূর্ত স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য' (a bundle of abstract destinctive features)। ব্লক ও ট্রেগার -এর মতে ধ্বনিমূল হলো উচ্চারণগতভাবে একই রকম ধ্বনির শ্রেণি বিশেষ (a class of phonemetically similar sounds)। ড্যানিয়েলের মতে – 'A phoneme is a family of sounds if a given language.'

মূলধ্বনির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে ত্রুবেৎস্‌কয় ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—

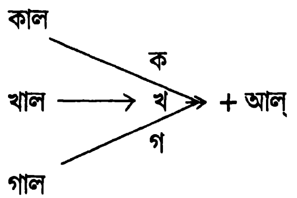
(ক) মূলধ্বনিকে আর ছোট এককে ভাঙ্গা যায় না।

(খ) একক বলতে মূলধ্বনিগত বৈপরীত্যের প্রত্যেক সদস্যকে নির্দেশ করে।

(গ) ধ্বনির এই বৈপরীত্য যে কোন ভাষার বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে পারে।

ধ্বনির এই বিমূর্ত বিষয়টি সংস্কৃত 'স্বন' এর সংগে 'ফোনিম' শব্দের 'ম' যোগ করে ভিন্ন নামে 'স্বনিম' করা হয়েছে। আবার নৈর্ব্যক্তিক বিশেষ্যের জন্য 'ধ্বনি' শব্দের সঙ্গে 'তা' যোগে 'ধ্বনিতা' করা হয়েছে। ভাষার গভীর বা মূল এই ভাবনা আমাদের পৌঁছে দেয় বলেই একে ধ্বনিমূল নাম দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণের সাহায্যে মূল ধ্বনির বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। মূলধ্বনিকে আর ক্ষুদ্রতম এককে ভাঙ্গা যায় না। বাংলায় উদাহরণ –

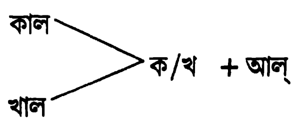


কাল এখানে 'ক', 'খ', 'গ' এই ধ্বনিগুলি একই ধ্বনিগুচ্ছ 'আল্'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থ পার্থক্য সৃষ্টি করেছে তাই এরা এক একটি ধ্বনিতা বা ধ্বনিমূল।

অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী এই ক্ষুদ্রতম একক যে সর্বদা একটি মাত্র ধ্বনি হবে, তা নয়। এক একটি স্বনিমীয় এককের একাধিক উচ্চারণ বৈচিত্র্য আছে। সেক্ষেত্রে স্বনিম একটি মাত্র ধ্বনি নয় ধ্বনিগুচ্ছ যাকে গ্লীসন বলেছেন ' Class of sounds', জোন্স এর মতে 'Family of sounds' বাংলাতে যেমন 'শ্রম' এবং 'শম' শব্দদুটিতে 'শ' এর উচ্চারণ স্থান আলাদা। প্রথমটি মূর্ধা দ্বিতীয়টি দন্ত্য স্থানে উচ্চারিত হয়। কিন্তু তবুও এরা একটি স্বনিম। কারণ তাদের অবস্থানের শর্ত নির্দিষ্ট।

✧ **বিশ্লেষণ ঃ**

স্বনিম বিশ্লেষণে ইতিমূলক ও নেতিমূলক দুটি দিক আছে। ইতিমূলক বিশ্লেষণ অনুযায়ী স্বল্প প্রভেদক শব্দযুগ্মের ধ্বনি দুটি অর্থপার্থক্য সৃষ্টি করলে তারা পৃথক স্বনিম আবার উচ্চারণে তফাৎ না থাকলে একই স্বনিম। এক্ষেত্রে আলাদা স্বনিমের তালিকা থেকে দুর্বল উচ্চারিত স্বনিমটিকে বাদ দিতে হবে। স্বল্প প্রভেদক শব্দযুগ্মের প্রত্যেক শব্দে মাত্র একটি করে ধ্বনি পৃথক হওয়া চাই। যেমন –



তাছাড়া স্বল্প প্রভেদকগুলি একটি ভাষারই নিজস্ব শব্দ হতে হবে এবং উচ্চারণের ক্ষেত্রে খাঁটি দেশিয় উচ্চারণ গ্রহণ করা উচিত। এই বিষয়গুলি মেনে চললে স্বনিম নির্ণয় সহজ সাধ্য হবে। অনেক সময় দুটি ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ প্রতিপন্ন করার জন্য স্বল্প প্রভেদক পাওয়া যায় না। আগে বাংলায় 'ড' ও 'ড়' -কে স্বতন্ত্র স্বনিম বলা হত না, কিন্তু বর্তমানে দুটি স্বরধ্বনির মাঝে 'ড' বসতে পারে (সোডা)। তাই আলাদা

স্বনিম।

ড়
/ ড / <
ড়

মূলধ্বনি পরিবর্তন ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশ বলতে বুঝায় কোন ধ্বনির আগে ও পরে ব্যবহৃত হচ্ছে যে ধ্বনি। যেমন 'আলতা' এবং 'উল্টা' শব্দের মধ্যে 'ল' ধ্বনি আছে কিন্তু প্রথম শব্দের 'ল' ধ্বনিটির পরে দন্ত্য ধ্বনি থাকায় তার প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দের 'ল' ধ্বনিটির পর মূর্ধান্য ধ্বনি থাকায় তার প্রকৃতিগত বদল ঘটেছে। অর্থাৎ প্রথম 'ল' ধ্বনিটি ধ্বনিতা কিন্তু দ্বিতীয় ধ্বনিটি ধ্বনিতা বা মূলধ্বনি নয়।

✧ সহধ্বনি ঃ

ব্লক এবং ট্রেগার ধ্বনিমূলের বিভিন্নতা এবং বৈপরীত্য সূচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। কারণ ধ্বনিমূলের উচ্চারণ বৈচিত্র্য থাকে এবং তাকে সহধ্বনি বা Allophone বলে। একটি ধ্বনিমূলের অন্তর্গত সহধ্বনিমূলের ধ্বনিগত সাদৃশ্য অংশত বা সম্পূর্ণ, দুই হতে পারে। পরিবেশ বা অবস্থান অনুযায়ী এগুলি পরস্পরের পরিপূরক। যেমন বাংলায় 'ন', 'ণ', 'ঞ' একই ধ্বনিমূলের সহধ্বনি, কারণ 'ন' ত-বর্গের ধ্বনির আগে ; ণ, ট-বর্গের ধ্বনির আগে এবং ঞ চ-বর্গের ধ্বনির আগে ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং পরস্পর পরিপূরক একাধিক সহধ্বনিই হল মূলধ্বনি বা ধ্বনিমূল।

বাংলাতে 'শ', 'ষ', 'স' এদের উচ্চারণ 'শ' এর মতো। আবার শ-এর সঙ্গে ল-ফলা বা র-ফলা যুক্ত হলে তা দন্ত উচ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে এরা সহধ্বনিমূল। কিন্তু কোনটিকে ধ্বনিমূল ধরা হবে। অধ্যাপক জোন্সের মতে যেটি বেশি উচ্চারিত হবে, সেটিই ধ্বনিমূল। বাংলায় 'শ' হল ধ্বনিমূল। তবে মনে রাখা দরকার সমোচ্চারিত ধ্বনিটি একই ভাষা বা উপভাষার অন্তর্গত হতে হবে। আলাদা ভাষার হলে হবে না। যেমন সংস্কৃতে 'শম' ও বাংলায় 'সম' এর শ-ধ্বনির উচ্চারণ একই। কিন্তু শম ও সম শব্দ দুটির ক্ষেত্রে 'শ' ও 'স' ধ্বনি দুটি আলাদা স্বনিম।

কোন ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে হলে ধ্বনিমূল বা মূলধ্বনিগুলিকে অবশ্যই জানা প্রয়োজন। মূলধ্বনির লিখন পদ্ধতি ক্ষেত্রে // চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। একটি ভাষার স্বরও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির অবস্থান ও পরিবেশ ভেদে আলাদা। সেজন্য মূলধ্বনি ভিত্তিক প্রতিলিপি হল একটি কথ্যভাষার মূলধ্বনি ব্যবস্থার যথার্থ প্রতিরূপ।

স্বনিমের উচ্চারণ বৈচিত্র্য দুরকমের —

(১) মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation)

(২) উপধ্বনি বা পূরক ধ্বনি (Allophone) বা সহধ্বনি।

✧ **মুক্ত বৈচিত্র্য ঃ** — একটি ধ্বনির একাধিক উচ্চারণ বৈচিত্র্য যখন ব্যক্তির খেয়াল খুশি অনুযায়ী সাধিত হয়, তবে একের অন্য উচ্চারণে অর্থ পার্থক্য সৃষ্টি করে না, তখন সেই উচ্চারণ বৈচিত্র্যকে মুক্ত বৈচিত্র্য বলে। যেমন — বন্যায় ভেসে আসা শবগুলি দাহ করা হল। 'শব' শব্দের উচ্চারণ 'সব' করলেও অর্থ পার্থক্য সৃষ্টি করে না। যেমন পাড়ার সব ছেলেরা শব দাহ করতে গেলাম। কিংম্বা — ' শ-বার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনাতে নজরুল'- অংশটি চোখে দেখে পড়ার সময় 'শ-বার' (একশ বার) বানান দেখে খটকা লাগতেই পারে কিন্তু যে কেউ ব্যক্তি উচ্চারণ করলে আমরা আর অর্থ বুঝতে অসুবিধা থাকে না।

বাগ্‌যন্ত্রের উপর মানুষের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের অভাব থেকেই ধ্বনিতত্ত্বে মুক্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। যেমন 'খ' ধ্বনিটি বিভিন্ন শব্দে উচ্চারণস্থান বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।

✧ **উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি ঃ** — এক্ষেত্রে ধ্বনি দুটির অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে না, অথচ সাদৃশ্য থাকে, এই ধ্বনিগুলি মূলধ্বনির পূরকধ্বনি। অর্থাৎ ভাষার দুটি ধ্বনি সর্বদাই শর্তসাপেক্ষ থাকে। পরিবেশ বা অবস্থান অনুযায়ী একে অপরের পূরকধ্বনি হয়।

যেমন —

শ্রী — দন্ত্য উচ্চারণে 'শ' (স)

শীল — তালব্য উচ্চারণে 'শ'

এখানে 'শ' এর উপধ্বনি 'স', আলাদা স্বনিম নয়।

অথবা — /ক/ — কিল .... ক$_১$ ...... ই

কুল — ক$_২$ .....উ

কাল .... ক$_৩$ .....আ

কোল .... ক$_৪$ ......ও পূরক অবস্থানে 'ক' ধ্বনির উচ্চারণ বদলে যাচ্ছে।

প্রায় সমোচ্চারিত এই ধ্বনিগুলিকে সন্দেহভাজন জোড় বলা হয়। এগুলি যদি স্বনিমের পূর্বশর্ত পূরণ করে তবে স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা দেওয়া যায়।

কখনো কখনো স্বনিম বিরোধ নিরপেক্ষ হয়ে যায় এই ব্যাপারটিকে আর্কিওফোনিম বলে। যেমন —

বাঘ
বাগ — বাগ্ (উচ্চারণে)

এক্ষেত্রে উচ্চারণ পার্থক্য না থাকায় স্বনিম বিরোধ নেই। তাই ব্যাপারটি আর্কিওফোনিম।

এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বাংলা ভাষায় স্বরস্বনিম এবং ব্যঞ্জনস্বনিমগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

রামেশ্বর শ' ও কালাম মনজুর মোরশেদ অনুযায়ী –

বাংলা স্বরস্বনিম

সংখ্যা	স্বনিম	আ. ধ্ব.লি.	শব্দ (অর্থ)	আ. ধ্ব.লি.
১.	ই	/i/	খিল (দরজার খিল)	/k^{h}il/
২.	এ	/e/	খেল (ধাতু)	/k^{h}el/
৩.	এ্যা	/æ/	খ্যাল (তুই)	/k^{h}æl/
৪.	আ	/a/	খাল (জলের খাল)	/k^{h}al/
৫.	অ	/ /	খল (চতুর)	/k^h l/
৬.	ও	/o/	খোল (বাজনা বিশেষ)	/k^{h}ol/
৭.	উ	/u/	খুল (খোলা, ধাতু)	/k^{h}ul/

বাংলা ব্যঞ্জনস্বনিম

সংখ্যা	স্বনিম	আ. ধ্ব.লি.	শব্দ (অর্থ)	আ. ধ্ব.লি.
স্পর্শধ্বনি ও ঘৃষ্ট ধ্বনি ঃ				
১.	প্	/p/	পাল (নৌকার পাল)	/pal/
২.	ফ্	/p^h/	ফাল (লাঙলের)	/p^{h}al/
৩.	ব্	/b/	বাল (বালক)	/bal/
৫.	ত্	/t/	তান (সঙ্গীতের রাগ)	/tan/
৬.	থ্	/t^h/	থান (থান ধুতি)	/t^{h}an/
৭.	দ্	/d/	দান (প্রদান)	/dan/
৮.	ধ্	/d^h/	ধান (শস্য)	/d^{h}an/

সংখ্যা	স্বনিম	আ. ধ্ব.লি.	শব্দ (অর্থ)	আ. ধ্ব.লি.
১২.	ঢ্	/ ^{h}/	ঢক-ঢক (শব্দ)	/ ^{h} k ^{h} k/
১৩.	চ্	/cʃ/	চাল (চাউল)	/cʃal/
১৪.	ছ্	/cʃ^h/	ছাল (চামড়া)	/cʃ^{h}al/
১৫.	জ্	/ /	জাল (ফাঁদ)	/ al/
১৬.	ঝ্	/ ^{h}/	ঝাল (মশলা)	/ ^{h}al/

১৭.	ক্	/k/	কোল (ক্রোড়)	/kol/
১৮.	খ্	/kʰ/	খোল (বাদ্যযন্ত্র)	/kʰol/
১৯.	গ্	/g/	গোল (গোলাকার)	/gol/
২০.	ঘ্	/gʰ/	ঘোল (খাদ্যবস্তু)	/gʰol/

নাসিক্য ধ্বনি ঃ

২১.	ম্	/m/	হিম (ঠাণ্ডা)	/him/
২২.	ন্	/n/	হীন (অধম)	/hin/
২৩.	ঙ্	/ŋ/	হিঙ (মাদক)	/hiŋ/

কম্পিত ও পার্শ্বিক ধ্বনি ঃ

২৪.	র্	/r/	রাশ (রশি)	/raʃ/
২৫.	ল্	/l/	লাশ (দেহ)	/laʃ/

উষ্ম ধ্বনি ঃ

২৬.	শ্	/ʃ/	শাল (বৃক্ষ)	/ʃal/
২৭.	হ্	/h/	হাল (লাঙ্ল)	/hal/

কম্পিত ও তাড়িত ঃ

	র্	/r/	হার (পরাজয়)	/har/
২৮.	ড়	/ /	হাড় (অস্থি)	/ha /

নৈকট্য ধ্বনি ঃ অর্ধস্বর ঃ

২৯.	য়	/ĕ/	ছায়া (প্রতিরূপ)	/cʃʰaja/
৩০.	ওয়	/w/	ছাওয়া (ঢাকা)	/cʃʰawa/

✧ অবিভাজ্য ধ্বনি ✧

✧ সংজ্ঞা

অবিভাজ্য অর্থাৎ যে ধ্বনি বিভাজন করে দেখানো যায় না । পরম্পরাক্রমে বিশ্লেষণযোগ্য নয় অথচ ধ্বনির উচ্চারণে মুখপ্রযত্নের বহুতা রয়েছে, এমন ধ্বনিকে বলা হয় বা অবিভাজ্য ধ্বনি বা বিভাজনাতিরিক্ত স্বনিম (Supra-segmental phoneme)। অবিভাজ্য ধ্বনির কোন রূপ নেই, তবে তার অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ এরা এমন একপ্রকার

স্বনিম যারা কোন রূপের মধ্যে ধরা পড়ে না, কিন্তু তার নিজস্ব চরিত্রের জন্য অবশ্যই অনুভবগম্য। এরা বাক্যের অর্থবোধে যথার্থ সাহায্য করে। যেমন সাধারণভাবে বলা একটা কথাকে আমরা উদাহরণ হিসাবে দেখাতে পারি—

১. হ্যাঁ, তুমি যাবে। (ব্যক্তির যাওয়াকে নির্দিষ্ট করে)

২. হ্যাঁ, তুমি যাবে। (ব্যক্তির যাওয়াকে আদেশ করে)

৩. হ্যাঁ, তুমি যাবে। (ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে)

বিশেষ সুর আরোপ করার ফলে এই বাক্যে যে অর্থ প্রকাশ পায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থও প্রকাশ পায়। তাই অবিভাজ্য ধ্বনি, বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যও স্বতন্ত্র স্বনিম-রূপে গৃহীত হতে পারে।

✧ বিভিন্ন প্রকার অবিভাজ্য ধ্বনি ঃ

বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ-ভঙ্গির অনুসরণে পাঁচটি অবিভাজ্য ধ্বনির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যায় । তবে এই তালিকা দীর্ঘতরও হতে পারে। পাঁচ প্রকার অবিভাজ্য ধ্বনি হল —

(১) মাত্রা বা স্বরের দীর্ঘত্ব

(২) প্রস্বর, ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত

(৩) স্বরাঘাত বা সুরতরঙ্গ

(৪) যতি বা অবকাশ

(৫) অনুনাসিকতা

✧ মাত্রা ঃ

মাত্রা হল এক প্রকার অবিভাজ্য ধ্বনি। ধ্বনির উচ্চারণ কালের একককে বলা হয় মাত্রা। মাত্রা দুই প্রকার । সাধারণতঃ মুক্ত দলে একমাত্রা এবং রুদ্ধ দলে দু মাত্রা হয়। মাত্রাভেদে শব্দের ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন —

১. 'তুমি কি খেয়েছো ?'

২. 'তুমি কী খেয়েছো'।

এ দুটি বাক্যের প্রথমটিতে 'কি' শব্দে একমাত্রা এবং প্রশ্ন করা হয়েছে সে খেয়েছে কি না। দ্বিতীয় বাক্যে 'কী' শব্দে দুইমাত্রা এবং সে কোন্ বস্তু খেয়েছে, তাই জানতে চাওয়া হয়েছে।

✧ প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক বা বল ঃ

প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক বা বল হল এক প্রকার অবিভাজ্য ধ্বনি। কোন কোন ভাষায় শব্দের মধ্যে কোন কোন নির্দিষ্ট স্থানে উচ্চারণ কালে বিশেষ জোর দেওয়া হয়, ফলে ঐ স্থানের অক্ষরটি উচ্চারণ তুলনামূলকভাবে তীব্রতর হয়। এই উচ্চারণগত বল প্রয়োগকে বলা হয় প্রস্বর, শ্বাসাঘাত, ঝোঁক বা বল। বিশেষ

কোন ধ্বনি বা দল উচ্চারণকালে যে বিশেষ বল প্রয়োগ করা হয় তাকেই বলা হয় 'শ্বাসাঘাত' বা 'প্রস্বর'। যদিও মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর 'ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থে মতে – 'ইংরেজীর মতো বাংলা Stress বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ভাষা নয়।" তবে বাংলায় কোন শব্দের আদিতে যদি স্বরান্ত বা মুক্তদল থাকে, তবে সাধারণতঃ আদি স্বরটি শ্বাসাঘাত না হয়ে দ্বিতীয় স্বরটি শ্বাসাঘাত হয়। যেমন – বা তাস রা জা, ত বে, অ সাধারণ, র বীন্দ্রনাথ, য থার্থ প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় শ্বাসাঘাত প্রয়োগে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

(ক) বাংলা আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে অনেক সময় আদি স্বর অকারণ দীর্ঘতা লাভ করে, যেমন – অকাল > আকাল, অলুনি > আলুনি।

(খ) আদিস্বর শ্বাসাঘাত হওয়াতে মধ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং স্বরধ্বনি লোপ পায়। যথা – গামোছা > গাম্‌ছা, পাগল + অ > পাগ্‌লা।

(গ) শ্বাসাঘাত ও উচ্চারণ- দ্রুতির ফলে শব্দসঙ্কোচ বা বাক্য সঙ্কোচ ঘটে। যেমন – কোথায় যাবে > কোজ্জাবে, কতদূর > কদ্দুর।

(ঘ) শ্বাসাঘাতের ফলে কখন কখন ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব লাভ করে। যথা – সকলে > সক্কলে, ছোট > ছোট্ট।

(ঙ) শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে বাংলায় শব্দার্থ পরিবর্তনেরও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন – ক ড়া-আদিস্বরে শ্বাসাঘাত, অর্থ 'কঠিন', ক ড়া, অন্ত্যস্বরে শ্বাসাঘাত অর্থ – 'কড়াই', ডা ল = শাখা, ডা ল = দ্বিদল ।

(চ) অনাদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত-হেতু শব্দের আদিস্বর বহু স্থলেই লোপ পেয়েছে। যেমন - - উরুমাল > রুমাল, উধার > ধার ।

রামেশ্বর 'শ শ্বাসাঘাতকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন – শব্দ শ্বাসাঘাত ও বাক্য শ্বাসাঘাত।

১. শব্দ শ্বাসাঘাত ঃ

ইংরাজি বা জার্মানের মতো বাংলা শ্বাসাঘাত প্রবল নয় তাই হয়তো সর্বদা শ্বাসাঘাত অর্থ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে পারে নি। অবশ্য ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন –

ˈঅ- তুল = ব্যক্তির নাম
অ - ˈতুল = অতুলনীয়

কিন্তু এই দুই শব্দে শ্বাসাঘাতের যে পার্থক্য তা সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে পাওয়া যায় না। কেবল সংস্কৃতানুগ উচ্চারণে, আবৃত্তিতে বা বক্তৃতায় এই শ্বাসাঘাত লক্ষ করা যায়।

বিভিন্ন প্রকার অক্ষর যুক্ত শব্দে শ্বাসাঘাতের অবস্থান লক্ষ করা যায় –

(১) **এক অক্ষর যুক্ত শব্দ ঃ** – অর্থ গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল। যেমন - কান্‌।

(২) **দুই অক্ষর যুক্ত শব্দ ঃ** — এই শব্দে অক্ষর গঠন হয় — স্ব ব্য স্ব, ব্য স্ব ব্য স্ব স্ব ব্য স্ব ব্য, ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য — এই প্রকার দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন রাজা , কমল, আবার ব্য স্ব ব্য ব্য স্ব ব্য এই ধরণের অক্ষরে শ্বাসাঘাত প্রথম অক্ষরে পড়ে — গামছা অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার গঠনযুক্ত শব্দে শ্বাসাঘাতের অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শ্বাসাঘাতের সাধারণ প্রবণতা দেখা যায় যা ক্রমে স্থায়ী ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সূত্রাকারে বৈশিষ্ট্য হল —

(ক) বাংলায় আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে আদিস্বর দীর্ঘ হয়। অলুনি > আলুনি

(খ) আদি শ্বাসাঘাতে মধ্য ও অন্ত স্বর দুর্বল হয় ও স্বরলোপ হয়। গামোছা > গাম্‌ছা

(গ) শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দ সংকোচ ঘটে — কোথায় যাবে > কোজ্‌জাবে

(ঘ) ঝোঁকের ফলে ব্যঞ্জন ধ্বনি দ্বিত্ব হয় — সকল > সক্কলে

(ঙ) আদি স্বরে ঝোঁক পড়ায় আদি স্বর লোপ পেয়েছে। উধার > ধার

বাক্য শ্বাসাঘাত ঃ — বাক্য শ্বাসাঘাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদগুলির কোন একটিতে শ্বাসাঘাত পড়ে অথবা পদগুচ্ছের প্রথমে পড়ে।

(১) পদগুচ্ছ অনুযায়ী — যেমন — রামের সঙ্গে / সে/কলকাতায়/কাজ করে।

(২) অর্থ স্পষ্ট করার জন্য বাক্যের কোন বিশেষ শব্দের উপর ঝোঁক দেওয়া হয়। যেমন রাম কলকাতায় কাজ করে (বিবৃতমূলক বাক্য)।

(৩) যুক্তি ও আবেদন মূলক অর্থ বোধের জন্য শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন — অন্যায় কাজটা আমি করেছি।

(৪) আবার একই বাক্যের মধ্যে স্থান পরিবর্তনে বাক্যের অর্থ পরিবর্তন হয়।

^{0}আমি বই পড়ি — অর্থাৎ অন্যলোক নয়, কেবল আমি পড়ি।

আমি ^{0}বই পড়ি — অর্থাৎ নোট নয়, বই পড়ি।

আমি বই ^{0}পড়ি — অর্থাৎ আমি শুধু কিনিনা পড়ি।

অর্থাৎ শ্বাসাঘাত অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলা ভাষায় উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে এবং ছন্দ নির্ণয়ে শ্বাসাঘাতের গুরুত্ব কম নয়।

✧ সুরতরঙ্গ বা স্বরাঘাত ঃ

ভাষা উচ্চারণ কালে যখন আমরা স্বরতন্ত্রী (Vocal cords) দুটির কম্পনের দ্রুততা বাড়িয়ে সুর বা স্বরকে তীব্র করে জোর দিই তখন তাকে বলে স্বরাঘাত বা সুরঘাত। সুব গ্রিক, চিনা ও বৈদিক ভাষায় লক্ষ করা যায়। সুর অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন—

১. **তুমি আজ এখানে কি বই পড়ছো —এই বাক্যে 'তুমি' শব্দটি যদি উদাত্ত সুরে উচ্চারণ করা যায়, তবে বোঝা যায়, বক্তা অপর কারো কথা বলছেন না, 'তুমি' নামক ব্যক্তিটির উদ্দেশ্যেই বলছেন।**

২. তুমি আজ এখানে কি বই পড়ছো — এই বাক্যে 'আজ' শব্দটি উদাত্ত সুরে উচ্চারণ করায় তিনি বিশেষ দিনটিকেই নির্দেশ করছেন।

৩. 'তুমি আজ এখানে কি বই পড়ছো' — এই বাক্যে তিনি 'এখানে' শব্দটি উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করাতে একটা বিশেষ স্থান গুরুত্ব পেল।

৪. তুমি আজ এখানে কী বই পড়ছো — 'কী' শব্দটি উদাত্ত সুরে উচ্চারণ করায় বইটির পরিচয়ই জানতে চাওয়া হয়েছে।

৫. 'তুমি আজ এখানে কি বই পড়ছো' — 'বই' শব্দটি উদাত্ত সুরে উচ্চারণ করায় বক্তার উদ্দিষ্ট পড়ার বস্তুটি, সেটি বই অথবা অন্য কিছু।

৬. 'তুমি আজ এখানে কি বই পড়ছো'— 'পড়ছো' শব্দটি উদাত্ত সুরে উচ্চারণ করায় ব্যক্তিটি বই পড়ছে অথবা দেখছে অথবা অপর কিছু করছে।

সুর — এর বৈশিষ্ট্য —

অর্থ পরিবর্তনে সুর এর ভূমিকা চিনা ভাষায় সব থেকে বেশি। চিনা তা সুরের পার্থক্যে 'মা' কখনো 'মাতা' আবার কখনো 'ঘোড়া' অর্থে প্রযুক্ত হয়। সংস্কৃত ভাষাতেও সুর যথেষ্ট গুরুত্বপূণও। সুর পার্থক্যে অর্থ পার্থক্য সৃষ্টি করে। বাংলার ক্ষেত্রেও অর্থ পরিবর্তন হয়।

উঁ — উচ্চ থেকে উন্নীয় মান সুর = প্রশ্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়।

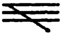
উঁ — উচ্চ থেকে অবনীয়মান সুর = 'তা বটে' অর্থে ব্যবহার করা হয়।

উঁ — নিম্ন থেকে অবনীয়মান ও প্রলম্বিত সুর = 'বেশ দেখা যাবে' অর্থে ব্যবহার করা হয়।

উঁ — আকস্মিক দ্রুত উচ্চারণ = বিরক্তি ব্যঞ্জক।

অনেক সুরের অর্থ নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি মানতে চান না। কিন্তু বাংলায় তিন প্রকার সুরতরঙ্গ দেখা যায় —

(১) উর্ধ্বমুখী ঃ — উচ্চারণ স্বাভাবিক থেকে চড়ায় যায় —

তুমি যাবে ?  (প্রশ্নবোধক)

(২) নিম্নমুখী সুর ঃ — উচ্চারণ স্বাভাবিক থেকে নিম্নমুখী —

তুমি যাবে ! (বিস্ময়বোধক)

(৩) জটিল সুর বা সমান্তরাল সুর ঃ — এদের মিশ্রণে অথবা স্বাভাবিক পথে চলে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। যেমন —

তুমি যাবে। (নির্দেশ বোধক)

সুতরাং সুর ও ঝোঁক বাংলা ভাষায়, অন্যান্য ভাষার মতো গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বিশেষ ভূমিকা যে পালন করে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

✧ যতি বা অবকাশ বা সন্ধান ঃ

যতি বা অবকাশ বা সন্ধান হল এক প্রকার অবিভাজ্য ধ্বনি। বাক্-প্রবাহে যে উপায়ে ধ্বনিগুলি একে অপরকে অনুসরণ করে অথবা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাকেই বলা হয় 'যতি' বা 'সন্ধান'। এ না হলে বাক্যে অর্থবিভ্রাট ঘটা খুব স্বাভাবিক। যেমন–

১. মনোরমাকে ডেকে দাও। – বাক্যে 'মনোর' এবং 'মাকে' যদি বিরতি না দিয়ে উচ্চারণ করলে অন্য অর্থ প্রকাশ করে।

২. মনোর মাকে ডেকে দাও। – যতিস্থাপনের সামান্যতম ব্যতিক্রমে অর্থাৎ বিরতি দিয়ে উচ্চারণ করলে বাক্যটির অর্থ আলাদা হয়।

✧ অনুনাসিক ধ্বনি ঃ

অনুনাসিক ধ্বনি হল এক প্রকার অবিভাজ্য ধ্বনি। শ্বাসবায়ু নাসা পথে বের হয়ে ধ্বনি উচ্চারিত হলে অর্থবিভ্রাট ঘটতে পারে। যেমন –

কাটা – হাত-পা কাটা অর্থে
কাঁটা – মাছের কাঁটা অর্থে

তবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ভাষিক পরিবেশে কোন উক্তিতে ব্যবহার করলে শ্রোতার কাছে অর্থবিভ্রাট নাও ঘটতে পারে। যেমন – 'সিদ্ধ করার পর কাঁটা মাছের কাঁটাগুলো বের করা সহজ।'

ধ্বনি পরিবর্তন

সময়ের পবিবর্তনে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন একই সঙ্গে আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক। ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন হল বহিরঙ্গ ব্যাপার। বাংলা ভাষাতেও কালে কালে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে এবং এর ফলে ভাষা নূতন রূপ লাভ করেছেন। তাছাড়া অন্য ভাষা থেকে যে শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলিও কিছু পরিবর্তনের পর বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। ভাষা বিজ্ঞানে এই ধ্বনির পরিবর্তন দুই প্রকার –

সাধারণ ধ্বনি পরিবর্তন ঃ যেখানে বাক্‌ব্যবহারে বিশেষ অর্থ পার্থক্য থাকে না।

ব্যাকরণগত ধ্বনি পরিবর্তন ঃ যেখানে ব্যাকরণগত প্রভাবই মূল।

✧ ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ ✧

ভাষাবিজ্ঞানীরা ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করেছেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান হল –

(১) ভৌগোলিক পরিবেশ
(২) অন্যভাষার প্রভাব
(৩) সাংস্কৃতিক ও ধর্মিয় কারণ
(৪) সন্নিকটস্থ ধ্বনির প্রভাব
(৫) ভাষা ব্যবহারকারী মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি
(৬) আরামপ্রিয়তা
(৭) শ্রবণ ও বোধের ত্রুটি

✧ ভৌগোলিক পরিবেশ ঃ –

স্থানভেদে একই ভাষার ধ্বনিগুলির উচ্চারণ পার্থক্য ঘটে। এই ভিত্তিতেই মেদিনীপুর অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার ও দিনাজপুর অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে ধ্বনি বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমশ এই পার্থক্য এমন হয় যে মূলভাষার উপাদান বলে একে আর চেনা যায় না। একই বাংলা ভাষা বঙ্গালিতে 'ভাত'কে ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী 'বাত'। সুতরাং – অঞ্চল ভেদের কারণে ধ্বনি পরিবর্তন হয়।

✧ **অন্যভাষার প্রভাব ঃ –**

সীমারেখা দিয়ে বিভাজন করলেও মানুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা যায় না। সেই সূত্রে এক ভাষার প্রভাব অন্য ভাষায় পড়ে এবং ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। মধ্য যুগে সাম্রাজ্যবাদের সূত্র ধরে আরবি-ফারসি ইংরাজি ভাষার প্রবেশ ও প্রভাব ঘটে। আবার বাণিজ্যের সূত্র ধরে রুশ, জাপান, চিন ইত্যাদি শব্দ ধ্বনি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে। যেমন – আবার আর্য গোষ্ঠির ভাষা বহির্ভূত অন্য ভারতীয় ভাষাগুলিও বাংলায় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যেমন পুরুলিয়ার বাংলা ভাষায় অষ্ট্রিক প্রভাব বেশি আবার চট্টগ্রামের ভাষার উপর বর্মি ভাষা প্রভাব সৃষ্টি করে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

✧ **সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণ ঃ –**

একই ভাষা ব্যবহার করে অথচ সাংস্কৃতিক ও ধর্মিয় কারণে তাদের মধ্যে উচ্চারণগত ধ্বনি পার্থক্য দেখা যায়। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গ্রাম্য ও শহুরে মানুষের মধ্যে ধ্বনি বৈষম্য দেখা যায়। যেমন অনেক গ্রাম্য মানুষই শরীরকে 'শরীল' বলে থাকেন কিংবা অনেক মুসলমান আছেন যারা 'স' কে 'ছ' উচ্চারণ করেন।

✧ **সন্নিকটস্থ ধ্বনির প্রভাব ঃ –**

একই ভাষার মধ্যে এক বা একাধিক সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাবে শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে নিকটস্থ দুটি ধ্বনির উচ্চারণ স্থান এক না হলে ঐ ধ্বনি দুটির মধ্যে একটির উচ্চারণ স্থান উভয়ে দখল করে তখন ধ্বনি সাম্যের সৃষ্টি হয়। যেমন সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যের শব্দ 'কর্ম'প্রাকৃত স্তরে 'কম্ম' হয়েছে। সর্বদাই যে যুক্ত ব্যঞ্জন যুগ্ম হবে তা নয়, কখনও কখনও আবার নূতন ধ্বনির আগমন ঘটে।

✧ **ব্যবহারকারীর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ –**

ভাষা ব্যবহারকারী ব্যক্তির মানসিকতা অনুযায়ী ধ্বনি পরিবর্তন হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণেও কোন কোন ব্যক্তি ভাষা উচ্চারণে বাগ্‌বৈদগ্ধ সৃষ্টি করতে চান। তখন ধ্বনি পরিবর্তন হয়। আবার দুটি ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষ যখন এক স্থানে সমবেত হন তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে পরিশীলিত উচ্চারণ করে ফলে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। এই সূত্র ধরে আজকের কলকাতার ভাষার ধ্বনি পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

✧ **উচ্চারণের ত্রুটি ঃ –**

উচ্চারণ কষ্ট দূর করার জন্যও ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। এই সূত্রে সংস্কৃত

শব্দের জটিল ধ্বনিরীতি বাতিল হয়েছে। তাই কালক্রমে প্রাকৃত অপভ্রংশ ভাষা জন্ম নিয়েছে। আবার অসাবধনতা বশত উচ্চারণের জন্য শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন হয়েছে। এই সূত্রে 'Hospital' বাংলায় 'হাঁসপাতাল' হয়েছে ,'খ্রীষ্টমাস' হয়েছে 'কেষ্টমাস' এবং 'অ্যাডভ্যাটাইজ' হয়েছে ' ইটভাটা' ইত্যাদি।

✧ আরাম প্রিয়তা ঃ –

আমাদের জিহ্বা আরামপ্রিয়তার জন্যই বিভিন্ন উচ্চারণ কালে যথাযথ না হওয়ায় ধ্বনির বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটে। আবার বক্তা ঠিকই বল্ছেন কিন্তু শ্রোতা তা যথাযথ তা শুনতে না পেয়ে অন্য উচ্চারণ করে ধ্বনি পরিবর্তন হয়। যেমন মুসলমানেরা একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে বলে – 'আস্সালামে আলায় কুম' স্থলে 'সালায় মালায় কুম'। কিন্তু যথাযথ না জানায় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে।

এইভাবে নানা কারণে একটি ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে। ভাষা বিবর্তনে এই প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক।

✧ ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকৃতি ✧

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগুলির শব্দ বিবর্তন কালে দেখা যায় যে ধ্বনিগুলির উচ্চারণ যথাযথ রক্ষিত হয় নি। শব্দ হল ধ্বনির সমষ্টি কথা বলতে গিয়েই শব্দ মধ্যস্থিত ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। বাগ্‌যন্ত্রের শিথিলতা মূলতঃ এই পরিবর্তন ঘটায়। বৈয়াকরণরা ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ লক্ষ করেছেন। যথা –

(১) ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু, দার্শনিক বডিনের মতে একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে।

(২) অন্যজাতির প্রভাব অর্থাৎ ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠির প্রভাব।

(৩) উচ্চারণের ত্রুটি, আরাম প্রিয়তা ও অসাবধানতা।

(৪) বক্তা-শ্রোতার বলা ও শোনার পার্থক্য ইত্যাদি ধ্বনি পরিবর্তন দুই শ্রেণির -

ক. অর্থনিরপেক্ষ ধ্বনিপরিবর্তন বা Phonetic Change – এখানে শুধু উচ্চারণগত পরিবর্তন হয়। যেমন – ধর্ম > ধম্ম।

খ. অর্থ সাপেক্ষ ধ্বনি পরিবর্তনে শব্দের বা Phonemic Change -এই শ্রেণির পরিবর্তনে শব্দের অর্থ বদলে যায়।

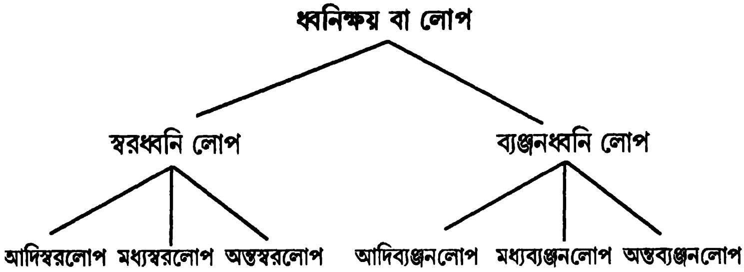
অর্থ নিরপেক্ষ ধ্বনি পরিবর্তন বর্তমান আলোচ্য বিষয়। ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানীরা এগুলি পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি সূত্র নির্ণয় করেছেন। এগুলি হল –

১. ধ্বনিক্ষয় বা ধ্বনিলোপ

২. ধ্বনিবৃদ্ধি বা ধ্বন্যগম

৩. ধ্বনির স্বরূপগত পরিবর্তন বা রূপান্তর

✧ ধ্বনিক্ষয় বা ধ্বনিলোপ ✧



✧ স্বরধ্বনি লোপ

স্বরধ্বনির লোপই স্বরলোপ। শব্দে ধ্বনির অবস্থান অনুযায়ী এটি তিন প্রকার —

ক) **আদিস্বরলোপ ঃ** — শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না থেকে যদি শব্দের মধ্যে বা শেষের কোন অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকলে আদিস্বর ক্রমশ ক্ষীণ হয় এবং শেষে লোপ পায়। শব্দের আদিতে এই স্বরলোপকে আদি স্বরলোপ বলে।

অ — লোপ ঃ আলাবু > লাউ, অতিসী > তিসি

উ — লোপ ঃ উদ্ধার > ধার, উদুম্বর > ডুমুর

এ — লোপ ঃ এহেন > হেন

ও — লোপ ঃ ওঝা > ঝা ইত্যাদি।

খ) **মধ্যস্বরলোপ ঃ** — সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের মাঝে থাকা স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে পরে লোপ পায়। একে মধ্যস্বরলোপ বলে।

অ — লোপ ঃ বসতি > বস্তি

উ — লোপ ঃ সুবর্ণ > স্বর্ণ

ও — লোপ ঃ গামোছা > গাম্ছা ইত্যাদি।

গ) **অন্তস্বরলোপ ঃ** — বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রবণতা অনুযায়ী শব্দ শেষে শ্বাসবায়ু ক্রমশ কমে যায় এবং এর ফলে অন্তস্বরের লোপ ঘটে।

অ — লোপ ঃ রাম > রাম্

ই — লোপ ঃ — রাশি > রাশ ইত্যাদি।

✧ দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা ঃ

এছাড়াও দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা আছে। শ্বাসবায়ু বাগযন্ত্রের এক ধাক্কায় যতটুকু ধ্বনিগুচ্ছকে একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায় তাকে অক্ষর বলে। বাংলায় উচ্চারণটা ঠিক জোড়মাত্রায় হয় না তবে জোড়অক্ষরের শব্দ হয়। তাই একে দ্বিমাত্রিকতা না বলে দ্ব্যক্ষরতা বলাই যুক্তিযুক্ত। যেমন গামোছা > গাম্ছা (গাম্ + ছা) — দুই অক্ষর।

✧ ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ

স্বরলোপের মতো শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে ব্যঞ্জনের লোপ ঘটে। এটা তিন প্রকার —

(ক) **আদিব্যঞ্জন লোপ ঃ** — বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক নয়। তবে উদাহরণ আছে। স্পষ্ট > পষ্ট ('স' লোপ), শ্মশান > মশান ('শ' লোপ)।

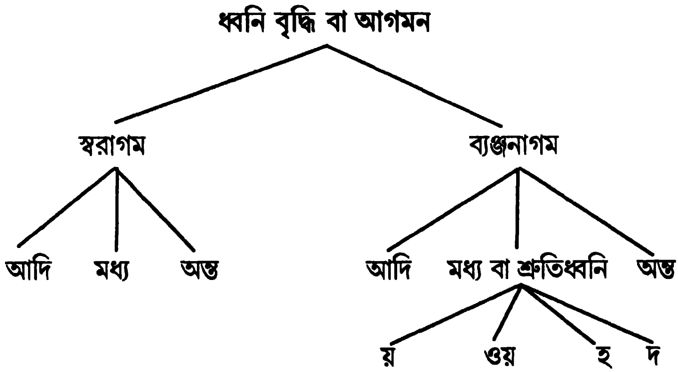
(খ) **মধ্যব্যঞ্জন লোপ ঃ** — আধুনিক বাংলায় স্বাভাবিক নয়। তবে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের উপভাষায় এখনও এই প্রবণতা আছে। যেমন — আমি > আঁই, গগন > গঅন, শৃগাল > শিয়াল।

(গ) **অন্তব্যঞ্জন লোপ ঃ** — এর উদাহরণ কম পাওয়া যায়। যেমন বর্‌গীর > বর্‌গী। এছাড়া 'হ' কার লোপ প্রবণতা আছে। যেমনি খড়্দহ > খড়্দা, ফলাহার > ফলার, শিয়ালদহ > শিয়ালদা।

✧ সমাক্ষর লোপ ঃ

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমধ্বনির অক্ষর কিংবা সমধ্বনির একটি লোপ পেলে সমাক্ষর লোপ হয়। যেমন — বড়দাদা > বড়দা।

✧ ধ্বনিবৃদ্ধি বা ধ্বন্যাগম ✧



✧ স্বরাগম

প্রধানত বিদেশি ভাষা থেকে যে সব জটিল অক্ষর যুক্ত শব্দগুলি বাংলায় এসেছে সেগুলি বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণে সঙ্গতিরক্ষার জন্য স্বরের প্রয়োজন হয়েছে। তিন প্রকার —

(ক) **আদি স্বরাগম ঃ** — শব্দের আদিতে স্বরের আগমন ঘটে। যেমন স্কুল > ইস্কুল।

(খ) **মধ্য-স্বরাগম ঃ** — শব্দস্থ যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে যদি স্বরাগম হয় তা মধ্য স্বরাগম বা স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। যেমন — ওলন্দাজ ত্রোফ > তুরুপ।

(গ) **অন্ত-স্বরগাম ঃ** — ডঃ সেনের মতে বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতার জন্য অন্ত স্বরাগম ঘটে। যেমন দরখাস্ত্ > দরখাস্তো।

✧ ব্যঞ্জনাগম

মূলত বাংলায় উপভাষাগুলির উচ্চারণ প্রবণতা থেকেই ব্যঞ্জনাগম লক্ষ করা যায়। এগুলি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত —

(ক) **আদি ব্যঞ্জনাগম ঃ** — শব্দের আদিতে হয়। যেমন আম > রাম ('র' আগম)।

(খ) **অন্ত ব্যঞ্জনাগম ঃ** — সংস্কৃতের মতো বাংলায় হয় আদর বৃদ্ধিতে যেমন — খোকা > খোকন, বাবু > বাবুন, মা > মাম্ ।

(গ) **মধ্য ব্যঞ্জনাগম বা শ্রুতি ঃ** — উচ্চারণের সময় জিহ্বার অসাবধানতা বশত দুটি ধ্বনির মাঝখানে কোন অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটে। এই অতিরিক্ত ধ্বনিকে শ্রুতি ধ্বনি বলে। যেমন — বানর > বান্দর (দ-শ্রুতি) । এইপ্রকার শ্রুতি

য় শ্রুতি — মা + এর > মায়ের
ওয় শ্রুতি — যাআ > যাওয়া
হ শ্রুতি — বিপুলা > বেহুলা (হ র আগম)।

✧ ধ্বনির স্বরূপগত পরিবর্তন বা রূপান্তর ✧

ধ্বনির রূপান্তর

- স্বরসংগতি
- সমীভবন
- বিসমীভবন
- ঘোষীভবন
- মহাপ্রাণীভবন
- অল্পপ্রাণীভবন
- মূর্ধ্যনীভবন
- তালব্যীভবন
- উষ্মীভবন
- অভিশ্রুতি
- স্বতোমূর্ধ্যন্যীভবন
- অঘোষীভবন
- নাসিক্যীভবন ইত্যাদি।

✧ স্বরসংগতি

জিহ্বার দৃঢ়তা বা শৈথিল্যের জন্য স্বরের উচ্চারণে সংগতি এসে যায়। ধ্বনি পরিবর্তনের গতিমুখ অনুযায়ী এটি তিন শ্রেণির —

(ক) **প্রগত ঃ** — পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়। যেমন — দিশাহারা > দিশেহারা।

(খ) **পরাগত ঃ** — পরবর্তী ধ্বনি প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি বদলে যায়। যেমন — দেশি > দিশি।

(গ) **পারস্পরিক বা অন্যোন্য ঃ** — পাশাপাশি উভয় ধ্বনির প্রভাবে ধ্বনির বদল ঘটে। যেমন — যদু > যেদো।

✧ **সমীভবন বা ব্যঞ্জনসংগতি ঃ**

শব্দ উচ্চারণ কালে পাশাপাশি দুটি ভিন্ন ধ্বনি পরস্পরের প্রভাবে বা একে অপরের প্রভাবে উচ্চারণে অল্প বিস্তর সাম্য লাভ করলে ধ্বনিবিজ্ঞানে প্রক্রিয়াটিকে সমীভবন বলে। আংশিকতা ও সম্পূর্ণতার বিচারে সমীভবন দুই প্রকার –

i. **আংশিক সমীভবন ঃ** – এক্ষেত্রে দুটি সন্নিহিত ধ্বনিরই উচ্চারণ স্থান অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু একটি অন্যটির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লাভ করে পারস্পরিক আংশিক সমতা লাভ করে। যেমন বাক্‌দত্তা > বাগদত্তা এখানে 'গ' ও 'দ' উভয়ে মহাপ্রাণ বর্ণ।

ii. **পূর্ণাঙ্গ সমীভবন ঃ** – এক্ষেত্রে ব্যঞ্জন দুটি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে ধ্বনি বা ধ্বনি দুটি সম্পূর্ণ সমতা লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ সমীভবন তিন প্রকার –

ক. **প্রগত ঃ** পূর্ববর্তী ধ্বনি যদি পরবর্তীকে প্রভাবিত করে তাকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন – পদ্ম > পদ্দ, গলদা > গল্লা (চিংড়ি)।

খ. **পরাগত ঃ** পরবর্তী প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি উচ্চারণ সাম্য লাভ করলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন – চারশো > চাশ্‌শো।

গ. **অন্যোন্য ঃ** পরস্পরের প্রভাবে ব্যঞ্জন দুটি প্রত্যেকটি নিজস্ব উচ্চারণ স্থান বর্জন করে ভিন্ন উচ্চারণ স্থান গ্রহণ করলে তাকে অন্যোন্য বা পারস্পরিক সমীভবন বলে। যেমন – কুৎসিত > কুচ্ছিত।

এছাড়া দুই শব্দ মধ্যবর্তী সন্নিহিত ব্যঞ্জনের সমীভবন হয় – যাক্‌চলে > জাচ্চোলে।

✧ **বিষমীভবন ঃ**

সমান দুটি ব্যঞ্জন বিষম হয়। যেমন – শরীর > শরীল , লাল > নাল ।

✧ **ঘোষীভবন ঃ**

য, র, ল, ড়,হ, ঢ় এই সঘোষ ধ্বনি গুলির প্রভাবে অঘোষ ধ্বনির ঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন – ছাত্ > ছাদ্।

✧ **অঘোষীভবন ঃ**

ঘোষীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে ঘোষধ্বনি অঘোষ হয়।
যেমন– বড়ঠাকুর > বট্‌ঠাকুর।

✧ **মহাপ্রাণীভবন ঃ**

ব্যবধান সৃষ্টিকারী স্বরলোপের ফলে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন হয়।
যেমন – হস্ত > হত্থ, স্তম্ভ > থাম, মস্তক > মাথা ।

✧ **অল্পপ্রাণীভবন ঃ**

বিশেষ বিশেষ ধ্বনি পরিবেশে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণতা লাভ করে। যেমন — দুধ > দুদ।

✧ **মূর্ধন্যীভবন ঃ**

ঋ, র, ষ এবং ট, ঠ, ড প্রভৃতি মূর্ধন্য ধ্বনির প্রভাবে দন্তধ্বনি (ত্, থ্, দ, ধ ইত্যাদি) মূর্ধনীভূত হয়। যেমন — উৎ + ডীন > উড্ডীন।

✧ **স্বতোমূর্ধন্যীভবন ঃ**

এক্ষেত্রে মূর্ধন্যীভবনের কারণ ছাড়াই দন্ত্যধ্বনি মূর্ধন্য হয়। যেমন — সং তিক্তকারী > তিত্‌কারী > টিটকারি।

✧ **তালব্যীভবন ঃ** — তালব্যীধ্বনির প্রভাবে কণ্ঠ ও দন্ত্য ব্যঞ্জন তালুতে উচ্চারিত হয়। যেমন — মধ্য > মজ্‌ঝ।

✧ **উষ্মীভবন ঃ**

ধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু আংশিক বাধা পায়। বাংলায় দন্ত্যব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী ঘৃষ্ট তালব্যব্যঞ্জনের উচ্চারণে উষ্মীভবন হয়। যেমন -- গাছতলা > গাস্‌তলা।

✧ **নাসিক্যীভবন ঃ**

বাংলা লিপি অনুসারে নাসিক্যধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) গুলির উচ্চারণ ক্ষীণ হতে হতে ক্রমশ লোপ পেয়েছে এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতে একটা আনুনাসিক অনুরণন যোগ হয়েছে এই প্রক্রিয়াটিকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন — চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ। এক্ষেত্রে ব্যঞ্জনধ্বনির পুরোপুরি উচ্চারণের বাইরে রাখার জন্য স্বরধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে স্বরধ্বনিকে নাসাপথে বের করা হয়। আধুনিক বাংলায় বর্গীয় আনুনাসিকতা যুক্ত স্পর্শব্যঞ্জনের প্রভাবেও নাসিক্যীভবন হয়। যেমন — কণ্টক > কাঁটা; দন্ত > দাঁত ইত্যাদি।

✧ **স্বতোনাসিক্যীভবন ঃ**

বাংলা উচ্চারণ রীতি অনুসারে নাসিক্যধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম)-গুলির কোন রকম প্রভাব ছাড়াই যখন শব্দের সানুনাসিক উচ্চারণ হয় তখন তাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। যেমন — হাসপাতার > হাঁসপাতাল , আখ > আঁখ।

ধ্বনির অবস্থান গত পরিবর্তন

বিপর্যাস | অপিনিহিতি | অভিশ্রুতি

✧ বিপর্যাস ঃ

দ্রুত শব্দ উচ্চারণ অথবা অসতর্কতা বশত শব্দ উচ্চারণ কালে শব্দ মধ্যস্থ দুটি ধ্বনি পরস্পরের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে এবং শব্দকে সামান্য বিকৃত করে। একে ধ্বনি বিজ্ঞানীরা বিপর্যাস নাম দিয়েছেন। যেমন – পেনাল্টি > পেলান্টি; রিক্‌শা > রিশ্‌কা ; পিশাচ > পিচাশ্ ; মুকুট > মুটুক। এছাড়া স্বরভক্তির ফলেও কিছু বর্ণবিপর্যাস লক্ষ করা যায়। যেমন – চক্র > চরকা ; ভর্তা > ভাতার ; গর্জন > গজরানো ইত্যাদি।

✧ অপিনিহিতি ঃ

শব্দমধ্যস্থিত 'ই' বা 'উ'-কে উচ্চারণ স্থানের পূর্বে উচ্চারণ করার ফলে অপিনিহিতি হয়। এছাড়া শব্দ মধ্যে য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন 'জ্ঞ' বা 'ক্ষ' থাকলে তার আগে 'ই' এর আগমন হয়। কখনো আবার সানুনাসিক শব্দ মধ্যে অতিরিক্ত 'ই' এর আগমন ঘটে। এই প্রক্রিয়াগুলিকে অপিনিহিতি বলে। এটি আসলে এক ধরণের মধ্য স্বরাগম। ই – আগমন ঃ রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্ক, কাঁচি > কাঁইচি ।

উ – আগমন ঃ সাধু > সাউদ ইত্যাদি।

এছাড়া 'জ্ঞ', 'ক্ষ' বা ' ক্য' থাকলেও অপিনিহিতি হয়। যেমন — যজ্ঞ > যইজ্ঞ; বক্ষ > বইক্ষ ; বাক্য > বাইক্য ইত্যাদি।

✧ অভিশ্রুতি ঃ

অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ' ধ্বনি যদি লোপ পায় অথবা অপর স্বরের প্রভাবে অথবা স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নবরূপ প্রাপ্ত হয়, তবে তাকে বলা হয় অভিশ্রুতি। যেমন– আজি > আইজ > আজ, হাটুয়া > হেটো। অভিশ্রুতিতে শব্দ মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা তিন প্রকার –

১. একাক্ষর শব্দে অপিনিহিতি 'ই' বা 'উ' লোপ। চারি > চাইর > চার।
২. একধিক অক্ষরময় শব্দে বাংলা সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী আভ্যন্তর সন্ধি হতে যেমন – বহিন > বইন > বোন।
৩. স্বরসঙ্গতির নিয়মানুযায়ী স্বরসন্ধি ও স্বর পরিবর্তন হতে পারে। যেমন – মাছ + উয়া = মাছুয়া > মাউছা > মেছো।

অভিশ্রুতি হল রাঢ়ি উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অক্ষর

সারা পৃথিবী জুড়ে ভাষার মধ্যে অক্ষর নিয়ে ভাষা নিরপেক্ষ তত্ত্ব নির্ধারণ করা যায় কিনা তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এই সূত্রে যত লেখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার বেশির ভাগই অক্ষর পদ্ধতি নির্ভর। আদিম জনগোষ্ঠির অক্ষর সম্পর্কে একধরণের স্বতন্ত্র ধারণা ছিল। একটি শব্দের মধ্যে কটি অক্ষর আছে তাও মানুষ বলতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও অক্ষরের সংজ্ঞা নির্ধারণ ভাষাতত্ত্ববিদদের পক্ষে সহজ হয় নি। তার প্রধান কারণ অক্ষর কিভাবে বক্তা কর্তৃক উৎপাদিত হয় এবং শ্রোতা কর্তৃক অনুভূত হয় সে ব্যাপারে কোন সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। তবুও অক্ষরের একটি সংজ্ঞা দেওয়া যায় যা অনেকদিক থেকে পূর্ণতার দাবি করতে পারে।

✧ **প্রচলিত ধারণা ঃ**

সাধারণত আমরা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কিছু অর্থবোধক ধ্বনির ব্যবহার করি। সেইসব অর্থবোধক ধ্বনির সাংকেতিক রূপকে বর্ণ বা অক্ষর বা ইংরেজিতে Letter বলে। অর্থাৎ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী অক্ষর বা বর্ণ একই। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগে দুই অক্ষরের ২৪ টি (চারি,পূজা,ধেনু ইত্যাদি) , তিন অক্ষরের ১৮ টি (বিকার,অকৃতি,মানুষ ইত্যাদি) , চার অক্ষরের ১৮ টি (অধিকার,পরিহার,পুরাতন ইত্যাদি) এবং পাঁচ অক্ষরের ১২ টি (অনুধাবন, অবিবেচনা,অকুতোভয় ইত্যাদি) অক্ষরের মিশ্র উদাহরণ দেখিয়েছেন। শব্দের শেষে অ-কার যোগ ধরে উচ্চারণ করলে কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু আধুনিক উচ্চারণে বাংলা শব্দের শেষে স্বরহীন উচ্চারণ হওয়ায় বিদ্যাসাগরের অক্ষরের ধারণাটি অসংগতি ঠেকে। উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে — বিদ্যাসাগর মহাশয় তিন অক্ষরের উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন 'বিকার'শব্দটি কিন্তু আধুনিক উচ্চারণে শব্দটি 'বিকার্' সেক্ষেত্রে এটি তিন নয় দুই অক্ষরের উদাহরণ। অনুরূপে ' নিরভিমান',' অনুমোদন' ইত্যাদি পাঁচ অক্ষরের উদাহরণ নয়।

✧ **অক্ষর ও বর্ণ এক নয় ঃ**

ভাষা ব্যবহারের সময় মানুষ মুখ দিয়ে যে সকল অর্থবোধক আওয়াজ নির্গত করে, তাদের ধ্বনি বলে। ধ্বনিগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে, উচ্চারিত

ধ্বনিগুলির কতকগুলিকে আলাদা আলাদা করে সুস্পষ্টভাবে বিভাজিত করা চলে। যেমন – আমি খাব বাক্যের ধ্বনিগুলিকে এইভাবে চিহ্নিত করা চলে – আ + ম্ + ই / খ্ + আ + ব্ + অ। ধ্বনির এই লিখিত সাংকেতিক রূপকে বর্ণ বলে।

অর্থাৎ ধ্বনি (Sound) শ্রুতিগ্রাহ্য এবং তারই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ হল বর্ণ বা Letter। সুতরাং আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ধ্বনি, বর্ণ, অক্ষর তিনটিই পৃথক। এখন অক্ষর বলতে কি বোঝায় তা জানব।

✧ সংজ্ঞা ঃ

বিভাজ্য ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখগহ্বর থেকে একসঙ্গে একটানা বেরিয়ে না এসে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। খণ্ডিত ওই ধ্বনিগুচ্ছের মূল কেন্দ্রে থাকে স্বরধ্বনি। এই ধ্বনি খণ্ডের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। স্বরধ্বনি এককভাবে অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে যে ধ্বনিখণ্ড নির্মাণ করে, ভাষাবিজ্ঞানে তাকেই বলা হয় অক্ষর বা Syallble।

সুকুমার সেন –

> শব্দ অক্ষরের সমষ্টি কোন পদ উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মাঝে মাঝে মন্দীভূত হয়। অর্থাৎ উচ্চারণ প্রবাহ যেন একটু শ্লথ হয। এক ছেদ হইতে আর এক ছেদ পর্যন্ত উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই অক্ষর (Syallble)।

মুহম্মদ আবদুল হাই –

> নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষঃ স্পন্দনের (By a single breath-pluse) ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয় তাকেই সিলেবল বা অক্ষর বলা যেতে পারে।

শ্রী পরেশ ভট্টাচার্য –

> বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় আমরা একবারে যতটুকু উচ্চারণ করতে পারি, তাকে বলে 'অক্ষব বা দল' (Syallble)।

রামেশ্বর শ' –

> শ্বাসবায়ুর এক-এক ধাক্কায় আমরা যে ক' টি ধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারণ করি সেই ক' টি ধ্বনি এক-একটি ধ্বনিগুচ্ছরূপে সংবদ্ধ হয়ে যায় ; ছন্দোবিজ্ঞানে এই রকমের এক-একটি ধ্বনিগুচ্ছকে 'অক্ষর' বা 'দল' (Syallble) বলা হয়।

অক্ষরের সংজ্ঞায় আমরা প্রধান যে চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি, সেগুলি হল —

১. বাগ্‌যন্ত্র
২. শ্বাসবায়ু
৩. স্বাভাবিক উচ্চারণ
৪. ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ।

প্রথমে ধ্বনি কিভাবে গঠিত হয়, সেটা জানা দরকার।

ফুসফুসের চাপে প্রেরিত নিঃশ্বাসবায়ু শ্বাসনালীদ্বয়ের মধ্য দিয়ে কণ্ঠনালীতে মিলিত হয় এবং সেখান থেকে কণ্ঠ ও মুখবিবর বা কণ্ঠ ও নাসিকা পথে নির্গত হয়। সচেষ্ট পেশী সঞ্চালনের দ্বারা এই নিঃশ্বাসবায়ু কণ্ঠনালী থেকে ওষ্ঠ পর্যন্ত স্থান মধ্যে কোথাও কোন রকম বাধা পায়, তাকেই ধ্বনিরূপে প্রকাশ করে।

স্বরতন্ত্রীতে কম্পনের ফলে গঠিত ধ্বনি বাতাসে তরঙ্গের মধ্যে শ্রোতার কানে পৌঁছায় এবং অক্ষরের উৎপত্তি ঘটায়। অক্ষরের তরঙ্গ আকৃতির মাধ্যমে শ্রোতার কানে যায়। অপর একদল ধ্বনিবিজ্ঞানীদের মতে শব্দ যদি তরঙ্গের আকারে পৌঁছায়, তবে সর্বদাই বক্তা যা বলবে শ্রোতা তাই শুনবে। কিন্তু বাস্তবে অনেকক্ষেত্রে তা ঘটে না। তাদের মতে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে শ্রবণের দূরত্বের মধ্যে অক্ষর গঠন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই দূরত্ব ও শ্রবণের মধ্যে সম্পর্ক সমানুপাতিক। দূরত্ব বাড়লে শব্দ ক্ষীণ হবে। সুতরাং অক্ষরের যে একটি সরলীকৃত সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে তা হল —

ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু (নিঃশ্বাস) একবারমাত্র বের করে অর্থবোধের প্রয়োজনে আমরা যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারণ করি তাকেই অক্ষর বলা যেতে পারে।

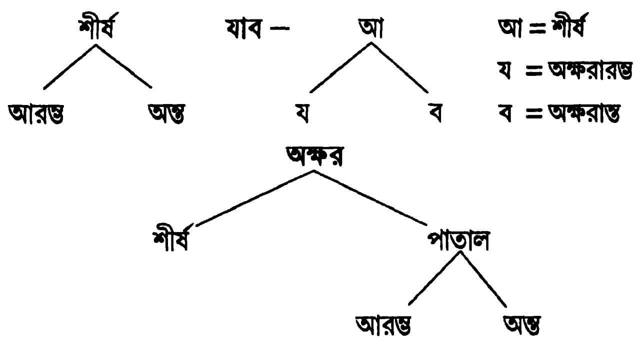
✧ সংজ্ঞায় দ্বন্দ্ব ঃ

অক্ষরের সংজ্ঞা সম্পর্কে এতখানি আলোচনা করা সত্ত্বেও অক্ষর সম্পর্কে কিছুটা দ্বন্দ্ব রয়েই গেছে। অক্ষরের সংজ্ঞায় আমরা জেনেছি যে, ফুসফুস থেকে একবারমাত্র শ্বাসবায়ু বের করে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বলে এবং প্রতিখণ্ড অক্ষরে স্বরধ্বনি বাধ্যতামূলকভাবে থাকবে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে যে এই নিয়মের লঙ্ঘন ঘটেছে তা একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। যেমন ইংরাজি better শব্দে দুটি স্বরধ্বনি রয়েছে। সুতরাং বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা অনুযায়ী এখানে দু'টি অক্ষর রয়েছে। আবার syallble অনুযায়ী এখানে bet এবং ter দুটিঅক্ষর পাওয়া যায়। কিন্তু setter শব্দ একবার শ্বাসবায়ু বের করেই উচ্চারিত হয়। তাই একটি অক্ষর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সংজ্ঞা ও উদাহরণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়। তাই বিজ্ঞানীরা অক্ষরের সংজ্ঞা নির্ণয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

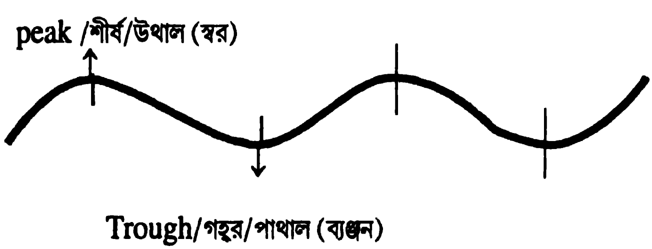
✧ রেখাচিত্র ঃ

অক্ষর গঠনের রেখাচিত্র শীর্ষদেশকে বলে অক্ষরচূড়া আর দুই প্রান্তদেশ এই দুই ভাগে। অক্ষরারম্ভ এবং অক্ষরান্তের ভাগ করা যায়। অক্ষরচূড়ায় স্বরধ্বনির অবস্থান এবং স্বরধ্বনির পূর্বে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিকে অক্ষরান্ত এবং পরে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিকে অক্ষরান্ত বলে। যেমন — যাব



✧ গড় অক্ষর গঠনের রেখাচিত্র ঃ

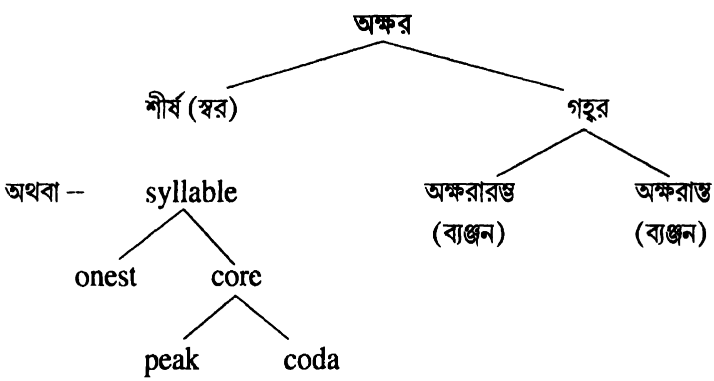
ধ্বনির গঠনগত দিক দিয়ে যেমন নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একবারে উচ্চারিত ধ্বনিই অক্ষর, তেমনি শ্রুতির দিক দিয়ে যে ছোট ছোট ধ্বনিগুচ্ছ শ্রোতার কানে এক একটি তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করে, সে গুলোকে অক্ষর বলা যায়। নদীর খরস্রোত যখন প্রবাহিত হয় তখন তরঙ্গমালা চোখে না পড়লেও, পরে নিম্নগতিতে তরঙ্গমালার সৃষ্টি হলে তরঙ্গের শীর্ষ এবং গহ্বর চোখে পড়ে। তেমনি অক্ষরের ক্ষেত্রেও স্বরধ্বনিকে কেন্দ্র করে উথাল পাতালের বিষয়টি চোখে পড়ে। রেখাচিত্রের বিষয়টি দেখানো যেতে পারে —

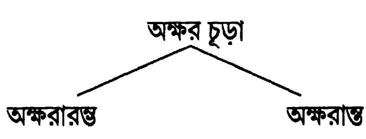


peak স্পষ্ট ভাবে কানে পৌছায়। কিন্তু Trough স্পষ্টভাবে কানে পৌঁছায় না বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ অক্ষরের মধ্যে অবস্থিত ব্যঞ্জনটি স্বরের থেকে কম স্পষ্ট। কিন্তু এ মত মানা যায় না।

✧ বাংলা অক্ষর গঠন ঃ

শব্দ উচ্চারণ কালে শ্বাসবায়ু একটানা বের না হয়ে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বের হয়ে আসে। আসলে শ্বাস যন্ত্রের কাঠামো অনুযায়ী একসঙ্গে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বজায় রেখে আমাদেরকে ভাষা বিনিময়ের কাজটি চালিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেকটি খণ্ডের মধ্যে অবশ্যই একটি স্বরধ্বনি থাকবে, কারণ স্বরধ্বনি হল অক্ষরের প্রাণ, তাই বাংলা অক্ষরের স্বরধ্বনিটিকে বলা হয় অক্ষরচূড়া বা অক্ষরশীর্ষ (peak)। স্বরধ্বনিটি নিজে একটি অক্ষর হতে পারে এবং এই স্বরধ্বনির আগে-পরে ব্যঞ্জন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। স্বরধ্বনির আগের ব্যঞ্জনটিকে অক্ষর আরম্ভ বা (onset) বলে এবং স্বরধ্বনির পরের ব্যঞ্জনটিকে অক্ষরান্ত বা (coda) বলে। এবং অক্ষরান্ত উভয়েরই অবস্থান গহ্বরে। একটি রেখাচিত্রে বিষয়টিকে দেখানো যেতে পারে --



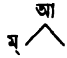


বাংলা অক্ষর গঠনে স্বরধ্বনি প্রধান। তাই স্বরধ্বনিকে শীর্ষ বা চূড়ায় রাখা হয়। একে অক্ষর চূড়া বলে। স্বরের আগের ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুলিকে অক্ষরারম্ভ এবং স্বরের শেষের ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুলিকে অক্ষরান্ত বলে।

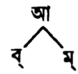
✧ তদ্ভব বাংলায় অক্ষরের সংখ্যা

মূলত চার ধরনের অক্ষর গঠন দেখা যায়—

(১) স্ব = এ  (স্ব = স্বর, ব্য = ব্যঞ্জন)

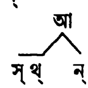
(২) ব্য স্ব = মা 

(৩) স্ব ব্য = আম্ 

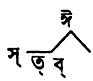
(৪) ব্য স্ব ব্য = রাম্ 

এছাড়াও স্বরবর্ণের আগে পরে একাধিক ব্যঞ্জনের ফলে অক্ষর গঠনের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। যেমন —

(১) ব্য ব্য স্ব = শ্রী 

(২) ব্য ব্য স্ব ব্য = স্থান্ 

(৩) ব্য স্ব ব্য ব্য = বন্ধ্ 

(৪) ব্য ব্য ব্য স্ব = স্ত্রী 

(৫) ব্য ব্য স্ব ব্য ব্য = গ্রান্ট্ 

✧ বাংলা অক্ষর বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলা অক্ষর গঠনে যে রূপ বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় —

এক, একটি মাত্র স্বর দিয়ে একটি অক্ষর গঠিত হতে পারে।

দুই, একটি মাত্র স্বর ও তার আগে একটি ব্যঞ্জন দিয়ে একটি অক্ষর গঠিত হতে পারে।

তিন, একটি মাত্র স্বর ও তার পরে একটি ব্যঞ্জন দিয়ে একটি অক্ষর গঠিত হতে পারে।

চার, একটি মাত্র স্বর ও তার আগে - পরে একটি করে ব্যঞ্জন দিয়ে একটি অক্ষর গঠিত হতে পারে।

পাঁচ , একটি মাত্র স্বর ও তার আগে - পরে একাধিক করে দিয়ে একটি অক্ষর গঠিত হতে পারে।

বাংলা অক্ষর গঠনে সাধারণতঃ অক্ষরারম্ভে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না। সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে একটি অতিরিক্ত স্বর বা অক্ষর চূড়ার আগমন ঘটে। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, একটি অক্ষরের একটি স্বর থাকবেই কিন্তু ব্যঞ্জন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। যদি আমরা এক অক্ষরে স্বরের আগে তিনটি ব্যঞ্জন পাই তা হলে স্বাভাবিক উচ্চারণে আর একটি স্বর এসে দুটি অক্ষর গঠন করবে। যেমন -

স্ত্রী – স্ + ত্ + র্ + ঈ (ই)   , কিন্তু এক্ষেত্রে শ্বাসবায়ুর কষ্ট হওয়ায় উচ্চারণ সুবিধার জন্য স্বরাগম ঘটে হয়েছে ইস্ত্রী – ই + স্ + ত্ + র + ঈ (ই) । এক্ষেত্রে দুটি অক্ষর তৈরি হল – ইস্ + ত্রি । লোকায়ত সমাজে এই প্রবণতা স্বাভাবিক।

✧ অক্ষর ও রূপমূলের সম্পর্ক ঃ

(১) অক্ষর আর রূপমূল হল ভাষার ক্ষুদ্রতর বিভাগ। বাক্‌যন্ত্র থেকে শ্বাসবায়ুকে একবার মাত্র বের করে যতটা বেশি পরিমাণ উচ্চারণ করা যায় তাকেই বলা যায় অক্ষর। অন্যদিকে ধ্বনি দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদনকে রূপমূল বলে।

উদারহণ -- **অক্ষর**--   বিচার = বি + চার ('বি' এবং 'চার' এই দুটিই অক্ষর)

রূপমূল -- শহর = ('শহর' শব্দটি একটি রূপমূল)

(২) অক্ষর হল শব্দের এমন এক ক্ষুদ্রতম উপাদান যাকে ভাঙ্‌লে তার মধ্যে একটি স্বরধ্বনি অবশ্যই থাকবে। যদি একাধিক স্বরধ্বনি থাকে তাহলে অক্ষর সংখ্যাও একাধিক হবে । রূপমূলেব ক্ষেত্রে ভাষাকে ক্ষুদ্রতম উপাদানে ভাগ করা হয় কিন্তু আরও বেশি ভাঙ্‌তে গেলে যদি তা কোনরূপ অর্থপ্রকাশ না করে তাহলে রূপমূল হবে না।

যেমন -   'শহর' = শ + হর

↓ ↓ ↓

রূপমূল অক্ষর অক্ষর

(৩) একটি অক্ষর অর্থবোধক হলে তা রূপমূল হতে পারে কিন্তু রূপমূল মাত্রই অক্ষর নয়্। যেমন – আম্ → রূপমূল, অক্ষর

(৪) অক্ষর গঠনের ক্ষেত্রে স্বরধ্বনিই প্রধান। স্বরধ্বনি না থাকলে তাকে অক্ষর বলা যাবে না। তাই অক্ষর গঠনে স্বরধ্বনিকে অক্ষরচূড়া বলা হয়।

অক্ষরচূড়া (স্ববধ্বনির অবস্থান)

/ \

ব্যঞ্জন স্থান   ব্যঞ্জন স্থান

কিন্তু রূপমূলের ক্ষেত্রে তাকে অর্থবোধক হতেই হবে।

(৫) অক্ষর বা দলকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়-- ক. মুক্তদল খ. রূদ্ধদল। মুক্তদল স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ (মা) , এক্ষেত্রে উচ্চারণে মুখবিবর খোলা থাকে। কিন্তু রুদ্ধদল – ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শেষ (আম্) , এক্ষেত্রে বাগ্‌যন্ত্রের কোন না কোন অংশ বাধার সৃষ্টি করে।

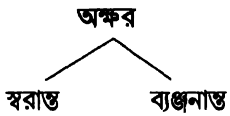
✧ শ্রেণি বিভাগ ✧

✧ গঠন অনুযায়ী ঃ

গঠন অনুযায়ী অক্ষরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় —

স্বরান্ত — স্বর দিয়ে শেষ তাকে স্বরান্ত বা মুক্তদল বলে। যেমন — মা।

ব্যঞ্জনান্ত — যে অক্ষর ব্যঞ্জন দিয়ে শেষ তাকে ব্যঞ্জনান্ত, হলন্ত বা রুদ্ধদল বলে। যেমন — আম্।



✧ সংখ্যা অনুযায়ী ঃ

সংখ্যানুযায়ী অক্ষরকে ভাগ করা যায় —

একধ্বনিবিশিষ্ট অক্ষর — যেমন — চ (যাওয়া অর্থে)।

ধ্বনিসমষ্টিযুক্ত অক্ষর — যেমন — রাম্।

✧ অক্ষরান্তের অবস্থিতি বা অনবস্থিতি অনুযায়ী ঃ

অক্ষর গঠনের ক্ষেত্রে অক্ষরান্তের অবস্থিতি বা অনবস্থিতির বিচারে অক্ষরকে দুভাগে ভাগ করা হয় —

বিবৃত অক্ষর বা মুক্ত দল ঃ — যে অক্ষরের শেষে অক্ষরান্ত থাকে না তাকে বলা হয় বিবৃত অক্ষর। যেমন — "আকাশেতে" শব্দে চারটি সরল, মুক্ত ও স্বরযুক্ত ধ্বনি খণ্ড আছে। আ + কা + শে + তে = আকাশেতে।

সংবৃত অক্ষর বা রূদ্ধদল ঃ — যে অক্ষরের শেষে অক্ষরান্ত (ব্যঞ্জন) থাকে তাকে বলা হয় সংবৃত অক্ষর। যেমন — অঞ্চল -এ দুটি সংবৃত অক্ষর 'অন্', 'চল্' আছে।

✧ অক্ষরারম্ভ ও অক্ষরান্তের সংখ্যা অনুযায়ী ঃ

অক্ষরারম্ভ ও অক্ষরান্তের সংখ্যার বিচারে অক্ষর দু শ্রেণির —

সরল অক্ষর ঃ

শীর্ষ অবস্থানে স্বরধ্বনি তো থাকবেই কিন্তু যে অক্ষরের অক্ষরারম্ভ ও অক্ষরান্ত থাকে না এবং থাকলে তাদের সংখ্যা একাধিক না হলে তাদের সরল অক্ষর বলে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্বরের সংখ্যা - ১, আগে পরে ব্যঞ্জনের সংখ্যা ১, কিন্তু তার বেশি কখনোই নয়। স্বরের আগে একটি ও পরে একটি ব্যঞ্জন থাকতে পারে কিন্তু তার বেশি থাকবে না। যেমন —

স্ব স্ব স্ব স্ব

আ, না, আন্ নাক্ গঠন — স্ব , ব্য স্ব , স্ব ব্য , ব্য স্ব ব্য

জটিল অক্ষর ঃ

যে অক্ষরে অক্ষরারম্ভ ও অক্ষরান্তের সংখ্যা একাধিক তাকে জটিল অক্ষর বলে। এক্ষেত্রে স্বরের আগে পরে একাধিক ব্যঞ্জন থাকতে পারে। যেমন —

স্ব . স্ব স্ব স্ব

শ্রী, স্ত্রী আস্ত গ্রান্ট

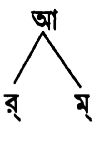
গঠন — ব্য ব্য স্ব , ব্য ব্য ব্য স্ব , স্ব ব্য ব্য , ব্য ব্য স্ব ব্য ব্য ,

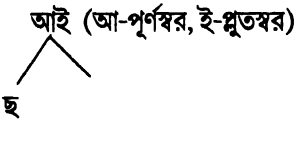
অক্ষর গঠনে বাংলা ভাষার মতো প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। মূলত সরল অক্ষর ব্যবহারে মিল থাকলেও জটিল অক্ষরে বেশি পার্থক্য দেখা যায়। যেমন সংস্কৃত জটিল অক্ষরে 'অক্ষরান্ত' কম থাকে আবার আরবি-ফারসিতে অক্ষরারম্ভ কম থাকে। আবার ইংরাজিতে দুইই স্বাভাবিক। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণে সরল অক্ষর গঠনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

✧ দ্বিস্বর নির্ণয়ে অক্ষরের ভূমিকা ঃ

স্বরধ্বনি হল অক্ষরের জীবন। কারণ কেবলমাত্র একটি স্বরধ্বনি দিয়ে অক্ষর গঠন হতে পারে কিন্তু একটি ব্যঞ্জন দিয়ে অক্ষর গঠিত হতে পারে না। যখন দুটি স্বর পাশাপাশি উচ্চারিত হয় তখন তাকে দ্বিস্বর বলা হয়। এই দ্বিস্বর গঠনে অক্ষরের ভূমিকা কম নয়। বাংলায় দ্বিস্বর অক্ষরের প্রারম্ভে যাবে না।

স্বাভাবিক অক্ষর গঠন — রাম্ দ্বিস্বর যুক্ত অক্ষরের গঠন — ছাই

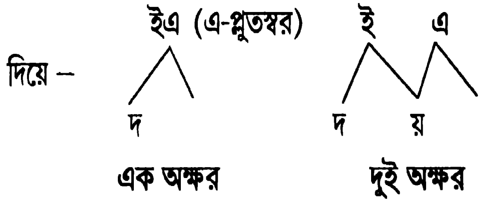




এক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থিত স্বরধ্বনি দুটি বিচ্ছিন্নভাবে বা দূর প্রয়াসে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ পূর্ণ উচ্চারিত হয়। তাহলে দুটি স্বতন্ত্র অক্ষর তৈরি হবে। আবার স্বর দুটি বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারিত হলে আবার তা দ্বিস্বর রূপে গৃহীত হবে না। ছাই — দ্বিস্বর ধ্বনি। কিন্তু ছা-ই কিংবা ছ-আ-ই দ্বিস্বর ধ্বনি নয়। অর্থাৎ বাংলা দ্বিস্বরের যে গঠন চিত্র আমরা তৈরি করেছি সেই চিত্রে মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান শীর্ষে কিন্তু দ্বিস্বর যুক্ত অক্ষর দুটি স্বরের

অবস্থান শীর্ষে এবং পাশাপাশি। দ্বিস্বরের ক্ষেত্রে প্রথম স্বরধ্বনি স্বতন্ত্র উচ্চারণের সময় জিহ্বা যতটুকু সময়ে অপেক্ষা করে দ্বিস্বর উচ্চারণে সেই সময় না নিয়েই দ্বিতীয় স্বরে উচ্চারণ করে। দ্রুত পেশি সঞ্চালন না হলেই শ্রুতিধ্বনির আগমন ঘটে। অর্থাৎ একটি অক্ষর দ্বিস্বরের দুই স্বরকে আলাদা করে দুটি অক্ষরে পরিণত হয়।

যেমন –



মনে রাখতে হবে দ্বিস্বর গঠনে অক্ষর স্বরকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে।

রূপমূল ও রূপতত্ত্ব

রূপমূল বা রূপিম শব্দটির ইংরাজি প্রতিশব্দ হল Morpheme ,যা এক বা একাধিক স্বনিমের সমন্বয়ে গঠিত । রামেশ্বর শ' রূপমূল শব্দটির পরিবর্তে 'মূলরূপ' শব্দটি গ্রহণ করার পক্ষপাতি। আর শব্দের গঠন ও রূপবৈচিত্র ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয় তাকে বলে রূপতত্ত্ব বা Morphology। Morphe শব্দটির অর্থ রূপ এবং logy শব্দের অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ যে কোন ভাষার রূপগঠন এবং তার উপর যেখানে জ্ঞানলাভ করা যায় তাকেই সাধারণভাবে রূপতত্ত্ব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

✧ **সংজ্ঞা ঃ**

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ –

ধ্বনি দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানকে রূপমূল বলে।

মহাম্মদ দানীউল হক –

এক বা একাধিক ধ্বনিসহযোগে গঠিত ক্ষুদ্রতম বাক্যিক একক, যার দ্বারা কোনো অর্থ (বা অর্থের রেশ) প্রকাশ পায় তাকে রূপমূল বলে।

Ronald W. Langaker –

The phonological units that recur with constant meaning are morphemes.

সহজ কথায় এক বা একাধিক ধ্বনি দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানকে রূপমূল বলে। অর্থাৎ রূপমূলগুলি ক্ষুদ্রতম আকার বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান এবং এগুলির অর্থগত তাৎপর্য আছে । যেমন 'আম্'একটি রূপমূল, এর অর্থ আছে কিন্তু একে ভাঙলে 'আ' এবং 'ম' ধ্বনিদুটির স্বতন্ত্র কোন অর্থ নেই। তাই 'আম' রূপমূল কিন্তু 'আ' বা 'ম' রূপমূল নয়।

✧ শ্রেণি বিভাগ ✧

ভাষাবিজ্ঞানে রূপমূল দুই প্রকার –

১) মুক্ত রূপমূল (Free morpheme)

২) বদ্ধ রূপমূল (Bound morpheme)

✧ মুক্ত রূপমূল :

যে সব রূপমূল মুক্তভাবে অন্য রূপমূল সংযুক্তি ছাড়া এককভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে এবং যাদের নিজস্ব অর্থ বিদ্যমান, সেগুলোকে মুক্ত রূপমূল বলে। যেমন – ছাত্র , শহর, বন্ধু ইত্যাদি । উল্লেখিত রূপমূলগুলির ভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা আছে ।

✧ বদ্ধ রূপমূল :

যে রূপমূলের নিজস্ব অর্থ আছে এবং ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজ্য নয়, কিন্তু যেগুলো স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে না এবং মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, এই শ্রেণির রূপমূলকে বদ্ধ রূপমূল বলে। যেমন – -গুলো, -রা, অ-, -ওর ইত্যাদি। এগুলি মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বদ্ধ রূপমূল তৈরি করে। ছেলে + গুলো = ছেলেগুলো , মেয়ে + রা = মেয়েরা ইত্যাদি । এখানে ‘ছেলে’ ও ‘মেয়ে’ মুক্তরূপমূল এবং ‘গুলো’ ও ‘রা’ বদ্ধরূপমূল। বাংলায় প্রকৃতি-প্রত্যয়,উপসর্গ-অনুসর্গ এবং বিভক্তি সবই বদ্ধরূপমূলের পর্যায়ে পড়ে।

আমেরিকার ভাষাবিজ্ঞানী জর্জ ট্রেগার ও হেনরী স্মিথ রূপমূলের ধ্বনিগত গঠন এবং বাক্যে তার ব্যবহারের ভিত্তিতে একে দু ভাগে ভাগ করেছেন –

১. বিভাজিত রূপমূল বা খণ্ডিত রূপমূল (Segmental Morphemes)

২. অতিরিক্ত রূপমূল বা খণ্ডাতিরিক্ত রূপমূল (Supra-segmental Mor phemes)।

অন্যান্য রূপমূল

✧ বিভাজিত রূপমূল :

স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির সমবায়ে গঠিত এই রূপমূলে খণ্ডাতিরিক্ত কোন বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে না। যেমন ‘কাল’ বিভাজন করেলে ক + আ + ল।

✧ অতিরিক্ত রূপমূল :

এই রূপমূল স্বরাঘাত, মীড় ইত্যাদি খণ্ডাতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য উপাদান রূপে অন্তর্ভূক্ত হয়ে অর্থ পার্থক্য সৃষ্টি করে। বাংলায় এ ধরনের রূপমূল প্রায় নেই। যেমন –

তবে এ বিভাজন আসলে মুক্ত রূপমূল ও বদ্ধ রূপমূলেরই ভিন্ন নাম। এ ছাড়া অন্যান্য রূপমূলগুলি হল –

✧ সহরূপমূল ঃ

যে একাধিক বদ্ধ রূপমূল একই অর্থ প্রকাশ করছে এমন রূপমূলকে বলা হয় সহরূপমূল। যেমন –

বালক-এরা খেলে।
বালকগুলি খেলে।
বালকগণ খেলে।
বালকসকল খেলে।

এখানে এরা, গুলি, গণ, সকল এগুলি একই অর্থ প্রকাশ করছে তাই এদের সহরূপমূল বলে।

✧ শূন্য রূপমূল ঃ

যে মুক্ত রূপমূলগুলি একবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয় আবার বহুবচনেও ব্যবহৃত হয় তাকে শূন্য রূপমূল বলে। যেমন –

একবচন	বহুবচন
জল	জল
হতাশা	হতাশা
নীলিমা	নীলিমা
আকাশ	আকাশ

ইংরাজিতে Sheep - Sheep ইত্যাদি।

✧ সাধিত রূপমূল ঃ

যে ধরণের রূপমূলগুলি নতুন শ্রেণির শব্দ সৃজনে সহায়তা করে অথবা বিশেষ্য থেকে বিশেষণ , বিশেষণ থেকে বিশেষ্য, ক্রিয়া থেকে বিশেষ্য – এই ধরণের শব্দ সৃষ্টিতে সহায়তা করে, তাকে সাধিত রূপমূল বলে। যেমন, দেব + এ – দেবে, দেব + ও দেবো।

✧ সম্প্রসারিত রূপমূল ঃ

ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় যে রূপমূল তাকে সম্প্রসারিত রূপমূল বলে। কারকবাচক, লিঙ্গবাচক, পুরুষবাচক, কালবাচক বিভক্তিগুলি এর উদাহরণ । যেমন, গাছ + এ – গাছে
এখানে 'এ' হল কারকবাচক বিভক্তি। তাই এটি সম্প্রসারিত রূপমূল।

✧ সাধিত রূপমূল ও সম্প্রসারিত রূপমূল সম্পর্ক ঃ

সাধিত রূপমূল	সম্প্রসারিত রূপমূল
১. ব্যবহার সীমিত	১. অনেক প্রসারিত
২. নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ গঠনের জন্য ব্যবহৃত ।	২. যে কোন শব্দ গঠনের জন্য ব্যবহৃত।
৩. একটি নির্মাণে একই সঙ্গে একাধিক সাধিত রূপমূল ব্যবহার করা যায়। যেমন, অগণতান্ত্রিক — অ, গণ, তান্, ত্রিক্	৩. একবারে একটির বেশি রূপমূল ব্যবহার করা যায় না। যেমন, হাত + এ — হাতে।

✧ রূপমূল ও ধ্বনির সম্পর্ক ✧

ধ্বনি হল ভাষার ক্ষুদ্রতম একক যার সবসময় অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা নেই। অপরপক্ষে রূপমূল ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হলেও কখনো কখনো অর্থ প্রকাশ করে। যেমন 'আম্'একটি রূপমূল, এর অর্থ আছে কিন্তু একে ভাঙলে 'আ' এবং 'ম' যে দুটি স্বর ও ব্যঞ্জন পাওয়া যায় স্বতন্ত্রভাবে তাদের আলাদা কোন অর্থ নেই। তবে এমন ধ্বনি আছে যে একাই বাক্যের কাজ করে সেই ধ্বনিটি অবশ্যই অর্থবোধক। যেমন —

বক্তা — এখুনি ট্রেন ধরবি ?

শ্রোতা — চ ।

এখানে 'চ' অর্থবোধক । সুতরাং বলা যেতে পারে ধ্বনিকে অর্থ দান করতে গিয়েই রূপমূলের আবির্ভাব ঘটেছে। আমরা জানি ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি; কিন্তু ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক একক হল রূপমূল। ভাষাকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আমরা শেষ পর্যন্ত যে ধ্বনিতে পৌঁচাচ্ছি, সেই পথে ধ্বনির আগের স্তর হল রূপমূল। তবে সব সময় যে আগের স্তর হবে তারও কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

✧ অক্ষর ও রূপমূলের সম্পর্ক ✧

১. অক্ষর আর রূপমূল হল ভাষার ক্ষুদ্রতর বিভাগ। বাগ্‌যন্ত্র থেকে শ্বাসবায়ুকে একবার মাত্র বের করে যতটা বেশি পরিমাণ উচ্চারণ করা যায় তাকেই বলা যায় অক্ষর। অন্যদিকে ধ্বনি দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদনকে রূপমূল বলে।

উদারহণ — **অক্ষর**— বিচার = বি + চার ('বি' এবং 'চার' এই দুটিই অক্ষর)

রূপমূল — শহর ≠ ('শহর' শব্দটি একটি রূপমূল)

২. অক্ষর হল শব্দের এমন এক ক্ষুদ্রতম উপাদান যাকে ভাঙলে তার মধ্যে একটি স্বরধ্বনি অবশ্যই থাকবে। যদি একাধিক স্বরধ্বনি থাকে তাহলে অক্ষর সংখ্যাও

একাধিক হবে। রূপমূলের ক্ষেত্রে ভাষাকে ক্ষুদ্রতম উপাদানে ভাগ করা হয় কিন্তু আরও বেশি ভাঙতে গেলে যদি তা কোনরূপ অর্থপ্রকাশ না করে তাহলে রূপমূল হবে না।

যেমন – 'শহর' = শ + হর
↓ ↓ ↓
রূপমূল অক্ষর অক্ষর

(৩) একটি অক্ষর অর্থবোধক হলে তা রূপমূল হতে পারে কিন্তু রূপমূল মাত্রই অক্ষর নয়। যেমন – আম্ ——— রূপমূল
\ অক্ষর

(৪) অক্ষর গঠনের ক্ষেত্রে স্বরধ্বনিই প্রধান। কারণ শ্বাসবায়ু বের হয়ে এলেই একটা স্বর টেক্স হিসাবে তাকে নিয়ে আসতেই হয় স্বরধ্বনি না থাকলে তাকে অক্ষর বলা যাবে না। তাই অক্ষর গঠনে স্বরধ্বনিকে অক্ষরচূড়া বলা হয়।

অক্ষরচূড়া (স্বরধ্বনির অবস্থান)
/ \
ব্যঞ্জন স্থান ব্যঞ্জন স্থান

কিন্তু রূপমূলের ক্ষেত্রে তাকে অর্থবোধক হতেই হবে।

(৫) অক্ষর বা দলকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়– (১) মুক্তদল (২) রুদ্ধদল। মুক্তদল স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ (মা)। রুদ্ধদল – ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শেষ (আম্)। রূপমূলও দুই প্রকার– (১) মুক্ত রূপমূল (২) বদ্ধ রূপমূল।

মুক্তরূপমূল ➔ সর্বদাই অর্থবোধক; ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য নয়, অন্যের সাহায্য ছাড়া ব্যবহৃত হয়। যেমন -'মরণ', 'জীবন'।

বদ্ধরূপমূল ➔ সর্বদাই অর্থবোধক, ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য নয়, কিন্তু স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, মুক্তরূপমূলের সাহায্য নিতে হয়। যেমন - রা, গুলো ইত্যাদি।

তবে আকৃতি ও প্রকৃতিতে রূপমূল বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

✧ রূপমূল ও শব্দের সম্পর্ক ✧

শব্দ বলতে বোঝায় ভাষার ক্ষুদ্রতম একক যা অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে। কিন্তু রূপমূল ভাষার ক্ষুদ্রতম একক যা সর্বদা বা কখনো কখনো অর্থ প্রকাশ করে। যেমন – 'ছেলে' এটি শব্দ এবং রূপমূল উভয়ই হবে।

রূপমূলের ক্ষেত্রে বিভক্তি যুক্ত হতে পারে। কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে তা হয় না। কারণ বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলে। তাই শব্দে বিভক্তি যোগ করলে তা পদে পরিণত হয়।

যেমন — ছেলেরা = ছেলে + রা

এখানে 'ছেলে' শব্দ। কিন্তু তার সঙ্গে 'রা' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। তাই এটি শব্দ না হয়ে পদে পরিণত হয়েছে।

✧ রূপমূল ও ভাষার সম্পর্ক ✧

প্রচলিত ব্যাকরণ থেকে এটা আমরা জেনেছি যে কোন ভাষার জ্ঞান বলতে সেই ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞানকে বোঝায়, কিন্তু আধুনিক ভাষাবিদ্‌রা রূপমূলের ভূমিকাকে খাটো করে দেখেন নি। ভাষা বিভাজন ও সংগঠনের দিক থেকে রূপমূল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যেক ভাষায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয় তা এক বা একাধিক রূপমূল দিয়ে গঠিত। তাছাড়া রূপমূলে অর্থ ভাষা প্রয়োগ ও বিস্তারে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ভাষাকে ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে যখন কোন অর্থ পাওয়া যায় না তখন তা রূপমূল হয়। আবার ভাষাকে ক্ষুদ্রতম উপাদানে ভাঙতে গেলে অক্ষর বা ধ্বনি পর্যন্ত যে স্তরে যেখানে আমরা অর্থ পাচ্ছি তাকে রূপমূল স্তর বলা হয়।

✧ রূপমূল চেনার উপায় ✧

এমনিতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা হলেও রূপমূল চেনা কঠিন ব্যাপার। সাধারণত ভাষাবিদ্‌রা বাক্য বিশ্লেষণ করে রূপমূল খুঁজে পান। রূপমূল চিহ্নিতকরণের দুটি পদ্ধতি হল — প্রচলিত পদ্ধতি এবং আধুনিক পদ্ধতি। প্রচলিত পদ্ধতির জনক ইউজিন.এ. নিদা বা নাইডা এবং আধুনিক পদ্ধতির জনক আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি।

নিদা বা নাইডার ছয়টি শর্ত ঃ

রূপমূল চেনার পদ্ধতি হিসাবে উনিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের শেষভাগে, সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের যুগে আমেরিকার প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ইউজিন এ. নিদা ছয়টি মাপকাঠি নির্দেশ করেন — সেগুলো ষাট দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত জনপ্রিয় ভাবে অনুসরণ করা হতো। পরবর্তী পর্যায়ে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের অভিধা ও ভাষাবিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলনের পর সত্তর দশকে প্রথম দিক থেকে রূপমূল চিহ্নিতকরণ ও বিভাজনের ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে রূপমূল চিহ্নিতকরণ তথা বিভাজন পদ্ধতির ব্যাপারে ভাষাবিজ্ঞানীরা একমত নন। তবু যেহেতু রূপমূল ভাষার উপাদান হিসেবে সংগঠনে কার্যকর সেহেতু কিছু বৈশিষ্ট্য এর সম্পর্কে সর্বদাই মৌলিক। তাই নিদা (Nida) এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের সকলেই কতিপয় মৌলিক বিষয়কে বিবেচনা না করে পারেন না (তাঁদের মধ্যে ধারণা ও পদ্ধতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও)। এজন্যই আমরা নিদা উল্লেখিত মাপকাঠিগুলো বা শর্তগুলোকে সংক্ষেপে বিবৃত করবো। নিদা তাঁর 'Morphology' নামক গ্রন্থে রূপমূল গঠনের ৬টি শর্তের কথা বলেছেন।

প্রথম শর্ত ঃ

যে নির্মাণগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং অর্থগত মিল বর্তমান তাদেরকে আমরা একটি মাত্র রূপমূল হিসাবে চিহ্নিত করবো।

উদাঃ প্রভুত্ব, দাসত্ব, অস্তিত্ব শব্দে। যে জায়গায় 'ত' প্রত্যয় যোগ সেখানে একটা ভাবকে বোঝাচ্ছে। চেহারা এবং অর্থ এক— দাতা, কর্তা, জ্ঞাতা এই শ্রেণির উদাহরণ।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ

যে নির্মাণগুলোর অর্থগত মিল আছে কিন্তু ধ্বনিগত অমিল বর্তমান, তাদেরকেও একই রূপমূল হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে যদি তাদের ভিন্নতা ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায়।

উদাঃ অবিচার – অ + বিচার,
অনাচার – অন + আচার,
অকাজ – অ + কাজ,
অনপনেয়– অন + অপনেয়

'অ', 'অন' এখানে নঞর্থক, চেহারার অমিল অ, অন একই রূপমূল।

অনুরূপে–

সন্ত্রাস – সন্ + ত্রাস
সংলাপ – সং + লাপ
সন্ধান – সন্ + ধান
সম্প্রচার – সম্ + প্রচার

অর্থ ব্যাপকতা সম্ , সন্ , সং একই রূপমূলের উপরূপ।

তৃতীয় শর্ত ঃ

যে নির্মাণগুলির মধ্যে অর্থগত মিল আছে কিন্তু ধ্বনিগত অমলি বর্তমান তাদেরকেও আমরা একই রূপমূল হিসাবে চিহ্নিত করবো। যদি তারা পূরক অবস্থানে বসে।

উদাঃ গায়িকা -- গায় + ইকা
বেদেনি – বেদে + নি
ইন্দ্রানী – ইন্দ্র + আনী
দেবী – দেব + ঈ

এই প্রত্যয়গুলি দিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ তৈরি করি। কিন্তু একের প্রত্যয় অন্যত্র দিলে চলে না। পূরক অবস্থান ইন্দ্র + ই যোগ করতে পারবো না। ইকা , নি , আনী , ঈ একই রূপমূলের সহরূপ।

চতুর্থ শর্ত ঃ

যে নির্মাণগুলি একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তাকেও আমরা রূপমূল হিসাবে চিহ্নিত করবো যদি যার সঙ্গে রূপমূলটি ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি একাধিক স্থানে বসে।

উদা ঃ বে—হায়া — হায়াকে রূপমূলক হিসাবে চিহ্নিত করতে পারছি।

বে — আব্রু বে — হাত

বে — নজির বে — নামী

পঞ্চম শর্ত ঃ

একটি নির্মাণকে রূপমূল চিহ্নিত করা যাবে যদি সেই রূপমূলটি যে প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সেই প্রত্যয়টি একাধিক নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

উদ ঃ গম + অন < গমন - এই -অন প্রত্যয়টি একাধিক নির্মাণে অবস্থান করছে, নিম্নলিখিত উদাহরণে প্রত্যেকটাতে অন প্রত্যয় আছে।

শ্রবণ বলন

চলন ধরণ

ষষ্ঠ শর্ত ঃ

যদি একাধিক নির্মাণের মধ্যে গঠনগত মিল থাকে কিন্তু অর্থগত অমিল থাকে তাদেরকে আমরা ভিন্ন রূপমূল হিসাবে চিহ্নত করব। তাদের সমধ্বনি রূপমূল বলবো — ধ্বনিগত দিক থেকে এক, অর্থগত দিক থেকে আলাদা।

উদা ঃ চিনি — মিষ্টি দ্রব্য
চিনি — জানা অর্থে
> চেহারা এক অর্থ আলাদা

কিংবা— সাল — সন
শাল — গাছ
> উচ্চারণে (চেহারা এক) অর্থ আলাদা

এইভাবে নিদা রূপমূলের ছয়টি শর্ত দিয়েছেন।

আধুনিকযুগের ভাষাবিজ্ঞানীরা রূপমূল চিহ্নিতকরণের জন্য শিশুদের ভাষা এবং কথ্যভাষা বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়েছেন। কারণ শিশুরা প্রথম এক একটি শব্দ আয়ত্ত্ব করে , আবার একটি বাক্য বাক্য পুরো শিখে নিয়ে সেখান থেকে শব্দকে আলাদা করে চিহ্নিত করে। একটা ভাষিক পরিবেশে শিশুরা প্রথম বয়স্কদের কাছ থেকে ধ্বনি প্রবাহ আয়ত্ত্ব করে এবং ভুল শুধরে নিয়ে বলতে থাকে। চমস্কি বাক্যপ্রয়োগে প্রয়োগ কর্তার মনস্তত্ত্বকেগুরুত্ব দিয়েছেন।

✧ রূপতত্ত্ব ✧

রূপতত্ত্ব আসলে রূপমূলতত্ত্ব (Morpholygy) । বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক । একে বলা হয়েছে ‘ minimal linguistic sign’। প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী বাংলায় বিভিন্ন প্রকার রূপগুলি হল – পদ , লিঙ্গ , বচন , কারক, সর্বনাম , ক্রিয়া , ধাতু , পুরুষ উপসর্গ, অনুসর্গ ইত্যাদি।

✧ পদ ✧

বিভক্তিরূপ অলংকারে সেজে শব্দ যখন বাক্যের সারিবদ্ধ পিঁড়িতে বসে তখন শব্দ পদে পরিণত হয়। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে, অর্থাৎ পদ - বিভক্তি = শব্দ । পাণিনি তাঁর ‘অষ্টাধ্যায়ী’-তে বলেছেন ‘সুপ্ তিঙন্তং পদম্’ । তিনি পদকে দুভাগে ভাগ করেছেন – সুবন্ত ও তিঙন্ত। ‘সুপ্’ অর্থাৎ কাবক-বচন-লিঙ্গবাচক বিভক্তিযুক্ত পদ। এর মধ্যেই বিশেষ্য-বিশেষণ ও সর্বনামের অবস্থান। আর ‘তিঙ্’ হল কাল-ভাব-বাচ্য-পুরুষ-বচনবাচক বিভক্তিযুক্ত পদ। এছাড়া পাণিনি আর এক শ্রেণির পদের কথা বলেছেন যার নাম নিপাত। কারক-বচন-কাল-ভাব-বাচ্য ইত্যাদি ভেদে এই অব্যয় জাতীয় পদের কোন রূপান্তর হয় না। নিপাত অর্থাৎ ‘উড়ে এসে জুড়ে বসা’ বাক্যেব অর্থেব কোন পরিবর্তন ঘটায় না ঘটালেও বাক্য-বোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নিপাত দু’করম –

ক. খাঁটি নিপাত ঃ বিভক্তি-চিহ্নহীন

খ. ব্যবহারিক নিপাত ঃ একসময় সুবন্ত ছিল পরে পরিবর্তিত হয়েছে।

অব্যয় জাতীয় হলেও নিপাত আর ফেলার নয় । অরুণ ঘোষ এবং প্রবাল দাশগুপ্ত যথাক্রমে ‘তো’ এবং ‘যে’ নিপাতের বিচিত্র বাক্য-প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

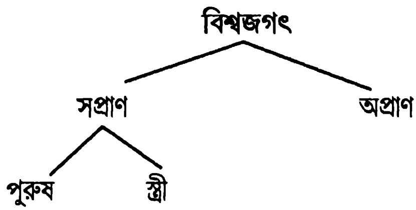
প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পদ পাঁচ প্রকার – বিশেষ্য , বিশেষণ , সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া। বিশেষ্য হল নাম প্রকাশক শব্দ ; বিশেষণ হল বিশেষ্যের দোষ গুণের প্রকাশক; সর্বনাম বিশেষ্যের পরিবর্তিত শব্দ। আর ক্রিয়া বাক্যের মূল , তার সঙ্গে আন্বয়িক সম্পর্কে বাক্যের অন্য শব্দগুলি বিভক্তিযুক্ত হয়ে বসে। অব্যয় আপাতভাবে গুরুত্বহীন হলেও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এর গুরুত্ব কম নয়।

বিদ্যালয় পাঠ্য ব্যাকরণে পদ আট প্রকার । সুকুমার সেন জানিয়েছেন এই বিভাজন ইংরাজি ব্যাকরণ অনুযায়ী – “ নাম (noun), সর্বনাম (pronoun), বিশেষণ (adjective), ক্রিয়া (verb), ক্রিয়াবিশেষণ (adverb), উপসর্গ (preposition), সংযোজক-বিয়োজক অব্যয় (conjunction), এবং বিস্ময়সূচক অব্যয় (interjection)।”

✧ বাংলা ভাষায় লিঙ্গ নির্দেশ পদ্ধতি ✧

ভাষার মধ্যে মানুষ তার নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটায়। জগৎ এবং জীবনকে দেখার ভঙ্গিতে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠির মধ্যে পার্থক্য আছে। আর তাই লিঙ্গ অনুযায়ী

শব্দের রূপান্তর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকমের হয়। মানব সমাজের প্রত্যুষলগ্নে লিঙ্গ নির্দেশের দিক থেকে সপ্রাণ ও অপ্রাণের ভেদটাই ছিল মুখ্য। আবার সন্তান ধারণ ও কতকগুলি বিশেষ দৌহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সপ্রাণ বস্তুগুলোকে পুরুষ ও স্ত্রী দুভাগে ভাগ করা যায়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় প্রাকৃতিক লিঙ্গ নির্দেশ পদ্ধতি । অন্যান্য ভাষার বাংলা ভাষাতে এই পদ্ধতির অনুসরণ দেখা যায়। ইংবাজিতে আছে Father - Mother; সংস্কৃতে পিতা- মাতা ; পার্সিতে পেদর-মাদর ; বাংলায় 'বাবা-মা'। এক-কথায় প্রাকৃতিক লিঙ্গ বিভাজন পদ্ধতি অনুসারে –



প্রাকৃতিক লিঙ্গ -বিভাজন পদ্ধতি ছাড়াও ভাষা বিজ্ঞানে আরও যে দু-একটি পদ্ধতি আছে তা আলোচনা করে না নিলে বাংলা ভাষার সঠিক লিঙ্গ নির্দেশ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা যাবে না। বৈয়াকরণ লিঙ্গ নির্দেশ পদ্ধতির প্রভাবও এ প্রসঙ্গে আলোচ্য।

সংস্কৃতে নদ - পুং, নদী - স্ত্রী, তেমনি দার, কলত্রম্ ও ভার্যা এক জাতি বোঝায় এ পদ্ধতি অনুসারে তাদের তিন লিঙ্গ। এতে জাতিবাচক একটি শব্দ যে লিঙ্গ বোঝায় অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় সেই শব্দই অন্য লিঙ্গ বোঝাতে প্রযুক্ত হয়। যেমন সংস্কৃতে 'ইক্ষু' পুংলিঙ্গ, পঞ্জাবিতে 'ইকখ্' পুংলিঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত কিন্তু গুজরাতিতে 'ইখ্'/উখ্ স্ত্রী লিঙ্গ। তেমনি হিন্দী 'দহি' পুংলিঙ্গ ; কিন্তু পঞ্জাবিতে 'দহী' এবং সিন্ধি ভাষায় 'ডহী' স্ত্রী লিঙ্গ।

বৈয়াকরণ লিঙ্গ বিভাগ দু-ভাবে হয় –

(ক) প্রত্যয় সিদ্ধ

(খ) ব্যবহার সিদ্ধ

এই পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে এর স্ত্রীলিঙ্গ যে প্রাকৃতিক জগতের স্ত্রী লিঙ্গকে বোঝাতে ব্যবহৃত হবে এমন কোনো কথা নেই। বাংলায় এমনটা দেখা যায় না।

তৃতীয় আর একটি পদ্ধতি ভাষাবিজ্ঞানে আছে – যাকে শ্রেণিকেন্দ্রিক লিঙ্গ পদ্ধতি বলা হয়। যেমন গারো ভাষায় –

পুরুষ বা বাবা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়	– bi -pa
মা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়	– bi-ma
বাচ্ছা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়	– bi-sa

শ্রেণিবাচক শব্দ (bi) আগে বসে। অর্থাৎ পুং, স্ত্রী নির্বিশেষে একটি নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়। তেমনি –

do-po – পেঁচা ┐
               ├– 'do' ডানা যুক্ত প্রাণি
do-gep – হাঁস ┘

এ পদ্ধতিতে শ্রেণির উপর গুরুত্ব পড়ে। তাই একে অনেক ভাষাবিজ্ঞানি শ্রেণিকেন্দ্রিক লিঙ্গ নির্দেশ পদ্ধতি বলে থাকেন। বাংলায় এই পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। যেমন হাঁস উভয় লিঙ্গ, কিন্তু হাসা পুং লিঙ্গ, এবং হাঁসী স্ত্রী লিঙ্গ অর্থাৎ 'আ' এবং 'ই' প্রত্যয় যুক্ত করে যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়েছে।

এছাড়া বাক্যভিত্তিক লিঙ্গ নির্দেশ পদ্ধতি নামে একটি পদ্ধতিও ভাষা বিজ্ঞানে প্রচলিত। এই পদ্ধতি অনুসারে বিশেষণ হবে বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুযায়ী। অবশ্য একে একটু বৃহৎ অর্থে বৈয়াকরণ লিঙ্গনির্দেশ পদ্ধতি বলা যায় –

সংস্কৃতে – পুং – সুন্দরং বালকঃ গচ্ছতি।
স্ত্রী – সুন্দরী বালিকা গচ্ছতি।

এই ধরনের প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে বিশেষণের ক্ষেত্রে (সুন্দর-সুন্দরী) লিঙ্গ সামঞ্জস্য হচ্ছে কিন্তু ক্রিয়া সামঞ্জস্য হচ্ছে না।

বাংলায় বাক্য অনুযায়ী এরকম লিঙ্গ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। যেমন–

একজন সুন্দর বালক যাচ্ছে।
একজন সুন্দর বালিকা যাচ্ছে।

এখানে বাক্য ভিত্তিক লিঙ্গ পদ্ধতি রক্ষিত হচ্ছে না। অবশ্য এককালে বিদ্যাসাগরী বা বঙ্কিমী লেখায় তা চালু ছিল অর্থাৎ সাধু গদ্যে তার প্রচলন ছিল, পরে ধার করা এই সংস্কৃত রীতি বাংলায় গৃহীত হয় নি।

পশ্চিমা ভাষাগুলিতে সর্বদাই বিশেষণ, সর্বনাম-বিশেষণ এবং কৃদন্ত ক্রিয়াপদ লিঙ্গভেদে পরিবর্তিত হয়। যেমন –

' উনকা বেটা '।
' উনকী বেটি '।

কিন্তু বাংলায় তা হয় না – যেমন 'ভাল ছেলে', 'ভালো মেয়ে'।

লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপান্তর প্রাচীন ভারতিয় আর্য এবং বাংলা কোন ভাষাতেই নেই, কিন্তু হিন্দিতে হয় –

চল গোয়া – পুং লিঙ্গ
চলি গ্যোয়ি – স্ত্রী লিঙ্গ

লিঙ্গ নির্ণয় পদ্ধতি

শব্দভিত্তিক — বাক্যভিত্তিক (বাংলায় চল নেই)

শব্দভিত্তিক:

পুরুষবাচককে ভিত্তি হিসাবে (নী, ইনী) যোগ করে স্ত্রী লিঙ্গ করা হয়
যেমন, বরুণ-বরুনানী
বাঘ -বাঘিনী।

শব্দশেষে স্ত্রী প্রত্যয় -'ঈ' যোগে স্ত্রী লিঙ্গ করা হয়।
যেমন, বুড়া -বুড়ী
খুড়া-খুড়ী

স্ত্রী বাচক শব্দ আগে যোগ করে স্ত্রী লিঙ্গ করা হয়। যেমন,
ঘোড়া -মাদী ঘোড়া
ছেলে -মেয়ে ছেলে।

এরপর ঐতিহাসিক দিক থেকে বাংলার লিঙ্গ নির্ণয়ের বিবর্তনের ধারাটি পর্যালোচনা করা দরকার। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য ভাষার প্রভাবও আলোচ্য।

সর্বনামের ক্ষেত্রে কোন স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গ বিভাগ বাংলায় নেই, মাগধিভুক্ত সব ভাষারই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। অবশ্য অসমিয়া (সি -পুং, তাই- স্ত্রী) মণিপুরিতে (তা-পুং, তেই-স্ত্রী) -এ পার্থক্য আছে। বাংলায় 'সে' স্ত্রীলিঙ্গও হতে পারে আবার পুংলিঙ্গও হতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বিশেষ্য , বিশেষণ ও প্রথম পুরুষ সর্বনামে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ বজায় ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ নির্দেশ

প্রত্যয় সিদ্ধ (স্ত্রী প্রত্যয় যোগে)
যেমন — নরঃ + ঈ = নারী
নদ + ঈ = নদী

ব্যবহার সিদ্ধ (ব্যঞ্জনান্ত শব্দে)
যেমন — মরুৎ —পুং
সরিৎ — স্ত্রী

প্রাচীন ভারতীয় আর্যে শব্দগত লিঙ্গ পরিবর্তন হতো মূল পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে 'আ' এবং 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করে। যেমন — নিশি + আ = নিশা।

মধ্য ভারতীয় আর্যে -'আ' কারান্ত স্ত্রী লিঙ্গ পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। লোপের কারণ পদান্ত 'আ'-কারের 'অ'-কার প্রবণতা। এর ফলে যে অসুবিধা হল তাতে মধ্য ভারতীয় আর্যে স্ত্রী লিঙ্গ বোঝাতে 'আ' কারের ব্যবহার কমে গিয়ে 'ই' প্রাধান্য পেল।

অগ্নি > আগ্‌গি > আগ এই 'আগ'-এর সঙ্গে নূতন স্ত্রী প্রত্যয় (-ই) যুক্ত করে 'আগি' স্ত্রী লিঙ্গ করা হল। কিন্তু চর্যায় যে 'লাগেলি আগি' পাওয়া যায় সেখানে 'আগি' কিন্তু স্ত্রী লিঙ্গ নয়। 'ই' কারান্ত ক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য বা স্বর-সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই তা ব্যবহৃত হয়েছে।

হাড়েরি মালী — হাড়েরি = হাড়ের (হাড় + এর) + ই (স্ত্রী) মালীর সঙ্গে লিঙ্গ সৌষম্য। মালী < মালিকা।

সোনে ভরলী করুণা নাবী — ভরিলী 'নাবী'-র লিঙ্গ সামঞ্জস্যর জন্য হয়েছে।

প্রাচীন বাংলায় 'র'-কারান্ত মত্বার্থ বিশেষণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সামঞ্জস্য বজায় ছিল, পরে ব্রজবুলির মধ্যে কিছু কিছু দেখা গেলেও পরবর্তীকালে এই ব্যবহার লুপ্ত হয়, কিন্তু 'ল' কারান্ত কৃদন্ত বিশেষণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সামঞ্জস্য ব্যাপারটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত চলে এসেছে। — 'উত্তরলী হইলী রাহী বাঁশীর নাদেঁ।'

বচন, কারক অনুযায়ী বা ব্যাকরণ ঘটিত ব্যাপারে লিঙ্গ সামঞ্জস্য মাগধি সম্ভূত কোন ভাষাতে নেই, স্বাভাবিকভাবে বাংলাতেও অদৃশ্য।

বেটা-ছেলে, মেয়ে-ছেলে ইত্যাদি পুরুষ বা স্ত্রী বাচক শব্দ আগে যোগ করে যে লিঙ্গ নির্ণয় পদ্ধতি বাংলাতে প্রচলিত ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন এটা ফারসি প্রভাবজাত। কিন্তু এর পিছনে অষ্ট্রিক গোষ্ঠির প্রভাবও থাকতে পারে।

সাঁওতালি ভাষায় — কোড়া হপন্ — পুং,
কুড়ি হপন — স্ত্রী অর্থে প্রচলিত।

এছাড়া বাংলার আর একটি বৈশিষ্ট্য ক্ষুদ্র অর্থে 'ই' প্রত্যয় এবং বড় অর্থে 'আ' প্রত্যয় যোগ। যেমন — থালি — ছোট বাটি বা পাত্র
থালা — বড়ো পাত্র বা আধার

এই 'ই' আবার স্ত্রী লিঙ্গের 'ই'-র সঙ্গে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো, তাই 'আ' পুংলিঙ্গের নির্দেশক প্রত্যয় হিসাবে নির্দিষ্ট হল; যেমন — 'হরিণা -হরিণীর নিলয় না জানি' অনুরূপে 'চকা-চকি' ; বগা-বগি ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলায় বা অধিকাংশ আধুনিক ভাষাতেই ক্লীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ একাকার হয়ে গেছে। একমাত্র ক্লীবলিঙ্গ রক্ষিত আছে মারাঠি গুজরাতি ও সিংহলিতে।

✧ বাংলা ভাষায় স্ত্রী বাচক শব্দ তিনটি উপায়ে গঠিত হয় ✧

✧ পৃথক শব্দ দ্বারা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশ ঃ —

(ক) বাংলা শব্দ ঃ — বাবা, বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে (জাতি অর্থে, পত্নী অর্থে, বউ, পুত্র-বধূ), ভাই-বহিন, বোন্, ভগিনী (ভাইয়ের পত্নী — ভাজ, ভাই-বউ, ভ্রাতৃবধূ, চলিত উচ্চারণে ভাদ্রবধূ, বউ দিদি — বড় ভাইয়ের স্ত্রী), পো-ঝি জাতি অর্থে, বউ (পত্নী অর্থে), জামাই-ঝি / মেয়ে (স্ত্রী অর্থে) ইত্যাদি।

(খ) সংস্কৃত শব্দ ঃ — পিতা-মাতা, জনক-জননী, স্বামী-স্ত্রী, বর-বধূ, নর-নারী, বৃষ/ষণ্ড-গাবী (প্রাকৃত -গাভী), পুত্র-কন্যা, (পুত্রের স্ত্রী অর্থে পুত্রবধূ), ইত্যাদি।

(গ) বিদেশি শব্দ ঃ — বাদশা/নবাব-বেগম, সাহেব-বিবি, গোলাম-বাঁদী, লর্ড / লাট-

লেডি, মিষ্টার (শ্রীযুক্ত)-মিস (কুমারী), মিসেস (বিবাহিত নারী), সাহেব-সাহেবা, চাকর-ঝী (প্রাকৃতজ) / চাকরাণী ইত্যাদি।

✧ **সাধারণ শব্দে পুরুষ অথবা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগে লিঙ্গ নির্দেশ ঃ —**

বেটা / পুরুষ — মেয়ে / নারী / স্ত্রী / মহিলা ; নর-নারী প্রভৃতি কতকগুলি শব্দযোগে বিশেষ্যের লিঙ্গ নির্দেশ হয়। 'বউ, পত্নী' প্রভৃতি শব্দও স্ত্রীলিঙ্গে যুক্ত হয়। - বেটাছেলে-মেয়েছেলে; পুরুষমানুষ -মেয়েমানুষ/ স্ত্রীলোক; কবি (পুং কবি) -মেয়ে কবি/ স্ত্রীকবি/ মহিলা কবি; (পুং) যাত্রী-মেয়ে যাত্রী; গোঁসাই-মাগোঁসাই; ষাঁড়-গাই গোরু; এঁড়ে বাছুর - বকনা বাছুর ইত্যাদি। উভয়লিঙ্গ বাচক একমাত্র শব্দ দিয়েও কাজ চলে, বাক্যের অর্থ ধরে লিঙ্গ নির্ণয় করতে হয়। -গোরুতে গাড়ী টানে, (গোরু-বৃষ), গরু দুধ দেয় (গরু -গাভী), অনুরূপে 'মহিষ' শব্দ মহিষে গাড়ী টানে, মহিষে দুধ দেয় ইত্যাদি।

✧ **পুংবাচক শব্দের অন্তে প্রত্যয় যোগে স্ত্রী বাচক শব্দ গঠন ঃ —**

(ক) **বাংলা প্রত্যয় ঃ** — (অ) 'ঈ' (ই) -তৎপত্নী/তদ্‌জাতীয়া অর্থে পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করে। মামা-মামী / মামী মা, কাকা-কাকী, খুড়া-খুড়ী, সত্ / সৎ-সতী, ঘোড়া-ঘুড়ী / ঘোড়ী, বেঙ্গমা (বিহঙ্গম শব্দজাত)-বেঙ্গমী। 'রূপসী, সজনী, ধনী'-- এই তিনটি স্ত্রীলিঙ্গ (বাংলা) শব্দের পুংরূপ বাংলায় নেই।

(আ) 'ন' প্রসারে 'নী, নি, আনী, ইন, উনি, উন্' ইত্যাদি। -- 'বেহাই-বেহাইন/ বেয়ান, নাতী-নাতিনী /নাত্নী, কুমার-কুমারী, নাপিত-নাপিতানী ইত্যাদি। কতকগুলি শব্দে দুই প্রস্থ স্ত্রী প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে। সতীন (সপত্নী থেকে সৎ/মাতা শব্দ যেমন সৎ-মা, সৎ-ঈনী, ঈন -সতীনী, সতীন), ননদ (মুল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তাহাতে স্ত্রী প্রত্যয় 'ইনী' যোগে কাব্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত), — ননদিনী ইত্যাদি।

(ঘ) **সংস্কৃত প্রত্যয় ঃ —**

(১) 'আ' যোগে স্ত্রী -প্রত্যয় হয়। বৈবাহিক-বৈবাহিকা, অনুরূপে দ্বিজ-দ্বিজা, প্রাচীন-প্রাচীনা, মহাশয় - মহাশয়া, অশ্ব - অশ্বা (অশ্বী), মূর্খ - মূর্খা ইত্যাদি।

(২) 'আনী' — পত্নী অর্থে— ভবানী (ভব), মাতুলানী (মাতুল, মাতুলী) ইন্দ্রাণী, আচার্য্যানী (স্ত্রী আচার্য্য অর্থে 'আচার্য্যা)। অনুরূপে 'হিমানী, অবন্যনী, বনানী' ইত্যাদি। এগুলি কিন্তু নিপাতনে সিদ্ধ।

(৩) 'ইকা', 'অক' প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ইকা' হয়। — লেখক -লেখিকা, পাচক -পাচিকা, বালক-বালিকা, ঋষি-ঋষিকা। ক্ষুদ্র অর্থে 'ইকা' প্রত্যয় হয়।যেমন- পুস্তক-পুস্তিকা, নাটক-নাটিকা, মালা-মালিকা, চয়ন-চয়নিকা ইত্যাদি।

(৪) 'ঈ' প্রত্যয় যোগে — কুমার-কুমারী, অনুরূপে কিশোরী, হংসী, তন্বী (তনু), লঘী (লঘু) বৈষ্ণবী ইত্যাদি। কিন্তু নর-নারী — এখানে 'ঈ' প্রত্যয়ের ব্যবহার রীতি

বহির্ভূত। নদ-নদী, এখানে হ্রাস্বার্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহাব। অন্য — 'ঈ' প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। অনুরূপে অনুচরী প্রলয়ঙ্করী, শুভঙ্করী, জলময়ী, চতুর্থী, অষ্টাদশী, চতুর্দশী, পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দগুলি ক্রম জানাইতে ও তিথি জানাইতে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু ১মা, ২য়া, ৩য়া— এদের ক্ষেত্রে 'আ' প্রত্যয় হয়।

তাছাড়া জাতি বা শ্রেণিবাচক অ-কারন্ত তৎসম শব্দে (মানব ও ইতব প্রাণি, উভয় দ্যোতক) 'ঈ' প্রত্যয় সাধারণ নিয়ম (মানব-মানবী, হংস-হংসী ইত্যাদি)। কখনো আবার 'আ' প্রত্যয়ও হয়, যথা -শূদ্র-শূদ্রা, কোকিল-কোকিলা, অজ-অজা ইত্যাদি, কতকগুলি 'ক' বা 'অক' প্রত্যয়ান্ত পুং লিঙ্গ শব্দের স্ত্রীরূপে 'ইকা' প্রত্যযের পরিবর্তে 'কী'/'অকী' হয়। — রজক-রজকী, নর্তক-নর্তকী ইত্যাদি।

(অ) 'ইনী' (ইন + ঈ) — হস্তিনী, বিদেশিনী, মালিনী (= মালী + নী) ইত্যাদি।

(আ) বিনী (= বিন্ + ঈ) — যশস্বিনী, তেজস্বিনী, মায়াবিনী ইত্যাদি।

(ই) — তৃ = এ্ + ঈ = ত্রী ঃ — কর্তা -(কর্তৃ)- কত্রী, দাতা-(দাতৃ)-দাত্রী।

(ঈ) শতৃ (-অচ্/ অন্ত) — 'অৎ + ঈ'= অতী ঃ — সৎ-সতী, বৃহৎ-বৃহতী।

(উ) রাজন (রাজা) + ঈ = রাজ্ঞী, খ্যাতনামন্ + ঈ = খ্যাতনাম্নী, নর + ঈ = নারী।

(৫) (ক) কতকগুলি শব্দের বিকল্পে 'আ/ঈ'' হয়। — বিশাল-বিশালা /বিশালী, ভাবুক-ভাবুকা /ভাবুকী ইত্যাদি।

(খ) বহুব্রীহি সমাসের পরবর্তী, অঙ্গবাচক শব্দের বিকল্পে 'ঈ'/আ' হয়। — সুকেশা/সুকেশী, চন্দ্রমুখা/ চন্দ্রমুখী ইত্যাদি।

(গ) বিদেশী স্ত্রী প্রত্যয় — (১) তুর্কি 'অম্', বেগ্-বেগম্, খান-খানম্। (২) আরবি ও ফারসি — 'অহ্ = আ ' — সুলতান-সুলতানা, মালিক-মালিকা ইত্যাদি।

(ঘ) স্ত্রী লিঙ্গ থেকে পুং লিঙ্গ — কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের আধারের উপর তৈরি হয়েছে। বোনাই < বোন , পিসা (পিউসা < পিসী), খালু < খালা ইত্যাদি।

(ঙ) বাংলায় অ-প্রাণিবাচক শব্দেও অনেক সময় লিঙ্গান্তরের সাহায্যে ক্ষুদ্রবৃহৎ ভেদ বোঝানো হয়। পুং বাচক 'আ' প্রত্যয় 'বৃহৎ — এবং স্ত্রীবাচক 'ঈ' প্রত্যয় ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাণ্ডা-হাঁড়ী, জাঁতা-জাঁতি ইত্যাদি।

✧ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বাংলা বচন নির্দেশ পদ্ধতি ✧

বস্তু জগতে বস্তু সমূহের অবস্থান ও সংখ্যা বোঝাবার জন্য প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দের কিছু রূপান্তর ঘটানো হয় একে বচন (Number) বলে । একটি বোঝাতে একবচন, দুটি বোঝাতে দ্বিবচন ও দুইয়ের অধিক বোঝাতে বহুবচনের ব্যবহার হয়।

ভাষা বিজ্ঞানীরা ইন্দো-ইউরোপিয় গোষ্ঠিভুক্ত ভাষাগুলির তুলনামূলক পর্যালোচনা

করে দেখেছেন যে, এই ভাষার রূপতত্ত্বে তিনটি বচন ছিল — একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে দ্বিবচন ছিল এবং এর ব্যবহারও ছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রাতিপদিক এর ব্যবহার হতো পৃথক বচন অনুযায়ী। যেমন — একবচনে 'অহম্' (আমি), দ্বিবচনে 'আবাম্' (আমরা দুজন) এবং বহুবচনে 'বয়ম্' (আমরা)। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্যে দ্বিবচন লুপ্ত হয়। বাংলা ভাষায় দ্বিবচন নেই। সংস্কৃত ভাষার আগে ভারতে প্রচলিত অষ্ট্রিক ভাষা সাঁওতালিতে তিন বচন ছিল কিন্তু দ্রাবিড় গোষ্ঠির ভাষায় বাংলার মতো দুটি বচন লক্ষ করা যায়।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় দ্বিবচন লুপ্ত। তবে চর্যাগীতিতে দু-একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত আছে। ১৫ সংখ্যক গানে আছে -- 'বাম দাহিন দো বাটা চ্ছাড়ী .... বুজিঅ বাট জাইউ' সংখ্যা বাচক 'দো' বহুবচনের রূপ হিসাবে ধরে নিতে হয় (দো — দ্বৌ)।

✧ প্রাচীন বাংলা বচন নির্দেশ (চর্যাগীতি) ঃ

চর্যা নির্ভর প্রাচীন বাংলায় নামশব্দের রূপে বচন পার্থক্য ছিল না। নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝাতে পূর্বে সংখ্যা বাচক শব্দ, অথবা অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝাতে আগে বা পরে বহুত্ববাচক 'নানা', 'সঅল', জন লোঅ ইত্যাদি বসিয়ে কিংবা বিশেষণের বা সর্বনামের দ্বিত্ব ঘটিয়ে বহুবচন নির্দেশ হতো।

(১) সংখ্যা বাচক শব্দ আগে বসিয়ে — 'দুই চাকা', 'পঞ্চবি ডাল', 'বতিশ তান্তি'।
(২) অনির্দিষ্ট সংখ্যা বা বহুত্ব বাচক শব্দ — নানা তরুবর, বিদুজন ইত্যাদি।
(৩) বিশেষণের দ্বিত্ব ঘটিয়ে — 'উঁচা উঁচা পাবত'।
(৪) সর্বনামের দ্বিত্ব ঘটিয়ে — 'জে জে আইলা তে তে গেলা'।

এছাড়া সর্বনামে শুধু উত্তম ও মধ্যম পুরুষে বচন পার্থক্য ছিল।

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	হঁউ, হাঁউ, মই, মোএ	অমহে
মধ্যম পুরুষ	তু, তো, তই, তোএ	তুহ্মে, তুম্হে

কিন্তু এ পার্থক্য সর্বদা রক্ষিত হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বহুবচন জাত 'আহ্মে', তুহ্মে পদ একবচন ব্যবহার হলে সর্বনামে বচন পার্থক্য লোপ পায়।

✧ মধ্য বাংলায় বচন নির্দেশ ঃ

চর্যার সর্বনামের বহুবচন পদ একবচন হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নতুন করে -রা

প্রত্যয় যোগে সর্বনামের বহুবচনের পদ গঠন শুরু হল। যেমন — 'আহ্মারা মরিব শুনিলে কাঁশে', কিন্তু প্রথম পুরুষের কর্তায় এই ব্যবহার বহুল প্রচলিত নয়। এক্ষেত্রে বহুত্ববাচক শব্দ প্রয়োগ করা হয় — 'দেখি হরষে তা সব গোপ যুবতী'। এছাড়া চর্যার মতো বচন নির্দেশ ছিল। যেমন —

(১) সংখ্যাবাচক শব্দ বসিয়ে — 'দুই কেশ', 'বত্তীস রাজলক্ষণ' ইত্যাদি।

(২) সংখ্যাবাচক শব্দে নির্দেশক প্রত্যয় বা প্রত্যয়ের মতো বিশিষ্ট শব্দ বসিয়ে। — 'একখানি নাএ', 'দুটি মানিকেঁ'।

(৩) বহুত্ববাচক শব্দ আগে পরে বসিয়ে — 'সব দেবেঁ' (আগে), 'দেবাগণ'(পরে।

(৪) বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনামের দ্বিত্ব যোগে — 'ঘরে ঘরে ফিরি বুলে'।

পরবর্তী যুগে মধ্য বাংলা বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কর্তার বহুবচনে রা প্রত্যয় বিশেষ্যের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে থাকে এবং নির্দেশক বহুবচনে 'গুলা', 'গুলি' ব্যবহার হয়। অন্য উদাহরণ যেমন —

রা — বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণে' — কাজীরা, কামারেরা ইত্যাদি।

রা — মনোএল দা আস্‌সুম্পা সাঁও এর — 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এ — 'পাদ্রিরা'।

গুলা — বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভগবত' -এ — 'বামনগুলা'।

তির্যক কারকের বহুবচনে '-দি', -দে, -দিগ প্রত্যয় ব্যবহার সপ্তদশ শতাব্দি থেকে শুরু হয়। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে এর ব্যবহার আছে (তোমার দিগের)।

✧ আধুনিক বাংলায় বচন নির্দেশ ঃ

আধুনিক বাংলায় বচনে নির্দেশে প্রত্যয় বা প্রত্যয়স্থানীয় শব্দের ব্যবহার বেশি। বিভিন্নভাবে বহুবচন নির্দেশ হয় —

(১) প্রত্যয় বা প্রত্যয়স্থানীয় শব্দ যোগে — 'পাখিরা' (-রা যোগে বহুবচন), পাখিগুলো (-গুলো যোগে বহুবচন)।

(২) আগে পরে বহুত্ববাচক শব্দ যোগে — সব পাখি (আগে বসিয়ে), নক্ষত্র মালা (পরে বসিয়ে)।

(৩) সংখ্যাবাচক শব্দ বসিয়ে — পাঁচ মাথা, তিন কড়ি ইত্যাদি।

(৪) বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনামে দ্বিত্ব যোগে — 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'।

(৫) তির্যক কারকের বহুবচনের প্রাতিপাদিক প্রত্যয় রূপে 'দি', 'দিগের' ব্যবহার। বাংলা গদ্যের সূচনায় এমন পাওয়া যায়।

✧ নির্দেশক প্রত্যয় ও শব্দগুলির উৎপত্তি

প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলা বচন নির্দেশক প্রত্যয় ও শব্দগুলির উৎপত্তি জেনে নেওয়া

দরকার। বাংলা বহুবচন করতে গিয়ে যে 'রা' প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। এটি অনেকে মনে করেন ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। কিন্তু ফারসিতে এটি কর্ম কারকের বিভক্তি, বচন নির্দেশক প্রত্যয় নয়। বেশিরভাগ ভাষাবিদ্ মনে করেন এটি সংস্কৃত সম্বন্ধ 'র' বিভক্তির প্রসারিত রূপ।

গুলি, গুলা ঃ —

প্রাণিবাচক এবং অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রে 'গুলি' ও 'গুলা' যোগে বহুবচন করা হয়। 'গুলি' ব্যবহার হয় আদর অর্থে এবং অনাদর অর্থে 'গুলা' ব্যবহার করা হয়। এর উৎপত্তি সম্পর্কেও ভাষাবিদ্‌গণের মতপার্থক্য দেখা যায়। অনেকে মনে করেন এটি বহুত্ব তাৎপর্যবাহী সংস্কৃত 'কুল' শব্দ থেকে ধ্বনি পরিবর্তনে বাংলায় এসেছে সংস্কৃত কুল > গুল (ঘোষীভবন, স্বরের দীর্ঘত্ব)।

দের, দিগের ঃ -

'দের', 'দিগের' এদের উৎপত্তি হিসাবে কেউ বলেন এগুলি বহুত্ববা৲ক শব্দ মূল থেকে এসেছে। অনেকে মনে করেন প্রত্যয়টি ফারসি 'দিগের' থেকে আগত।

কুল, গণ ঃ —

বহুত্ববাচক বচন নির্দেশক শব্দ — কুল, গণ, জন, মণ্ডলী, লোক বর্গ, বৃন্দ, সকল, সব, সভা, সমুচ্চয়, সমুহ এগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত থেকে নেওয়া।

বাংলায় সংখ্যাবাচক শব্দগুলির সাহায্যে বচন নির্দেশিত হলে পদাশ্রিত নির্দেশক পদ যুক্ত হয়। যেমন — পাঁচজন মানুষ। বাংলায় একটা সাধারণ নিয়ম হল বহুত্ববাচক কোন শব্দ ব্যবহৃত হলে মূল শব্দের সঙ্গে আর কোন বহুত্ববাচক প্রত্যয় যুক্ত হয় না। যেমন — 'যে সকল লোক এলো' ('লোকেরা' হবে না)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত বা গ্রিক ভাষার মতো বাংলা ভাষায় দ্বিবচন নেই। হিন্দি, ইংরাজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার মতো বাংলায় বচন মাত্র দুটি — একবচন ও বহুবচন। বিভিন্ন প্রত্যয়, সংখ্যাবাচক ও বহুত্ববাচক শব্দ যোগে একবচনকে বহুবচনে রূপ দেওয়া হয়।

✧ বহুবচনে ভিন্নমুখি প্রয়োগ ✧

বাংলা ভাষায় মাত্র এক বচন অর্থাৎ যে বচন দ্বারা কেবল এক বস্তুকে বুঝায় এবং বহু বচন অর্থাৎ যে বচন দ্বারা একাধিক পদার্থকে বুঝায়। যেমন — মানুষ, গাছ, ধ্বনি প্রভৃতি একবচন এবং মানুষেরা গাছগুলি ইত্যাদি বহুবচন। বাংলাভাষায় এক বচনের জন্য বিশেষ কোনও প্রত্যয় নাই নাম/শব্দ স্বয়ংই এক বচনে ব্যবহৃত হয়। বহু বচনের জন্য শব্দের উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং সমষ্টিবাচক কতকগুলি শব্দও সংযোজিত হয়। যেমন — প্রত্যয় -রা, -এরা, -দিগ, -দিগের ইত্যাদি, সমষ্টি বাচক শব্দ -গণ, -কুল,-বৃন্দ, -জন, -আজি ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় মাঝে মধ্যে এক বচনের রূপ নিয়ে বহুবচন গঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে বাক্যের অর্থ ধরে একবচন অথবা বহুবচন বুঝতে হয়। শব্দের পূর্বে বহুত্ব জ্ঞাপক বা সংখ্যাবাচক বিশেষণ বসলে বহুবচনের চিহ্ন যুক্ত হয় না। 'পাঁচজন মানুষ' হয় কিন্তু 'পাঁচজন মানুষেরা' — এই প্রয়োগ যথার্থ নয়। কখনও কখনও সংখ্যা বা সমষ্টি বাচক শব্দ, নামশব্দের পরে বসে। যেমন 'মানুষ পাঁচজন'। সর্বনাম-পদ নামশব্দের বিশেষণ রূপে বসলে, সমষ্টিবাচক শব্দগুলি সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন — 'যে সকল মানুষ' প্রয়োগ ঠিক কিন্তু 'যে মানুষ সকল' হয় না।

✧ **বহুবচন জ্ঞাপক প্রত্যয়ের প্রয়োগ ঃ**

১. 'রা, এরা' — সব মুখ্যত চলিত ভাষার প্রয়োগ। সর্বনাম এবং দেবতা ও মানবের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং কখনও আবার ইতর প্রাণিবাচক নামেও যুক্ত হয়। আমরা, তোমরা, এক, দেবতারা, মুনিবা, ইউরোপীয়েরা, পণ্ডিতেরা ইত্যাদি। অনুরূপ পাখিরা, পশুরা, প্রাণিরা ইত্যাদি। অপ্রাণিবাচক বস্তুতে প্রাণ বা চেতনাশক্তি কল্পনা করিয়া 'রা' প্রত্যয় চলতে পারে। -আকাশের তারারা অতন্দ্র নয়নে চাহিয়া আছে। অনেক সময়ে -রা, -এরা প্রত্যয়ের সঙ্গে -সব এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। পণ্ডিতেরা সব, শয়তানেরা সব। তবে -রা, -এরা কেবল কর্তৃকারকে প্রযুক্ত হয়। শব্দটির উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত হলে সাধারণত -এরা এবং স্বরান্ত হলে -রা যুক্ত হয়। রাখাল্ -- রাখালেরা, পণ্ডিত্ — পণ্ডিতেরা; কিন্তু রাজা -- রাজারা, অনুরূপে সাধু — সাধুরা, ভাল -ভালরা ইত্যাদি।

২. 'দিগ, দিগের, দিগে, দের, এদের' — এই প্রত্যয়গুলি কর্তা ছাড়া অন্য কারকে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত যেখানে কর্তায় -রা, -এরা আসে সেখানে অন্য কারকে এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। এগুলি সংস্কৃত 'আদি' শব্দ ও তার ষষ্ঠী ও অন্য বিভক্তির রূপ 'আদির, আদিকের, আদিরে, আদিকে', থেকে জাত। বালকদিগকে, শিক্ষকদিগের, তোমাদিকে, ভদ্রলোকদের ইত্যাদি।

৩. 'গুলা, গুলি' — এই প্রত্যয়টি সংস্কৃত সমষ্টিবাচক 'কুল' শব্দ জাত। এর রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় -গুলা, -গুলির উৎপত্তি। প্রাণি ও অপ্রাণি বাচক উভয়প্রকার নামের সঙ্গে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। অনাদরে -গুলা (চলিত ভাষায় 'গুলা'-র পরিবর্তে 'গুলো' -স্বরসঙ্গতির নিয়মানুসারে) -গুলি ব্যবহৃত হয়। গোরুগুলি, বদমাইশগুলা, ফুলগুলি ইত্যাদি। উচ্চ শ্রেণির ব্যক্তিগণের নাম বাচক শব্দে -গুলা, -গুলি যুক্ত হয় না। দেবতাগুলা হয় না পরিবর্তে দেবতাগণ, শিক্ষকগণ ইত্যাদি। -গুলান, -গুলিন, -গুলাক—এই রূপগুলি সাধুভাষায় এখন অপ্রচলিত, তবে প্রাদেশিক ভাষায় এগুলি ব্যবহৃত হয়। -গুলা, -গুলি কর্তৃ ও অন্য সমস্ত কারকেই ব্যবহৃত হয়।

✧ বহুবচন জ্ঞাপক শব্দাবলি ঃ

বাংলায় নামের সঙ্গে যুক্ত বহুবচন দ্যোতক শব্দ সাধারণতঃ সংস্কৃত থেকে নেওয়া, এবং এগুলি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, প্রাকৃতজ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় না। যেমন — বালকবৃন্দ কিন্তু 'ছেলেবৃন্দ' নয় , পরিবর্তে ছেলেরা বা ছেলেগুলি। কিন্তু বিদেশি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন — 'নবাবগণ', 'মুসলমানগণ', কিন্তু 'গোরাগণ' হয় না। মূল শব্দ সমষ্টিবাচক শব্দ মিলিত হয়ে সংস্কৃতের অনুযায়ী একটি সমস্তপদ সৃষ্টি করে। তবে এই প্রকার সমস্ত পদে বাংলা বিভক্তি প্রত্যয়াদি হয়।

১. প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে 'কুল,গণ, জন, মণ্ডলী, লোক, বর্গ, বৃন্দ, সভা, মহল,' প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দের সহযোগে বহুবচন পদ গঠিত হয়। যেমন — মানবকুল, জনগণ, জনমণ্ডলী, রমণীসমাজ, নেতৃবর্গ, সভ্যবৃন্দ, যুবতীসভা, বন্ধুমহল ইত্যাদি।

২. 'অপ্রাণিবাচক' শব্দের সঙ্গে আবলী (রত্নাবলী), দাম (লতাদাম), রাজি (বৃক্ষরাজি), মালা (মেঘমালা), গুচ্ছ (গল্প গুচ্ছ) প্রভৃতি শব্দ যোগে বহুবচন পদ গঠিত হয়।

৩. সমূহ, সব, সকল, গ্রাম প্রভৃতি শব্দগুলি সাধারণভাবে সমস্ত প্রকার বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন পদ গঠন করে। আম্রসমূহ, তোমরা সব, যতলোক, সঅল সমাহিঅ করিঅই ইত্যাদি।

✧ বিদেশি বহুবচনে প্রত্যয় ঃ

আদালতে ব্যবহৃত বাংলা ভাষায়, ফারসি থেকে আগত 'হায়, ও আৎ' বিভক্তি বহুবচনে পাওয়া যায়। যেমন — আমলাহায়, দলিলাৎ ইত্যাদি। ফারসি 'আন' বিভক্তিতে মেলে। যেমন — সাহেবান্, বাবুয়ান্ ইত্যাদি। আবার বহুবচনে ফারসি 'দিগর'ও পাওয়া যায়। -'গোপাল দত্ত দিগর (অর্থাৎ গোপালদত্ত ও তার সহযোগীরা) বিদ্যা জাহির করছে ইত্যাদি।

✧ দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুবচন প্রকাশ ঃ

শব্দকে দুইবার ব্যবহার করে বহুবচনের ভাব প্রকাশিত হয়।

১. বিশেষ্য পদ 'বনে বনে' (বনে বনে ফুল ফুটেছে), ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, জিজ্ঞাসিত জনে জনে ইত্যাদি। এখানে পৃথক সত্তার ভাব উহ্য থাকে।

২. বিশেষণকে দ্বিরুক্তি করে — লাখ লাখ ফুল, বড় বড় গাছ, উঁচু উঁচু পাহাড় ইত্যাদি। এই ধরণের প্রয়োগ বহুবচন বুঝালেও, বহুবচনের অন্তর্গত পদার্থটির পৃথক সত্তার ভাব স্পষ্ট করে।

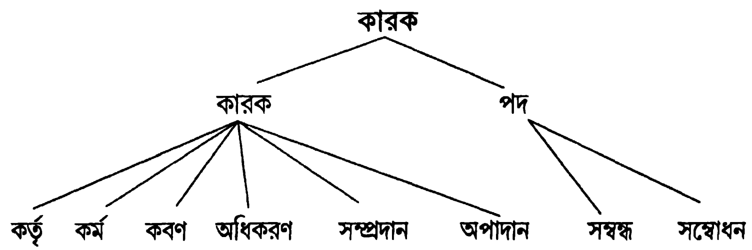
৩. সর্বনাম ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করেও বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে । যেমন — যে যে আইলা তে তে গেলা ইত্যাদি।

✧ কারক ও বিভক্তি ✧

অধিকাংশ ব্যাকরণ রচয়িতাই সংস্কৃতকে অনুসরণ করে বাংলা কারকের গঠন দেখিয়েছেন এবং এই সূত্র ধরে স্কুল পাঠ্য ব্যাকরণগুলি লেখা হয়েছে। আবার পবিত্র সরকারের মতো আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলা ভাষা অনুযায়ী কারক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। কারক নিয়ে তাই বিতর্কের শেষ নেই।

পাণিনির মতে কারক হল 'ক্রিয়ান্বয়ী' অর্থাৎ বাক্য ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য পদের যে সম্বন্ধ আছে তারই একটি একটি কারক আছে। এ সংজ্ঞা অর্থের দিক থেকে। কেউ ক্রিয়াটি সম্পাদন কবছে, তাকে প্রকাশ করছে যে 'পদ' তা কতৃকারক, যে ব্যক্তি বা বস্তু ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তার প্রকাশ পদটি পাচ্ছে কর্মকারক। ক্রিয়া সম্পাদনে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সহায়তা নেওয়া হচ্ছে, তাদের অর্থবোধক পদটি আসছে করণ কারকে। কারো উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত কাজটি ঘটছে -- প্রকাশক পদটি সেখানে সম্প্রদান কারক । কোন উৎস থেকে ক্রিয়াটির উদ্ভব বা ভিন্নতা ঘটেছে, তার পদটি অপাদান কারক। যে স্থান বা কাল ইত্যাদির পটভূমিকায় কাজটি ঘটছে, তার বাচক পদটি হচ্ছে অধিকরণ কারকে। তাছাড়া দুটি পদ — সম্বন্ধ আর সম্বোধন। এগুলি কারক নয় কারণ এদুটির সঙ্গে ক্রিয়াপদের কোন সম্পর্ক তৈরি হয় না। যখন বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে বিশেষ্য ইত্যাদির সম্পর্ক থাকে তখন হয় সম্বন্ধ পদ আর যে শব্দে কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে সম্বোধন করা হয় তখন বাক্যে ব্যবহৃত ওই পদটি সম্বোধন পদ।

প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী --



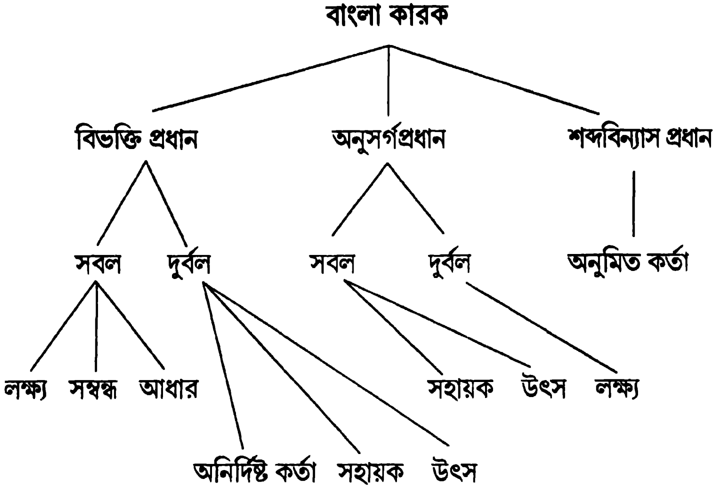
এই পথ অনুসরণ করেই আমরা বাংলায় কারক ও বিভক্তি চর্চা করে চলেছি । কিন্তু সুকুমার সেন, পবিত্র সরকার ইত্যাদিরা বাংলায় প্রযুক্ত কারক ও বিভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

কারকের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে কারক সূচক বিভক্তির ভিত্তিতেই বাংলা ভাষার চারটি কারক নির্দেশ করেছেন —

সুকুমার সেন —

আধুনিক বাঙ্গালায় কারক চারটি, — (১) কর্ত্তা, (২) কর্ম্ম, (৩) করণ - অধিকরণ ও (৪) সম্বন্ধ ।

পবিত্র সরকার অনুযায়ী বিভাজন —



প্রচলিত ব্যাকরণের 'সম্প্রদান' কারককে বাংলায় রাখার কোন অর্থ হয় না, একথা অনেকদিন আগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন। বাংলা ভাষায় নিজস্ব রূপ ও প্রকরণ অনুযায়ী পবিত্র সরকারের এই নতুন বিন্যাস নিয়ে ভাবা উচিত ।

প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে বলা হয়েছে বাংলায় কারক ছয়টি — কর্তৃকারক, কর্ম, করণ সম্প্রদান, অধিকরণ ও অপাদান কারক এবং ব্যবহৃত বিভক্তিগুলি হল এ, কে, রে, এর, তে, এতে। বাংলায় ব্যবহৃত কারক ও বিভক্তির বিবর্তনক্রমটি লক্ষ করা যেতে পারে।

(১) **কর্তৃকারক ঃ –**

সংস্কৃত তৃতীয়ার 'এন' বিভক্তি জাত 'এ' বিভক্তি বাংলায় কর্তৃকারকে অন্তর্ভূক্ত হয়। সংস্কৃতে পুত্রকঃ > পুত্তকে (মাগধি প্রাকৃত) > পুত্তএ > পুত্তই > পুত্তে। যেমন– কুম্ভীরে খাই (প্রাচীন বাংলা), মুখে রচিল গীত (মধ্য বাংলা), লোকে বলে (আধুনিক বাংলা)। বাংলায় 'এ' বিভক্তির রূপভেদ 'য়', 'য়ে'। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, মায়ে ডাকে (পূর্ববঙ্গের উপভাষা)। পশ্চিম বাংলার অঞ্চল বিশেষে 'এ' বিভক্তির সঙ্গে ৭মীর 'ত' বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'তে' বিভক্তি হয়। জার্সী গরুতে ভাল দুধ দেয়।

(২) **কর্ম কারক ঃ –**

সংস্কৃতের কর্মকারকের 'ম্' বিভক্তি বাংলায় লুপ্ত হয়েছে । সাধারণত মুখ্য কর্মে শূন্য বিভক্তি যুক্ত হয় , এখানে শব্দমূলই/প্রাতিপদকটিই কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়। – গুরু পুচ্ছিঅ জান (প্রাচীন বাংলা), বন্দোঁ মাতা সুরধনী (মধ্য বাংলা), আমাকে চা দাও (আধুনিক বাংলা)।

প্রাচীন -ত মধ্যবাংলায় গৌণ কর্মে 'ক < কৃতম্ বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। ছান্দক বান্ধ (প্রাচীন বাংলা), রাধক বলিল নিষ্ঠুর বাণী (মধ্য বাংলা)। ভাষাবিদ্‌দের ধারণা সংস্কৃতে 'কৃতঃ' থেকে বাংলার কর্মে 'কে' বিভক্তি এসেছে। —বাহ্বকে পারই (প্রাচীন বাংলা) , কংসকে বলিল কন্যা (মধ্য বাংলা), জলকে চল (আধুনিক বাংলা)। ষষ্ঠীর 'র', 'এর' বিভক্তির সঙ্গে ৭মীর 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে প্রাচীন বাংলার গৌণ কর্মে 'যে' বিভক্তি হয়েছে। – সংস্কৃতে কার্য্য > কাইর > কের > এর > র, র + এ = রে। যেমন—কেহো কেহো তোহারে বিরুঅ বোলাই (প্রাচীন বাংলা), দৈবকীর প্রসব কংসেরে জানায়িল (মধ্য বাংলা)। 'এ', 'তে' , 'য়' যুক্ত ৭মীব পদওগৌণ কর্মে ব্যবহৃত হত। কারে নিবেদিবো মোএঁ, বৃথা গুঞ্জ দশাননে। আধুনিক বাংলায় - আমায় শক্তি দে মা ।

(৩) **করণ কারক ঃ --**

করণ কারকের এ/এঁ বিভক্তি সংস্কৃতে 'এন' জাত । সংস্কৃত -এন > এঁ/এ। — আলি এঁ কালি এ (প্রাচীন বাংলা), নিজ মাঁসে হরিনি জাগতের বৈরী (মধ্য বাংলা) এ কলমে ভাল লেখা যায় (আধুনিক বাংলা)। 'দিআঁ) অনুসর্গের সাহায্যে প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় তৃতীয়ার অর্থ প্রকাশ পায় – দিআঁ চঞ্চলী, বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায 'এতে' (অন্ত > ত, ত + এ) ব্যবহৃত হত। সুখ দুখেতেঁ নিতি মরি অই (প্রাচীন বাংলা)। সম্বন্ধ পদে 'র' যোগ প্রাচীন বাংলাতেও পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলায় করণের এই বিভক্তির রূপও পাওয়া যায়। — আজ তাহাকে চাবুক মাবেন।

(৪) **সম্প্রদান কারক ঃ --**

আধুনিক বাংলায় এ, কে , রে বিভক্তির সাহায্যে সম্প্রদান কারক গঠিত হয়। সংস্কৃতে এন > এঁ > এ, অন্ধজনে দেহ আলো (আধুনিক বাংলায়), জলকে চল (কৃত > ক, ক + এ = কে) । মধ্য বাংলায় এই অর্থে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হত— মথুরাকে চলী ভৈলী। রাঢ়ি উপভাষাতেও 'কে' বিভক্তির ব্যবহার আছে — মাঠকে গেলছে। রে বিভক্তিও সম্প্রদান কারকে মেলে - তোহোর অন্তরে, তোমার তরে।

(৫) **অধিকরণ কারক ঃ —**

অধিকরণে 'এ' বিভক্তি এসেছে বৈদিক অধিকরণের 'ধি' বিভক্তি থেকে । বৈ - -গৃহথি, ঘরহি > ঘরই > ঘরে। যেমন — জালে মাছ আছে। বনে থাকে বাঘ। 'ত' বিভক্তি এসেছে সংস্কৃতে 'অন্ত' শব্দ থেকে -অন্ত > আঁত > ত, সাঙ্কমত চড়িলে (প্রাচীন বাংলা)। বাটত সৃজিআঁ জান (মধ্য বাংলা)। ত + ৭মী এ = তে — ঘরেতে ভ্রমর এল। শূন্য বিভক্তির প্রয়োগও আছে — আজ নগদ কাল ধার। প্রাচীন বাংলায় কচিৎ 'রে' বিভক্তির প্রয়োগ পাওয়া যায় — জীবেরে সদয় হএগ্রা। কালবাচক অর্থে কখনো 'কে' বিভক্তি যুক্ত হয়— আজকে তোমায় মেলাতে এলাম।

(৬) অপাদান কারক :—

আধুনিক বাংলায় অপাদানে 'এ' বিভক্তি অথবা বিভক্তির অভাবে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়— হইতে, থেকে, অপেক্ষা প্রভৃতি অনুসর্গের সাহায্যে অপাদান কারকের অর্থ প্রকাশ পায়। প্রাচীন বাংলায় অপভ্রংশের হুঁ/হু বিভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। কৃষ্ণহু অন্যে নাহি জানে, অনুরূপে খপহুঁ, রঅনহু ইত্যাদি। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় 'ত' > তস বিভক্তি পাওয়া যায়— ডোম্বিত আধালি, 'মাওত বাপাত বড় গুরুজন নাহি'। 'এ'/এঁ সাধারণত তির্যক বিভক্তি— জামে কাম কি কামে জাম, এ মেঘে বৃষ্টি হবে না। কিংবা ত + এ > তে – ভালতে উধীলী রাহী। 'অন্ত' > 'ত' বিভক্তি মধ্য বাংলায় আছে— ঘরত বাহির। 'শূন্য, তে, য়' বিভক্তির প্রয়োগ আছে— স্কুল পালিয়ে কোথায় যাবে, খনিতে কয়লা পাওয়া যায়, লেখায় ক্ষান্ত হয়ো না। সম্বন্ধপদও কখনো কখনো অপাদান অর্থে ব্যবহৃত হয়। -বোমার ভয় নেই কি তোমার?

বাংলায় বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলি –

কারক	বিভক্তি
কর্তৃকারক	শূন্য বিভক্তি, এ (রে, য়), তে , এতে
কর্ম ও সম্প্রদান কারক	এ (য়ে, য়) ক, কে, বর, (এরে)
করণ ও অধিকরণ কারক	এ, (য়ে, য়), ত, তে (এতে)

'এ' -বিভক্তির প্রয়োগ সমস্ত কারকেই পাওয়া যায়।

✧ বিভক্তিগুলির উৎস ও বিবর্তন

বিভক্তি :—

যে সব পদ্যাংশ বা গদের দ্বারা বিশেষ্যের ভিন্ন ভিন্ন কারক নির্দেশ করা যায় সেগুলিকে বিভক্তি বলে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণভাবে প্রতিটি কারক বা পদের জন্য বিশেষ বিশেষ বিভক্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। সেই হিসাবে বলা হয় — কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী, সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং অধিকরণে

সপ্তমী বিভক্তি। সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক বিভক্তির এই বৈচিত্র প্রাকৃত স্তরে অনেক কমে এল। এতগুলো কারক রইল না, আবার শব্দ ভেদে বিভক্তির এত রূপান্তর রইল না। বাংলা ভাষায় ও বিভক্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। কার্যত বাংলায় বিভক্তি মাত্র চারটি — এ, ক, ত, র। এই বিভক্তিগুলি এসেছে প্রধানত কোন কোন সংস্কৃত শব্দের বিকারে একমাত্র 'এ' বিভক্তিটি সংস্কৃত বিভক্তির বিকারে এসেছে। আসলে বাংলায় বিভক্তির ব্যবহার সংস্কৃতের মত নয় এবং কারক বোঝাবার জন্য বাংলায় সব সময়েই যে বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে তা নয়। আবার বাক্যে শব্দগুলিকে কারক অনুসারে বিন্যাস করতে গিয়ে বিভক্তির প্রয়োগ করতে হলেও এর অর্থ এই নয় যে সব ভাষাতেই বিভক্তির প্রয়োগ করে শব্দের রূপান্তর ঘটানো হয়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য সংস্কৃতের এই কারক বিভক্তি মধ্য ভারতীয় আর্যে বা প্রাকৃত স্তরে আরো সরলীকৃত হলো। এতগুলো কারক রইল না, আবার শব্দভেদে বিভক্তির এত রূপান্তরও রইলো না। ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলো স্বরান্ত হয়ে গেল এবং অনেক শব্দ বিভক্তিই 'অ'-কারন্ত শব্দ সাদৃশ্য গঠিত হলো। যেমন নর শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তি হলো 'নরস্‌স' বা 'মনি' শব্দের 'মুনিস্‌স' ইত্যাদি।

অবহট্ট স্তরে কারকের সংখ্যা দাঁড়ালো তিনটিতে, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রাচীন বাংলাতেও কারকের সংখ্যা ছিল তিনটি। (১) কর্তা-কর্ম (২) করণ অধিকরণ (৩) সম্বন্ধ। আধুনিক বাংলায় কারকের সংখ্যা মাত্র চারটি — (১) কর্তা (২) কর্ম (৩) করণ-অধিকরণ (৪) সম্বন্ধ। বিভক্তির ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষায় বৈচিত্র্য ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। আসলে বাংলায় বিভক্তি মাত্র চারটি -এ, -ক, -ত, -র। এদের পারস্পরিক যোগে গঠিত আরো কয়েকটি বিভক্তি — -য়, -য়ে, -কে, -তে, -রে, -এতে, -কার, -কের। এই বিভক্তিগুলো এসেছে প্রধানত কোন কোন সংস্কৃত শব্দের বিকারে, একমাত্র 'এ' বিভক্তিটি সংস্কৃত বিভক্তির বিকারে এসেছে, এটি সংস্কৃত সপ্তমী বিভক্তির '-এ' (গৃহে) নয়। এছাড়া আর একটি বিভক্তি কল্পিত হয়, তাকে বলে 'শূন্য বিভক্তি'।

বাংলায় যে কয়েকটি কারক নির্দেশক বিভক্তির পরিচয় মেলে তাদের উৎস ও ঐতিহাসিক বিবর্তন লক্ষ্যণীয়। বাংলায় কোন কারকেই কোন সুনির্দিষ্ট বিভক্তি নেই, যদিও বাংলায় বিভক্তির বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। উৎসের দিক দিয়ে বিভক্তিগুলি —

শূন্য বিভক্তি ঃ

'শূন্য বিভক্তি' কোন বিভক্তিই নয়। আমার পকেটে শূন্য টাকা আছে বলার মতো ব্যাপার। সংস্কৃতে অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের একবচনে বিভক্তি ছিল 'স' (=ঃ), প্রাকৃতে এই বিভক্তিটি কোথাও লোপ পেয়েছে, কোথাও 'এ' কোথাও 'ও' হয়েছে। বাংলায় এই বিভক্তিটি লুপ্ত হয়েছে। যেমন — সংস্কৃতে রাম > প্রাকৃতে রাম > বাংলায় রাম্‌। তাই বাংলায় প্রথমা বিভক্তির একবচনের পদটি প্রতিপাদিকও বটে, এর সঙ্গে পরে অপর বিভক্তি যুক্ত হয়। কর্তৃকারকের একবচনে, সাধারণত

কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ — রাম যায়। কেউ কেউ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে শব্দে বিভক্তি চিহ্ন যোগ না করে বাক্যে ব্যবহার করতে নেই। এই অনুকরণে বাংলায় বিভক্তিহীনতার কল্পনা করে থাকেন। কর্ম কারক ও অধিকরণ কারকেও এরূপ বিভক্তিহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় কর্ম কারকে বিভক্তি শূন্যতা —

১. 'গুরু পুচ্ছিঅ জান' (চর্যাগীতি) ।

২. 'চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাও' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

'এ' বিভক্তি ঃ

বাংলা ব্যাকরণে 'এ' হল অধিক প্রয়োগমূলক বিভক্তি। একমাত্র সম্বন্ধ পদ ছাড়া সব কারকেই এর ব্যবহার দেখা যায়, তাই একে তীর্যক বিভক্তি বলে। যেমন কর্তৃকারকের চিহ্ন — 'পুত্রকঃ > পুত্তকে > পুত্তএ > পুত্তই > পুতে। আবার কবণ কারকের চিহ্ন — পুত্রেণ > পুত্তেঁ > পুতে। অর্থাৎ এই 'এ' বিভক্তিটি সংস্কৃতের চিহ্ন পূর্বেই লুপ্ত হয়েছিল। বাংলায় এই বিভক্তি চিহ্নটি বিভিন্ন সূত্র থেকে উৎপন্ন হতে পারে। অধিকরণ কারকের চিহ্ন —

(১) ইন্দো ইউরোপীয় -ধি > এ; গৃহধি > ঘরধি > ঘরহি > ঘরই > ঘরে।

(২) সংস্কৃতে 'ক' প্রত্যযান্ত শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগে; গৃহকে > ঘরএ > ঘরই > ঘরে।

(৩) ইন্দো-ইউরোপীয় -'ভিম' বা 'ভিস' থেকে -- হৃদয়ে ভিঃ / হৃদয় ভিম্ > হিঅহি /হিঅহিঁ > হিঅই > হিয়ে।

(৪) স্মিন > মহি > হিঁ > হি > ই > এ, গৃহস্মিন্ > ঘরমহি > ঘরহিঁ > ঘরই > ঘরে।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় প্রথমার একবচনে 'এ' বিভক্তি প্রয়োগ আছে—

প্রাচীন বাংলা — 'কুম্ভীরে খাএ' — (চর্যাগীতি)

মধ্য বাংলা — 'গাইল চণ্ডীদাসে' — (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

আধুনিক বাংলা — 'বাঘে খায়' — (রাঢ়ি)

আবার রূপ ভেদে — 'মায়ে ডাকে' ।

ক- বিভক্তি ঃ

প্রধানত গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকে এবং কখনো কখনো সম্বন্ধ পদে ব্যবহৃত 'ক' বিভক্তিটি সংস্কৃত 'কৃত' শব্দের বিকারে এসে থাকতে পারে। — কৃতম > কঅঁ > ক, কৃতঃ > কউ > কে। ডঃ সুকুমার সেন এই বিভক্তির অপর একটি সম্ভাব্য সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বার্থিক ও বিশেষণ স্থানে প্রত্যয় 'ক' আদি প্রাকৃতে ক্য / ক্ক > নব্য ভারতিয় আর্যে 'ক' আধুনিক বাংলায় এর প্রধান রূপ - 'ক' । এর সঙ্গে সম্বন্ধ পদের 'র' বিভক্তি যুক্ত হয়ে আরও রূপান্তর সৃষ্টি করেছে

'-কর','-কার', '-কের' প্রভৃতি। কর্ম-সম্প্রদান কারকের -'কে' বিভক্তির উদাহরণ — 'রামকে টাকা ধার দাও', 'ক' বিভক্তির ব্যবহার প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় রয়েছে। যেমন— 'ছান্দক বান্ধ (চর্যাগীতি), 'রাধাক বুলিল (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। 'কে' বিভক্তি 'বাহবকে পারই' (চর্যাগীতি), কংসকে বুলিল (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

ত-বিভক্তি ঃ

সাধারণত অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত 'ত' বিভক্তি সংস্কৃত 'অন্ত' শব্দের বিকারে উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু 'অন্ত' জাত হলে 'ত' বিভক্তির সানুনাসিক ধ্বনি (তঁ) প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় এরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি বলে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন এটি 'এ' জাত, ত্র > ত্ত > ত। অধিকরণ কারকের 'এ' প্রত্যয়ের ব্যবহার সংস্কৃতে বহুল প্রচলিত। সুতরাং এ মতই গ্রাহ্য। এই 'ত' এর সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে আধুনিক বাংলায় —'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' ইত্যাদি।

র- বিভক্তি ঃ

সংস্কৃত 'কৃ' ধাতুর সঙ্গে 'র' বিভক্তিটির কল্পনা করা হয়। কার্য > কাইর > কের > এর, র। ডঃ সুকুমার সেন বলেন -কর, -কার, -কের থেকে যথাক্রমে সম্বন্ধ পদেব - র আর -এর বিভক্তিগুলির উৎপত্তি ঘটেছে। সম্বন্ধ পদের 'র' বিভক্তি অন্য বিভক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে -এর,-এরে প্রভৃতি কর্মকারকের বিভক্তি হয়েছে। অনুমান করা চলে 'কর' ঘোষীভূত হয়ে -গর, -গোর, -গো প্রভৃতি বিভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্গালি উপভাষার সম্বন্ধ পদের বহুবচনের বিভক্তি রূপে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন বাংলা — 'তোহার অন্তরে', 'রুখের তেন্তুলী' ইত্যাদি।
মধ্য বাংলা — 'রূপকার এখনকার' ইত্যাদি।
আধুনিক বাংলা — 'দশের লাঠি একের বোঝা' ইত্যাদি।

✧ একই বিভক্তি বিভিন্ন কারকে ✧

এ বিভক্তি ঃ

কর্তৃকারক —	**পাগলে কিনা বলে।**
কর্মকারক —	**জীবে দয়া তব পরম ধর্ম জীবে দয়া তবে কই।**
করণ কারক —	**চোখে দেখি, কানে শুনি।**
সম্প্রদান কারক—	**যোগ্য বরে কন্যা দাও।**
অপাদান কারক—	**অর্থে অনর্থ ঘটায়।**
অধিকরণ কারক—	**সে বিজ্ঞানে কাঁচা।**

শূন্য বিভক্তি ঃ

কর্তৃকারক — রেল চলে দ্রুত গতিতে।
কর্মকারক — 'অন্ন চাই প্রাণ চাই'।
করণ কারক — ক্রিকেট খেলা বেশ জনপ্রিয়।
সম্প্রদান কারক— তিনি দরিদ্র ভোজন করালেন।
অপাদান কারক— এখন আমি কলকাতা প্রত্যাগত।
অধিকরণ কারক— আগামীকাল দেশে যাব।

তে-বিভক্তি ঃ

কর্তৃকারক — বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে ?
কর্মকারক — কাছারিতে কত সেলাম দিলাম।
করণ কারক — রুটিতে পেট ভরল না।
সম্প্রদান কারক— জন সেবাতে আত্মনিয়োগ কর।
অপাদান কারক— সর্দিতে কষ্ট পাচ্ছি।
অধিকরণ কারক— নদীতে নৌকা নেই।

কে-বিভক্তি ঃ

কর্তৃকারক -- মেয়েটিকে যেতে হবে।
কর্মকারক — পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করো।
করণ কারক — মেয়েটিকে দিয়ে তোমার রান্নার কাজ চলবে।
সম্প্রদান কারক— ভিখারিনীকে দুটো পয়সা দাও।
অপাদান কারক-- বাঘকে সবাই ভয় পায়।
অধিকরণ কারক— আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ।

র-(এর) বিভক্তি ঃ

কর্তৃকারক — গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের লেখা।
কর্মকারক — আমি শিল্পের আরাধনা করি।
করণ কারক — গরমে সুতির কাপড় পড় ।
সম্প্রদান কারক— ফুলের টব এনেছি।
অপাদান কারক— মৃত্যুর এত ভয় কেন ?
অধিকরণ কারক— নদীর জল অফুরন্ত।

✧ সংস্কৃত ও বাংলা কারকের পার্থক্য ঃ

১. **সংখ্যাগত পার্থক্য ঃ**

সংখ্যাগত দিক থেকে সংস্কৃত ও বাংলা কারকের পার্থক্যটি স্পষ্ট ।

সংস্কৃত ভাষায় কারক ছ-প্রকার — কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। সম্বন্ধকে ধরে বিদ্যালয় পাঠ্য ব্যাকরণে সাতটি কারক বলা হয়েছে । কিন্তু বাংলা ভাষা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাষা, তা সংস্কৃতের নিয়ম মেনে চলে না। বাংলায় সম্প্রদান কারক নেই। বাংলাভাষায় কারক মূলত পাঁচটি ঃ ১) কর্তৃকারক বা কর্তাকারক, (২) কর্মকারক, (৩) করণকারক, (৪) অপাদান কারক ও (৫) অধিকরণ কারক। রামেশ্বর'শ এর মতে বাংলা কারক মাত্র চারটি — কর্তৃকারক , কর্ম-সম্প্রদান কারক , করণ-অধিকরণ কারক ও সম্বন্ধ পদ ।

২. **বিভক্তি ব্যবহারে পার্থক্য ঃ**

সংস্কৃত কারকে বিভক্তি নির্দিষ্ট কিন্তু বাংলা কারকে কোন সুনির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। সংস্কৃত কারকে নির্দিষ্ট বিভক্তিগুলি হলো — কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া , করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী , অপাদানে পঞ্চমী, সম্বন্ধে ষষ্ঠী ও অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয় । প্রাকৃত স্তরে বিভক্তির এই ব্যবহার কমতে থাকে । বাংলায় বিভক্তি মাত্র চারটি — -এ,-ক,-ত , -র । তবে পারস্পরিক যোগে আরও কয়েকটি বিভক্তি লক্ষ করা যায়। বাংলায় প্রধান বিভক্তি হলো '-এ' ,এটি সংস্কৃত জাত । লিঙ্গ,বচন নির্বিশেষে যেকোন শব্দের সঙ্গে ' র ' বিভক্তি হয় ।

✧ কারক ও বিভক্তির সম্পর্ক ঃ

সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক ও বিভক্তির সম্পর্ক সুদৃঢ়। যেখানে প্রতিটি কারক বা পদের জন্য বিশেষ বিশেষ বিভক্তি নির্দিষ্ট। সেই হিসাবে বলা হয় কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী, সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। মধ্য ভারতিয় আর্য প্রাকৃত স্তরে বিভক্তি লোপ পায় এবং অনুসর্গ বা স্থানীয় সহায়ক পদের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলায় বিভক্তির বৈচিত্র্য আরও কম হয়। আধুনিক বাংলায় বিভক্তির সংখ্যা মাত্র চারটি - এ, -ক, -ত, -র। কারক ও বিভক্তির সাধারণ সম্পর্কগুলি আলোচ্য —

১. আধুনিক বাংলায় কর্তৃকারকে (এ, য়ে, তে) বিভক্তির ব্যবহার শুধু অনির্দিষ্ট কর্তা বোঝাতে হয়। যেমন — ঘোড়ায় গাড়ি টানে।

ঘোড়াতে গাড়ি টানে।

২. আধুনিক বাংলায় মুখ্য কর্ম-অনির্দিষ্ট। জড়বস্তু কিংবা জাতিবাচক পদ, পদ হলে (বিশেষ্য / সর্বনাম হলে) বিভক্তির প্রয়োজন হয় না।

৩. বাংলা, ওড়িয়া ও হিন্দিতে গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকে ও সম্বন্ধ পদে 'ক' প্রত্যয় বিভক্তি দেখা যায়, এটির প্রতিরূপ হল কৃত। প্রাচীন বাংলায় এর উদাহরণ পাওয়া যায় — 'মতিএ ঠাকুরক পরি নিবিত্তা'।

৪. বাংলায় ত প্রত্যয় জাত পদগুলি এক সময় ব্যবহৃত হলেও আধুনিক কালে ক

প্রত্যয় জাত পদগুলির তুলনায় ব্যবহার কম।

৫. (এ, -তে) বিভক্তি যুক্ত অধিকরণের পদগুলি গৌণ কর্মেও ব্যবহৃত হত। যেমন — কহে মোরে।

৬. করণের বিভক্তি এ এসেছে সংস্কৃত 'এন' থেকে। এটি বাংলায় প্রচলিত নেই।

৭. সংস্কৃতের অধিকরণে ই বিভক্তি বাংলায় লুপ্ত। যেমন — 'সে ঘর গেল'।

৮. বাংলায় অধিকরণে কয়েকটি বিভক্তি এখন আর ব্যবহৃত হয় না। যেমন ত। কিন্তু বরেন্দ্রি ও কামরূপি উপভাষায় এটি আশ্চর্যভাবে প্রচলিত আছে।

৯. -কার এসেছে কা-র সঙ্গে সম্বন্ধ বিভক্তি যোগ করে। যেমন — 'আজিকার দিনে'।

১০. আধুনিক বাংলায় সম্বন্ধ পদের সঙ্গে অনুসর্গ যোগ করে অপাদান কারক বোঝানো হয়। যেমন – 'কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে'।

✧ উপসর্গ ✧

শব্দ খণ্ড যখন নানাধরণের শব্দ বা ধাতুর গোড়ায় বসে নতুন শব্দ তৈরি করে তাকে বলা হয় উপসর্গ। উৎস অনুযায়ী বাংলায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা — ১. তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ ২. খাঁটি বাংলা উপসর্গ ৩. বিদেশি উপসর্গ।

✧ তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ ঃ

বাংলায় মোট ২০টি তৎসম উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। অর্থের দিক থেকে এগুলি আতিশয্য ,বৈপরীত্য , হীনতা, নিশ্চয়তা, নিন্দাকরা , সন্নিবেশ , বহির্মুখিতা , সহজ , স্থানান্তর, ঈষৎ , ক্লেশ ইত্যাদি প্রকাশ করে।

বর্ণ অনুযায়ী সাজালে এরকম —

অতি	ঃ	অতিকায়, অতিবৃষ্টি, অতিমানব, অতিপ্রাকৃত।
অধি	ঃ	অধিকার, অধিপতি, অধিষ্ঠান, অধিবাসী, অধিরোহণ।
অনু	ঃ	অনুজ, অনুগামী, অনুবাদ, অনুক্ষণ, অনুকূল।
অপ	ঃ	অপমান, অপব্যয়, অপসারণ, অপমৃত্যু, অপবাদ
অপি	ঃ	অপিচ (যদিও)।
অব	ঃ	অবগত, অবমাননা, অবরোধ, অবসান।
অভি	ঃ	অভিশাপ, অভিসার, অভিনয়, অভিষেক, অভিবাদন।
আ	ঃ	আকণ্ঠ, আসমুদ্র, আভাস, আরক্ত।
উৎ	ঃ	উৎসুক, উত্তাল, উৎক্ষিপ্ত, উৎপাদন, উত্তপ্ত।
উপ	ঃ	উপকণ্ঠ, উপবন, উপদ্বীপ, উপহার, উপকূল।
দুর	ঃ	দুর্নাম, দুর্ভাগ্য, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্মূল্য।

নি : নিবৃত্তি, নিপাত, নিবারণ, নির্ণয়।
নির : নিরক্ষর, নির্ভর, নির্ণয়, নির্গত, নির্ধারণ।
পরা : পরাভব, পরাজয়, পরায়ণ, পরাকাষ্ঠা।
পরি : পরীক্ষা, পরিভ্রমণ, পরিতোষ, পরিসীমা, পরিশ্রান্ত।
প্র : প্রভাত, প্রভাব, প্রতাপ, প্রবেশ, প্রসার।
প্রতি : প্রতিকার, প্রতিবাদ, প্রতিমাস, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিষ্ঠান।
বি : বিবর্ণ, বিফল, বিহার, বিকার, বিপর্যয়।
সম : সম্মুখ, সমাগত, সম্পূর্ণ, সমাদর, সমৃদ্ধ।
সু : সুকণ্ঠ, সুনীল, সুগম, সুলভ, সুকঠিন।

✧ **খাঁটি বাংলা উপসর্গ :**

শব্দকে নেতিবাচক হিসাবে, অপকর্ষ হিসাবে প্রয়োগ, অভাব, উত্তম, ছোট, বড় ইত্যাদি বোঝাতে খাঁটি বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে।

অ : অবেলা, অঘোরে, অকেজো, অচেনা, অসময়।
অঘা : অঘাবগা, অঘারাম, অঘাচণ্ডী।
অজ : অজপুকুর, অজপাড়াগাঁ, অজগ্রাম, অজমূর্খ।
অনা : অনাচার, অনাসৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাদায়
আ : আগাছা, আকাঠা, আধোয়া, আলুনা, আকাঁড়া।
আড় : আড়চোখে, আড়নয়নে, আড়কোলা, আড়কাঠি, আড়পাগলা।
আন (অন) : আনমনা, আনচান, আনকোরা, আনসেলাই।
আব : আবছায়া, আবডাল।
ইতি : ইতিকথা, ইতিহাস, ইতিপূর্বে, ইতিকর্তব্য।
উন (উনা) : উনপাঁজরে, উনাবর্ষা।
কদ : কদাকার, কদবেল, কদর্য।
কু : কুনজর, কুকথা, কুঅভ্যাস, কুসঙ্গ, কুশল, কুআচার।
পাতি : পাতিকথা, পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল।
নি : নিরেট, নিভাঁজ, নিলাজ, নিখুঁত, নিখোঁজ।
বি : বিকল, বিফল, বিভুঁই, বিজন্মা।
ভর : ভরপুর, ভরসাঁঝ, ভরপেট।
রাম : রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা।
স : সঠিক, সলাজ, সরব।
সা : সাজোয়ান, সামরিচ, সাজিরা।
সু : সুদিন, সুখবর, সুনাম, সুনজর, সুসময়।
হা : হাভাত, হাঘরে, হাপিতেশ।

✧ বিদেশি উপসর্গ ঃ

সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সূত্র ধরে বিদেশি শব্দের মতো বিদেশি উপসর্গগুলিও বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। এগুলি খারাপ, অভাব, কাজ , খুশি , প্রধান , অর্ধেক , পুরো ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

ক) আরবি থেকে আগত ঃ

আম ঃ আম-দরবার, আম-মোক্তার।

খাস ঃ খাস-পরিবার, খাস-মহল, খাস-কামরা, খাস-দখল।

গর ঃ গর-মিল, গর-হাজির, গর-রাজি।

বাজে ঃ বাজে-বকা, বাজে-কথা, বাজে-খরচ, বাজে-জমা।

লা ঃ লা-চার, লা-ওয়ারিস, লা-জওয়াব, লা-খেরাজ।

খ) ফারসি থেকে আগত ঃ

কম ঃ কম-জোর, কম-বখ্ত, কম-আক্কেল।

কার ঃ কার-বার, কার-সাজি, কার-খানা।

দর ঃ দর-দালান, দর-পাট্টা, দর-কাঁচা।

না ঃ না-খোদা, না-মঞ্জুর, না-লায়েক, না-ছোড়বান্দা।

নিম ঃ নিম-রাজি, নিম-মোল্লা, নিম-খুন।

ফি ঃ ফি-হপ্তা, ফি-বছর, ফি-সন, ফি-মাসে।

ব ঃ ব-নাম, ব-কলম।

বদ ঃ বদ্-জাত, বদ্-হাল, বদ্-মেজাজ।

বর ঃ বর-দাশ্‌ত, বর-খেলাপ, বর-খাস্ত।

বা ঃ বা-মাল।

বে ঃ বে-বাক, বে-আদব, বে-কসুর, বে-কার, বে-তার।

গ) ইংরেজি থেকে আগত ঃ

ফুল ঃ ফুল-বাবু, ফুল-হাতা, ফুল-সার্ট।

সাব ঃ সাব-জজ, সাব-অফিস, সাব-ইন্সপেক্টর।

হাফ ঃ হাফ-শার্ট, হাফ-নেতা, হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট।

হেড ঃ হেড-ক্লার্ক, হেড-অফিস, হেড-মাস্টার, হেড-পণ্ডিত ।

ঘ) হিন্দি থেকে আগত ঃ

হর ঃ হর-রোজ, হর-মাহিনা, হর-করা, হর-কিসিম।

✧ উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মিল ও অমিল ঃ

উপসর্গ ও প্রত্যয় একই প্রকার উভয়েই শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থকে পরিবর্তিত করে । উভয়েই মূলত শব্দখণ্ড , শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ও

উক্তি সংক্ষেপে সাহায্য করে।

উপসর্গ ধাতু বা শব্দের গোড়ায় যুক্ত হয় আর প্রত্যয় শব্দের শেষে যুক্ত হয়। উপসর্গ বিশেষ্য-বিশেষণ ইত্যাদি শব্দের শ্রেণিকে পরিবর্তন করে না কিন্তু প্রত্যয় শব্দের শ্রেণিকে পরিবর্তন করে।

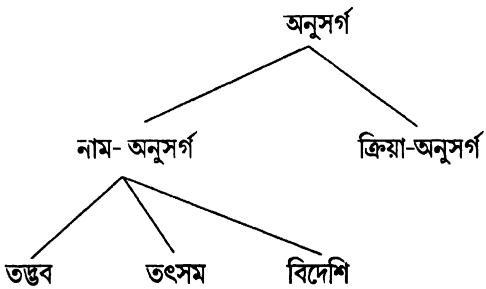
✧ অনুসর্গ ✧

কোন পদের অব্যবহিত পরে অপর কোন পদ বসে পূর্ব পদের কারক অর্থ সুনির্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট করলে দ্বিতীয় পদটিকে অনুসর্গ বলে। কর্তা ও মুখ্য কর্মছাড়া অন্য কারকের অর্থ ও বাংলায় অনুসর্গের ব্যবহার চলে। এইসব অনুসর্গ সাধারণত সম্বন্ধ পদের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কোথাও কোথাও প্রতিপাদিকের অর্থাৎ যেন সমাসের দ্বিতীয় পদ রূপে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা অনুসর্গগুলিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন --

(১) নাম-অনুসর্গ ঃ অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ।

(২) ক্রিয়া-অনুসর্গ ঃ অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত ক্রিয়াজাত পদ।

নাম অনুসর্গ তিন প্রকার (১) তদ্ভব (২) তৎসম (৩) বিদেশি। ক্রিয়া অনুসর্গগুলি প্রায় সবই তদ্ভব অসমপিকা রূপে ব্যবহৃত হয়।



বিভক্তি হচ্ছে, কারক সূচক ধ্বনি সমষ্টি। বিভক্তি পদের সঙ্গে মিশে থাকে, কিন্তু অনুসর্গ পদের পরে স্বতন্ত্র ভাবে বসে এবং পদের কারক অর্থকে স্পষ্ট করে। বিভক্তির নিজের কোন অর্থ নেই, কিন্তু অনুসর্গ পৃথক অর্থবহ।

যেমন--

তিলে তেল হয় -- বিভক্তি (তিল + 'এ' বিভক্তি)

তিল হইতে তেল হয় -- অনুসর্গ (তিল + হইতে অনুসর্গ)

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় প্রাচীন ভারতিয় আর্যে অনুসর্গের ব্যবহার ছিল না বললেই হয়, তবে এই স্তরের শেষের দিকে অনুসর্গ ব্যবহার কিছু ছিল। ইন্দো-ইউরোপিয় গোষ্ঠির অন্যান্য ভাষার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিল না। অষ্ট্রিক এবং দ্রাবিড়

গোষ্ঠির মধ্যে অনুসর্গের ব্যবহার আছে। মধ্য ভারতিয় আর্য স্তরে এসে প্রাচীন ভারতীয় আর্য স্তরের বিভক্তিগুলি লুপ্ত হয়। এর ফলে অর্থবোধ বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং তখন থেকে অনুসর্গের প্রচলন শুরু হয়। অপভ্রংশ স্তরে অনুসর্গের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। বিশেষত শৌরসেনি অপভ্রংশ স্তরে এর ব্যপক ব্যবহার ছিল।

বাংলায় কারক নির্ণয় এখনও সংস্কৃতানুসারী। বিভিন্ন কারকে বিভিন্ন অনুসর্গের ব্যবহার হয়। কর্তৃ ও মুখ্য কর্মছাড়া প্রায় সব কারকে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন — করণ কারকে দ্বারা, দিয়া, কতৃক ইত্যাদি ।

উদাহরণ—

(১) 'মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে' — বঙ্কিমচন্দ্র

(২) 'যদি যাতনা দিয়া আমার প্রাণ বধ করা তোমার অভিপ্রেত নয়, তবে ত্বরায় চল'। — বিদ্যাসাগর

সম্প্রদান কারকে — জন্য, নিমিত্ত, লাগিয়া, হেতু, তরে ইত্যাদি।

উদাহরণ —

(১) 'যার জন্যে চুরি সেই বলে চোর।'

(২) 'সকলের তরে সকলে আমরা।' — কামিনী রায়

অধিকরণ কারকে 'কাছে', মধ্যে, ভিতরে ইত্যাদি।

উদাহরণ —

(১) 'তোমার কাছে এ বর মাগি/মরণ হতে যেন জাগি'

(২) 'ফুল ফোটে বন-মাঝে' — রবীন্দ্রনাথ

অপাদান কারকে নিকট, চেয়ে, হইতে, থেকে ইত্যাদি।

উদাহরণ —

(১) যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ! — দ্বিজেন্দ্রলাল

(২) 'একটি ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল।' — চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

আবার কারক ভিন্ন অন্যস্থানেও অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন অপেক্ষা, ভিন্ন, বিনা, ব্যতীত ইত্যাদি ।

উদাহরণ —

(১) সঙ্গত বিনা সঙ্গীত জমে না।

কয়েকটি কারক বাচক অনুসর্গের বিশ্লেষিত ব্যাখ্যা —

কাছে, কাছ —

এটি তদ্ভব নাম- অনুসর্গ। সংস্কৃতে কক্ষ > কচ্ছ > কাছ (কক্ষ, অভিমুখ, সমীপ অর্থে) মধ্য বাংলায় 'গুরু কাছে এই ভক্তি দ্রষ্টব্য / শ্রোতব্য।' আধুনিক বাংলায় 'শেষে জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমার কাছেতে হারিয়া', কথ্য বাংলায়— কার কাছ থেকে আসছে ?

চেয়ে —

এটি ক্রিয়া অসমাপিকা অনুসর্গ। অপাদান কারকে ব্যবহৃত অনুসর্গটির প্রয়োগ প্রাচীন বাংলায় ছিল না। চাহ্ (অতিশায়নে) > চাহ + ইয়া (প্রত্যয়) > চাহিয়া > চেয়ে (অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি জনিত পরিবর্তন)। আধুনিক বাংলায় — 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'।

ছাড়া —

এটি নাম-অনুসর্গ। বাংলা ভাষায় বাক্যের পদের সঙ্গে পদের সম্বন্ধ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে 'বিনা' অর্থে 'ছাড়া' ব্যবহৃত হয়। যেমন — তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলব ? √ছৃধ্ > পালি √ছড্ড > ছড় > ছাড়া (স্বরাগম)।

থেকে —

এটি একটি ক্রিয়া অসমাপিকা অনুসর্গ। সংস্কৃতে স্তবক > থাক > থাক্ এখানে স্তর বা শ্রেণি অর্থে ব্যবহৃত। মধ্য বাংলায় 'যথা থাকি ডাক দিআঁ বুইল বনমালী'। থাক্ + ইয়া = থাকিয়া — 'গলায় থাকিয়া হস্ত করিল বাহির'।
থাক + এ = থেকে —'স্নানের ঘাটের থেকে আমরা দেখব'।

থাক্ + ইয়া -- থাকিয়া অসমাপিকা যোগে গঠিত। মধ্য বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিভক্তিহীন পূর্বপচ্ছদ অপাদান কারকে ও অধিকরণে অর্থবোধক দৃষ্টান্ত রূপে দেখা যায়। বাংলা — 'বুঝিলে কন্যা আকাশে থাঁকিয়া'। আবার ভিন্ন অর্থে অপাদান কারকেও ব্যবহার দেখা যায় — 'মন্দ কাজ প্রাণ থেকে জন্মে'। আধুনিক বাংলায় — বিভক্তিহীন পূর্বপদের সঙ্গে এই অনুসর্গ যুক্ত হতে দেখি যেমন — 'ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

আবার তুলনা অর্থে এই অনুসর্গ 'থাক' ধাতু থেকে এসেছে থাক > থক্কঅ > থাক ।

দ্বারা —

এটি করণ কারকে ব্যবহৃত তৎসম নাম- অনুসর্গ। বাংলা ভাষায় এর কোন প্রাচীন ব্যবহার নেই। বৈদিক সাহিত্যে 'দ্বারা' শব্দটির বাচ্যার্থ ছিল 'দরজা' (প্রবেশ করিবার উপায়)। করণ কারকে 'আ' বিভক্তি যোগে 'দ্বারা' শব্দটি সমাসবদ্ধভাবে বৈদিক যুগে ব্যবহৃত হত। অন্য ভাষাতে এর ব্যবহার নেই। সাহিত্য ছাড়া সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষাতেও এর ব্যবহার আছে।

সাহিত্যে — 'মায়ের দ্বারা ছেলে লালিত।'
কথ্য — 'তোর দ্বারা কিস্‌সু হবে না।'

আগে —

সামনে বা অভিমুখে অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন — 'কংসের আগক নারদ মুনী। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

পাশ — পাশে অর্থে। যেমন — বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।

ভিতর — ভিতরে আছে অর্থে। যেমন — 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'।

হাত — হাত দ্বারা বা নিকট হইতে অর্থে। যেমন — এ ব্যপারে আমার কোন হাত নেই।

চাহ — চেয়ে অর্থে। যেমন — তুমি কি করিতে চাহ।

বলে — কারণ, হেতু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন — খোকা বলেই ভালবাসি ভালো বলে নয়।

সুতরাং বিভক্তির মতো অনুসর্গ ও কারক-বাচক হিসাবে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। অর্থবোধের দিক দিয়ে বাংলা রূপতত্ত্বে এগুলি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

✧ কারক, বিভক্তি ও অনুসর্গেরর পারস্পরিক সম্পর্ক

কারক ঃ

যে কোন বাংলা বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাই হল কারক।

বিভক্তি ঃ

বিভক্তি হল কারক বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টি বা পদান্বয়। এক কথায় কারক সূচক ধ্বনিসমষ্টি বা পদাংশ হল বিভক্তি।

অনুসর্গ ঃ

যে কোন পদের ঠিক পরে অপর কোন পদ থেকে পূর্ব পদের কারক অর্থ স্পষ্টতর কিংবা সুনির্দিষ্ট করে দিলে দ্বিতীয় পদটিকে অনুসর্গ বলে। অনুসর্গ কখনই মূলপদের সঙ্গে যুক্ত হয় না।

✧ কারক ও অনুসর্গের সম্পর্ক ঃ

প্রাকৃত স্তর থেকে কারকের সঙ্গে অনুসর্গের সম্পর্ক গঠিত হয়। অর্থ স্পষ্ট করার জন্য কারক বাচক অনুসর্গগুলি ব্যবহার করা হয়। অনুসর্গ দুই প্রকার — নাম ও ক্রিয়া অনুসর্গ। এদের আবার ভাগ আছে। নাম অনুসর্গকে তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশি এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু ক্রিয়া অনুসর্গগুলি সাধারণভাবে তদ্ভব অসমাপিকা ।

কারকের সঙ্গে বিভক্তি ও অনুসর্গের যোগ সুত্র ধরে বলা যা সংস্কৃত কারককে বাংলার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। বিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্য পুস্তকে কারক সংখ্যার সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞান সম্মত কারক সংখ্যার পার্থক্য আছে। অনেক সময় একই বিভক্তি চিহ্ন অধিক কারকে ব্যবহৃত হয়। তবুও কারক,

বিভক্তি ও অনুসর্গের সম্পর্কের নিবিড়তা আমাদের জানায় যে, বাংলা বাক্যের মধ্যে অন্বয় কিভাবে গড়ে উঠে।

✧ সর্বনাম পদ ✧

বাক্যের মধ্যে প্রযুক্ত ও অপ্রযুক্ত কোন নামের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। এই প্রকার পদের জন্য 'প্রতিনাম' এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন — সুমিতাদির বাড়ী গিয়াছিলাম, শুনিলাম তিনি বাড়ী নাই। এখানে 'তিনি' পদটি 'সুমিতাদির' এই নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার আমি বলিয়াছিলাম যে তোমার সঙ্গে একা যাইব। এখানে বক্তার পরিবর্তে 'আমি' এবং যাকে বলা হচ্ছে তার পরিবর্তে 'তোমার' ব্যবহৃত হয়েছে। কিংবা — কে যায় ? এখানে 'কে' শব্দ কোন অজ্ঞাত এবং অনুল্লিখিত পূর্ব ব্যক্তির স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সর্বনাম পদ ব্যবহারের দ্বারা একই নাম শব্দকে বারবার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। ফলে অর্থ প্রকাশের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং বাক্যের প্রকাশ ক্ষমতার সৌকর্য হয় সাধিত।

বাংলায় সর্বনামের তিনটি পুরুষ — (১) উত্তম পুরুষ (২) মধ্যম পুরুষ (৩) প্রথম পুরুষ বা নাম পুরুষ। বাংলা পুরুষে লিঙ্গ ভেদ নাই। সংস্কৃতে প্রথম পুরুষে ছিল বাংলায় তাও নেই। সর্বনামের প্রধান বিভাগ দুটি — (১) পুরুষ বাচক (২) নির্দেশক।

সংস্কৃতে উত্তমপুরুষে 'অস্মদ্' শব্দ বাংলায় উত্তমপুরুষে কর্তৃকারকে একবচনের রূপ 'আমি'। কিন্তু আমি শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয় না। যে দুটি শব্দকে প্রতিপাদিক রূপে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ যাদের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয় সে দুটি 'আমা' এবং 'মো' । আমার, আমাকে, আমাদের, মোর , মোদের প্রভৃতি রূপ সেখানে পাওয়া যায়।

বৈদিক অস্মে > অমহে > আহ্মে > আমি, মূলত বহুবচন পদ হলেও আধুনিক বাংলায় মূলত একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ভাষাবিদ্ বলেন যে 'আমি' শব্দটি সংস্কৃতে করণ কারকের পদ, 'আস্মাভিঃ' থেকেও আসতে পারে। সংস্কৃত ময়েন > ময়েঁ > মঁই > মুঞি > মুই । মূলত একবচন হলেও আধুনিক বাংলায় সাধু ভাষায় ব্যবহার নেই। উত্তম পুরুষের এই সর্বনাম পদটির উপভাষায় এখন প্রচলিত রয়েছে। উত্তম পুরুষের সর্বনাম পদ সম্পর্কে আরও বলা যায় যে, সংস্কৃত অহকম্ > হকন্ > হউ > হোঁ। 'হুঁ' মধ্য বাংলায় প্রচলিত ছিল এখনও অপ্রচলিত, এই পদটি শেষ পর্যন্ত ক্রিয়া বিভক্তির রূপে উত্তম পুরুষে যুক্ত হত। যেমন — দেহুঁ (আমি দিই) ।

আধুনিককালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের 'ম' যথা বলিলাম এই 'হুঁ' থেকে আগত। প্রাচীন বাংলায় 'হাঁউ' কর্তায় ব্যবহৃত হত। যেমন — তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী। কর্তৃকারকের বহুবচন এবং তির্যক কারকের প্রতিপাদিক 'আমা' শব্দের উদ্ভব হয়েছে এইভাবে — আমাকম্ > আমহাকম্ > আমহাম > আমহা > আম্মা > আমা ; অথবা

বুৎপত্তিটি এইভাবেও হতে পারে আহ্মাম > আমহম, অম্হ > আম্মা > আহ্মা > আম > আমা । উত্তম পুরুষের অপর প্রতিপাদিক 'ম' এইভাবে উদ্ভূত হয়েছে মম > মএ্রা > মো। লক্ষ করা যায় বাংলা ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগের কর্তার বহুবচনে প্রতিপাদিকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'রা' বিভক্তি এবং অন্যান্য কারকেও বিভক্তি যুক্ত হত, যথা — আহ্মারা, আহ্মার প্রভৃতি। আধুনিক বাংলায় 'আমা' প্রতিপাদিকের সঙ্গে একবচন বিভক্তি চিহ্ন এবং বহুবচন প্রাতিপাদিকের সঙ্গে দে, দিগ যোগ করে বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন — আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের, আমাদিগের প্রভৃতি। 'ম', 'মো' প্রতিপাদিকে প্রাচীনকালে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হত — 'মো', মোরা মোকা, মোকে, মোর প্রভৃতি। আধুনিক কালের কবিতায় মোর, মোর, মোদের প্রভৃতির ব্যবহার থাকলেও গদ্যে অপ্রচলিত। দেখা যায় পুরুষবাচক সর্বনামে উত্তম পুরুষের পদগুলি সংস্কৃত প্রাকৃতের ধারা যেমন অনুসরণ করেছে তেমনি তার স্বাধীন ভাবে বিকশিত রূপের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

বাংলায় মধ্যম পুরুষের সর্বনাম পদের তিনটি রূপ প্রচলিত। তাদের রূপ কর্তৃকারকের একবচনে যথাক্রমে < অ > তুই, (আ) তুমি এবং (ই) আপনি 'তুই' মূলত ছিল বাংলায় সর্বনামের একবচনের রূপ। সংস্কৃতে অবশ্য এর মূল পাওয়া যায়। তবে তা রূপগতভাবে ভিন্ন। যেমন — সংস্কৃত ত্বয়া > তয়ে, তুএ > তই, তোত্র > তুই। মূলে করণ কারক থেকে জাত হলেও এই আধুনিক বাংলায় কর্তৃকারকের পদ বাংলায় প্রধানত তুচ্ছার্থে এবং আনাদরে এই সর্বনাম পদটি ব্যবহৃত হয়। আবার অতি ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে ও নিকট সম্বন্ধে এটি প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন — 'তুই মা জগতের আলো'। এর প্রতিপাদিক রূপ তো এর সঙ্গে বিভিন্ন বির্ভাক্ত যোগে কর্তৃকারকের বহুবচন এবং তীর্যক কারকের বিভিন্ন পদ সাধিত হয়। যথা 'তোরা', 'তোকে', 'তোদের' প্রভৃতি ।

প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রাতিপাদিকটি কর্তৃকারকের একবচনের পদরূপেও ব্যবহৃত হত। যেমন চর্যাগীতিতে আছে — 'শুনো হরিমাতো'।

তুমি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত এবং বহু প্রচলিত মধ্যম পুরুষে একটি সর্বনাম পদ। এটি মূলত ছিল বহুবচনের শব্দ। যেমন — তুমাভিঃ > যুমাভিঃ এই দুটি সংস্কৃতে যেটি ছিল বহুবচনে সর্বনাম পদ সেটি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার স্তর থেকেই একবচন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, এর প্রতিপাদিক রূপ তোহ্মা, তোমা। মধ্যযুগে কতৃকারকের পদ রূপেও ব্যবহৃত হত। যেমন — এক তোহ্মা তোমা বনমালী। এর বুৎপত্তি হয়েছে 'তুষ্মাকম্' (যুষ্মাকম্) > তুহ্মাকং; তুমহ্ > তোমহ্য > তোহ্মা > তোহাঁ — প্রাতিপাদিকের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি জুড়ে কর্তৃকারকে বহুবচন তীর্যক কারকের পদ গঠন করা হয়। যেমন — তোমার, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমাদের, তোমাদিগের প্রভৃতি।

'আপনি' হোল মধ্যম পুরুষের আর একটি সম্ভ্রম বাচক সর্বনাম পদ। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দিতে এই পদটি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। এর মূল সংস্কৃতে পাওয়া

যায়। যেমন – আত্মস > আপন > আপনা – এই 'আপনা' প্রাতিপাদিকের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যোগে তীর্যককারক সাধিত হয়। যথা -- আপনারা, আপনার, আপনাদের, আপনাদিগের, আপনি শব্দ নিজ অর্থেও ব্যবহৃত হয। যেমন – 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও'। সুতরাং বলা যায় যে, উত্তম পুরুষের মতো মধ্যম পুরুষে সর্বনাম পদের প্রয়োগও বাংলা ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতের উৎস থেকেই রূপান্তরিত রূপ লাভ করেছে। তবে তার স্বাধীন প্রয়োগ ক্ষেত্রটির বিস্তারও সামান্য নয়।

✧ ক্রিয়াপদের কালবাচক প্রত্যয় ✧

ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার সময়কেই বলা হয় ক্রিয়ার কাল। আর ক্রিয়ার মূলকেই বলা হয় ধাতু। যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি মৌলিক শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে বলা হয় প্রত্যয়। আমরা আলোচ্য ক্ষেত্রে ক্রিয়ার কাল বাচক প্রত্যয়গুলি আলোচনা করবো।

সাধারণভাবে ক্রিয়ার কাল তিনটি – (১) বর্তমান কাল (২) অতীত কাল (৩) ভবিষ্যৎ কাল। ক্রিয়ার নির্দেশক ভাবে তিনটি কালই হয় কিন্তু অনুজ্ঞাভাবে কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালই হতে পারে। কাল ভেদাভেদ কেবল সমাপিকা ক্রিয়াতেই হয়। অসমাপিকা ক্রিয়াতে হয় না। ধাতুর মতো কালবাচক কৃৎপ্রত্যয় এবং পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে কাল রূপে নির্মাণ হয় তাই-ই ক্রিয়াপদ হিসাবে বাক্যে বসে (যথা – করিলাম √কর + (অতীতার্থক প্রত্যয়) ইল্ + (পুরুষবাচক বিভক্তি) আম্। সব বাংলার ফলরূপ একটিমাত্র ধাতু থেকে হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক ধাতুর ব্যবহার করতে হয়। এই বিচারে কালের আরও দুটি ভাগ দেখা যায় (১) সরল বা মৌলিক কাল (২) মিশ্র বা যৌগিক কাল। সরল কাল বা মৌলিক কালে একটি ধাতুর সংগেই প্রত্যয় বিভক্তি যোগ করে কালরূপ হয়। মিশ্রকাল তৈরি করতে একাধিক ধাতুর প্রয়োজন হয়।

আবার ক্রিয়াপদের রূপভেদ অনুসারে ক্রিয়াপদকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – (১) সমাপিকা ক্রিয়া (২) অসমাপিকা ক্রিয়া। তাছাড়াও কর্তৃকর্মের সম্বন্ধ বিচারে ক্রিয়ারূপের দুটি শ্রেণি (১) অকর্মক ক্রিয়া (২) সকর্মক ক্রিয়া। তাছাড়া বাচ্য ভাব, পুরুষ, এবং কাল বিষয়ে ক্রিয়াপদের রূপের বৈচিত্র দেখা যায়।

কালবাচক প্রত্যয়কে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় যথা (১) কৃৎ প্রত্যয় (২) তদ্ধিত প্রত্যয়। যে প্রত্যয় ক্রিয়া-ধাতুতে হয় তাহাকে বলে কৃৎপ্রত্যয়। যেমন – বল্ (ধাতু) + আ (প্রত্যয়) = বলা। আবার যে প্রত্যয় শব্দে যুক্ত হয় তাকে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন – পুষ্প (শব্দ) + ইত (প্রত্যয়) = পুষ্পিত।

আবার প্রত্যয় যোগে তৈরি শব্দকে বলা হয় কৃদন্ত শব্দ। এই পরিপেক্ষিতে প্রত্যয়কে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে (১) সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় (২) বাংলা কৃৎপ্রত্যয়। সংস্কৃত

কৃৎপ্রত্যয়ের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় √নি + অক্ = নায়ক (নক) √দা + তব্য = দাতব্য (তব্য) √পূজ্ + অনীয় = পূজনীয় (অনীয়) □√মহ্ + শতৃ = মহৎ (শতৃ) √জ্ঞ + ক্ত = জ্ঞাত (ক্ত) বাংলা কৃৎপ্রত্যয় উদাহরণ হিসাবে বলা যায় অ, আ, আই, ইয়ে, অন্ত, আনি ইত্যাদি। যেমন – √চল্ + অ = চল, √তুল + অ = তুলা, √বাচ্ + আই = বাছাই, √নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে, √চল্ + অন্ত = চলন্ত, √চাল + আনি = চালানি।

আবার কালবাচক কৃৎপ্রত্যয় বাংলায় পাওয়া যায়। যেমন – বর্তমান কালে √কর + ই = করি। অতীতকালে √কর + ইত + এন = করিতেন > করতেন, ভবিষ্যৎকালে √কর + ইব্ + অ = করিব > করব।

এবার আমরা কালবাচক ক্রিয়াপদের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রত্যয়ের কথা বলতে পারি। যার ফলে ক্রিয়াপদের কালগত রূপান্তর ঘটে যথা – 'ইয়' প্রত্যয় 'ই' প্রত্যয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে ঞ্চ্, ল্যাপ, ল্যপ্ বিভক্তির পরিবর্তে বাংলায় 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়। প্রাচীন বাংলায় এবং আধুনিক বাংলায় কবিতায় 'ই' প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন প্রাচীন বাংলায়– বেজ্জ দেক্খি রোগ পালায়। 'ইয়া' প্রত্যয়টি একান্তভাবে কর্তৃনিষ্ঠ। বাক্যের মধ্যে সমপিকা ক্রিয়ার কর্তাই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা হতে পারে। আমি বইটি পড়িয়া তোমাকে বোঝাইব।

এরকম আরও দুটি প্রত্যয়ের উল্লেখ করা যায় যথা 'ইলে' এবং 'ইতে'। সমাপিকা ক্রিয়া এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা বিভিন্ন হয়। কিন্তু একটি কর্তা উহ্য থাকলেও চলে। দুটি উদাহরণ থেকে তা বোঝা যাবে। যেমন – তুমি গেলে যেতে পারি। কিংবা – তুমি গেলে তবে আমি যাব। প্রাচীন বাংলায় 'সাঙ্কমত চড়িলে দাহিন বাম মা হোহী'। সম্ভাবত বোঝাতে এই প্রত্যয়ের উপরের উদাহরণের কথা বলা যায়। 'ইতে' প্রত্যয়টির একাধিক অর্থে বাংলায় ব্যবহার দেখা যায়। 'ইতে'র পরিবর্তে আন্ত রূপে প্রাচীন বাংলায়। যেমন -- আমিঅ আজান্তে বিষ গিলেছি। এই প্রত্যয়টির সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে বলা যায় সম্ভবত সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়ের সঙ্গে করণ-অধিকরণের বিভক্তি যোগে প্রত্যয়টির ভদ্ভব। আধুনিক বাংলায় উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে উক্ত প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। যেমন – বউ ঝিরা জল আনিতে নদীতে যায়। বঙ্গালি উপভাষায় 'ইতে'র স্থলে 'তে'-এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন – আমি দেখতে চাই।

এছাড়াও এই ক্রিয়াপদের এই প্রত্যয়যুক্ত রূপ রচনার ক্ষেত্রে একথাও বলা যায় বাংলা ভাষার মূল ধাতুতে 'আ' প্রত্যয় যোগ প্রযোজক ধাতু গঠিত হয়। যেমন – কর - করা, চল – চলা, নাচ – নাচা,। বাংলা চলিত ভাষায় ধাতুর স্বরধ্বনি ই, উ, ও আবার কখনো 'এ' থাকলে কালরূপে নিজস্ব প্রত্যয় যথা – আ, ও এবং দ্বিতীয়টির বিকার উ প্রত্যয়ের প্রয়োগ মেলে। যথা – করাইতেছে > করছে, লুকাইবে > লুকাবে > লুকুবে। কোন কোন জায়গায় আবার প্রত্যয় যোগ না করে নাম শব্দটি ধাতু বা ক্রিয়ার মূল রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা – কম – কমে, তাত – তাতিল , পাক – পাকামি, জম – জমিয়ে।

বিভিন্নকাল অনুসারে প্রযোজক ক্রিয়াতেও নাম ধাতুতে যে সব প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়, সেগুলো সাধারণ ক্রিয়ারই মতো রূপলাভ করে। সামগ্রিকভাবে 'ইয়া', 'ইলে', 'ইতে' প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক ও ক্রিয়াকালবাচক প্রত্যয় কিছু পরিমাণে সংস্কৃতের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। বাংলা ক্রিয়াপদ গঠনের ক্ষেত্রে এগুলি একটি বিশেষ রূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ।

✧ যৌগিক ক্রিয়া ✧

সুকুমার সিকদার—

> যখন দুইটি ক্রিয়ার সমন্বয়ে একটি কাজ সম্পন্ন হওয়া বোঝায়, তাকে বলে যৌগিক ক্রিয়া।

দুটি ক্রিয়ার সমন্বয়ে একটি কাজ হলে যৌগিক ক্রিয়া হয়। যৌগিক ক্রিয়া কাজ সম্পাদন করে কিন্তু কাল জ্ঞাপন করে না। এই ক্রিয়ার মূল ধাতু সহকারী রূপে যে ধাতুটি সমাপিকা ক্রিয়ার কাজ করে, সেই পদটিতে অবশ্য যে কোন কালের চিহ্ন থাকতে পারে। আধুনিক বাংলায় '-ইতে' এবং 'ইয়া' অন্তক অসমাপিকার সঙ্গে আছ বা অন্যান্য ধাতু যোগ করে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। তাই দ্বিতীয় পদটি সহকারী ক্রিয়া।

যৌগিক ক্রিয়ার সহকারী -'আছ' ধাতুটি মূল ধাতুর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। তাই দুটি ধাতুর যে কেউ প্রধানের ভূমিকা নিতে পারে।

প্রাচীন বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার অনেক উদাহরণ পাওয়া য়ায়। আসলে অর্বাচীন বৈদিক স্তর থেকেই এর ব্যবহার ছিল। তাই প্রাকৃত হয়ে বাংলায় একে পাওয়া সহজ হয়েছে।

প্রাচীন বাংলা — 'টুটি গেলি কংখা' (চর্যাগীতি)।
মধ্য বাংলা — 'সখি সঞে করিল গমনে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
আধুনিক কথ্য — সে আমার বাড়ী আসে যায়। (রাঢ়ী)

আধুনিক বাংলায় পাঁচপ্রকার যৌগিক ক্রিয়ার গঠন দেখা যায় —

ক. সমাপিকা + সমাপিকা ক্রিয়া ঃ খায় দায় আর এখানে থাকে।
অনুরূপে — এল গেল, আসে যায়, জানে শোনে ইত্যাদি।

খ. সমাপিকা + অসমাপিকা ক্রিয়া ঃ যত্নপূর্বক জল বান্ধি রাখ গিআ।
অনুরূপে — ঘুমাওগে, দেখে এসো, রহি গিয়া ইত্যাদি।

গ. সমাপিকা + অসমাপিকা + সমাপিকা ক্রিয়া ঃ যা খুশি করগে যা।
অনুরূপে — বল গে যাও , খাও গে যাও ইত্যাদি।

ঘ. অসমাপিকা + সমাপিকা ক্রিয়া ঃ তোমার নাম লিখে গেল।
অনুরূপে — উঠি গেল, শুনে যাও, কাড়ি নিলে ইত্যাদি।

ঙ. নামপদ + সমাপিকা ক্রিয়া ঃ রাজু সাঁতার কাটে।
অনুরূপে — ডুব দেয়, রা কাড়ে ইত্যাদি।
যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রধান ধাতুগুলি — আস, কর, গে, নে, দে, পা, ফেল, যা মার, ইত্যাদি।

✧ যৌগিক কাল ✧

সুকুমার সেন —

> যৌগিক কাল বলিতে সেই-ধরনের দ্বৈত ক্রিয়াপদ (Compound Verb) যাহার প্রথম অংশ' ই (য়া)', '-(ই) ল' -যুক্ত অতীত অথবা '-ই (তে)' -যুক্ত বর্তমান, শেষ অংশ 'আছ' ধাতুর সমাপিকা পদ, এবং দুই অংশের মধ্যে কোন ফাঁক (Juncture) অনুভূত নয়।

মূলক্রিয়ার 'ইতে' বা 'ইয়া' অন্তক অসমাপিকা রূপের সঙ্গে অবস্থান বাচক 'আছ' ধাতুর সমাপিকা ক্রিয়াপদ যুক্ত করে যে কাল গঠন করা হয় তাকে যৌগিক কাল বলে। যৌগিক কালে অবশ্য ভবিষ্যৎ, নিত্যবৃত্ত অতীতে অসমাপিকা ক্রিয়া এবং ক্রিয়া বিশেষ্যে 'আছ্' ধাতুর প্রয়োগ চলে না। পরিবর্তে 'থাক্' ধাতুর ব্যবহার হয়।

প্রাচীন মৈথিলি, প্রাচীন ওড়িয়া ইত্যাদিতে যৌগিক কালের উদাহরণ থাকলেও প্রাচীন বাংলায় এর উদাহরণ মেলে না। আসলে আধুনিক বাংলাতেই এর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেছে। মধ্য বাংলাতেও অবশ্য এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী যৌগিক কাল আট প্রকার —

	বর্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ	নিত্যবৃত্ত
ঘটমান	(১) করিতেছে	(২) করিতেছিল	(৩) করিতে থাকিবে	(৪) করিতে থাকিও
পুরাঘটিত	(৫) করিয়াছে	(৬) করিয়াছিল	(৭) করিয়া থাকিবে	(৮) করিয়া থাকিত

অনেকে অবশ্য নিত্যবৃত্ত যৌগিক কালের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আবার ডঃ পরেশ চন্দ্র মজুমদার এগুলিকে যৌগিক ক্রিয়া মনে করেন।

✧ বাংলায় যৌগিক কালের বিভিন্ন প্রয়োগ ঃ

ক. ঘটমান বর্তমান ঃ — 'ইতে' অন্তক ঘটনা বাচক — তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের

নন্দনে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। অনুরূপে – দেখিতেছি, করিতেছি, দিতেছি ইত্যাদি আধুনিক প্রয়োগ আছে।

খ. ঘটমান অতীত ঃ – 'ইতে' অন্তক অসমাপিকার সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগে – আমি সেখানে ছিলাম। অনুরূপে – ছিলে, ছিল, করিতেছিলে ইত্যাদি।

গ. পুরাঘটিত বর্তমান ঃ 'ইয়া' অন্তক অসমাপিকা সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগে – তোঁ মোর নিঁয়াছিস বাঁশী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

ঘ. পুরাঘটিত অতীত ঃ 'ইয়া' অন্তক ক্রিয়ার সঙ্গে 'ছিল' যোগে – সে এখানে এসেছিল। এছাড়া রাঢ়ি উপভাষা অঞ্চলের বীরভূম, মুর্শিদাবাদে 'ইল' অন্তক যৌগিক কালের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন – মলছে (মরেছে), গেলছে, গেলছিল ইত্যাদি।

✧ যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কালের পার্থক্য

১. যৌগিক ক্রিয়ার সহকারী 'আছ্' ধাতু ও মূল ধাতুটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। দুটির মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে পারে। কিন্তু যৌগিক কালে 'আছ্' ধাতু সহকারী রূপেই থাকে।

২. যৌগিক ক্রিয়ায় ক্রিয়াপদ দুটি পাশাপাশি থাকে, তারা স্বাধীন। যৌগিক কালে পদ দুটি একত্রিত হয়। যেমন – সে বসিয়া আছে – যৌগিক ক্রিয়া এবং সে বসিয়াছে – যৌগিক কাল।

✧ বাংলা অতীত কাল গঠন ✧

কালকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে । (১) মৌলিক ও (২) যৌগিক কাল। অতীত কালের রূপগুলি হইল কৃদন্ত নির্দেশক অতীত, কৃদন্ত নিত্যবৃত অতীত, পুরাঘটিত অতীত এবং ঘটমান অতীতকাল।

কৃদন্ত নির্দেশক অতীত কাল ও কৃদন্ত নিত্যবৃত্ত অতীত কাল – মৌলিক কাল পর্যায় ভুক্ত এবং পুরাঘটিত অতীত কাল, ঘটমান অতীত কাল – যৌগিক কাল শ্রেণির অন্তর্গত। কৃদন্ত নির্দেশক অতীত কাল দুই ভাগে বিভক্ত (ক) 'ল' প্রত্যয় হীন ও (খ) 'ল' প্রত্যয় যুক্ত।

ক. 'ল' প্রত্যয় হীন শ্রেণিতে পড়ে 'ত' ও 'ইত' প্রত্যয়। ত প্রত্যয় – প্রবিষ্ট > পইটঠ > পঠি > পইঠা। চঞ্চল চীএ পইঠা কাল। সমহর গউ নিরানে (গউ > গতঃ)। 'ইত' প্রত্যয় বাহিতঃ > বাহিত > বাহিউ। – বাহিউ হেলে, কমল কেক মউ (বিকসিতম্)। এই শ্রেণির অতীত কালের পদ প্রা-বাংলাতে খুব অল্প।

খ. 'ল' প্রত্যয়ান্ত – খ ও অ-বাংলায় ধাতুর সহিত 'ইল' প্রত্যয় যোগ করে অতীত কালের ক্রিয়া প্রাতিপাদিক গঠিত হয়। আস্ + ইল > আসিল। মধ্যবাংলায় ধাতুর সঙ্গে 'ইল' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। পরে (ক্ষেত্র বিশেষে) – আগম + ক্ত >

আগত > আঅত, আঅত + ইল > আয় + ইল > আইল। মধ্যযুগ থেকে ধাতুর সঙ্গে সরাসরি 'ইল' প্রত্যয় যুক্ত করে এই অতীতকালের ক্রিয়াপদ গঠন করার রীতি প্রচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'প্রাচীন' ও নুতন সৃষ্টি দুইটি রূপের /রীতির নির্দশন আছে। - মইল > মরিল (প্রা-রূপ, ভইল > হইল (নূতন রূপ)। আধুনিক কথ্য ভাষায় 'এল' (আগত > আআত, আঅত + ইল > আইল্ল > আইল > এল) কিন্তু সাধুভাষায় 'আসিল > আস + ইল, অ-বাংলায় কেবল প্রাচীন রূপ রক্ষিত। 'ইল' প্রত্যয়ের অপভ্রংশ রূপ 'ইল্ল'।

প্রাচীন বাংলায় উত্তম পুরুষে – এসু, ই (কৈলী, আছিলেসু, সুতেলি), ম পুরুষে ই-এসি (আইলেসি) এবং প্র পুরুষে সি, আ, ই (গেল, গেলা, গেলসি) প্রত্যয়গুলি যুক্ত হত।

মধ্য বাংলায় উত্তম পুরুষে 'ওঁ', আহোঁ, আঙ্, (আইলাহোঁ, আইলো, আইলাঙ), মধ্যম পুরুষে 'আ, আহা, এ, ই' (আইলাহা, আইলা, আইলি) এবং প্রথম পুরুষে -'ই, এ আন্তি, এন' (গেলা, গেলান্তি, গেলেন ইত্যাদি), প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বাংলায় উত্তম পুরুষে – আম্, এন্ (গেলাম্, গেলেম্), মধ্যম পুরুষে 'ই, আ, এ' (গেলি, গেলে, গেলা) এবং প্রথম পুরুষে 'এ, এন' (গেল, গেলেন) প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়।

✧ কৃদন্ত নিত্যবৃত্ত অতীত কাল ✧

বাংলায় নিত্যবৃত্ত কালের 'ইত' প্রত্যয় এসেছে সংস্কৃত 'শতৃ' পদ থেকে। 'শতৃ' স্থানে প্রাকৃত 'অন্ত' (অন্ত > এন্ত > ইত) হত। এই 'ইত' প্রত্যয়ের সঙ্গে পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হয়ে বাংলায় নিত্যবৃত্ত অতীতের ক্রিয়াপদগুলি গঠিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় সমাপিকা ক্রিয়ারূপে 'শতৃ' প্রত্যয়ের ব্যবহার ক্বচিৎ। – শান্তি ভনই পোহান্ত (প্রবাতায়ান্ত) পহারাঁ। নিত্যবৃত্ত মধ্য বাংলায় একটি পূর্ণকালে পরিণত হয়। যেমন – কিনা বিধি লিখিত (লিখিলি) (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। আধুনিক বাংলায় নির্দেশক ভাব ছাড়া অভিপ্রায় অর্থে নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন – বৃষ্টি হইলে শস্য হইত।

নিত্যবৃত্ত অতীত কালের পুরুষবাচক প্রত্যয়গুলি নিম্ন রূপ ঃ –

পুরুষ	প্রত্যয়
উত্তমপুরুষ	তি, তোঁ, থুঁ, ইতাও, তাম্, তুম্, তেন (জানিতাম, খেতুম ইত্যাদি)।
মধ্যম পুরুষ	তেঁ, ইতে, ইতা, তিস (পাঠ্যত্যে, জানিতা, জানিতে, ইত্যাদি)।
প্রথম পুরুষ	ত, তেন, (করিত, খাইত, দিতেন ইত্যাদি)।

✧ কর্ম-ভাববাচ্যের সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠনের বৈশিষ্ট্য ✧

ক্রিয়া রূপ গঠনের ক্ষেত্রে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কর্মভাব-বাচ্যের সমাপিকা ক্রিয়া পদগঠনের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রথম পরিচয় পাওয়া গেছে ইন্দো ইরানীয় ভাষায়। ক্রিয়ার আত্মনেপদরূপে, কর্ম ভাববাচ্যের ক্রিয়াপদ গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ আত্মনেপদের যে ক্রিয়া বিভক্তি ছিল সেই বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। যেমন — ইন্দো-ইবানীয় আবেস্তায় Kiryeinte > বৈদিক সংস্কৃতে Kriyante ।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ধাতুতে উদাত্ত 'য়' (yá) বিকরণ যোগ করার পর আত্মনেপদ বিভক্তি দিয়ে কর্মভাববাচ্য পদ নিষ্পন্ন হত। যেমন ভূ-য়-তে > ভবতি, আ -গম্-য়-ত > আগচ্ছৎ।

মধ্য ভারতীয় আর্যে আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ বিভক্তি যোগ হত, এবং 'য়' বিকরণে বিকল্পে স্বরহীনতা দেখা দেওয়ার ফলে দুরকম ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে —

১. উদাত্তে 'য়' (-yá) সম্প্রসারিত হয়ে হল 'ইঅ' ।

২. অনুদাত্ত 'য়' (-ya) হল ইয্য, ইজ্জ।

এরকম ধ্বনি পরিবর্তনের মূলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যে যে সুর ব্যবহৃত হত তার একটা ভূমিকা সক্রিয় ছিল। দিবাদিগণীয় ধাতুর ক্ষেত্রে 'য়' বিকরণটির উপর সুর পড়ত না, পড়ত মূল ধাতুর উপর । যেমন — লর্ভ্যতে এবং কর্মভাববচ্যে পড়ত বিকরণেব উপব যেমন — লভ্যর্তে।

অর্বাচীন প্রাকৃতে 'ইঅ' রূপের কর্মভাববাচ্য, অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও মধ্য বাংলা পর্যন্ত এসেছে, তার পরে আধুনিক চলিত বাংলায় ক্রিয়ার এই রূপটি কর্তৃবাচ্যের সঙ্গে মিশে কর্মবাচ্যের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ —

প্রাচীন ভারতীয় আর্যে (কথ্যরূপ)	— ঈদৃশং কার্যং ন কার্য্যতে (কৃয়তে)।
মধ্য ভারতীয় আর্যে	— ঈদিশনং কজ্জং ন করিয়তি।
অপভ্রংশে	— এইহন / আইহন কজ্জং ন করিঅই।
প্রাচীন বাংলায়	— এইহন / অইহন কাজ ন করিঅই।
মধ্য বাংলায়	— এহেন / হেন কাজ ন করিএ।
আধুনিক চলতি বাংলায়	— হেন কাজ করে না।

অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় কর্মভাববাচ্যের সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন আজও চলিত বাংলায় আছে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অনুদাত্ত 'য়' বিকরণ, মধ্য ভারতীয় আর্যে 'ইজ্জ'-তে

রূপান্তরিত। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই পরিবর্তনের কোন রূপ পাওয়া যায় না। তবে অবহট্‌ঠে এর ব্যবহার দেখা যায়। দোঁহায় পাওয়া গেছে — 'পুরাণে বক্‌খানিজ্জি'। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন মধ্য ভারতীয় আর্যের এই 'ইজ্জ' রূপটি প্রাচীন ভারতীয় আর্যের উর্ধগামী সুর 'ইঅ' বিকরণে পরিণত, যা দিবাদিগণীয় ধাতুরূপের বৈশিষ্ট্য।

মধ্য ভারতীয় আর্যের শেষস্তর পর্যন্ত 'ইজ্জ' কর্মভাববাচ্য দেখা গেলেও বাংলায় তা না থাকার কারণ হচ্ছে, এইসময় কর্মভাববাচ্যের ওই রূপটি দিবাদি ধাতুর তদ্ভব রূপের সঙ্গে মিশে গিয়ে কর্তৃবাচ্যের মতো ব্যবহৃত হত। যেমন —

প্রাচীন ভারতীয় আর্যে — ময়েং লভ্যতে।
অবহট্‌ঠে — মএঁ লভ্‌ভতি।
প্রাচীন বাংলায় — ময়িঁ লব্‌ভই।

শুভঙ্করি আর্যায় 'ইজ্জ' ব্যবহারও দেখা যায় — 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।' আধুনিক বাংলায় দৈবাৎ প্রবাদে এবং ইডিয়ামে এমন পদ লুকিয়ে আছে। যেমন — "যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে"। আবার নিজন্ত ক্রিয়াপদে, কখনো কখনো ভাববাচ্যের ও কর্মকর্তৃবাচ্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন — এ কাজ তোমায় মানায় না (মানায়< মানাপয়তি)।

মধ্য বাংলায় একধরণের 'আ' প্রত্যয় যুক্ত কর্মভাববাচ্যের ক্রিয়ার রূপ দেখা যায়। যেমন -- ছাড়য়ে, বোলায়ে। এই 'আ' প্রত্যয়টির উৎস সম্পর্কে হোর্ণলে বলেন এটি প্রাচীন ভারতীয় আর্যের আ-কারান্ত ধাতু (যা, দা) নিচ্‌ প্রত্যয় আ পয় জাত কিন্তু গ্রিয়ার্সন ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এই প্রত্যয়কে নাম ধাতু 'আয়' প্রত্যয়ের সম্প্রসারণ বলে মনে করেন। তবে উৎস আলাদা হলেও আধুনিক বাংলায় এটি এক হয়ে গেছে।

√যা, √হ, √পর ইত্যাদি সহায়ক ধাতুর যোগে বাংলায় কর্মভাববাচ্যের সমাপিকা পদ গঠন করা হয়। এই প্রবণতা প্রাচীন বাংলা থেকেই। এক্ষেত্রে ক্রিয়াটিকে ভাববচন অথবা ক্রিদন্ত বিশেষণে রূপান্তরিত করা হয়।

প্রাচীন বাংলা (চর্যাগীতি) -- ধরণ ণ জাই (সহায়ক ধাতু জাই)।
মধ্য বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) — খণ্ডন ণ জায়ে।

প্রাক্‌-আধুনিক বাংলায় ভাববচনের সঙ্গে সহায়ক ক্রিয়া যোগে কর্মভাববাচ্যের ক্রিয়াপদ গঠনের প্রাধান্য ছিল। চলিত বাংলায় এটা লুপ্ত হলেও উপভাষায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন — 'এটা কহন যায় না'।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান 'যা' ধাতু যোগে কর্মভাববাচ্যের ক্রিয়াগঠন নিঃসন্দেহে অপভ্রংশের 'ইজ্জ' বিকরণের প্রভাবে হয়েছে। প্রাকৃত অপভ্রংশে 'ইজ্জ' যুক্ত কর্মভাববাচ্যে পদের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। পক্ষান্তরে বাংলা সহ আধুনিক ভারতিয় আর্য ভাষার 'যা' ধাতু যোগে পদ গঠনের প্রাচুর্য। অর্থাৎ মধ্যবর্তী পরিবর্তনের চিহ্ন নেই। তাঁর অনুমান ধ্বনিগত সমতার জন্য প্রাচীন প্রত্যয়টি বিষমচ্ছেদের ফলে 'যা' ধাতু রূপে

গৃহীত। তাঁর মতে চর্যায় — অবসরি জাই < অবসরি জ্জই < অবশরি জ্জতি (অবসৃয়তে।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় পূর্ব পদটি ই-কারান্ত হওয়ায় ধ্বনি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'আ' প্রত্যয় যুক্ত পূর্বপদ গঠন আধুনিক কালের ব্যাপার। প্রত্যয় যুক্ত পদের সঙ্গে 'যা' ধাতুর যোগে কর্মভাববাচ্যের গঠন সম্পর্কে তাঁর একই সিদ্ধান্ত। বিবর্তন ক্রমটি এইরকম— করণিয়ক > করণিজ্জঅ > করণিজাএ > করণজাঅ।

আসলে এই তথাকথিত ভাববাচ্যের পদটি 'অন্' যুক্ত ছিল না, ছিল 'অনি' যুক্ত। তার প্রমাণ স্বরূপ তুলসীদাসের কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 'কহনি জাঅ' এবং মধ্য বাংলায় 'না জায় কহনে'। অর্থাৎ 'কহনি' থেকে 'কহনে' এসেছে। পরবর্তীকালে এই 'এ' কে করণ-অধিকরণ বিভক্তির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলায় পদটি ভাববচন রূপে প্রয়োগ হয়েছে।

অনেক সময় শ্রোতার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় বক্তা কর্তাপদের প্রয়োগ এড়াবার জন্য বাংলায় কর্মভাববাচ্যে প্রয়োগ করে। যেমন 'কবে আসা হল'। বাংলা সাধু নিষ্ঠান্ত তৎসম পদের সাহায্যে কর্মভাববাচ্যের ক্রিয়া গঠন লক্ষ করা যায়। যেমন — 'ইহা দৃষ্ট হইল'।

নির্দেশক ভাব ছাড়া অনুজ্ঞাতেও কর্ম ভাববাচ্যের ব্যবহার আদি-মধ্য বাংলা পর্যন্ত ছিল। আধুনিক বাংলায় অনুজ্ঞাতে যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে বহুভাষিত প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন — 'কাজটা করা হউক'। কিন্তু প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রে যৌগিক কর্মভাববাচ্যের পদ ব্যবহার হত না। যেমন — বর্ত্মজায়তু (গম্যতাম্) > বট্ট জাইউ > বাট জাইউ (১৫ নং চর্যাগীতি)। এই ভাবে বাংলায় কর্মভাববাচ্যের সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটেছে।

বাক্যতত্ত্ব

ভাষা গঠনের বিভিন্ন স্তরগুলির মধ্যে বাক্য গঠন হল একটি স্তর। ইংরাজি Syntax শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা বাংলায় ' বাক্যতত্ত্ব ' কথাটি ব্যবহার করি। ইংরাজি Syntax শব্দটি এসেছে গ্রিক Syntaxis থেকে। গ্রিক বৈয়াকরণ দিওনুসিউস্ থ্রাক্স এই কথাটির অর্থ করেন 'একত্র বিন্যাস'। আবার একাধিক বাক্য যুক্ত হয়ে গঠন করে Text Structure। এই বাক্য গঠনে লেখকের মানসিকতাও উপেক্ষিত নয়। তাই শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বাক্য বিচারের প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে।

বাক্যের মধ্যে কোন্ শব্দ কোথায় বসবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিরকম হবে তা ভাষা বিজ্ঞানের যে শাখার আলোচনা করা হয় তাকে বলে বাক্যতত্ত্ব। আর বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন শব্দের যে রূপ পরিবর্তন হয় তা ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে বলে রূপতত্ত্ব। 'মানুষ বাঘ মারে' — এই বাক্যে 'মানুষ' ও 'বাঘ' শব্দের স্থান পরিবর্তন করে দিলে বাক্যটি হবে 'বাঘ মানুষ মারে'। এখানে বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে শব্দের বিভক্তি চিহ্ন পরিবর্তনের ফলে নয়, বাক্যের মধ্যে শব্দের স্থান পরিবর্তনের ফলে। এইজন্য রূপতত্ত্ব ও বিন্যাসক্রম ব্যাপক অর্থে দুটিই বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে।

ভাষার বৃহত্তম একক হিসাবে বাক্যতত্ত্বের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাবিজ্ঞানে যেখানে বাক্যগঠনের এককগুলির আন্বয়িক সম্পর্ক, তাদের অর্থগত সম্বন্ধ ইত্যাদি বিজ্ঞান-সম্মতভাবে যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকেই বলে বাক্যতত্ত্ব। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত জেনে নেওয়া দরকার।

✧ সংজ্ঞা ✧

হুমায়ুন আজাদ —

সংস্কৃত 'কারকতত্ত্ব' হলো প্রকৃতপক্ষে বাক্যতত্ত্ব ...

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ –

> **বাক্যতত্ত্ব হচ্ছে বাক্যগঠনের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক-সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং বাক্যের পর্যায়ক্রমের বিন্যাস নিয়ন্ত্রিত সূত্রসমূহ ।**

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য –

> **ব্যাকরণ বা ভাষাবিজ্ঞানে ব্যক্য-সম্বন্ধীয় আলোচনাকে বলা হয়'বাক্যতত্ত্ব' (Syntax)।**

Maria per & Frank Gaynar --

> **Syntax is the study and rules of the relation of words to one another as expressions of ideas and as parts of the structures of sentences.**

প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী বাক্যের গঠনগত এবং অর্থগত আলোচনা বাক্যতত্ত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন বাক্য কাকে বলে।

✧ সংজ্ঞা ঃ বাক্য ✧

প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী যে পদ বা শব্দ সমষ্টির দ্বারা কোনোও বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে বক্তার মনের ভাব প্রকটিত হয় সেই পদ বা শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলে। এক কথায় বাক্য হল মনের ভাব প্রকাশের আধার। এই সংজ্ঞাটি শুধু ভাব প্রকাশের দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি বলি – গরুর দুটি লেজ আছে। এই উদাহরণটি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নয়। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতায় গরুর একটি লেজ আছে, দুটি লেজ হলে তা সেই গরুর জন্মগত ত্রুটি। উপরোক্ত সংজ্ঞাটি বাক্যের গঠন সংক্রান্ত কথা বলে না। বাক্যের এই সংজ্ঞার মধ্যে ত্রুটি আছে। তাই বাক্যের অর্থগত ও গঠনগত দুটি দিক মিলিয়ে একটি সংশোধিত সংজ্ঞা রচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে –

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় –

> **কোনও ভাষার যে উক্তির সার্থকতা আছে, এবং গঠনের দিক হইতে যাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য (Sentence) বলা হয়।**

Bloomfield --

1. . . . an independent from, not included in any larger linguistic form.
2. A maximum form is any utterance is a sentence.

Leman --

A sentence is a sequencee of selected syntactic items combined into a unit in accordance with certain patterns of arrangement, modification, and intonation in any given language.

অর্থাৎ বাক্য হচ্ছে এমন কতকগুলি নির্বাচিত উপাদানের পরম্পরাক্রমিক বিন্যাস যেগুলি ভাষা বিশেষের বিশেষ ছাঁদ, রূপ পরিবর্তন ও সুরতরঙ্গের বিশেষ নিয়ম অনুসারে মিলিত হয়ে, ভাষার বৃহত্তম একক গঠন করে। যার মধ্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় বর্তমান।

আধুনিক ভাষাতত্ত্বে একটি ভাষিক পরিবেশে বাক্যকে বলা হয় উক্তি। কোনো ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে অর্থাৎ অর্থবোধক এবং গঠনের দিক থেকে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্থক এরকম একক উক্তিকে বাক্য বলে । যেমন — রাম ভাত খায় , এটি একটি বাক্যের উদাহরণ কারণ এটি একই সঙ্গে অর্থবোধক ও গঠনগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ।

গঠন ঃ	রাম	ভাত	খায়।
	কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া
	(S)	(O)	(V)

বাংলা বাক্যগঠনের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কর্তা বিভিন্ন স্থানে বসতে পারে না। কিন্তু

ভাত রাম খায়।

অথবা, খায় ভাত রাম।

অথবা, খায় রাম ভাত।

এখানে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার অবস্থানগত পার্থক্য থাকলেও বাক্যের অর্থের কোনো পার্থক্য ঘটেনি। কর্তার বিভিন্ন স্থানে বসা ঘটনা আমরা পদ্যে দেখতে পাই। অর্থাৎ অর্থবোধ অনুযায়ী বাক্যের কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া বিভিন্নস্থানে বসতে পারে। তবে তারও সীমাবদ্ধতা আছে।

রাম	ভাত	খায়।
সোনামুখীর রাম	শাক দিয়ে ভাত	মেখে খায়।

প্রসারক সহ (সোনামুখীর, শাক দিয়ে) কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার অবস্থানগত পরিবর্তনে অর্থবোধে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না কিন্তু কর্তার প্রসারক স্থলে কর্মের প্রসারক বসালে অর্থের

উলট-পালট হয়ে যায়। আবার উদ্দেশ্য প্রসারকের স্থানে বিধেয় প্রসারক অথবা বিধেয় প্রসারকের স্থানে উদ্দেশ্য প্রসারক বসালে বাক্যের অর্থ হয় না।

কর্তা বাক্যের বিভিন্ন স্থানে বসতে পাবে, আবার পারেও না। সরল বাক্যে কর্তাকে যেখানেই বসাই না কেন আপাত দৃষ্টিতে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রসারকের স্থানে বিধেয় প্রসারক এর উল্টোটা বসালে বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় না এমন কি কোনো বাক্যে কর্মের স্থানে বসালে অর্থের পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন –

মানুষ বাঘ মারে।
বাঘ মানুষ মারে।

বাক্য অনুযায়ী কর্তা কর্ম বদলে যাচ্ছে। ফলে বাক্যগঠন সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা কতদূর সার্থক সে ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

✧ বাংলা বাক্যে গঠন ও গঠনগত শ্রেণিবিভাগ ঃ

ঐতিহ্যগত ব্যাকরণে বাক্যকে প্রথমে দুটি অংশে ভাগ করা যায় – উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

যেমন – অপু | চলে গেল।
উদ্দেশ | বিধেয়

মৌলিক উপাদান নির্ণয় করে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায় —

১. সরলবাক্য
২. মিশ্র বা জটিল বাক্য
৩. যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য।

✧ সরলবাক্য ঃ

প্রথমে বলা হয়েছিল , যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাই-ই হল সরল বাক্য। যেমন – ছাত্রেরা পড়ে। কিন্তু বাক্য যদি একরম হয় – ঠেলা গাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরেজ পুরুষগণ বায়ু সেবনে বাহির হয়েছেন। এখানে একাধিক কর্তা থাকলেও সমাপিকা ক্রিয়া একটি মাত্র থাকায় বাক্যটি সরল। সুতরাং এক বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকলেও বিধেয় অংশে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে তাকে সরল বাক্য বলে ।

✧ মিশ্র বা জটিল বাক্য ঃ

যে বাক্যে একটি প্রধান উপবাক্য থাকে এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বা আশ্রিত উপবাক্য থাকে তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন – ছাত্রটি যদি পড়ে তাহলেই সে পাশ করবে।

এখানে ছাত্রের পাশ করার কথাই বক্তার মূল বক্তব্য। সুতরাং 'সে পাশ করবে' -

- হল মূল বাক্য। আর যদি ছাত্রটি পড়ে, এটি হচ্ছে পাশ করার শর্ত। তাই এটি অপ্রধান বাক্য।

✧ যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য ঃ

যে বাক্য একের বেশি প্রধান উপবাক্য সংযোগে গঠিত হয় তাকে যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য বলে। অথবা একের বেশি সরল বা মিশ্র বাক্যকে সংযোগ অব্যয় (এবং, ও, আর) বা বিয়োজক অব্যয় (অথবা, বা, কিংবা) দিয়ে যুক্ত করে যে বাক্য গঠিত হয় তাকে যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য বলে। যেমন — 'শরৎচন্দ্র সমাজপ্রেমী উপন্যাসিকএবং তিনি সামাজিক উপন্যাসে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা লিখেছেন।' এখানে দুটি সরল বাক্য –

১. শরৎচন্দ্র সমাজপ্রেমিক উপন্যাসিক ছিলেন।

২. তিনি সামাজিক উপন্যাসে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা লিখেছেন।

বাক্য দুটিকে একটি সংযোগ অব্যয় (এবং) দিয়ে যোগ করা হয়েছে।

✧ তিন শ্রেণির বাক্যের পার্থক্য ঃ

১. সরল বাক্য আসলে একটি বাক্য।
১. জটিল বাক্য আসলে দুটি বাক্য তাদের একটি বাক্যে পরিণত করা হয়।
১ যৌগিক বাক্য আসলে একাধিক বাক্যের একটি বাক্যে পরিণত করা হয়।

২. সরল বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।
২. জটিল বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া একটি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে।
২. যৌগিক বাক্যে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।

৩. সরল বাক্যে সংযোজক বা নির্দেশক অব্যয় থাকে না।
৩. জটিল বাক্যে সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় থাকে না।
৩. যৌগিক বাক্যে সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় থাকতে পারে আবার নাও পারে।

✧ প্রকৃতি অনুসারে বাক্যের ভেদ ঃ

প্রকৃতি অনুসারে বাংলা বাক্য চার প্রকার । তবে তাদের প্রতিটিই আবার সদর্থক ও নঞর্থক উ ভয়ই হতে পারে।

ক. **বিবৃতিমূলক ঃ** ঘটনা ও মত প্রকাশের জন্য যখন বিবৃতি দেওয়া হয়। যেমন –

সদর্থক – পাঁড়েজি রুটি খায়।

নঞর্থক – রহিম রোজা রাখে না।

খ. **আবেগমূলক ঃ** বিস্ময় ও আবেগের প্রকাশ ঘটানো হয়। যেমন -

সদর্থক — ইস্ ! কি বিশ্রি বৃষ্টি !

নঞর্থক — ছি ছি ! এভাবে পরীক্ষায় কপি করো না !

গ. আদেশ সূচক ঃ আদেশ, অনুরোধ অভিশাপ বোঝানো হয়। যেমন —

সদর্থক — ভালো করে পরীক্ষা দাও।

নঞর্থক — গোলমাল করো না।

ঘ. প্রশ্নবোধক ঃ জানার আগ্রহে প্রশ্ন করা হয় । যেমন —

সদর্থক — কে বোমা মেরেছে ?

নঞর্থক — বোমা মারলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রাখা যাবে ?

✧ বাক্যগঠনের শর্ত ঃ

বৈয়াকরণরা শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠনের জন্য তিনটি শর্ত নির্ণয় করেছেন) (১) আকাঙ্ক্ষা (২) যোগ্যতা (৩) আসত্তি। যেমন — আজ যদি বৃষ্টি হয় . . . এইটুকু বলেই যদি কোনো বক্তা থেমে যান তাহলে পরবর্তী পরিণামটি জানার জন্য শ্রোতার মনে একটি আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় এবং বাক্যটি অপূর্ণ থেকে যায়। শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা হরণ বক্তাকে আরও কিছু বলে বক্তব্যটি পূর্ণ করতে হয়। সুতরাং বাক্যের অন্যতম শর্ত আকাঙ্ক্ষা পুরণ। যেমন — আজ যদি বৃষ্টি হয় তা হলে আমি স্কুলে যাব না। এক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা পুরণ করতে সমর্থ হচ্ছে।

যোগ্যতা ঃ

বাক্যের অর্থ অর্থাৎ বক্তার বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার বা বৃহত্তর বা গভীরতর সত্যের যে সঙ্গতি থাকে তাকে বলে যোগ্যতা। এই সঙ্গতি না থাকলে যোগ্যতা নিঘ্নিত হয় এবং তাতে বাক্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর অর্থযুক্ত সমষ্টি না হলে তাকে বাক্য বলা যায় না।

যেমন — ১. মানুষ মেরুদণ্ডহীন প্রাণী।

২. কেঁচো মেরুদণ্ড যুক্ত প্রাণী।

দুটি বাক্যেরই কোন অর্থ-সঙ্গতি নেই, তাই বাক্য নয়।

আসত্তি ঃ

আসত্তি বলতে বোঝায় বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির মধ্যে রূপতাত্ত্বিক সঙ্গতি ও বিন্যাসের নৈকট্য বা ক্রমবাক্যে বিন্যস্ত পদগুলির মধ্যে রূপতাত্ত্বিক সঙ্গতি থাকা চাই।

যেমন — আমি কলকাতা যাই।

'আমি 'উত্তম পুরুষের সঙ্গে 'যাই' ক্রিয়াটিও উত্তম পুরুষে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয় — আমি কলকাতা যান ।

'আমি' উত্তম পুরুষের সঙ্গে 'যান' প্রথম পুরুষের সঙ্গতি থাকে না। তাই গঠনগত দিক থেকে এটি বাক্য নয়।

✧ উদ্দেশ্য প্রসারক ও বিধেয় প্রসারক ঃ

বাক্য বড় হয় মূলত প্রসারকের জন্য । উদ্দেশ্যের বিশেষণ প্রভৃতি যেসব শব্দ উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার অর্থকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট বা বিশেষত করে তাকে উদ্দেশ্যের প্রসারক বলে। অনুরূপে বিধেয়ের সঙ্গে থাকে বিধেয় প্রসারক। যেমন — বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ ভালো ছাত্ররা খুব মনোযোগ সহকারে মূল বই পড়ে। এই বাক্যটিতে 'ছাত্ররা' এই উদ্যেশের প্রসারক হল — ' বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ ভালো '। আর বিধেয় বই পদটির প্রসারক হল —' খুব মনোযোগ সহকারে মূল'।

✧ বাংলা বাক্যের পদক্রম ✧

বাংলা বাক্যে পদক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শৈলি-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সাহিত্য সমালোচনায় পদবিন্যাস রীতিটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঐতিহ্যপন্থী বৈয়াকরণরা বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে দেখেছেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতিবাবু পদক্রম-এর মূল সূত্র দিয়েছেন। সেগুলি হল —

ক. বাংলা বাক্যের প্রধান উপাদান দুটি — উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যের প্রথমে বসে উদ্দেশ্য আর উদ্দেশ্যের কাজকর্ম ইত্যাদি বোঝাতে, পরে বসে বিধেয়। উদ্দেশ্যের প্রসারক উদ্দেশ্যের আগে এবং বিধয়ের প্রসাবক বিধেয়ের আগে বসে। যেমন -

ছাত্ররা	বিপ্লব করবে।
উদ্দেশ্য	বিধেয়

প্রসারক বসালে —

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মশাল মিছিল করবে।

উদ্দেশ্য প্রসারক (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের) বিধেয় প্রসারক (মশাল)

বাংলা বাক্যে কখনোও উদ্দেশ্য বা কখনো বিধেয় উহ্য থাকতে পারে। যেমন —

— মোবাইল নেবে কে !

— আমি।

খ. সাধারণত উদ্দেশ্য বিধয়ের আগে বসে তবে অবস্থানের পরিবর্তন ঘটালে ও অর্থের পরিবর্তন হয় না। বাক্যের কোন অংশকে জোর দেবার জন্য বা ছন্দের প্রয়োজনে এমনটা ঘটে। যেমন — চলে যাও তুমি।

গ. বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক পদক্রম হল কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া। তবে কোন পদের উপর জোর দেওয়ার জন্য এদের অবস্থানের পরিবর্তন অসম্ভব নয়। যেমন —

কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া = আমি ভাত খাব।
কর্ম + কর্তা + ক্রিয়া = ভাত আমি খাব।
ক্রিয়া + কর্তা + কর্ম = খাব আমি ভাত। ইত্যাদি।

তবে মনে রাখা দরকার পদক্রমের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হলেও কখনোই উদ্দেশ্যের বা কর্তার প্রসারক বিশেষণকে কর্মের প্রসারক হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়া কর্তার আগে বসে।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে বাংলার পদক্রমটি হল —

"বাক্যের সর্বশেষ সমাপিকা ক্রিয়া — নঞর্থক না হইলে, তাহার পূর্বে মুখ্য কর্ম, তাহার পূর্বে গৌণকর্ম, তাহার পূর্বে করণ অধিকরণ, তাহার পূর্বে অসমাপিকা (ও তদযুক্ত বাক্যাংশ), তাহার পূর্বে কর্তা। সমাপিকা ক্রিয়া বলিতে যুক্ত ও যৌগিক ক্রিয়া পদও ধরিতে হইবে।"

বাক্য গঠনে পদক্রমগুলি হল — বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় (সংযোজক, অনন্বয়ী, পদান্বয়ী) এগুলিই প্রধান পদক্রম রূপে ব্যাকরণে অন্তর্ভুক্ত।

সংস্কৃত বাক্যতত্ত্ব অনুযায়ী বাক্য হল যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি যুক্ত পদ সমুচ্চয়। যেখানে শ্রোতার জানার আকাঙ্ক্ষা, পদগুলির রূপতাত্ত্বিক সঙ্গতি ও বিন্যাস এবং গভীরতর সত্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্যগত ব্যকরণে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়-এর উপর ভিত্তি করে বাক্যকে সরল, জটিল ও যৌগিক এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

উপরি উক্ত প্রধান বিষয়গুলি ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় বাংলা বাক্য গঠনে মনে রাখতে হবে।

i. ক্রিয়ার পুরুষ কর্তার পুরুষের অনুরূপ হবে। বাক্যে অনেক পুরুষ থাকলে উত্তম পুরুষ হবে প্রধান কর্তা এবং ক্রিয়া হবে তার অনুগামী।
ii. উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য প্রসারক রূপে অনেক পদ ব্যবহৃত হলে সেগুলিকে অব্যয় দিয়ে যুক্ত করতে হবে। যেমন — রাম ও শ্যাম, অর্থ ও প্রতিপত্তি ইত্যাদি।
iii. মূল বাক্যের পূর্বে আশ্রিত খণ্ড বাক্য বসে। যেমন — 'যতই কর না কেন, ভবী ভোলবার নয়'।
iv. ইংরাজির মতো বাংলা বাক্যে বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্যের আগে বসে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। যেমন — 'ভাল ছেলে' হয় আবার 'ছেলে ভাল' হয়।
v. উদ্দেশ্যের প্রসারক কে বিধেয়ের পূর্বে বা বিধেয় প্রসারককে উদ্দেশ্যের পূর্বে বসানো যায় না।
vi. বাংলায় একই বাক্যে একই ভূমিকায় ব্যবহৃত একাধিক পদ থাকলে প্রথমগুলি

কমা চিহ্ন দিয়ে যুক্ত করা হয় এবং শেষেরটির সঙ্গে কারক বাচক বিভক্তি চিহ্ন ও বহুবচন প্রত্যয় যোগ করা হয়। যেমন – 'হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনরা ব্যাপক অর্থে হিন্দু বলেই পরিচিত।'

vii. বাংলা বাক্য গঠনে ক্রিয়াপদের কালগত সঙ্গতি সর্বদা থাকে না। যেমন – 'তুমি গিয়ে দেখবে, নাটক থেমে গেল।'

viii. এক কর্তার অনেকগুলি সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে শেষেরটি ঠিক রেখে অন্যগুলিতে 'ইয়া' > 'এ' যোগ করে অসমাপিকায় পরিণত করা হয়। যেমন -- 'তুমি এখানে এসে দেখে শুনে কাজ কর্ম সেরে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে বাড়ি যেয়ো।'

ix. বাংলা বাক্যে নির্দেশক ভাবে নঞর্থক অব্যয় 'না', 'নি' ইত্যাদি সাধারণত সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন – 'বাঙালিরা রুটি খায় না।' আবার অসমাপিকার ক্ষেত্রে 'বাঙালিরা রুটি না খেয়ে দুর্বল হয়ে গেছে।'

x. পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়া কালকে অনুসরণ করে না। যেমন – সুবোধ জানালো যে সে ঘরে থাকবে না।'

xi. নিত্য সম্বন্ধযুক্ত শব্দগুলো একটির সঙ্গে অন্য সম্পর্ক যুক্তটি বাক্যে বসে অর্থকে স্পষ্ট করে। যেমন – 'যত মত তত পথ।'

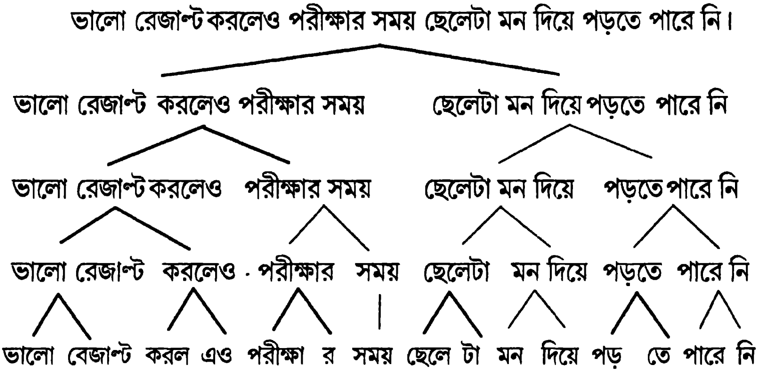
লক্ষ্যণীয় যে, বাংলা বাক্য গঠনের এত রূপ বদল ঘটেছে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। তবু কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে আলোচিত হল।

✧ বাক্যের অব্যবহিত উপাদান (IC) ✧

ভাষাবিজ্ঞানের সাংগঠনিক ধারণায় বিশ শতকের তিন-এর দশক থেকে বাক্য বিশ্লেষণে অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constituent) বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। ব্লুমফিল্ডের সুযোগ্য ছাত্র চমস্কি সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্বের প্রতিষ্টা করলে ,অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের ধারনাটি প্রসার লাভ করে। বর্ণনামূলক ভাষা বিজ্ঞানে বাক্যকে বৃহত্তম একক ধরে তাকে ধাপে ধাপে ক্ষুদ্রতম উপাদানে বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি তাঁরা সাংগঠনিক বাক্য চিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন বাক্যের আন্বয়িক সম্পর্ক। এক্ষেত্রে শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসারে প্রথমে উদ্দেশ্য ও বিধেয় প্রসারক সহ সমগ্র বাক্যটি বড় বড় অংশে ভাগ হয়ে যাচ্ছে । এই বড় অংশগুলো পরের স্তরে আবার মাঝারি মাপের টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত হচ্ছে। তার পরের স্তরে আবার তাকে টুকরো করে তার অব্যবহিত উপাদান বের করা হয়। শেষে একটি করে শব্দ থাকে । এক্ষেত্রে পদ থেকে বিভক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে অব্যবহিত উপাদান বের করা হয়। মনে রাখতে হবে অব্যবহিত উপাদানের টুকরোগুলো জুড়ে দিলে আবার পূর্বের বাক্যটিকে পাওয়া যায়। বাক্যকে এই ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে চান আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা।

বাক্যকে এরকম টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গার উদ্দেশ্য হলো বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের ব্যাকরণগত আলোচনা করা। যেমন – ' নাসিম লেখাপড়া ছেড়ে অটো চালাতে বাধ্য হয়েছে।' এই বাক্যের প্রতিটি উপাদান পরস্পর আন্বয়িক সম্পর্কে যুক্ত । আবার তাদের আন্বয়িক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে নাসিমের বাধ্য-বাধ্যকতা। ইটের পর ইট সাজিয়ে যেমন পাকা বাড়ি নির্মাণ হয়ে তেমনি বাক্যের উপাদানগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে পূর্ণ বাক্য গড়ে উঠে। উদাহরণ দিয়ে একটি বাক্যের স্তর বিন্যাস ও উপাদানগুলির আন্বয়িক সম্পর্কটি লক্ষ করা যেতে পারে।

যেমন –



এই ধরণের আলোচনায় বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির পারস্পরিক ঘনিষ্টতার তারতম্য দূরত্ব নৈকট্য নির্দেশ করা যায়। তবে বিভিন্ন পদের পৃথক ভূমিকা স্পষ্ট হয়। বাক্যটিতে মোট ১১ টি পদ থাকলেও এর উপাদানের (রূপমূলের) সংখ্যা ১৫। এগুলি হলো 'ভালো','রেজাল্ট ','করল','-এও ','পরীক্ষা','-র',' সময়', 'ছেলে','টা',' মন', 'দিয়ে', 'পড়','তে', 'পারে', 'নি'।

বাক্যগঠনের প্রযুক্তিতে দীর্ঘ বাক্যের মধ্যে একই পদ বা বাক্যাংশ বারবার ব্যবহার না করে অন্যপদ বা বাকাংশ ব্যবহার করা হয়। তবে প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী পদ বলতে শুধু সর্বনাম নয়,বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের ও প্রতিরূপর (Pro=form) বসতে পারে। পদের সংযোগে যে পূর্ণ গঠন তার মধ্যে কাল, কারক, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ প্রভৃতির সংগতি থাকা দরকার। যেমন 'আমি যাও' বললে পুরুষের দিক থেকে অসঙ্গতি দেখা যায় এবং বাক্যের দিক থেকেও অশুদ্ধ গঠন।

অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণে দুটি সমস্যা দেখা যায় । প্রথমত, উপাদানগুলি নির্ণয়ের সমস্যা । দ্বিতীয়ত, উপাদান নির্ণয় থেকে পাওয়া টুকরো রূপগুলিকে অব্যবহিত উপাদানে নির্দেশ করা।

✧ অন্তঃকেন্দ্রিক ও বহিঃকেন্দ্রিক গঠন ✧

পরস্পর আন্বয়িক সম্পর্কযুক্ত একাধিক শব্দের সমন্বয়কে গঠন (Construction) বলে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে বাক্যের গঠননের প্রকৃতি দু'প্রকার -- অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন ও বহিঃকেন্দ্রিক গঠন। বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত এক বা একাধিক শব্দ না বসালে বাক্যের গঠনের বদল ঘটে এক্ষেত্রে অর্থগত পরিবর্তন ঘটলেও ব্যকরণের দিক থেকে কোন ভুল হয় না। এই রকমের গঠনকে অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন বলে । যেমন -- ' ভালো খেলোয়াড়েরা সবসময় দলে খেলার সুযোগ পায় ।' এই বাক্যে ' ভালো খেলোয়াড়েরা ' পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত । সুতরাং এটি একটি গঠন। এই গঠনের অন্তর্গত 'ভালো খেলোয়াড়েরা' অংশটির বদলে যদি আমরা ' খেলোয়াড়েরা ' শব্দ বসাই তা হলে ব্যাকরণের দিক থেকে কোন ভুল হয় না কিন্তু অর্থের পরিবর্তন ঘটে। তাই আমরা বলতে পারি -- ' ভালো খেলোয়াড়েরা সবসময় দলে খেলার সুযোগ পায়। ' -- এই বাক্যে 'ভালো খেলোয়াড়েরা' হল বাক্যের একটি অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন। আবার কখনো কখনো গঠনে ব্যবহৃত এক বা একাধিক শব্দ গোটা গঠনের বদলে বসতে পারে না , তা বসালে ব্যাকবণেব দিক থেকে ভুল হয়ে যায়। এই ধরণের গঠনকে বহিঃকেন্দ্রিক গঠন বলে। যেমন -- ' রহিম পড়ে । ' এই বাক্যে ' রহিম ' অথবা ' পড়ে ' কোন একটি বসালে তা বাক্যই হবে না। সুতরাং ' রাম পড়ে । ' এই গঠনটি বহিঃকেন্দ্রিক গঠন ।

বহিঃকেন্দ্রিক গঠনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। যদি বলি -- ' তুমি করো।' -- এই বাক্যটি বিবৃতিমূলক হলে মূল গঠনের পরিবর্তে 'তুমি ' বা ' করো' বসালে ব্যাকরণের দিক থেকে ভুল হবে । সুতরাং গঠনটি বহিঃকেন্দ্রিক । কিন্তু এটি আদেশমূলক বাক্য হলে একটি শব্দ ' করো' দিয়েই বাক্য হবে। সেক্ষেত্রে এটি অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন। সংলাপের ক্ষেত্রে যে কোন একটি পদ দিয়েই বহিঃগঠন হতে পারে ।

যেমন --

রাজিব -- কে যাবে ?

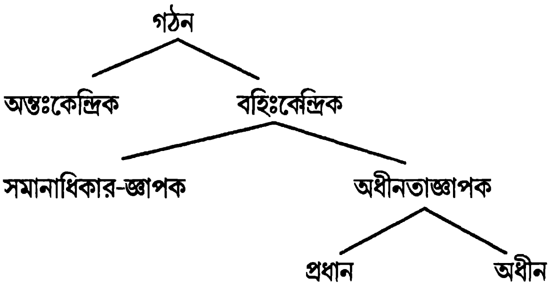
পবিত্র -- তুমি ।

এখানে পবিত্র কথিত বাক্যটি সংক্ষিপ্ত , আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী পূর্ণ গঠনহীনতার জন্য এটি বাক্য নয়। বাক্যটি হবে ' রাজিব তুমি যাবে।' তখন বাক্যটি অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন। অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন দুই প্রকার -- সমানাধিকার-জ্ঞাপক (Coordinative) ও অধীনতা -জ্ঞাপক (Sub-ordinative)।

সমানাধিকার-জ্ঞাপক হলো এমন এক গঠন ,যেখানে বাক্যের অন্তর্গত উপাদানগুলি সমান গুরুত্ব সম্পন্ন , একটি উপাদান অন্যটির শুধু বিশেষণ-স্থানীয় শব্দ নয় বা একটি অন্যটির অধীনস্থ উপাদান নয়। যেমন -- 'লায়লা ও মজনু রোমাণ্টিক চরিত্র। ' -- এই

গঠনে দুটি উপাদান ‘ লায়লা ’ ও ‘ মজনু’ – এরা সমানাধিকার নিয়ে বাক্যে বসেছে । একটি অন্যটিকে বিশেষিত করার জন্য গঠনে বসে নি। কিম্বা উপাদান দুটির কোন একটি প্রধান বা কোন একটি অপ্রধান নয়। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি বসালে বাক্যের গঠন বিপন্ন হবে না। আমরা বলতে পারি – ‘ লায়লা রোমাণ্টিক চরিত্র’ অথবা ‘ মজনু রোমাণ্টিক চরিত্র। ’ অর্থাৎ দুটি উপাদানের সমান গুরুত্ব। তাই ‘লায়লা ’ও ‘মজনু ’ হলো একটি সমাধিকার-জ্ঞাপক গঠন।

অধীনতা-জ্ঞাপক হলো এমন এক গঠন, যেখানে বাক্যের অন্তর্গত উপাদানগুলির মধ্যে একটি প্রধান অন্যটি অ-প্রধান বা একটি অন্যটিকে বিশেষিত করার জন্য বসে অথবা একটি অন্যটির অধীন। যেমন – ‘ ভালো খেলোয়াড়েরা সবসময় দলে খেলার সুযোগ পায়।’ এই বাক্যে ‘ ভালো খেলোয়াড়েরা ’ এমন এক গঠন যার দুটি উপাদান হলো ‘ ভালো’ ও ‘ খেলোয়াড়েরা’। তবে উপাদান দুটির মধ্যে ‘খেলোয়াড়েরা’ হলো প্রধান বা মুখ্য আর ‘ ভালো’ হলো অপ্রধান বা গৌণ। ‘ভালো’ শব্দটি ‘খেলোয়াড়েরা’ শব্দের অধীন । তাই ‘ ভালো খেলোয়াড়েরা ’ হল অধীনতা-জ্ঞাপক। এই সূত্রে অধীনতা-জ্ঞাপকের উপাদানগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায় – প্রধান ও অধীন। উল্লিখিত গঠনে ‘ ভালো ’ উপাদানটি হলো অধীন ,আর ‘ খেলোয়াড়েরা’ হল প্রধান। একটি রেখাচিত্রে বিষয়টিকে দেখানো যেতে পারে —



✧ গভীরতর ও উপরিতলের সংগঠন ✧

সাংগঠনিক মতবাদ অনুযায়ী বাক্যের যে একটি দৃশ্যমান সংগঠনের কথা বলা হয়েছে তা কখনই ভাষা পদ্ধতির গভীরতর অর্থকে প্রকাশ করতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য নোয়াম চমস্কি বাক্যের দুটি ব্যাকরণিক ধারণার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী প্রত্যেক বাক্যের জন্য দুটি তল থাকে। একটি হল উপরিতল (Sarface Structure) অর্থাৎ বাস্তবে যে সংগঠনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আরেকটি হল গভীরতল (Deep Structure) যেটি বিমূর্ত অর্থাৎ আপাতভাবে দেখা যায় না। বাক্যের

এই গভীরতল সংগঠন থেকেই পাঠক লেখকের অভিপ্রেত অর্থটি চিনে নিতে পারে।

বাক্যের উপরিতলগত সংগঠন আলাদা হলে গভীরতল সংগঠনটিও আলাদা হয়। তবে বাক্যের উপরিতল সংগঠন যাই হোক না কেন বাক্যেব ধারণাগত বা গভীরতল সংগঠনের সঙ্গে তা আপেক্ষিক। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে —

ক. গত বছর বন্যা হয়েছিল। ⟩ উপরিতল সংগঠন
খ. বন্যা হয়েছিল গতবছর।

√ ভূ (অতীতকাল) + বন্যা গত বছর — গভীরতল সংগঠন

আবার বিপরীত দিক থেকেও বিষয়টি লক্ষ করা যেতে পারে। অর্থাৎ উপরিতল সংগঠন অভিন্ন কিন্তু গভীরতল সংগঠন ভিন্ন। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট কবা যেতে পারে।

উপরিতল সংগঠন
রামকে খুশি করা/ব্যাগ্র কবা সহজ

গভীরতল সংগঠন	গভীরতল সংগঠন
বাম নিজে খুশি হয় এমন কিছু করা যে কারও পক্ষে সহজ	রাম নিজে কোন কিছুতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে এমনটি করা যে কারও পক্ষে সহজ

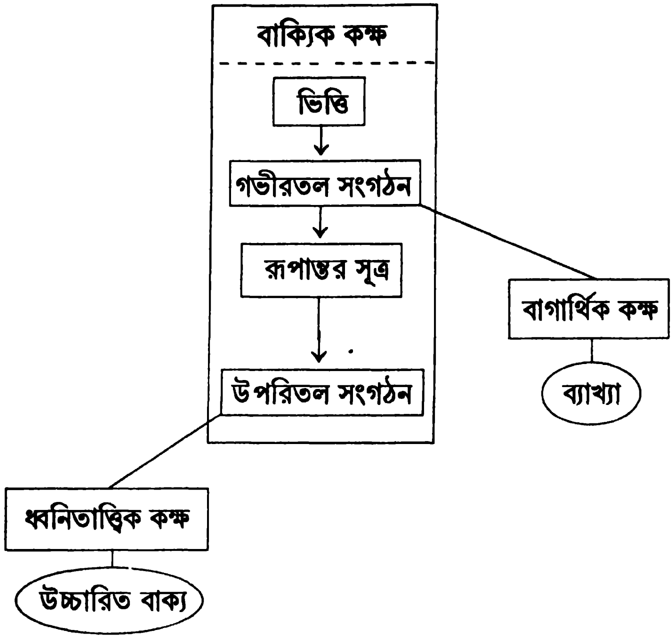
আসলে চমস্কি ভাষাবোধ ও ভাষা প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। এই দুটি তলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই একটি সম্পূর্ণ অর্থবোধক বাক্য গঠিত হয়। রূপান্তরমূলক উৎপাদনী ব্যাকরণে চমস্কি অবশ্য ভাষা বিশ্লেষণে ৩টি মৌলিক কক্ষের কথা বলেছেন। এগুলি হল —

(১) বাক্যিক কক্ষ।
(২) ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ।
(৩) বাগার্থিক কক্ষ।

একটার পর একটা কক্ষ অতিক্রম করে বাক্যের গভীরতর অর্থটিকে জেনে নিতে হয়। সচেতন পাঠকমাত্রই তা জেনে নেয়।

চমস্কির 'অ্যাসপেক্ট' অনুসরণে মহম্মদ দানীউল হক তাঁর 'ভাষাবিজ্ঞানের কথা'

গ্রন্থে একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন --



বাক্যের রূপান্তরে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন -- একটি বাক্য -- 'বাঘ মানুষ ধরে', আবার বাক্যটিকে রূপন্তরিত করলে -- মানুষ বাঘ ধরে। এই একই বাক্যকে আবার বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ কালরূপে আলাদা আলাদা উপরিতলে দেখানো যেতে পারে।

আপাতভাবে উল্লিখিত বাক্য দুটি উপরিতলের দিকে থেকে এক মনে হলেও গভীরতলের দিক থেকে আলাদা। একটিতে বাঘের ও অন্যটিতে মানুষের প্রাধান্য। সুতরাং চমস্কির ধারণা অনুযায়ী বাক্যের উপরিতল ও গভীরতল ধারণাটি আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

✧ রূপান্তর ও তার সূত্রাবলী ✧

✧ রূপান্তর :

সাংগঠনিক তত্ত্বের কিছু সমস্যা মীমাংসা করার লক্ষ্যে রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ভাষার বর্ণনা-বিবৃতির পরিবর্তে ভাষার উৎপাদনশীলতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হল। আসলে ভাষা নিত্য রূপান্তরিত হয় বলেই তা সক্রিয় থাকে। এর উপর ভিত্তি করে রূপান্তরের একটি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে-- রূপান্তর হল বাক্যের বিভিন্ন অবস্থা, যা একটি বাক্যকে বিভিন্নরূপে উপস্থাপিত করতে পারে।

উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন — বাঘ, মানুষ, ধরা এই তিনটি শব্দ দিয়ে আমরা একাধিক বাক্য তৈরি করতে পারি —

কর্তা-কর্মের অবস্থান পরিবর্তন করে রূপান্তরিত করলে —

ক. বাঘ মানুষ ধরে।

খ. মানুষ বাঘ ধরে।

কাল অনুযায়ী অবস্থান পরিবর্তন করে রূপান্তরিত করলে —

ভবিষ্যৎকালে —

গ. বাঘ মানুষ ধরবে।

ঘ. মানুষ বাঘ ধরবে।

অতীতকালে —

ঙ. বাঘ মানুষ ধরেছিল।

চ. মানুষ বাঘ ধবেছিল।

বাক্যের প্রকৃতি অনুসাবে রূপান্তরিত করলে —

প্রশ্নবোধকে -

ছ. বাঘ কি মানুষ ধরে ?

জ. মানুষ কি বাঘ ধরে ?

আবেগসূচকে --

ঞ. বাঘ মানুষ ধবে !

ট. মানুষ বাঘ ধরে !

এই একই বাক্যকে আমরা ভাষিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রূপে দেখাতে পারি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু সূক্ষ্ম পার্থক্য ঘটে যাচ্ছে । লক্ষ্যণীয় বাক্য জোড়াগুলির একই সঙ্গে উপরিতল ও গভীরতলের দিক থেকে আলাদা।

আপাতভাবে ক এবং খ বাক্য দুটি একই মনে হলেও অর্থগত তাৎপর্যের দিক থেকে আলাদা। কারণ ক বাক্যে বলা হচ্ছে — বাঘের দ্বারা মানুয ধৃত হয়; খ বাক্যে কর্তা-কর্মের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় অর্থ দাঁড়াচ্ছে — মানুষের দ্বারা বাঘ ধৃত হয়। কর্তা-কর্মের অবস্থান পরিবর্তন ঘটালেই যে এমন অর্থের পরিবর্তন সর্বদাই ঘটবে তা নয়। যেমন — আমি ভাত খাই। কর্তা-কর্মের অবস্থান পরিবর্তন করে লিখলে হবে ভাত আমি খাই। এক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটলেও পূর্বের মতো অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটছে না। কিন্তু সৃজনশীলতার লক্ষ্যে উপরিউক্ত বাক্যগুলির রূপান্তর ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে উল্লিখিত প্রতিজোড়া বাক্যে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা প্রয়োগের দিক থেকে আলাদা আলাদা তাৎপর্য বহন করে। যেমন — 'বাঘ মানুষ ধরে ! ', কিংম্বা — ' মানুষ বাঘ ধরে! ' — আবেগসূচক বাক্য দুটির উত্তরে 'হাঁ' কিংম্বা ' না' উত্তর নিয়ে বির্তর্ক হতেই পারে , তবে তা নির্ভর করে বক্তার প্রয়োগগত উদ্দেশ্যের উপর।

✧ রূপান্তরের সূত্রাবলী ঃ

প্রথাগত বা সাংগঠনিক ব্যাকরণে সন্ধি , সমাস , কারক ইত্যাদির যেমন সূত্র থাকে তেমনি রূপান্তরমূলক ব্যাকরণেও কতগুলি সূত্র থাকে। তবে এই সূত্রগুলি একটু আলাদা। সূত্রগুলিতে দুটি অংশ থাকে – একটি হল বিশ্লেষণ ও অন্যটি সংগঠনগত পরিবর্তন। মহম্মদ দানীউল হক সূত্রগুলিকে ভাষাপ্রক্রিয়ায় অত্যন্ত শক্তিশালী বলেছেন। রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের এই সূত্রগুলি – ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র , বাক্যিক সূত্র ও বাগার্থিক সূত্র। রূপান্তরের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আমাদেরকে বাক্যিক সূত্র নিয়ে আলোচনা করতে হয়। রূপান্তরের সুত্রকে সংক্ষেপে ' রূ-সূত্র' বলা হয়।

বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে পদগুচ্ছের অবস্থান এইরকম –

বাক্য = বিশেষ্যগুচ্ছ + ক্রিয়াগুচ্ছ ।
বিশেষ্যগুচ্ছ = নির্দেশক + বিশেষণ গুছ + বিশেষ্য
ক্রিয়াগুচ্ছ = বিশেষ্যগুচ্ছ + ক্রিয়া + সহায়ক

এই পদগুচ্ছের এই অবস্থানকে তিনটি সূত্রে সংক্ষেপে এইভাবে লেখা যায় –

সূত্র – ১ বা = বি.গুচ্ছ + ক্রি.গুচ্ছ ।
সূত্র – ২ বি.গুচ্ছ= নির্দেশক + বিণ গুছ + বি.
সূত্র – ৩ ত্রি.গুচ্ছ= বি.গুচ্ছ + ক্রি + সহায়ক

চমস্কি তাঁর 'সিন্ট্রা'-তে ঐচ্ছিক (optional) এবং বাধ্যতামূলক (oblitgatory) সূত্রের কথা বলেছেন। এছাড়া অন্যান্য সূত্রগুলি হল - পৌনঃপুনিক (recursive) , বিশ্বব্যপ্ত (global) , অপসারণ (movement) এবং পরিবর্তনীয় (variable)। এই সূত্রগুলি রূপান্তরে কীভাবে সাহায্য করছে তা দেখাতে হবে।

✧ বাক্যের আন্বয়িক সম্পর্ক ✧

✧ অন্বয় ঃ

বাক্যের মধ্যে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, প্রভৃতি পদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে অন্বয় বলে। অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত পদ সমূহের যথাক্রমের যে বিন্যাস থাকে সেটাই হল অন্বয়। তাছাড়া বাক্য গঠনের অর্ন্তগত উপাদানগুলির মধ্যে কাল, কারক, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ প্রভৃতি ব্যাকরণিক সংসর্গের দিক থেকে যে মিল থাকে, তাকে সঙ্গতি বা অন্বিতি বা অন্বয় বলে। একএকটা ভাষায় শব্দগুলি একটা নির্দিষ্ট বিন্যাস রীতিতে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করে ভাষাবোধের কাজ চালিয়ে যায়। প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বের জনক পাণিনি ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদের অন্বয়ের কথা বললেও আধুনিক বাক্যতত্ত্বে অন্বয়ের ধারণাটির ব্যাপকতা আছে।

✧ নোঙর এবং যোজক ✧

নোঙরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে তার বাঁপাশে প্রকাশ্য বা উহ্য একটা হাইফেন থাকে। অর্থাৎ বাক্যের শুরুতে সে বসে না। এমনিতে নোঙর অর্থাৎ দরকার মতো জাহাজের নীচে তাকে ফেলে তাকে প্রয়োজনে কাজে লাগানো। একটা বাক্যকে যদি জাহাজ ধরা হয় তাহলে সেই বাক্যে যে কোন পদের পরেই অব্যয়টিকে বসানো যায়। তাতে করে বাক্যের অর্থের তেমন একটা হেরফের ঘটে না। যেমন — ও-যে তোমার কাছে ফিরবে না তা তুমি জানতে। এখানে 'যে' নিপাতটি নোঙরের কাজ করেছে। আর দুটি খণ্ডবাক্যকে এক আন্বয়িক রেখায় আনতে যখন কোন অব্যয় বা নিপাত সাহায্য করে তাকে বলে যোজক। যোজকের কাজ দুই অঙ্গবাক্যকে যুক্ত করা, জোড়ের মাঝখানে বসে সে নিরবে কাজ করে যায়। যেমন -- তুমি একথা জানতে যে ও তোমাকে বিয়ে করবে না। এখানে 'যে' নিপাতটি জানা আর বিয়ে না করার মঝে বসে যোজক হিসাবে কাজ করেছে।

✧ নিপাত বা প্রকার্য শব্দ ✧

এটাই ছাত্রবেলা থেকে জেনে এসেছি যে বাংলা বাক্যের একটা পদ আছে তার নাম অব্যয় পদ। বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে তবে অর্থ নির্ধারণে গুরুত্বহীন। কারক-বচন-কাল-ভাব-বাচ্য ইত্যাদি ভেদে এই জাতীয় পদের কোন রূপান্তরও হয় না। পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে একে বলেছেন 'নিপাত'। অর্থাৎ বাক্যের পাতে পড়ুক আর না পড়ুক তেমন কোন জায় আসে না। এই নিপাতকেই প্রকার্য শব্দ বলা হচ্ছে। বাংলায় এই ধরনের শব্দ ও শব্দগুচ্ছ গুলো — তো, যে, কি, বলে, বলছিলাম, বলছি কি ইত্যাদি। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন এই জাতীয় শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ না থাকলেও কিন্তু এগুলি শব্দ হিসাবে যখন বাক্যে প্রযুক্ত হয় তখন তার অর্থ নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমন — আমি যে জলসাঘরের বেলোয়ারী ঝাড়। মান্না দের গাওয়া গানের কথা ভাবলেই এই 'যে' নিপাতের গুরুত্ব বোঝা যায়।

নিপাত নিয়ে মৌলিক গবেষণা যাঁরা করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে অরুণ ঘোষ এবং প্রবাল দাশগুপ্ত অন্যতম। অরুণ ঘোষ মহাশয় অবশ্যই এর পথিকৃৎ। 'বাংলা নিপাত "তো" ' নিয়ে তিনি সর্ব প্রথম 'ভাষা' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম প্রকাশ সংখ্যায় একটি অসাধারণ নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁকে অনুসরণ করেই প্রবাল দাশগুপ্ত লিখেছেন "বাঙলা অব্যয় 'যে' "।

✧ নিপাত তো ঃ

তবে শব্দ থেকেই 'তো' -এর উৎপত্তি হয়েছে। 'তো' এর নিজস্ব কোন অর্থ নেই। 'তবে' শব্দটির অর্থ দুটি — কালবচক, কারণবাচক। বাংলা পদ সংগঠনে নিপাত

তো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তো-এর দু'ধরণের প্রয়োগ দেখিয়েছেন — একটি তবু অর্থে আর একটি ভর্ৎসনা বা বিস্ময়ের অর্থে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও দুরকম প্রয়োগ দেখিয়েছেন — একটি হল প্রতিপক্ষিক অন্যটি অবধারণ। ই. এম. বিকোরা শুধুমাত্র অবধারণিক প্রয়োগই দেখিয়েছেন। পুণ্যশ্লোক রায় -এর মতে 'তো' সন্দেহের উদ্রেক করে বা নিরসন করে। তো নিপাতকে বলা হচ্ছে barrel word (শূন্যশব্দ)।

তো১ — গুরুত্বসূচক

'তো' একটা শূন্য শব্দ

১. আমি তো যাব।

২. আমি তো যাব।

৩. আমি যাব তো।

'তো' বিভিন্ন জায়গায় বসাচ্ছি বলে বাক্যের সূক্ষ্ম একটা অর্থ পরিবর্তন হচ্ছে। উহ্য অথবা প্রসঙ্গে 'তো' একটা লেজুড় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. বাক্যের কোন একটা অংশের উপর জোর দেওয়া 'তো' সেইক্ষেত্রে নোঙরের (Focus) কাজ করছে।

খ. যেহেতু এটা নোঙর বাক্যের যে কোন অংশের যে কোন পদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

গ. পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

ঘ. এর কাজটা কখনো নোঙর, কখনও যোজক হতে পারে। এক্ষেত্রে নোঙর।

ঙ. একাধিক বাক্যকে সংযুক্ত করা যোজকের বৈশিষ্ট্য।

৪. যাও তো এনো

৫. যদি যাও তো আনবে যোজক / প্রাতিপাক্ষিক

৬. গেলে তো আনব

দুটি বাক্যের মঝে 'তো' বসছে

যাও তো এনো

প্রক্রম অনুক্রম

প্রক্রম— আরোপিত শর্ত (যদি তুমি যাও) আগে বসে

অনুক্রম — বাস্তবিক চেহারা বাক্যের পরে বসে (এনো)

'গেলে' র সঙ্গে 'তো' ব্যবহার করলে নঞর্থক ব্যাপার ঘটবে। গেলে আনবো -- সদর্থক, গেলে তো আনব — নঞর্থক।

বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. নোঙর যে কোন জায়গায় বসতে পারে।

তো আমি এখন যাব

খ. 'তো' এর একটা স্পষ্ট অথবা উহ্য একটা প্রসঙ্গ থাকবে।

তেমনিভাবে – যোজকের ক্ষেত্রে দুটি বাক্যের মধ্যবর্তী বসে –

৭. যাও এনো তো

'তো$_৩$ এনো তো – অনুজ্ঞা সূচক

তো$_১$ – গুরুত্বসূচক

তো$_২$ – যোজক রূপে কাজ করে

তো$_৩$ – অনুজ্ঞাসূচক

অনুজ্ঞাভাবের পরে 'তো' ব্যবহৃত হয় । অনুজ্ঞার মধ্যেও একটা সন্নিকর্ষের মাত্রা আছে। বক্তার সঙ্গে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পাচ্ছে ।

এনো তো – ঘনিষ্ঠতা আছে (ii) তো নোঙর$_২$

এনো – আদেশ

৮. – তো আমি যাব (এর আগে একটি উহ্য প্রসঙ্গ আছে)

৯. – তো ?

বাক্যের প্রথমেই যদি তো ব্যবহৃত হয় উহ্য প্রতিবেশের সঙ্গে স্পষ্ট প্রতিবেশের যোগসূত্র রচনা করেছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. নোঙর তো$_১$ বাক্যেব যে কোন অংশে বসে।

খ. নোঙর তো$_২$ শুধুমাত্র অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়ার শেষে বসে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সন্নিকর্ষ মাত্র।

গ. প্রক্রম এবং অনক্রমের মাঝে বসে এবং সেটি শর্তবাচক সীমাবদ্ধ 'যোজক তো' গেলে ।

ঘ. 'ইলে' শর্তবাচক প্রযুক্ত তো নঞর্থক অর্থ বহন করে।

'তো' একাধিকবার বসতে পারে কি ?

১০. আমি তো এখন তো যাব তো

একাধিক 'তো' ব্যবহৃত হয় না। point of view এর প্রকাশ করতে হলে একাধিক Focus ব্যবহৃত হয় না।

১১. যদি সে ভালোবাসে তো আমি তো ভালোবাসবো (অসম্ভব বাক্য)

যোজক তো, নোঙর তো একইসঙ্গে বাক্যে প্রযুক্ত হতে পারে।

যদি সে ভালোবাসে তো আমি ভালোবাসবো শর্তবাক্যের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা জ্ঞাপনের কোন প্রশ্ন নেই।

প্রকৃত প্রশ্নবাক্যে নোঙর তো$_১$তা বসতে পারে না।

১২. তোমার নাম কী ? প্রকৃত প্রশ্ন

১৩. তোমার নাম তো ? (অসম্ভব বাক্য)

কিন্তু যোজক বসতে পারে প্রকৃত প্রশ্নে

১৪. যদি যাও তো কি হবে ?

প্রকৃত প্রশ্নে যোজকের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নেই। যোজক লগ্ন প্রশ্নে ব্যবহৃত হতে পারে। কোন অধীনস্থ বাক্যে নোঙর তো ব্যবহৃত হতে পারে না।

১৫. আমি ভেবেছিলুম অঞ্জন তো সিগারেট খায়।

প্রধান বাক্যে 'তো' হতে পারে– আমি তো ভেবেছিলুম।

বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. শূন্য শর্তবাক্য – যাও তো এনো।

খ. ইলে শর্তবাক্যের ক্ষেত্রে যোজক আলাদা – সে খাওয়ালে তো আমি তো খাবই।

গ. যদি শর্তবাক্যে 'তো' ব্যবহার করতেও পারি নাও পারি – যদি সে যায় তো আমি যাব, যদি সে যায় তো যাব।

প্রচলিত ব্যাকরণ ও অভিধান অনুযায়ী, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত, এবং ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা তো-এর প্রয়োগ লক্ষ করে এব প্রয়োগকে অরুণ ঘোষ এইভাবে সূত্রায়িত করেছেন –

ক. নিশ্চয়তাজ্ঞাপক (Emphatic) ঃ রহিম তো বললো তো।

খ. প্রাতিপক্ষিক (Adversative) ঃ বেশি খেলে তো বমি করবো।

গ. অনুজ্ঞসূচক (Requestative) ঃ বলো তো তোমার নাম কী ?

এই ধরণের 'তো' নিপাত যুক্ত অনেক বাক্যের উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। সাধারণভাবে বাংলা ভাষিক পরিবেশে এগুলির ব্যবহার হয়।

✧ নিপাত 'যে' ঃ নোঙর ও যোজক ✧

অরুণ ঘোষের 'নিপাত তো'-কে মডেল ধরে নিপাত 'যে' নিয়ে প্রবাল দাশগুপ্ত আলোচনা করেছেন। বাংলা বাক্যে 'যে' কিভাবে নোঙর ও যোজকের কাজ করছে তা তিনি দেখিয়েছেন। এই নিপাতের প্রয়োগ পরিবার জীবনে ,পথে-ঘাটে প্রায়ই শোনা যায়। যেমন – ' এই যে শোনো', 'এই যে কোথায় যাওয়া হচ্ছে'। বাক্যে 'যে' নোঙর অর্থাৎ দরকার মতো জাহাজের নীচে ফেলার মতোই বাকের মধ্যে একে ফেলা হচ্ছে। একটা বাক্যকে যদি জাহাজ ধরা হয় তাহলে সেই বাক্যে যে কোন পদের পরেই অব্যয়টিকে বসানো যায়। তাতে করে বাক্যের অর্থের তেমন একটা হেরফের ঘটে না। যেমন– ও যে আসবে না একথা আমি জানতাম। এই বাক্যে 'যে' হল নোঙর। বিভিন্নভাবে এই নোঙরের অবস্থানটিকে লক্ষ করা যেতে পারে –

১. আশা যে ব্যাগটা খুজতে এ ঘরে আসবে ভাবিনি।

২. আশা ব্যাগটা যে খুজতে এ ঘরে আসবে ভাবিনি।

৩. আশা ব্যাগটা খুজতে যে এ ঘরে আসবে ভাবিনি।

৪. আশা ব্যাগটা খুজতে এ ঘরে যে আসবে ভাবিনি।

৫. আশা ব্যাগটা খুজতে এ ঘরে আসবে যে ভাবিনি।

৬. আশা ব্যাগটা খুজতে এ ঘরে আসবে ভাবিনি যে।

উল্লিখিত ছয়টি বাক্যে লক্ষ করা যাচ্ছে যে পদের আগে 'যে' বসছে সে পদের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যাচ্ছে। প্রবাল দাশগুপ্তের মতে – 'নোঙরের অন্যতম ধর্ম তাঁর বাঁ পাশে প্রকাশ্য বা উহ্য একটা হাইফেন (-) থাকবে। বাক্যের শুরুতে বসলে এটা করা চলে না তাই নোঙর বাক্যের গোড়ায় বসে না।'

যোজকের কাজ যুক্ত করা। যাদেরকে সে যুক্ত করে বা জোড়া দেয় তাদের মাঝখানেই সে বসে। এক্ষেত্রে দুই পদের মাঝখানে যাকে বসানো হচ্ছে সে হল অব্যয়। 'যে' নিপাত এই কাজটি করে । শুধু পদ নয় 'যে' নিপাত দুই অঙ্গে বাক্যকেও যুক্ত করে। যেমন —আমি একথা জানতাম যে ও আসবে না। এই বাক্যে 'যে' হল যোজক এটি ব্যবহারের ফলে একটি অঙ্গবাক্য আর একটি অঙ্গবাক্যের মধ্যে হারিয়ে যায় নি। আবার যদি বলা হয় যদিও বলা হয় – আমি একথা যে ও আসবে না জানতাম। এই বাক্যে 'যে' কে দিয়ে অ-যোজকের কাজ করানো হয়েছে বলে বাক্যটি দাঁড়াতে পারে নি। আসলে যোজকের কাজ হল দুটি অঙ্গবাক্যকে জুড়ে দিয়ে অর্থ প্রকাশ করা।

✧ সংহতি এবং সংযোগ ✧

বাংলা বাক্য গঠনে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী কর্তা - কর্ম - ক্রিয়ার একটা আন্বয়িক সম্পর্ক থাকে। যেমন 'আমি ভাত খাই'। আমি কর্তা, ভাত কর্ম, খাই ক্রিয়া পদগুলি পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত তাদের মধ্যে সংহতি না থাকলে অর্থের প্রকাশ ঘটবে না। যেমন 'আমি' কর্তার সঙ্গে 'খাই' ক্রিয়া পদের সংহতি আছে। যদি কর্তা 'সে' হত তাহলে ক্রিয়া পদ হত 'খায়', অর্থাৎ 'সে' ও 'খায়' সংহতি যুক্ত।

কতকগুলি বাক্যে কর্ম ও ক্রিয়াকে এক রেখে কর্তা পদের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলে যে জোটসঙ্গী লক্ষ করা যায় তার মধ্যে যে সম্পর্ক লুকিয়ে থাকে তাকেই বলে সংযোগ। যেমন–

১. **রাম** ভাত খায় ।

২. **সে** ভাত খায়।

৩. **তারা** ভাত খায়।

৪. **সীতা** ভাত খায়।

৫. **সেলিম** ভাত খায়।

৬. **রেজিনা** ভাত খায়।

বাক্যগুলিতে রাম, সে, তারা, সীতা, সেলিম, রেজিনা এরা–জোট সম্পর্ক রক্ষা

করছে। এদের একই রকমের অধিকার। এরা প্রত্যেকেই ভাত খাওয়া এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এখানে বচন, পুরুষ, লিঙ্গের কোন গুরুত্ব নেই। ভিন্ন কর্তা অনুয়ায়ী ভিন্ন বাক্য হলেও এরা একটা পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা করেছে।

✧ আশ্রয়দাতা বাক্য ও আশ্রিতবাক্য ✧

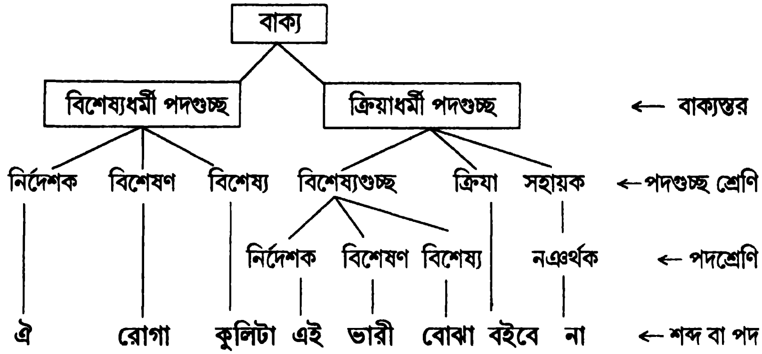
একটা অঙ্গবাক্য জাহাজের মতো। তাকে বলা যায় আশ্রিত। সে নোঙর ফেলে সমুদ্রতুল্য আর এক অঙ্গবাক্যে আশ্রয় নেয়। যে অঙ্গবাক্যে আশ্রয় নিলো তাকে বলে আশ্রয়দাতা অঙ্গবাক্য আর যে আশ্রয় নিচ্ছে তাকে বলে আশ্রিত অঙ্গবাক্য। যেমন — 'ও যে আসবে না আমি এ খবরটা কাউকেই জানাই নি।' এই বাক্যে 'আমি এ খবরটা কাউকেই জানাই নি' হল আশ্রয়দাতা অঙ্গবাক্য এবং 'ও আসবে না' হল আশ্রিত অঙ্গ বাক্য ; 'যে' হল নোঙর । অঙ্গবাক্যটির সম্পর্ক স্থাপক পদ হল 'যে' । এই 'যে' কে বলা হয় আশ্রয়িক।

✧ মূলবাক্য ও অধীনস্থ বাক্য ✧

'যে' 'বলে' ইত্যাদি যোজক এনে মূলবাক্যের মাঝেই অধীনস্থ বাক্যের সংযোগ ঘটে। যেমন — আমি (ছেলে পড়বে বলে) মনে করি। 'আমি মনে করি' এই মূলবাক্যের মাঝে অধীনস্থ বাক্য 'ছেলে পড়বে' ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিংবা সে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে অধীনস্থ বাক্য (সে আসবে) আগে আছে, পরে আছে মূল বাক্য 'আমার বিশ্বাস'। 'বলে'প্রকার্যটি অধীনস্থ বাক্যের পরে বসেছে। 'বলে' অব্যয় প্রযোগ একটা অনিশ্চয়তা থেকেই যায়।

✧ পদগুচ্ছের সংগঠন ✧

বাংলায় পদগুচ্ছের সংগঠন নিয়ে উদয়কুমার চক্রবর্তী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। নোয়াম্ চমস্কির বক্তব্য অনুসারে একটি বাক্য আসলে কতকগুলি পদের সমবায়ে গঠিত। বাক্যের এই গঠনকে পদগুচ্ছের সংগঠন বলে। এই সূত্রের মধ্যেই বাক্যের আন্বয়িক গঠনটি ধরা পড়ে । এই গঠনটি ক্রমোচ্চস্তরভিত্তিক অর্থাৎ একদম নিচুস্তরে শব্দ ও বিভক্তিগুলি অবস্থান তার ওপরে পদশ্রেণি যেমন বিশেষ্য, ক্রিয়া ইত্যাদি। তার উপরের স্তরে থাকে পদগুচ্ছ শ্রেণি যেমন বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ এবং ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ এবং সর্বোচ্চ স্তরে আছে বাক্য। এই সংগঠনকে বৃক্ষচিত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আসলে গাছ যেমন মূল কান্ড থেকে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে যায় তেমনি বাক্যের গঠনের ক্ষেত্রেও এই মূল কান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা দেখা যায়। চমস্কি নির্দেশিত পদগুচ্ছের সংগঠনটি উদয়বাবু অনাযায়ী বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে এইরকম —



মনে রাখতে হবে –

১. বাংলা বাক্যে সহায়কটি কোন গুরুত্বপূর্ণ গঠন নয়। তাই একে ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছের মধ্যেই রাখা সঙ্গত। যদিও চমস্কি এটিকে আলাদা বাক্যস্তর ধরেছেন ।

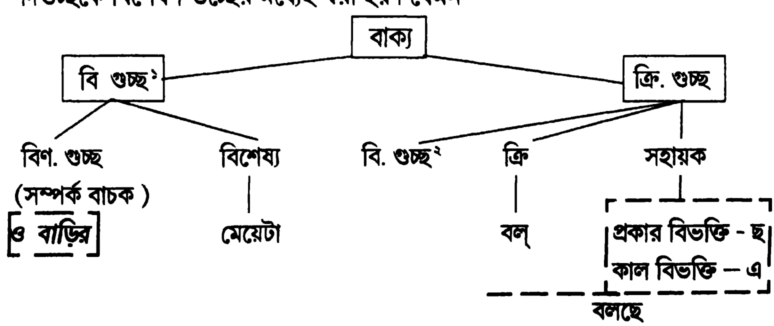
২. বাংলা বাক্যের আদর্শ গঠনে বিশেষ্যগুচ্ছ বাক্যের শেষে বসে না। বসে ক্রিয়ার আগে। যেমন – সে ভাত খায় ।

যেধরনের পদ বা শব্দগুলি বাক্যে বসে সেগুলি হলো – বিশেষ্যগুচ্ছের ক্ষেত্রে ঃ প্রতিনির্দেশক = যে-সে, যিনি-তিনি, যাঁর-তাঁর ; বিশেষণ = খারাপ, চালক, মোটা ইত্যাদি ; বিশেষ্য = মানুষ ,বই ইত্যাদি। আর ক্রিয়াগুচ্ছের ক্ষেত্রে ঃ ক্রিয়া = যা, চল দেখ ইত্যাদি; সহায়ক = কাল বিভক্তি বো, ইল ইত্যাদি ; বিভিন্ন প্রকার বিভক্তি যেমন- -এছ, -ছ ইত্যাদি; পুরুষ বাচক বিভক্তি বা পক্ষ বিভক্তি যেমন- -ই, -ও, -এস ইত্যাদি ; নঞর্থক – না, নয় ইত্যাদি ; প্রশ্নবোধক – কে, কি ইত্যাদি।

✧ বাংলা পদগুচ্ছের শ্রেণি ঃ

মোট ছয় রকমের পদগুচ্ছ বাংলা ভাষায় হতে পারে –

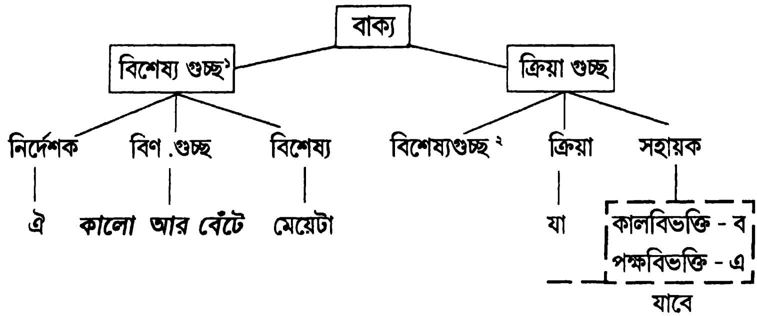
১. **সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছ ঃ** বাক্যে বিশেষণের কাজ করে তাই সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছকে বিশেষণ গুচ্ছের মধ্যেই ধরা হয়। যেমন –



এখানে সম্পর্কবাচক পদগুচ্ছ হল — ও বাড়ির।

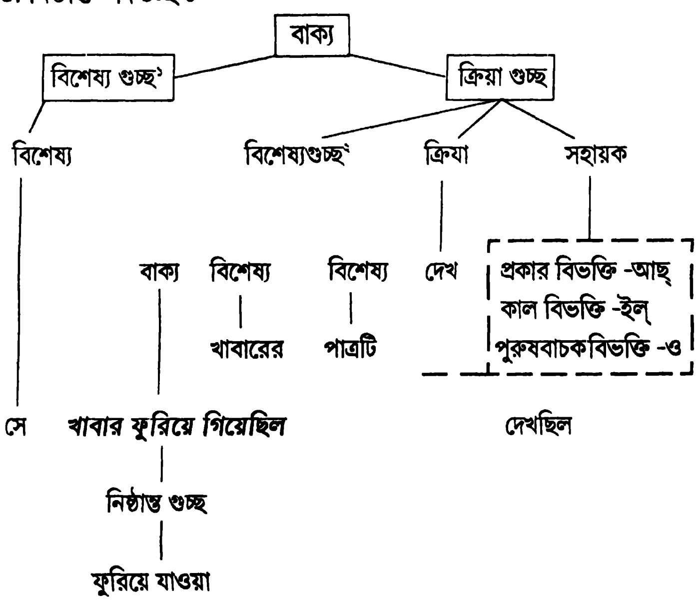
২. বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ ঃ — কর্তা ও কর্ম উভয় স্থানেই বসে। বিশেষ্যগুচ্ছের মধ্যে সম্পর্কগুচ্ছ ও বিশেষণ গুচ্ছ সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকতে পারে। উপরের উদাহরণে 'ও বাড়ির মেয়েটা' বিশেষ্যগুচ্ছ।

৩. বিশেষণধর্মী পদগুচ্ছ ঃ — সম্পর্কগুচ্ছ, নিষ্ঠান্তগুচ্ছ ও ক্রিয়া বিশেষণ গুচ্ছ বিশেষণের মতো কাজ করে বলে এদের বিশেষণের বা বিশেষণগুচ্ছের মধ্যে ধরা হয়। এই পদগুচ্ছগুলি বিশেষ্য পদকে বিশেষিত করে। যেমন —



এখানে বিশেষণধর্মী পদগুচ্ছ হল - কালো আর বেঁটে। বিশেষণ গুচ্ছ এখানে বিশেষ্য গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত।

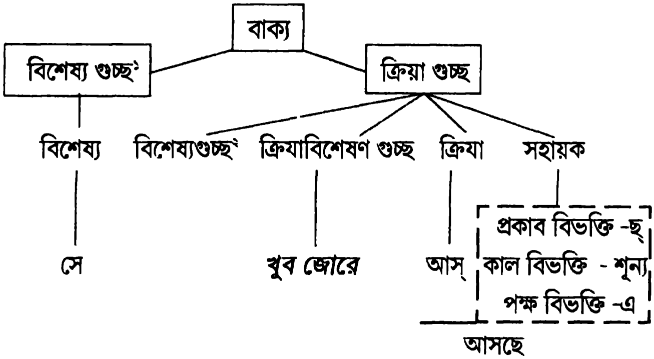
৪. নিষ্ঠান্ত পদগুচ্ছ ঃ —



উদাহরণ দেওয়া বাক্যটি হল — সে ফুরিয়ে যাওয়া খাবারের পাত্রটি দেখছিল।

এই বাক্যে নিষ্ঠান্ত গুচ্ছ হল ‘ খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল ’।

৫. **ক্রিয়া-বিশেষণ গুচ্ছ ঃ** — এক্ষেত্রে ক্রিয়া বা বিশেষণকে পদ বা পদগুচ্ছ বিশেষিত করে । যেমন —



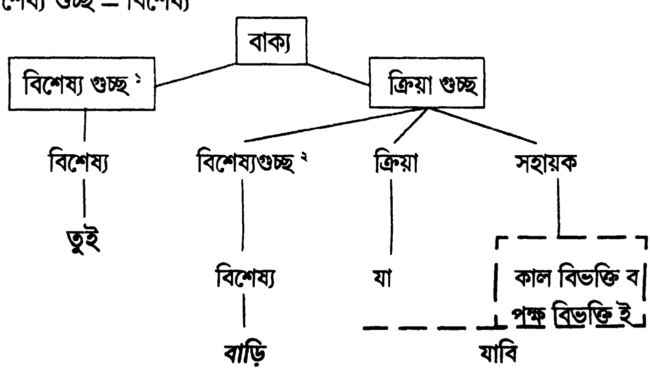
এখানে ‘সে খুব জোরে আসছে।’ বাক্যটিতে , ‘খুব জোরে’ হল ক্রিয়া-বিশেষণ গুচ্ছ।

৬. **ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ ঃ** — নিষ্ঠান্ত গুচ্ছ ও ক্রিয়া বিশেষণ গুচ্ছ ক্রিয়া গুচ্ছের মধ্যেই থাকে। বিশেষ্য গুচ্ছ ক্রিয়া এবং সহায়ক মিশে ক্রিয়া গুচ্ছ গঠিত হয়।

✧ বিশেষ্যগুচ্ছের প্রকার ঃ

ছয় প্রকার পদগুচ্ছ যে দুটি প্রধান পদগুচ্ছের অধীন সেদুটি হল বিশেষ্যগুচ্ছ এবং ক্রিয়াগুচ্ছ । বাংলা ভাষায় নানা প্রকারের বিশেষ্যগুচ্ছ পাওয়া যায়। উদয় চক্রবর্তীর সূত্র অনুযায়ী বিশেষ্যগুচ্ছ — {(প্রতিনির্দেশক) (বিশেষণ) (বিশেষ্য) (সংযোজক) (সম্বোধক) (বিশেষ্য বাক্য)} । এখান থেকেই বিশেষ্যগুচ্ছের বিভিন্ন প্রকার গঠনগুলি পাওয়া যায় —

১. বিশেষ্য গুচ্ছ = বিশেষ্য



তুই বাড়ি যাবি — এই বাক্যে বিশেষ্য হল ‘বাড়ি’, যেটি দ্বিতীয় বিশেষ্যগুচ্ছে অবস্থিত।

২. বিশেষ্য গুচ্ছ = বিশেষ্য + সম্বন্ধক + বিশেষ্য । যেমন — রামের দাদা মিতার বাড়িতে ছিল। এখানে বিশেষ্য হল - 'রাম' , 'দাদা' ; সম্বন্ধক হল - এর (রাম + এর); বিশেষ্য হল 'মিতা'। বাক্যের গঠনে এটিকে দেখানো যায়।

৩. বিশেষ্য গুচ্ছ = বিশেষ্য + সংযোজক + বিশেষ্য । যেমন — স্বপন , ইরফান, সুধীর এবং প্রতাপ ক্রিকেট আর ফুটবল খেলে। এখানে বিশেষ্য হল - 'স্বপন' , 'ইরফান', 'সুধীর' এবং 'প্রতাপ'; সংযোজক হল - এবং ; বিশেষ্য হল 'ক্রিকেট' ,'ফুটবল'।

৪. বিশেষ্য গুচ্ছ = বিশেষণ + বিশেষ্য । যেমন — ভালো ছেলেটা পাশ করেছে। এখানে বিশেষ্য হল - 'ছেলেটা' আর বিশেষণ হল ' ভালো'।

৫. বিশেষ্য গুচ্ছ = প্রতিনির্দেশক+ বিশেষ্য । এখানে প্রতিনির্দেশক দুই প্রকার - - পূর্বনির্দেশ ও পরনির্দেশক। যেমন — যে ইরফান সে তিনটে উইকেট নিয়েছে। এই বাক্যে 'যে' পূর্বনির্দেশ এবং ' সে' পরনির্দেশক ; আর বিশেষ্য হল 'ইরফান'।

৬. বিশেষ্য গুচ্ছ = বাক্য + বিশেষ্য । যেমন — মেয়েটা গতকাল পার্কে বসেছিল সেইই আত্মঘাতিনী । এই বাক্যে ' মেয়েটা গতকাল পার্কে বসেছিল' হল বাক্য ; বিশেষ্য হল ' আত্মঘাতিনী'।

৭. বিশেষ্য গুচ্ছ = বাক্য + বিশেষ্য + বাক্য। এই ধরণের বিশেষ্যগুচ্ছের গঠন দেখাতে গিয়ে উদয়বাবু এই উদাহরণটি দিয়েছেন — উড়ে এসে জুড়ে বসা লোকটা যে গতকাল এখানে এসে বসেছিল। এই বাক্যে 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' একটি বিশেষ বাক্য, 'লোকটা' হল বিশেষ্য আর 'যে গতকাল এখানে এসে বসেছিল' একটি সম্পূরক বাক্য।

✧ ক্রিয়াগুচ্ছের প্রকার ঃ

বাক্যের প্রধান পদগুচ্ছের একটি হল ক্রিয়াগুচ্ছ। ক্রিয়া আর বিশেষ্য গুচ্ছ মিলে তৈরি হয় ক্রিয়াগুচ্ছ । বাংলা বাক্যে ক্রিয়ার আগে বসে বিশেষ্যগুচ্ছ । ক্রিয়াগুচ্ছতে সহায়ক যুক্ত হলে বাংলা ক্রিয়াগুচ্ছের গঠন এইরকম —

ক্রিয়াগুচ্ছ = বিশেষ্যগুচ্ছ ² + ক্রিয়া + সহায়ক ।

এই সূত্র থেকেই ক্রিয়াগুচ্ছের বিভিন্ন প্রকার গঠন পাওয়া যাবে।

১. সাধারণভাবে বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ এবং ক্রিয়া ও সহায়ক যুক্ত হয়ে ক্রিয়াগুচ্ছ গঠন করে । যেমন — আমি ঘরে যাব , সে এখানে এসেছিল ইত্যাদি। এই বাক্য দুটিতে 'ঘরে যাব' বা 'এখানে এসেছিল' অংশদুটি ক্রিয়াগুচ্ছ। আর বিশেষ্যগুচ্ছ হল 'ঘরে', 'এখানে', 'যা' প্রভৃতি । ক্রিয়া আর সহায়ক হল প্রকার বিভক্তি । যথা — কালবিভক্তি, পুরুষ বিভক্তি ইত্যাদি।

২. এমন বাক্যও হতে পারে যেখানে পদগুচ্ছে বিশেষ্যগুচ্ছ নেই কেবল ক্রিয়াগুচ্ছ। যেমন — ক্রিয়া + সহায়ক — সে কাঁদছে ।

৩. দুটি বাক্য যুক্ত হয়ে ক্রিয়াগুচ্ছ মিশ্র ক্রিয়াগুচ্ছে পরিণত হতে পারে । যেমন -

ক. সে স্কুলে যাবে

খ. সে বই পড়বে।

মিশ্রক্রিয়াগুচ্ছে বাক্যটি হবে – সে স্কুলে গিয়ে বই পড়বে। ক. বাক্যটির সমাপিকা ক্রিয়া 'যাবে ' কে অসমাপিকাক্রিয়াতে পরিণত করে পরবর্তী খ. বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। এভাবে দুটি বাক্য মিলে তৈরি হয়েছে আশ্রয়ধর্মী বাক্য।

✧ বাক্য গঠনে শৈলীবিজ্ঞানের ভূমিকা ✧

ইংরাজি ভাষায় ১৮৬০ খ্রিঃ 'Stylistik' শব্দটি সাহিত্য শৈলীবিজ্ঞান (The science of literary style) অর্থে বিশেষ্য-বিশেষণে অভিন্নরূপ নিয়ে প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রচনার রূপ ও ভাবব্যঞ্জক অর্থে Stylistique শব্দটি ফরাসি সাহিত্যের অভিধানে স্থান পায় ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে। আর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে থেকে ইংরাজিতে 'stylistics' শব্দটির প্রয়োগ শুরু হয়। সাহিত্যিক শৈলীর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণকে ফরাসিরা বলেন La-stylistrke এবং জার্মানরা বলেন 'Die-Stylestik'. ল্যাটিন 'স্টাইলাস' থেকে স্টাইল এবং স্টাইলিস্‌টিকস্‌ শব্দ এসেছে। স্টাইলাস শব্দের মূল অর্থ একপ্রকার লেখনদণ্ড।

Style শব্দটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত। পোষাক পরিচ্ছদ, চুল ছাঁটা, লেখাপড়ায়, চলনে-বলনে, খেলাধূলায়, এক কথায় আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে শব্দটি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তবে Style শব্দের প্রচলিত শব্দ রীতি। রীতির বুৎপত্তি-- রী+ তি এবং অর্থ যথাক্রমে ধরণ, প্রণালী, পদ্ধতি, আচরণ ইত্যাদি। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা প্রাকৃত ও অপভ্রংশে গৌড়ী, পাঞ্চালী, লাটি, বৈদর্ভী নামে যে রীতিগত পরিচয় দিয়ে থাকেন, তা ভাষার বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা অঞ্চলগত, স্থানীয় নামের সঙ্গেই বেশি সম্পর্কিত । ভারতীয় আলংকারিক বামন আচার্য রীতির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন – 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। কিন্তু সংস্কৃত রীতিই হচ্ছে স্বীকৃত শিল্পগুণে গড়ে ওঠা বহিরঙ্গগত রচনা পদ্ধতি। যা একান্তভাবে বস্তুগত। অপরদিকে style হচ্ছে ব্যক্তি সত্তার প্রতিফলন। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার-এর মতে স্টাইল হচ্ছে মানুষের মনের ভাবাশ্রয়ী বহিঃপ্রকাশ। সেই জন্যই আধুনিককালে শৈলীবিজ্ঞান এর আলোচনার অনেকক্ষেত্রেই লেখকের রীতি ও তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে সম্বন্ধ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়। অতএব প্রচলিত রীতি অর্থে style বা Stylestics এর বিচারসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে Style ও Stylestics হল Language ও Linguestics এর মত ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়।

'শৈলী' একটা এমন আপেক্ষিক সম্বন্ধবাহক শব্দ যা একজন ব্যক্তি বা লেখকের আচরণ বা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে অন্যদের তুলনায় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলে।

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে শৈলী সাহায্য করে। শৈলী হল লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। লেখক বা বক্তার মনন, চিন্তন এবং অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তার প্রকাশই হল শৈলী। লেখকের যে ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে সেই ব্যক্তিত্ব যদি স্বাতন্ত্র্য না হয় অর্থাৎ গতানুগতিক ব্যক্তিত্বের থেকে যদি আলাদা হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে যে প্রকাশভঙ্গী তাকেই বলে শৈলী।

শৈলী হল রচনারীতি বা রচনা কৌশল। ইংরাজিতে যাকে Style বলে তাকেই বাংলায় শৈলী বলা হয়। 'শীল' বলতে বোঝায় সদবৃত্ত, আত্মগুণ বা স্বভাব। আবার 'শীল' শব্দ উপধারণ শব্দকেও বোঝায়। কিন্তু শৈলী হল রচনারীতির ভিন্ন নাম। সুতরাং শৈলী বলতে সেই পদ্ধতির বা ব্যবহার ক্রমকেই বোঝায় যার দ্বারা কোন রচনা গুণান্বিত হয়ে ওঠে। কোন রচনার প্রকৃতি বা স্বভাবগুণকেই শৈলী বা রীতি বলা হয়। মনিয়র উইলিয়াম শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন –

> " . . . habit, custom, manner of action or living, practice, usage; a special of particular interpretation (esr. a concise explanation of a grammatical aphorism)."

শৈলী বা রীতি বিজ্ঞান হল, বিজ্ঞান সম্মত এমন একটি বিশ্লেষণ পদ্ধতি, যেখানে কোন রচনার শৈলী বা রীতিকেতুলে ধরা হয়। শৈলী (Style) সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে–

1. Style is the man himself.
2. Style is the image of character.
3. Style is the flesh, bone and blood of the writer.
4. Style consists in adding to a given thought all the circumstances calculated to produce the whole effect that the thought ought to produce.

ফরাসি ধারণা অনুযায়ী শৈলী হল সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। লেখকের বা বক্তার মনন, চিন্তন, অনুভাবের যে নিজস্ব রীতি তারই প্রকাশ হচ্ছে শৈলী। এখন লেখকের এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমাজ প্রচলিত ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতা যদি না থাকে, যদি তাঁর প্রকাশ রীতিটি তাঁর গতানুগতিক ব্যক্তিত্বের অভিবক্তি হয়, তবে তাতে ব্যতিক্রমী প্রকাশভঙ্গী না থাকতে পারে বা কম থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যকরণের নিয়মানুগত ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীই তাঁর শৈলী।

লেখকের ব্যক্তিগত পছন্দের উপরভিত্তি করে রীতি বা শৈলীর স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়। একজন লেখক কোন্ বিষয়কে তাঁর রচনায় প্রধান্য দেবেন অথবা কেমনভাবে লিখবেন তা তাঁর নিজস্ব প্রবণতা ও পছন্দের ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনার মধ্যে হাস্যরসের একটা ছাপ পাওয়া যায়।

প্রাচ্য ধারণা অনুযায়ী রীতি বিজ্ঞান কোন রচনার বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থকে বিশ্লেষণ করে শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যকে দেখিয়ে দেয়। অর্থাৎ বাচার্থকে অবলম্বন করে শব্দের অর্থ লক্ষণায় পৌঁছায়। যেমন অঙ্কে 'মাথা' নেই বললে লক্ষণার্থে 'বুদ্ধি' কে বোঝায় অর্থাৎ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌রা মূলত শব্দ প্রয়োগের বিষয়টিকে রীতি আখ্যা দিয়েছেন। সেখানে লেখকের মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাছাড়া রীতি বিজ্ঞান ভাষার পারিপার্শ্বিক জটিলতা ও অবস্থা ব্যাখ্যা করে। বামন বলেছেন – রীতি হল বিশিষ্ট পদরচনা। ভামহ অলংকার প্রয়োগের বিশেষত্বকে রীতি বলতে চান।

আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানীরাও শব্দার্থ, ধ্বনি, শব্দ শক্তি, লক্ষণা গুণ, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে সক্রেটিস, বুকন গিবন, লুকাস মারি, রিচার্ডসন প্রভৃতিরা রীতি শব্দের নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে তাঁরা 'Style' শব্দটিকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন। বামনের কাব্যালঙ্কার অনুযায়ী রীতি তিন প্রকার – বৈদর্ভী, গৌড়ী, ও পাঞ্চালী । দণ্ডী অবশ্য শুধু বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির কথা বলেছিলেন।

রীতি বা শৈলী শুধু ভাষা বিশ্লেষণ নয়, তা শিল্প সৌন্দর্য বিশ্লেষণে সহায়ক। শব্দ ভাষার চরম উপাদান বা নূন্যতম উপাদান ঠিকই, তবে শব্দই শেষকথা নয়। কারণ শব্দ সমষ্টি মাত্রই বাক্য নয়, সমষ্টিগত রূপ দেওয়ার নিয়ম তাকে পালন করতেই হয়। তবে প্রত্যেক ভাষার বাক্য গঠনের একটা নিয়ম থাকলে তার মধ্যে একটা নমনীয়তা বা সীমাবদ্ধতা আছে।

বাংলা গদ্য বাক্য গঠনের স্বাভাবিক নিয়ম হল কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া।

যেমন– মাওবাদীরা বিপ্লব করবে।

মাওবাদীরা	বিপ্লব	করবে।
কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

কিন্তু বাংলা বাক্য গঠনে সর্বত্র verb থাকে না। যেমন আকাশের রং নীল। তাই বাক্য subject ও predicate এই দুই ভাগে ভাগ করলে verb কে Predecate এর রাখা হয়। অর্থাৎ predicate ভাগে বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ থাকে। আর subject ভাগে থাকে বিশেষ্য ও সাধারণ।

সুতরাং বাক্য গঠনে বর্তমান বাংলা বাক্য গঠনে বাক্যের মূল দুই ভাগ উদ্দেশ্য ও বিধেয়, এই প্রাচীন বিভাজন বর্তমান উদ্দেশ্য প্রসারক ও বিধেয় প্রসারক দিয়ে বাক্য দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলে যে ক্ষেত্রে বাক্য গঠনে শব্দ সাজানোর উপর যথেষ্ট সর্তকতা রাখতে হয়।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের	ছাত্ররা	খুব মনোযোগ সহকারে মুল	বই	পড়েন।
উদ্দেশ্য প্রসারক	কর্তা	বিধেয় প্রসারক	কর্ম	ক্রিয়া

বাক্যটি দীর্ঘ হলেও সরল বাক্য। বাক্যটিকে তিনটি বাক্যাংশে (Phrase) ভাগ করা হয়েছে।

১. বর্ধমান বিশ্ববিবিদ্যালয়ের ছাত্র

২. খুব মনোযোগ সহকারে বই

৩. পড়েন

বাক্যাংশকে আবার উপ-বাক্যাংশে ভাগ করা যায়।

'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা' অংশটিতে 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ' হল উপ-বাক্যাংশ।

আমরা কবিতা ইত্যাদিতে প্রয়োগের সময় বাক্যাংশের হেরফের ঘটাতে পারি, কিন্তু উপ-বাক্যাংশের কোন পরিবর্তন করা যায় না। এখানেই বাক্য গঠনের সীমাবদ্ধতা। যেমন, ছাত্ররা মূল বই মনোযোগ সহকারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ে না। এটি শব্দগুচ্ছের সমন্বয় হলেও বাক্য নয় কারণ যথার্থ অর্থকে প্রকাশ করার ক্ষমতা বাক্যটির নেই। সুতরাং বাক্য বিচারে শৈলী বিজ্ঞানের প্রয়োজন দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র বাক্য --

সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে / ধরা দিয়েছিলেন / জ্ঞান শংকর। তিনি / সে কালের লোক / কিন্তু তাঁর জন্ম তারিখটি / হঠাৎ পিছনে সরে এসেছিল / অনেক খানি একালে।

মনোরমা দরকার একটি শব্দ ও বাক্যাংশ হতে পারে যদি তার স্থলে অনেক শব্দ ব্যবহার করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতি অংশে স্টাইলিষ্টিক্‌দের মর্তে এই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ঝোঁক পড়েছে। কেন পড়ল তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করতে হলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

গঠনগত দিক দিয়ে বাক্য দুরকম --

১. সার্থক ঃ যে বাক্য অর্থ বহন করে।

২. নিরর্থক ঃ যে বাক্য অর্থ বহন করে না।

সার্থক বাক্যে আবার প্রকার --

১. স্বাভাবিক ঃ সাধারণত গদ্য ক্ষেত্রে দেখা যায়।

২. অস্বাভাবিক ঃ কবিরা স্বাভাবিক ক্রম নিয়ম ভেঙ্গে বাক্য গঠন করেন।

যেমন -- রবীন্দ্রনাথের শেষ সপ্তকের ১৮ সংখ্যক কবিতা--

"আমাদের / গর্ব আছে / নিজের শোকে নিয়েও।"

কিন্তু এক্ষেত্রেও কবি বাক্যাংশগুলির পরিবর্তন করলেও উপ-বাক্যাংশগুলির পরিবর্তন করলেও উপ-বাক্যাংশগুলির পরিবর্তন করতে পারেন নি। অর্থাৎ নতুন রচনা করলেও নূন্যতম সীমাবদ্ধতা বজায় আছে।

আবার একই বিষয় নিতে বিভিন্ন কবির কবিতা যেখানে Style -এর পার্থক্য দেখা যায় --

১. ধরণীর পূর্ব ধারে / বর্ষার নবীন মেঘ / এর।

২. বর্ষার নবীন মেঘ / বজ্র ভেরী বাজাইল।

এই বাক্য দুটিকে রবীন্দ্রনাথ একবাক্যে লিখলেন—

"বর্ষার নবীন মেঘ / এল ধরণীর পূর্ব দ্বারে / বাজাইল বজ্র ভেরী।"

অর্থাৎ কবিরা একাধিক চিন্তাকে কখনো এক বাক্যে কখনো একাধিক বাক্যে স্থান দেন। আবার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য, চরিত্রকে স্পষ্ট করার জন্য, দৃশ্য রূপের বর্ণনার মাধ্যমে বাক্য ছোট বড় হয়। মনস্তত্ত্ব মিশিয়ে চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য উপমা ব্যবহাব করেন। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'চিত্র'। যেমন – 'জীবন তরী এগিয়ে চলছে। সুতরাং ভাবনার অন্তর গঠনে (deep structure) এর একক বাক্যগুলির শৈলী সম্মত আলোচনায় প্রয়োজন থেকেই যায়।

✧ সুকান্তের 'আগামী' কবিতার শৈলী বিশ্লেষণ ঃ

'শৈলী' একটা এমন আপেক্ষিক সম্বন্ধবাচক শব্দ যা একজন ব্যক্তি বা লেখকের আচরণ বা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে অন্যদের তুলনায় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলে। তাছাড়া বিজ্ঞান সম্মতভাবে সাহিত্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে শৈলী সাহায্য করে।

অর্থাৎ শৈলী হল লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বেব প্রকাশ, লেখক বা বক্তার মনন, চিন্তন এবং অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তার প্রকাশই হল শৈলী। লেখকের যে ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে সেই ব্যক্তিত্ব যদি স্বাতন্ত্র্য না হয় অর্থাৎ গতানুগতিক ব্যক্তিত্বের থেকে যদি আলাদা হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে যে প্রকাশ ভঙ্গী তাকেই বলে শৈলী।

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হিসাবেই শৈলীবিজ্ঞানের গুরুত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুইজারল্যাণ্ডেব ভাষা বিজ্ঞানী সোস্যুর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান তত্ত্বকে গঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। পরবর্তীকালে নোয়াম চমস্কি ভাষা শৈলীকে অন্তরঙ্গ ও বহিঃরঙ্গ দু দিক থেকেই বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাই আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় শৈলীবিজ্ঞান বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

শৈলীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিশেষ প্রকাশভঙ্গী। বিশেষকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে সাধারণ (General) স্যতকে আবিষ্কার করে বলেই শৈলীকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে শৈলীবিজ্ঞান এক অর্থে ভাষা বিশ্লেষণ। তবে এই নয় যে কাব্য উপন্যাস নাটক ইত্যাদিকে শুধু কতগুলি ধ্বনি, শব্দ, বাক্যে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করা। সামগ্রিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করা শৈলী বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। আসলে সাহিত্যের আবেদন সৃষ্টিকারী বিশেষ উপকরণগুলিকে চিনে নেওয়ার জন্যই শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ভাব ও ভাষার শিল্প সৌন্দর্য বিশ্লেষণে সহায়তা করে শৈলীবিজ্ঞান। ইংরাজি Stylistics এর পথ অনুসরণ করে বাংলা শৈলীবিজ্ঞান আমাদের ভাষাবিজ্ঞান ও সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে।

Linguestics ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিবিচার, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব বাক্যতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করে। style ভাষার গঠন, নির্মাণ ও নির্মিতি, ভাব ও ভাষার পূর্ণ পরিচয় দেয়। যতি চিহ্ন, ধ্বনিতরঙ্গ, শব্দ, বাচ্য, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি যেসব উপাদানে রচনা হয়, তার সবকিছুরই বিশ্লেষণ শৈলীবিজ্ঞান করে এবং বিশ্লেষনান্তে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একজন লেখকের রচনা কেন রোম্যান্টিক বা মিষ্টিক তার ভাষাতাত্ত্বিক প্রমান রাখতে পারে শৈলীবিজ্ঞান। সাধারণত 'বঙ্কিমীরীতি', 'আলালীভাষা' বা 'পণ্ডিতি গদ্য' ইত্যাদি যেগুলো ব্যবহার করে থাকি, রচনারীতির এই প্রয়োগের পশ্চাতে শৈলীবিজ্ঞানে মাপকাঠি রয়েছে। এবার আমরা এর প্রয়োগের দিকটি লক্ষ করবো। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আগামী' কবিতায় বলা হয়েছে—

জড় নই , মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবুও ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা ;
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় ঃ
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড় ;
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে ;
জয়ধ্বনি কিশলয়ে ঃ সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো ঃ হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে ;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।।

বাক্য গঠন ঃ কবিতাটিতে ২৪ টি লাইন ১৪ টি বাক্য সম্মোলিত। বাক্যগুলি হল—

১। জড় নই, ... অঙ্কুরিত বীজ ;

২। মাটিতে লালিত .... ঘিরে রয়েছে আমাকে।

৩। যদিও নগন্য আমি, ... মর্মরধ্বনি বাজে,

৪। বিদীর্ণ করেছি মাটি .... বিশাল চেতনা।

৫। আজ শুধু অঙ্কুরিত .... নেড়ে যাবে মাথা;

৬। তাবপর দৃপ্ত শাখা .... প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।

৭। সংহত কঠিন ঝড়ে .... প্রত্যাহত হবে জানি ঝড় ;

৮। অঙ্কুরিত বন্ধু যত .... নব অরণ্যের গানে।

৯। আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে ;

১০। জয়ধ্বনি কিশলয়ে ঃ সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।

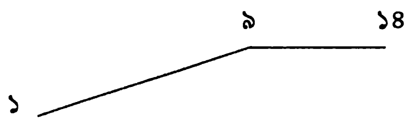
১১। ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,

১২। বৃষ্টিব, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।

১৩। সেদিন ছায়ায় এসো .... দেব আমি পাখিরও কূজন

১৪। একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।।

১ম বাক্যে প্রথম পংক্তি (জড় নই , মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,)ও দ্বিতীয় পংক্তি (আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ,) বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদ্র বাক্য ৯, ১০, ১১, দীর্ঘ বাক্য-১৩। ধ্বনিপ্রবাহ ও ভাবপ্রবাহে ব্যাঘাত ঘটেনি স্বচ্ছন্দে কবিতা এগিয়ে গেছে। সদর্থকে পৌছানোর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নঞর্থক বাক্য দিয়ে কবিতাটি শুরু। ৫,৬,৭ নং বাক্য থেকে কর্তা (আমি) উহ্য – ৮ নং কর্তা এসে ৯,১০ নং বাক্যে আবার উহ্য, ১১ নং বাক্যে দুবার কর্তার ব্যবহার। ১৪ নং বাক্যে আমি সবার পক্ষে উঠল। অর্থাৎ ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষায় মিশে গেল। একটা বৈখিক চিত্রে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে--



১ নং বাক্য থেকে বনস্পতি হয়ে উঠার প্রচেষ্টা, যার গতি উর্ধমুখী । ৯ নং বাক্যে চূড়ান্ত পরিণতি (আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে) । পরবর্তী বাক্যগুলিতে সংগঠনের ভূমিকা নেবে, মানবতার কাজে লেগে প্রতিদান দেবে – এই আশ্বাসে কবিতাটির সমাপ্তি ঘটেছে। কবির মতে মানুষ হয়ে জন্মালেই চলবে না । সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন না করলে মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

শব্দ গঠন ঃ

কবিতায় শব্দ ব্যবহারের বিষয়টিকেও শৈলী রীতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। কবিতাটি তৎসম শব্দ বহুল, বিশেষণে ঠাসা। তৎসম শব্দ গুলি — জড়, মৃত, ফল, বটবৃক্ষ, স্বপ্ন, ক্ষুদ্র, শিকড়, শাখা, ঝড়, বনস্পতি, কুঠার ইত্যাদি। আহ্বান ও অঙ্গীকারের দৃঢ়তা আনার জন্য তৎসম শব্দের বাহুল্য এনেছেন। বিশেষণ পদের সমাবেশ ঘটেছে— ভীরু, সন্দিগ্ধ, নগণ্য, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, বিদীর্ণ, অঙ্কুরিত, উদ্দাম, দৃপ্ত, বিস্মিত, সংহত, কঠিন, দৃঢ়প্রাণ, প্রত্যাহত, মুখরিত, আগামী, পুষ্ট ইত্যাদি । কবিতার শেষে বাক্যে বিশেষণের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কবিতার প্রথমে যে সমস্ত ক্রিয়াপদগুলির ব্যবহার আছে (রয়েছে , করেছি) - এসবের মধ্য দিয়ে চারাগাছ তার বর্তমান অবস্থাকে বুঝিয়েছে। আর প্রথম ৮ পংক্তির পর যেসব ক্রিয়াপদ (নেড়ে যাবে, প্রত্যাহত হবে, মিশে যাবে, ফুল দেব ইত্যাদি) আছে সেগুলি ভবিষ্যবাচক।

ধ্বনি গঠন ঃ

৪৩ টি 'ন'-এর ব্যবহারে কবি ব্যাপক নেগেটিভ পটভূমি দেখাতে চেয়েছেন? ৩৩ বার 'ম' ধ্বনির ব্যবহার ঘটেছে। ব্যক্তি সত্ত্বার উত্তরণ-এ 'ম' এর প্রয়োজন। ১৫ বার 'জ' ধ্বনি জ-ধ্বনিজাত শব্দ দিয়ে কবিতা শুরু (জড়) এবং শেষ (জন)। এক্ষেত্রেও অচেতন থেকে চেতনায় পৌঁছানোর বার্তা আছে।

অর্থ ক্ষেত্র (Semantic field) ঃ

কিভাবে অর্থক্ষেত্র গড়ে উঠে তা প্রথম বাক্যটি বিশ্লেষণ করে দেখানো যেতে পারে।

শীর্ষশব্দ — প্রথম বাক্য —

জড়	**মৃত**	**খনিজ**
— প্রাণ / অচেতন	— প্রাণ / অচেতন	— প্রাণ / অচেতন-চেতন
জীবন্ত প্রাণ		**অঙ্কুরিত বীজ**
+ প্রাণ / চেতন		+ প্রাণ / চেতন

'জড়' অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় প্রাণ হীন 'মৃত' ও তাই। কিন্তু খনিজ মাটির তলায় থাকে, তবে তুলে কাজে লাগালে অর্থাৎ পেট্রোল পরিশোধিত হলে জাহাজ চালাতে সক্ষম। 'প্রাণ' শব্দের আগে 'জীবন্ত' শব্দ বসিয়ে তাকে আরও মজবুত করা হয়েছে। বীজ যা মৃত ছিল, তা অঙ্কুরিত হল। 'জড় নই' পরিবর্তে সুকান্ত কিন্তু লেখেন নি 'জীব'। আসলে নেগেটিভ নেগেটিভ সংঘর্ষে তিনি পজেটিভ জায়গায় যেতে চাইছেন অর্থাৎ আশাবাদী কবি। এবার শীর্ষশব্দ থেকে কবিতাটির সামগ্রিক অর্থবোধে যেতে পারি —

জড় - মৃত - খনিজ - জীবন্ত প্রাণ - অঙ্কুরিত বীজ ঃ

১. আপাতভাবে পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতবাসী ও তাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে আশাহীন(জড় বা মৃত) মনে হচ্ছে। কিন্তু স্বাধীনতা আসবে। ভারতবাসী সমবেত আন্দোলন গড়ে তুলবে।

২. সাম্যবাদকে সারা পৃথিবীর মননশীল মানুষ গ্রহণ করবে না বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু গ্রহণ করবে।

৩. সুকান্ত কিশোর কবি। কবি হিসাবে তার প্রতিষ্ঠা হবে না বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু হবে।

অর্থাৎ বীজের অঙ্কুরিত হয়ে বনস্পতি হওয়া এবং ফল, ফুল, পাখির কূজন দান করাটা আপাতঅর্থ। বৃহত্তর অর্থক্ষেত্রে পৌছাতে গেলে শৈলী বিজ্ঞানের সাহায্যে এমন বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

✧ শৈলীবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক :

শৈলী বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যাকরণের বা ভাষাবিজ্ঞানের পার্থক্য আছে। ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হল কোন ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার। রীতিবিজ্ঞান কিন্তু এই শব্দ প্রয়োগের অনুসন্ধান করে না। শৈলীর লক্ষ্য হল কিভাবে বিশিষ্ট রীতি গড়ে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করা।

শৈলী বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যাকরণের আর একটি তফাৎ হল যে ব্যাকরণ ভাষার পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। অথচ শৈলী বিজ্ঞান কোন্ ভাষা কোন্ পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হল তা নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে চায়।

শৈলী বিজ্ঞান প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে লেখকের মানসিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে। কিন্তু ব্যাকরণে লেখকের মানসিকতা স্থান পায় না।

ভাষার বিভিন্ন উপকরণ – ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি তাদের বিন্যাস ও ক্রিয়া বিধিবদ্ধভাবে চালিত করার জন্য প্রচলিত ব্যাকরণ কতকগুলি নীতিনির্দেশ করে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবণতা, বিশেষ-বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি ও সাহিত্যিক প্রেরণার জন্য ভাষা ব্যবহারকারী গতানুগতিক রীতিনীতি মেনে চলেন না। তাই ভাষা ব্যবহারকারী বা লেখক ব্যাকরণের নিয়মকে লঙ্ঘন করেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

"খোকা যাবে নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে।।"

'জুতুয়া' শব্দে 'জুতা'র সঙ্গে 'উয়া' প্রত্যয় ব্যাকরণের নিয়মে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু স্নেহ মমতার ভাবের সঙ্গে শব্দটি জড়িয়ে আছে। এই অপরিহার্য ব্যতিক্রম শৈলী বিজ্ঞানের মূল পরিচয়।

তবে শৈলী বিজ্ঞান ব্যাকরণকে না মানলেও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে না। একটা অন্তর্নিহিত বিধান অবশ্য বজায় থাকে। তাই এক অর্থে শৈলী হল বিধিবদ্ধ আলোচনা। বলা হয়েছে –

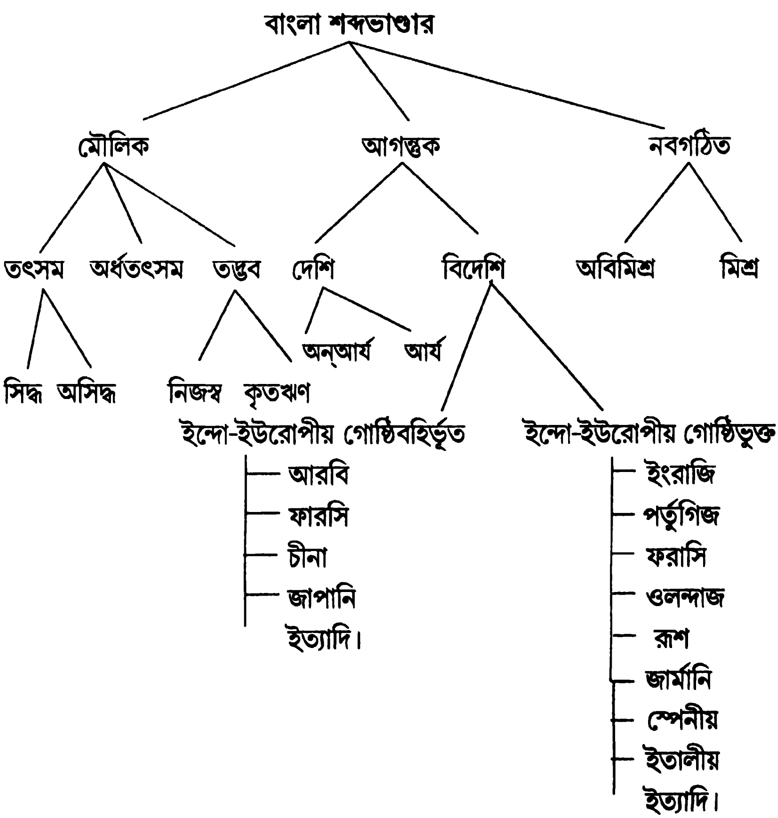
1. Stylistics is that part of linguistics .
2. Stylistics means the study of style, with a suggestion, form of the word, of a scientific or at least a methodical study.

তাই বলা যায় ব্যাকরণের সঙ্গে পার্থক্য থাকলে ও শৈলী বা রীতি বিশ্লেষণে ব্যাকরণের বা ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়। তাই এই প্রকার বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিজ্ঞানভিত্তিক সৌন্দর্য বিশ্লেষণ তথা আলোচনা।

শব্দভাণ্ডার

ভাষার প্রকাশ ক্ষমতার মূল আধার হল ভাষার শব্দ সম্পদ। ভাষার সমৃদ্ধি শব্দবাণ্ডারের উপর নির্ভরশীল। মনে রাখতে হবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দের সাহায্যে, অন্য ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দের এবং নূতন সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে আজকের বাংলা ভাষায় শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ। উৎস বিচারে মূলতঃ তিন রকমের শব্দ বাংলায় আছে। সেগুলি হল – (১) মৌলিক বা নিজস্ব (২) আগন্তুক (৩) নবগঠিত।

একটি চিত্রে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে -



- লক্ষ করলে দেখা যাবে বাংলা শব্দভাণ্ডারে যে সমস্ত শব্দমালা আছে সেগুলি তিনটি স্তরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল —

১. **প্রাক্-ইতিহাস ও ইতিহাস স্তর ঃ** ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে এই স্তরে প্রাচীন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে প্রথম অষ্ট্রিক গোষ্ঠির মানুষের প্রবেশ ঘটে , পরে আসে দ্রাবিড় গোষ্ঠি , তারপর আর্য গোষ্ঠি । দ্বিতীয়বারের জন্য এই আর্যগোষ্ঠির আবার প্রবেশ ঘটে। আর ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবেশ ঘটে ভোট-চীনীয় গোষ্ঠির। তাদের প্রত্যেক্যের ব্যবহৃত শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে সংখ্যার দিক থেকে বাংলা শব্দভাণ্ডারে আর্য গোষ্ঠির শব্দ সংখ্যাই বেশি।

২. **সাম্রাজ্যবাদী স্তর ঃ** তুর্কি আক্রমণ (১২০৩) থেকেই আমরা সাম্রাজ্যবাদী স্তর ধরছি ।এই স্তরে ক্রমান্বয়ে বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করেছিল সেমীয়-হামীয় অর্থাৎ আরবি-ফারসি শব্দ । বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রায় আড়াই হাজার আরবি-ফারসি শব্দ স্থান পেয়েছে। তারপর পর্তুগিজ, ফরাসি , ওলন্দাজ , ইংরাজি ইত্যাদি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে ।

৩. **স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের স্তর ঃ** ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সূত্র ধরে বাংলা শব্দভাণ্ডারে মেক্সীয়, স্পেনীয় অষ্ট্রেলীয় ইত্যাদি শব্দের প্রবেশ ঘটে।

✧ **মৌলিক বা নিজস্ব ঃ**

এই প্রকার শব্দগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলায় এসেছে। এগুলি তিন প্রকার —

ক) **তৎসম ঃ** প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে অপরিবর্তিত ভাবে বাংলায় স্থান লাভ করেছে। যেমন — ধর্ম, বৃক্ষ, জল, বায়ু, লতা ইত্যাদি।এগুলির মধ্যে ব্যাকরণ সিদ্ধ শব্দগুলি হল — সিদ্ধতৎসম, আর মৌখিক সংস্কৃতের শব্দগুলি হল অসিদ্ধতৎসম।

খ) **অর্ধ-তৎসম ঃ** প্রাকৃত স্তরে পরিবর্তিত না হয়ে বাংলায় এসে কিছুটা পরিবর্তন লাভ করেছে। যেমন কৃষ্ণ > কেষ্ট ; নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন ; যত্ন > যতন ইত্যাদি।

গ) **তদ্ভব ঃ** সংস্কৃত স্তর থেকে প্রাকৃত হয়ে ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় স্থান লাভ করেছে। যেমন ধর্ম > ধম্ম > ধাম ইত্যাদি। অনুরূপে —

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাংলা
হস্ত	হত্থ	হাত
পর্ণ	পন্ন	পান
মৎস্য	মচ্ছ	মাছ

সর্প	সপ্প	সাপ
বৈদ্য	বেজ্জ	বেজ ইত্যাদি।

এই ধরণের শব্দগুলি কিছু নিজস্ব অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত আর কিছু কৃতঋণ অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় বংশভূত ভাষা বা অন্যভাষা থেকে এসেছে।

✧ আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ ঃ

সংস্কৃত বহির্ভূত দেশি বিদেশি বিভিন্ন ভাষা থেকে প্রাপ্ত শব্দ। এগুলি দুই প্রকার—

ক. **দেশি ঃ (i) অন্-আর্য ঃ** যেমন অস্ট্রিক — ঢোল, ঝাঁটা, ঝুড়ি ইত্যাদি। ভোট-চীনীয় গোষ্ঠির বর্মি — ঘুঘনি, লুঙ্গি ইত্যাদি। দ্রাবিড় — গণ্ডোগোল , প্যাণ্ডেল ইত্যাদি শব্দ বাংলায় এসেছে।

(ii) আর্য ঃ হিন্দি — জানোয়ার, খানা, খতম, ঠেলাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, বাতাবরণ, ওস্তাদ ইত্যাদি। গুজরাতি — হরতাল, গরবা, ডাণ্ডিয়া ইত্যাদি। পঞ্জাবী শব্দ — ভাঙ্গরা, শিখ, চাহিদা ইত্যাদি।

খ. **বিদেশি ঃ** শাসন, বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের সূত্র ধরে এই ধরণের শব্দগুলি বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করেছে। বিদেশি ভাষা গুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি —

১. ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠি বহির্ভূত

২. ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠিভূক্ত

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠি বহির্ভূত শব্দগুলি যেমন —

আরবি	— আতর, উজির, ওমরাহ ইত্যাদি।
ফারসি	— আইন, আদালত, অক্কেল, খুন ইত্যাদি।
চীনা	— চা, চিনি ইত্যাদি
জাপানি	— রিক্সা, হারিকিনি, ইত্যাদি।

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠিভূক্ত শব্দগুলি যেমন —

ইংরাজি	— স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।
ফরাসি	— বুর্জোয়া, রেনেসাঁস, রেস্তোরাঁ, কার্তুজ, কুপন ইত্যাদি।
জার্মান	— জার, নাৎসী ইত্যাদি।
পর্তুগিজ	— বোতাম, আনারস, আলপিন, আলকাতরা ইত্যাদি।
ওলন্দাজ	— ইস্কুপ, ইস্কাবন, হরতন, রুইতন ইত্যাদি।
রুশ	— সোভিয়েত, বলশেভিক ইত্যাদি ।

এছাড়া স্পেনীয়, ইতালীয় , মেক্সীয় ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে।

✧ নবগঠিত ঃ

নতুনভাবে কিছু শব্দ এসেছে। নবগঠিত শব্দ দুই প্রকার —

i. **অবিমিশ্র শব্দ** — অনিকেত, অতিরেক ইত্যাদি।

ii. **মিশ্র বা সংকর শব্দ** — হেড (head) + পণ্ডিত = হেডপণ্ডিত ; মটর (motor) + গাড়ি = মটরগাড়ি ; স্কুল (school) + পাঠ্য = স্কুলপাঠ্য ; ইত্যাদি। আবার বিদেশি শব্দের সঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন — ডাক্তার (ইংরাজি শব্দ) + ঈ = ডাক্তারী; প্রফেসর (ইংরাজি শব্দ) + ঈ = প্রফেসারী ; বৈঠক + খানা (আরবি-ফারসি প্রত্যয়) = বৈঠকখানা ইত্যাদি।

✧ তৎসম শব্দের গুরুত্ব ✧

বাংলা শব্দভাণ্ডারে তৎসম শব্দের গুরুত্ব কম নয়। তদ্ভব শব্দগুলো বাংলার মূল শব্দভাণ্ডারকে গড়ে তুললেও তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা তদ্ভবকে ছাড়িয়ে গেছে। এটা ঠিক যে তৎসম শব্দের অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষার আদিস্তরের সূচনা হয়েছিল। চর্যাগীতিতে মোট দু'হাজার শব্দের মধ্যে তৎসম শব্দের সংখ্যা ১০০ টি। অর্থাৎ তৎসম শব্দের ব্যবহার প্রবণতা শতকরা ৫ টি। মধ্যবাংলা সাহিত্যে অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ১২·৫ টি। আবার আধুনিক বাংলায় অর্থাৎ উনিশ শতকের ব্যবহৃত সাধুগদ্যে তৎসম শব্দের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫২ শতাংশ।

অতি সাম্প্রতিক বাংলা গদ্যে শতকরা পরিমাণ না বাড়লেও জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বাংলার অনুবাদে এবং পরিভাষা ব্যবহারে তৎসম শব্দের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার পরিভাষার প্রয়োজনে এমন অনেক নতুন শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে যেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে সিদ্ধ। এই জাতীয় পরিভাষিক শব্দগুলিকে নবগঠিত শব্দ বলা ভালো, সেগুলিকে 'তৎসম' বলে স্বীকার করার কোন কারণ নেই। যেমন — বিশ্ববিদ্যালয়, গলবন্ধ, শীর্ষসম্মেলন ইত্যাদি শব্দগুলি তৎসম নয়।

তৎসম অর্থাৎ যে শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিত ভাবে বাংলায় গৃহীত হয়েছে। বাংলা শব্দভাণ্ডারে এমন অনেক তৎসম শব্দ আছে যেগুলি বানানে সংস্কৃত হলেও উচ্চারণে প্রাকৃত বা বিকৃত। সেই শব্দগুলিকে 'বিকৃত তৎসম' বলে। যেমন — সহ্য (শোজ্‌ঝ), জ্ঞান (গ্যাঁন) ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের গুরুত্ব আলোচনার শেষে একথা বলা যায় যে এখনো পর্যন্ত যথাযথ বাংলা ব্যাকরণ তৈরি না হওয়া এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের কল্যাণে সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি সুনির্দিষ্ট থাকায় নতুন শব্দ গঠন পদ্ধতিও বাংলা ভাষায় সহজসাধ্য প্রক্রিয়া বলে গ্রাহ্য

হয়ে উঠেছে। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে আমাদের লিখিত উত্তরটির মধ্যেও তৎসম শব্দের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

✧ বিদেশি শব্দ ও প্রত্যয় ✧

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ' নামক তাঁর একটি প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় আগত বিদেশি শব্দগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে বাংলায় বিদেশি শব্দের কথা আলোচনা করতে গেলে বাংলা ভাষার ইতিহাস নিয়ে দুকথা বলতে হয়। হাজার বছর হল আমাদের বাংলা ভাষা যেরূপে এখন প্রচলিত অনেকটা সেইরকম রূপ নিয়েই বাংলা ভাষা 'প্রাচীন বাংলা' পদবাচ্য হয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ এখন থেকে হাজার বছর 'চন্দ' না বলে 'চাঁদ' 'করিঅব্ব' না বলে 'করিব' বলতে আরম্ভ করে। আগে এদেশে যে 'মাগধী প্রাকৃত' আর মাগধী অপভ্রংশ চলত সে ভাষা পরিবর্তন হতে পুরাতন বাংলার রূপ গ্রহণ করে। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত, অবার প্রাকৃতের পরিবর্তিত রূপে অপভ্রংশ, অপভ্রংশের রূপান্তরিত রূপে বা হিন্দি, মারাঠি, পঞ্জাবি, নেপালি প্রভৃতি আধুনিক বা নব্য আর্য ভাষার জন্ম হয়। এই হচ্ছে এদেশে আর্যভাষার পরিবর্তনের ধারা।

সংস্কৃত শব্দ বংশ ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃত শব্দ হয়ে দাঁড়াল। এই সব প্রাকৃত শব্দ আরও পরিবর্তিত হয়ে বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি শব্দ হল, বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ভাষা প্রাকৃতের মধ্যস্থতায় যে সমস্ত পরিবর্তিত শব্দ পেয়েছে সেগুলি হল আধুনিক ভাষাগুলির শব্দভাণ্ডারের প্রাণ। কিম্বা সেগুলি শুদ্ধ খাঁটি বাংলা বা হিন্দি শব্দ। যেমন মাথা, আঁখ, নাক, কান মুখ, দাঁত, হাত, পা, আঙ্গুল প্রভৃতি অঙ্গবাচক শব্দ। হ্, খা, যা, দেখ্, নে, ধব্, কর্ প্রভৃতি ধাতু, এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি সংখ্যা বাচক শব্দ , গরু, ঘোড়া, বেড়াল, উট, সাপ, মাছ, হাঁস প্রভৃতি প্রাণিবাচক শব্দ। ভাই, বোন, মা, মামা, শাশুড়ি, ননদ, দেওর প্রভৃতি সম্পর্কবাচক শব্দ এইরকম শত শত শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের পথ ধরে খাঁটি বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি শব্দ হয়ে উঠেছে। আমরা বলতে পারি এই সব শব্দকে নিয়েই বাংলা ভাষার বাংলাতত্ত্ব। ভাষাচার্য যে কথাগুলি বলেছেন সেটিকে একটু অন্যভাবে এইরকম করে বলা যায় যে বাংলা শব্দ প্রধানত দুই জাতীয় — মৌলিক এবং আগন্তুক।

মৌলিক শব্দগুলি ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আগত বা গৃহীত সেগুলির তিনটি শ্রেণি — তদ্ভব, তৎসম এবং অর্ধতৎসম। উক্ত শব্দগুলির সবই তদ্ভব শব্দ। 'তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে 'ভব' অর্থাৎ উৎপত্তি যার সেগুলি হল বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের আদি মূলধন, আবার সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে অবিকৃতভাবে। 'তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান সেই শব্দগুলি । যথা — সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অরণ্য, আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। আর যে সব শব্দ একদা সংস্কৃত থেকে অবিকল

গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কালোচিত ধ্বনি পরিবর্তন এড়াতে পারে নি, সেইসব শব্দকে বলা হয় অর্ধতৎসম শব্দ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত তৎসম শব্দ। যেমন — কৃষ্ণ > কেষ্ট, নিমন্ত্রণ > নেমতন্ন, রাত্রি > রাত্তির প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এখন বাংলা ভাষার উক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বাংলা শব্দভাণ্ডারের মৌলিক শব্দগুলির পরিচয়ের সূত্রে বিদেশি শব্দগুলিকে চিহ্নিত করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়।

সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায় যে বাংলা ভাষা অপর যে সকল ভাষার কম বেশি ঘনিষ্ট সম্পর্কে এসে বিদেশি শব্দ সঞ্চয় করেছে সেগুলি হল বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিদেশি তথা আগন্তুক শব্দ। ফারসি এবং ফারসির মারফৎ অল্প তুর্কি ও প্রচুর সংখ্যক আরবির কথা বলা যায়। তার সঙ্গে বলা যায় পর্তুগিজ এবং খুব অল্প পরিমানে ওলন্দাজ ও ফারসি শব্দেরও উল্লেখ করা যায়। কিন্তু প্রধানভাবে উল্লেখ করা যায় বিদেশি শব্দরূপে ইংরাজির কথা।

এদেশের ইসলাম ধর্ম অবলম্বনকারী বিদেশি তুর্কিদের আগমন হয় খ্রিষ্টীয় বারো শতকের শেষ আর তেরো শতকের গোড়া থেকে। ভিন্ন ভাষায় বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য শুরু হয় তেরো শতকে এবং শেষ হয় আঠারো শতকে শেষের দিকে। এই দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতার ফলে এদেশের শাসকদের ভাষা ফারসি এবং ফারসির মধ্যস্থতায় বহু আরবি শব্দ এবং কিছু পরিমানে তুর্কি শব্দ বাংলায় এসেছে। আন্দাজ, খরচ, কম, বেশি, নগদ, পর্দা, শহর, কামান, জাহাজ, দূরবীন প্রভৃতি এমন বহু ফারসি শব্দ বাংলায় রয়েছে যাদের আজ বিদেশি বলে চেনাই কঠিন।

আইন আদালত সম্পর্কীয় বহু শব্দ আরবি শব্দ ফারসির মধ্যস্থতায় বাংলায় এসেছে। যেমন — আইন, উজির, নাজির প্রভৃতি শব্দের কথা বলা যায় এবং আতর, কেতাব, তাজ্জব, ফতোয়া প্রভৃতি অনেক আরবি শব্দের কথা বলা যায় এগুলি ফারসির মাধ্যমে এসেছে বাংলায়। সেইরকম ফারসির মধ্যস্থতায় আগত আলখাল্লা, উজ্জবুক, উর্দু, বিবি, বোচকা প্রভৃতি বাংলায় আগত তুর্কি শব্দের কথাও বলা যায়। আরবি হচ্ছে কোরাণের ভাষা, মুসলমানদের ধর্মের ভাষা — যারা মুসলমান শাস্ত্রে পণ্ডিত হতেন তাদের আরবি ভালো করে জানতেই হত। হিন্দু ছেলেরা ফারসি পড়ে মুনশি হত। এর থেকেই বোঝা যাবে বাংলা আগত বিদেশি শব্দের সূত্রে কি পরিমাণ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতির কারণের সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণও যুক্ত ছিল।

ফারসি শব্দ ছাড়া অন্য বিদেশি শব্দের মধ্যে বাংলায় শতখানেকের কিছু বেশি পোর্তুগিজ শব্দ আছে। তারও মূলে আছে ষোল শতকের শেষ থেকেই জলদস্যুতা এবং খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে পোর্তুগিজ যাজক এবং জলদস্যুদের আগমন। তাদের আনা বিদেশি জিনিসের, গাছপাল এবং অন্য জিনিসের, বিদেশি রীতি-নীতির নাম ঐ শব্দগুলির মধ্যে রয়েছে। সেগুলিকেও আজ বিদেশি বলে চেনা অত্যন্ত শক্ত। যথা — নোনা, আতা, আনারস, পেঁপে, পাউরুটি, আলপিন, আলকাতরা, আলমারি, বালতি,

বোতাম প্রভৃতি বহু পর্তুগিজ শব্দের নাম করা যায় যারা বাংলার শব্দভাণ্ডারে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রধানত বাণিজ্যিক যোগসূত্রেই এদেশে ডাচ এবং ফরাসিদের আগমন ঘটেছিল এবং খুব অল্প সংখ্যক তাদের ভাষার শব্দ আছে বাংলায়। যথা তাসখেলা বিষয়ক কয়েকটি ডাচ বা ওলন্দাজ শব্দ হল ইস্ক্রুপ, ইস্কাপন, তুরুপ, রুইতন, এই কয়েকটি শব্দের কথা বলা যায়। আর ফরাসি -বুর্জোয়া, রেনেসাঁস, রেস্তোরাঁ, কার্তুজ, কুপন প্রভৃতি শব্দের কথা বলা যায়।

বাংলায় আগত বিদেশি শব্দগুলির মধ্যে গুরুত্ব এবং সংখ্যা বহুলতা উভয়ের ব্যাপারেই ইংরাজি নাম করা যায়। সতেরো শতকের শেষ থেকেই ইংরাজি শব্দ বাংলায় আসতে আরম্ভ করে। সুনীতিকুমার তাঁর ১৯৪১ সালের বেতার ভাষণে বলেছেন যে বাংলায় প্রায় আট-নয় শত ইংরাজি শব্দ ইতিমধ্যেই পূর্ণরূপে গৃহীত হয়ে বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন — লাট, ডাক্তার, কৌঁশুলি, মোকদ্দমা, লজেঞ্জুস, জাঁদরেল প্রভৃতি শব্দের কথা বলা যায়। সেক্ষেত্রে এমন ধ্বনিপরিবর্তন ঘটেছে যে শব্দগুলিকে আমাদের বাংলা বলেই মনে হয়। আপিস, লণ্ঠন, লম্প, গেলাস, বাক্স বা বাস্ক, গারদ এইরকম শব্দের বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। আবার তেমন ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে নি, শব্দগুলিকে ইংরাজি বলে চেনা যায় অথচ শব্দগুলি আজ বাংলা শব্দভাণ্ডারেরই অন্তর্গত এমন উদাহরণও দেওয়া যায় অনেক। যেমন — চেয়ার, টেবল, সিনেমা, থিয়েটার, স্কুল, কলেজ, প্রফেসর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। ইংরাজি শব্দগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — অবিকৃত (কলেজ) ও বিকৃত (বেঞ্চি)।

কয়েকটি ইংরাজি শব্দ বাংলায় উপসর্গের মতোও চলে গেছে। যেমন — হেডপণ্ডিত, হাফহাতা জামা, ফুল হাতা পাঞ্জাবি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এমন বহু শব্দ বাংলায় রয়েছে যেগুলি ইংরাজির অনুবাদ বা অনূদিত ঋণ (Translation Loan)। যথা বিশ্ববিদ্যালয় (University) , শীর্ষ সম্মেলন (Summit Conference), আমি কি আসতে পারি (May I come in), বাতিঘর (Light House), পাদপ্রদীপ (Foot Light), মাতৃভূমি (Motherland), সংবাদপত্র (Newspaper), কাঁদানে গ্যাস (Tear Gass), হাতঘড়ি (Wrist Watch), সুবর্ণ মধ্যম (Golder mean), সুবর্ণ সুযোগ (Golden oppartunity), সিংহ ভাগ (Lionsshare), এই রকম বহু ইংরাজি শব্দ বা বাক্যাংশের নাম করা যায় যার অনুবাদের রূপ বা ঋণ আজ বাংলা শব্দভাণ্ডারের সম্পদ হয়ে উঠেছে।

বাংলা গদ্যের গঠন বা Syntax এর মধ্যেও ইংরাজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে নানাভাবে। যেমন — লেখক যখন বলেছেন যে রবীন্দ্রানুসারী কবিদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, কিন্তু ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। এই অন্বয়ের মধ্যে আমরা ইংরাজি বাক্যগঠনের অবিকল অনুবাদ পাই। অনিবার্য এবং অসম্ভব দুটি শব্দ Inevitable এবং Impossible, দুটি শব্দের বাংলায় পরিগ্রহণ ছাড়া আর কিছু নয়। বলা যায়

ইংরাজি ভাষার এইরকম প্রভাবেও বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার এবং প্রকাশশক্তির বৃদ্ধি ঘটেছে বা বাংলা ভাষায় এসেছে অভিনবত্বের রূপ।

✧ বাণিজ্য ও বিশ্বায়নে শব্দের অনুপ্রবেশ ✧

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে উপরিউক্ত শব্দগুলো প্রবেশ ঘটেছিল প্রথমস্তরে প্রাক্-ইতিহাস ও ইতিহাসের যুগে। দ্বিতীয় স্তরে সময়সীমা ১২০৩ খ্রিঃ তুর্কি আক্রমণ থেকে ইংরাজ শাসন পর্যন্ত ১৯৪৭ খ্রিঃ শাসনের সূত্র ধরে। তৃতীয় স্তরে সাংস্কৃতিক বিনিময় এ বাণিজ্য ও বিশ্বায়নের সূত্র ধরে।

বিশ্বায়নের সূত্রধরে ইতিমধ্যে অনেক শব্দই বাংলায় এসেছে। যেমন বিশ্বায়ন, ভুবনীকরণ, আগ্রাসন, লাইফ স্টাইল, গ্লোবাল, কন্‌জিউমার, টেক্‌নিক্, শেয়ার মার্কেট ইত্যাদি। অধিকাংশ শব্দ ইংরাজিজাত হলেও এগুলি বাংলাভাষিক পরিবেশে ভালই চলছে। তবে এই শব্দগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র্য আলোচনার প্রয়োজন।

একথা বলা যায় যে যে ভাষার মুখ্য সম্পদ শব্দভাণ্ডার। আর সেই শব্দভাণ্ডারের বৃদ্ধির হয় অন্যতম কারণ বিদেশি শব্দের পরিগ্রহণ বা বিদেশি শব্দকে আত্মসাৎ করার শক্তি। সেই স্বীকরণ ক্ষমতার প্রভাবেই বাংলা ভাষায় বিদেশি এবং বিশেষ করে ইংরাজি শব্দের আগমন আজও ক্রমবর্ধমান রূপ লাভ করেছে সেটি আমাদের ভাষার একটি প্রধান ক্ষমতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শব্দার্থতত্ত্ব

পার্বতী-পরমেশ্বর যেমন পরস্পর সম্পৃক্ত, বাক্য এবং অর্থ তেমনি পরস্পব সম্পৃক্ত – একের থেকে অপরকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শব্দ বস্তু বা ভাবের বোধক। কোনো শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তার মূল অর্থটি পাওয়া যায়। কালে কালে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচিত বস্তুজগৎ এবং ভাবজগতের পরিসীমা বাড়াতে থাকে, ফলে একই শব্দ বা শব্দমূল একাধিক ভাবের বোধক হয়ে দাঁড়ায়। তারই প্রত্যক্ষ ফল হল শব্দার্থ ও শব্দার্থের পরিবর্তন। ইংরাজি Semantics শব্দের পরিভাষা হিসাবে বাংলায় শব্দার্থতত্ত্ব , অর্থতত্ত্ব , বাগার্থতত্ত্ব শব্দগুলি এসেছে ।

✧ সংজ্ঞা ✧

রামেশ্বব শ' –

ভাষা বিজ্ঞানেব যে শাখায এই অর্থ (ভাষাব অর্থ) সম্পর্কে আলোচনা কবা হয তাকে শব্দার্থ তত্ত্ব বা Semantics বলে।

মহাম্মদ দানীউল হক–

যে বিদ্য, জ্ঞান বা শাস্ত্র শব্দেব অর্থ (তথা অর্থ পবিবর্তন, পবিবর্তনেব কাবণ) এবং ভাষায অর্থ-পবিবর্তনেব ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কবে তাকেই বলে 'শব্দার্থবিজ্ঞান (Semantics বা Semaciology)।

অনেকে মনে করে 'শব্দার্থতত্ত্ব ' কথাটি ঠিক নয় কারণ অর্থ প্রকাশে শুধু শব্দের ভূমিকার কথা বললেই হবে না , এর সঙ্গে বাক্যাংশ এমন কি বাক্যন্তর পর্যন্ত এসে পড়ে। তাই বাগার্থ বিজ্ঞান বললেই যথাযথ হয়। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ এই পর্বটিকে বাগার্থতত্ত্ব বলেই বিশ্লেষণ করেছেন।

কোনো কোনো বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার শুধু বাইরের গঠনের উপর জোর দেন এবং শব্দার্থতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞানের বহির্ভূত বলে উপেক্ষা করেন। অনেকের মতে

শব্দের অর্থ বা ভাব মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এবং যেহেতু মানুষের মনের খেয়ালকে বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট করা যায় না, তাই শব্দার্থ তত্ত্বকেও প্রকৃত বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা উচিত নয়। কিন্তু নোয়াম্ চামস্কি যে ভাবনা প্রবর্তন করেছেন তাতে শব্দার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদের উপর আধুনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদের সমর্থক ভাষাবিজ্ঞানীরা অর্থকে ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন। শব্দার্থই ভাষার প্রাণ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই সূত্র ধরে প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ববিদ্‌রা বলেছিলেন — শব্দই ব্রহ্ম।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বাইরের কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি তার ভিতরের অর্থের ও পরিবর্তন হয়। অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা — এই তিনটি শক্তির মধ্যেই শব্দার্থের মূল রহস্য ধরা পড়ে। অভিধা মুখ্যার্থের এবং লক্ষণা গৌণার্থের বোধ জন্মায়, আর এই দুইটি শক্তি যে তাৎপর্যের অর্থ জ্ঞাপন করতে পারে না। সেই ব্যঙ্গার্থের বোধ জন্মায় করতে পারে না সেই ব্যঙ্গার্থের বোধ জন্মায় ব্যঞ্জনা শক্তি। ব্যুৎপত্তির সাহায্যে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে বলে যৌগিক শব্দ। যৌগিক অর্থ সমূহের মধ্যে থেকে শব্দ যখন বিশেষ একটি কে মাত্রই গ্রহণ করে তখন তাকে বলে যোগরূঢ় শব্দ, যেমন 'হস্তি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যার হস্ত আছে কিন্তু যখন হস্তবৎ শুণ্ড আছে বলে এই শব্দ একটি বিশেষ জীবকে বোঝায় তখনই তা হয় যোগরূঢ় শব্দ ।

আধুনিককালে শব্দার্থতত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন মাইকেল ব্রেয়াল। প্রাচ্যদেশেও শাস্ত্রে প্রাচীনকালে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তার নিদর্শন পাওয়া যায় 'বাক্য পদীয়' গ্রন্থে। যেখানে বলা হয়েছে যে শুধু রূপ থেকেই শব্দ বিচার সম্ভব নয়। বাক্য বা পদ সংযোগের দ্বারা শব্দার্থ নির্ণয় করতে হয়।

শব্দের অভিধা শক্তিকে বলে বাচ্যার্থ। লক্ষণা শক্তিকে বলে লক্ষণার্থ এবং ব্যঞ্জনা শক্তিকে বলে ব্যঙ্গার্থ। এই সমস্ত শক্তির সাহায্যে শব্দের অর্থান্তর ঘটানো হয়ে থাকে। কোনো শব্দ ভাষায় বহুদিন ব্যবহৃত হলে একদিকে যেমন অর্থের দীনতা দেখা দেয় অন্যদিকে তেমনি মানসিক কারণ বা বহিঃপ্রভাবের ফলে অর্থের অনাবশ্যক বস্তুর সঞ্চার হয়।

✧ শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ ✧

কালের পরিবর্তনে সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বাইরের কাঠামোর পরিবর্তন যেমন অবশম্ভাবী তেমনি তার ভাবগত অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। তবে এই পবিবর্তনই ভাষাকে জীবন্ত রাখে । ধ্বনি পরিবর্তনের যেমন নানা কারণ আছে , অর্থ পরিবর্তনেরও তেমনি নানা কারণ আছে। ড. রামেশ্বর শ' -কে অনুসরণ করে কারণগুলিকে একটি চার্টে দেখানো যেতে পারে —

শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

- স্থূল কারণ
  - ভৌগোলিক
  - ঐতিহাসিক
  - উপাদানগত
- সূক্ষ্ম কারণ
  - সাদৃশ
  - ধর্মিয় বিশ্বাস ও সংস্কার
  - অসতর্কতা ও অজ্ঞতা
  - অল্পায়াস প্রবণতা
  - আলংকারিকতা

✧ স্থূল কারণ ঃ

ভৌগোলিক ঃ একই শব্দ বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন বাংলাদেশে ' শাক' হলো সবুজ ভোজ্যপত্র , কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাক হলো যে কোন নিরামিষ তরকারি।

ঐতিহাসিক ঃ ইতিহাসের বিবর্তন রেখায় শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে । আদিম জনগোষ্ঠীর কাছে ' বিবাহ ' শব্দের অর্থ ছিল বহন করা কিন্তু বর্তমানে তার অর্থ দাঁড়িয়েছে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া।

উপাদানগত ঃ যে উপকরণ বা উপাদান দিয়ে কোন বস্তু তৈরি হয় সেই উপাদানের নাম বা ধর্ম অনুসারে অনেক সময় বস্তুর নামকরণ করা হয়। কিন্তু বস্তুর উপাদান বদলে গেলেও নাম একই থেকে যায়। যেমন - প্যাপিরাস গাছকে উপাদান হিসাবে কাজে লাগিয়ে কাগজ তৈরি হতো বলে এর নাম হয়েছিল পেপার , বর্তমানে কাগজ তৈরিতে এই উপাদান ব্যবহার করা না হলেও ' পেপার ' নাম বজায় আছে।

✧ সূক্ষ্ম কারণ ঃ

ক. সাদৃশ্য ঃ

অন্য শব্দ সম্পর্কে ধারণার সাদৃশ্যে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়। সাদৃশ্য দুই প্রকার–

১. ধ্বনি সাদৃশ্য ঃ

'রোদসী' শব্দের 'ক্রন্দসী' শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্যের ফলে তৈরি হয়েছে। বৈদিকে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থ ছিল 'গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী সৈনদ্বয়' তার থেকে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থ হয়েছে 'অন্তরীক্ষ' (রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার)।

২. বস্তু সাদৃশ্য ঃ

' তিল হল তৈলের শস্য যা থেকে তেল উৎপন্ন হয়। 'তিল' শস্য অনুযায়ী গায়ের ফোঁটা কালো রংকেও 'তিল' বলা হয়।

খ. ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার ঃ

সাধারণ মানুষের ধারণা অনুযায়ী অশুভ বা বিপদজনক বস্তু নাম উচ্চারণ করতে নাই। তাই 'মৃত্যু' অর্থে 'গঙ্গাপ্রাপ্তি' এবং 'সাপ' অর্থে 'লতা' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

গ. শব্দ প্রয়োগে অসতর্কতা ও অজ্ঞতা ঃ

অনেক সময় শব্দের মূল অর্থ না জেনে শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন — 'সোচ্চার' শব্দটির আমরা 'জোরে বলা' অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু শব্দটির মূল অর্থ 'সশব্দে বমি করা'।

ঘ. অল্পায়াস প্রবণতা ঃ

অনেকটা কুঁড়েমির উপর ভিত্তি করে আমরা শব্দগুচ্ছের কিছুটা অংশ কেটে দিয়ে উচ্চারণ করি। যেমন 'খবরের কাগজ' না বলে শুধু 'কাগজ' বলি।

ঙ. আলংকারিক প্রয়োগ ঃ

সরাসরি আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ না করে অনেক সময় আলংকারিক বাচনভঙ্গি ব্যবহার করা হয়। যেমন 'জেলখানা' অর্থে 'শ্রীঘর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

✧ বিভিন্নপ্রকার শব্দার্থ পরিবর্তন ✧

শব্দার্থ পরিবর্তনের পঞ্চমুখী ধারার সাহায্যে সর্বপ্রকার অর্থ পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা চলে — অর্থের উন্নতি, অর্থের অবনতি, অর্থের সংকোচন এবং অর্থের সংশ্লেষ।

শব্দের অর্থের উন্নতি ঃ —

শব্দের বাচ্যার্থ বা মূল অর্থ অপেক্ষা প্রচলিত অর্থ যদি উচ্চতর ভাব বা বিষয়কে প্রকাশ করে, তবে তাকে বলে শব্দোৎকর্ষ। যেমন -'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ গৃহ, অর্থোন্নতির ফলে হল 'দেবগৃহ'। 'ভোগ' এবং 'ভোজ' এই দুটি শব্দ একার্থ বাচক হলেও 'ভোগ' এখন দেবতার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়। 'সাহস' -এর অর্থ যা সাহস করা হয় অর্থাৎ কিনা হঠকারিতা, কিন্তু এখন অতিশয় প্রশংসার্থক অর্থে ব্যবহৃত। আদর করে যখন 'দুষ্ট', 'পাজি', 'বদমাশ', 'পাগলা' প্রভৃতি শব্দব্যবহার করা হয় তখন তাদের ও অর্থোন্নতি ঘটে।

অর্থের অবনতি ঃ

শব্দের বাচ্যার্থ বা মূল অর্থ উৎকর্ষবাচক হলেও প্রচলিত অর্থ যদি অপেক্ষাকৃত হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে বলা হয় অর্থের অবনতি। 'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি, কিন্তু বর্তমানে উত্তমর্ণ, সুদখোর ব্যক্তি হিসাবে ব্যবহৃত। ইতর শব্দের অর্থ ছিল 'অপর ব্যক্তি' পরিবর্তিত অর্থ হল নীচ ব্যক্তি। পূর্বে 'রাগ' এর

অর্থ ছিল 'আকর্ষণ' এখন তা দাঁড়িয়েছে 'ক্রোধ'। মহাকাব্যিক চরিত্রের ও অর্থাবনতি ঘটে। যেমন — ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এখন ব্যঙ্গার্থে 'ধম্মপুত্ত যুধিষ্ঠির'।

অর্থের সংকোচন ঃ

প্রথমে কোনো শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপকভাবকে বোঝায় এবং কিছু কাল পরে যদি তার অর্থ একটিমাত্র ভাব বা বস্তুকে বোঝায় , তবে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থসংকোচ বলে। অর্থ সমষ্টির মধ্যে যদি কোনো একটি প্রধান হয়ে উঠে অথবা সমষ্টিবাচক শব্দকে ব্যষ্টি অর্থে, সমগ্র থেকে অংশকে কিংম্বা কারণবাচক শব্দ থেকে অর্থবাচক শব্দকে বোঝায় তখনই শব্দের অর্থসংকোচ হয়। 'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ খাদ্য বস্তু। বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত, তাই এখন অন্ন খাদ্যবস্তুকে না বুঝিয়ে শুধু ভাতকেই বোঝায়। 'মৃগ' শব্দের মূল অর্থ পশু, অর্থ সংকোচের ফলে হয়ে গেছে হরিণ। সংস্কৃতে 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ ছিল সমস্ত প্রকারের আলো, কিন্তু আধুনিক বাংলায় পিতল বা মাটির তৈরি আলো প্রদানকারী বিশেষকে বোঝায়।

অর্থ সংকোচনের ফলে অর্থের অবনমনও ঘটে থাকে। যেমন — 'কৃপণ' শব্দের অর্থ ছিল 'কৃপার পাত্র' কিন্তু এখন 'ব্যয় কুণ্ঠ ব্যক্তিকেই' বোঝায়। 'পঙ্কজ' শব্দের মূল অর্থ পঙ্কজাত পদ্ম, শ্যাওলা, গুগলি, ঝিনুক সবই পঙ্কে জন্মায় কিন্তু এখন 'পঙ্কজ' বলতে পদ্মফুলকেই বোঝায়। 'সাহেব' শব্দটি আরবি (সাহিব) ভাষা থেকে এসেছে । আরবিতে এর অর্থ শাসন কর্তা বা সম্রাট শেযে অর্থের সংকোচ ঘটল ইউরোপীয় পুরুষ অর্থে শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

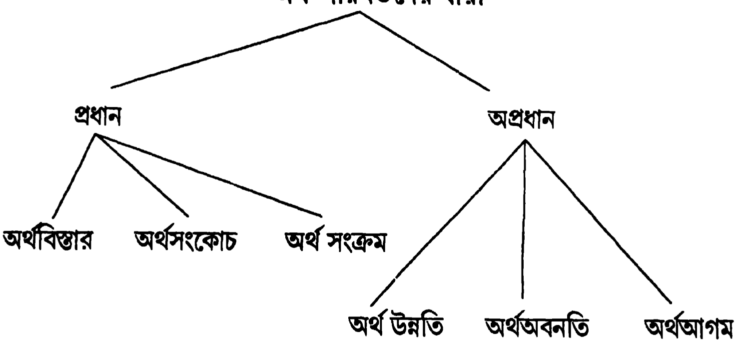
অর্থের প্রসার ঃ

শব্দের মূল অর্থ যখন কোনো কারণে বস্তুর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বস্তু নিরপেক্ষ হয় তখনই তার প্রসার ঘটে। গৌরচন্দ্র অবলম্বনে গীতই ছিল 'গৌরচন্দ্রিকা' এখন যেকোন বিষয়েই প্রারম্ভিক আলোচনা বোঝাতে গৌরচন্দ্রিকা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কালো রং এর লেখার উপাদান ছিল কালি, এখন কিন্তু রঙের প্রসার ঘটায় লাল, সবুজ, কালো হলদে যে কোন রকম রং এর লেখা তরল পদার্থকেই বোঝায়। বিশেষ নদী গঙ্গা থেকে জাত গাও অর্থে যেকোন নদীকেই বোঝায়। ব্যক্তির নাম বস্তু নিরপেক্ষ হয়ে অনেক সময় সাধারণ বস্তু বা ভাবের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়, যেমন — লেডি ক্যানিং এর নাম থেকে 'লেডিকেনি' নামক মিষ্টি। কোনো স্থান থেকে আগত বস্তুর নাম থেকে ঐ স্থানের নামের যোগাযোগেও শব্দার্থের প্রসার ঘটে। বাটাভিয়া থেকে আগত 'বাতাবিলেবু', চীন থেকে আগত 'চিনি', মার্তাবান থেকে আগত 'মর্তমান' কলা এই জাতীয় দৃষ্টান্ত। মির্জাফর মূলত এক ব্যক্তির

নাম, কিন্তু এখন যেকোন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই আমরা এই শব্দটি ব্যবহার করি। 'ধন্য' শব্দের মূল অর্থ 'ধনশালী' অর্থ সম্প্রসারণে 'সর্বসৌভাগ্যবান'। অর্থ বিস্তারের ফলে অনেক সময় অর্থ প্রতীক স্থানীয় হয়ে পড়ে। যেমন, 'ভাত'= সিদ্ধ চাউল > জীবিকা সংস্থান, 'বদন = যে অঙ্গ কথা বলে> মুখ (আদর অর্থে)। একই স্থান নাম একাধিক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বোঝাতে পারে। যেমন — বাংলায় চিনি (মিষ্ট চূর্ণ ও ইংরাজি 'China'/মসৃণ পোড়ামাটির বাসনপত্র) একই দেশনাম থেকে এসেছে।

সেকালের লোক আত্মীয়কুটুম্বের 'তত্ত্ব' বা 'সন্দেশ' অর্থাৎ কুশলবার্তা নেওয়ার উপলক্ষে মিষ্টান্ন উপহার পাঠাত। তা থেকে এরূপ মিষ্টান্ন উপহারের সাধারণ নাম হল 'তত্ত্ব' শব্দ এখনো চলিত আছে। কিন্তু 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ আরও সঙ্কুচিত হয়ে ছানা চিনি সংযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিশেষে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ থেকে সাধারণ অর্থ পরিবর্তনের উদাহরণ 'সিধা' মূল অর্থ সিদ্ধ অর্থাৎ রান্না করা খাবার দ্রব্যাদি, এখন অর্থ চাল, ডাল, ঘি, নুন ইত্যাদি শুদ্ধাচারীদের অপর খাদ্য সম্ভার। শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি হল প্রধান আর অন্যটি অপ্রধান। এই ধারাগুলিকে আবার তিনটি আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করা যায় —

অর্থ পরিবর্তনের ধারা



সূত্রাকারে বিষয়টি —

✧ **প্রধান ধারা ঃ**

ক. **অর্থবিস্তার ঃ**

যদি কোন শব্দ প্রথমে কোন সংকীর্ণভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে তা ব্যাপক ভাব বা অধিকতর বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থবিস্তার বলে। সংস্কৃত শব্দে 'বর্ষ' শব্দের অর্থ ছিল 'বর্ষাকাল' কিন্তু বাংলায় এখন 'বর্ষ' শব্দের অর্থ সারাবছর অর্থাৎ মিলিত ছয় কাল।

খ. **অর্থ সংকোচ ঃ**

প্রথমে কোন শব্দের অর্থ যদি বস্তুকে বা ব্যাপকভাবকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে যদি তার অর্থ একাধিক বস্তু বা বৃহত্তর ভাবকে না বুঝিয়ে তার মধ্যে একটি মাত্র ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তাকে অর্থ সংকোচ বলে। যেমন সংস্কৃতে 'প্রদীপ' শব্দের বদলে এখন কেবল মাটি বা পিতলের তৈরি সলতে বা পলতে দিয়ে তৈরি আলো।

গ. **অর্থসংক্রম ঃ**

ধাপে ধাপে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হতে হতে শব্দ কোন নতুন অর্থে পৌঁছায়, এই ধরণের পরিবর্তনকে অর্থসংক্রম বলে। সংস্কৃতে 'ঘর্ম' শব্দের অর্থ হল গরম, বাংলায় এর অর্থ কেবল ঘাম। ঘর্ম > ঘম্ম > ঘাম।

✧ অপ্রধান ধারা ঃ

ক. **অর্থ উন্নতি ঃ**

প্রথমে শব্দের অর্থ মন্দ, বা সাধারণ ছিল, পরে শব্দের অর্থ ভালো বা যথার্থ প্রয়োগ ভিত্তিক হয়ে উঠেছে। এই প্রক্রিয়াটিকে অর্থ উন্নতি বলে। যেমন সংস্কৃতে 'বাতুল' শব্দের অর্থ হল 'উন্মাদ', বায়ুগ্রস্থ, পাগল ইত্যাদি। বাতুল > বাউল। বাংলায় 'বাউল' শব্দের বর্তমান অর্থ সহজিয়া ধর্মের মানুষ বা বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় বলতেই বোঝায় ।

খ. **অর্থ অবনতি ঃ**

আদিতে শব্দের অর্থ সাধারণ উৎকর্ষ ছিল পরে এই অর্থ বদল ঘটে তা অপকর্ষ বাচক হয়েছে। যেমন— 'ইতর লোক' বলতে বোঝাত অন্য লোক কিন্তু বর্তমানে শব্দটির অর্থ 'ছোটলোক' বা হীন মানসিকতা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

গ. **অর্থ আগম ঃ**

শব্দের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে নতুন অর্থের আগমন ঘটে। 'পাকা' শব্দটিকে প্রসারণ কাজে লাগালে বিভিন্ন শব্দের পূর্বে বসে তা ভিন্ন তাৎপর্য লাভ করে।

যেমন — পাকা ফল — কাঁচা থেকে পাকা অর্থে
পাকা কাজ — মজবুত অর্থে
পাকা মাথা — অভিজ্ঞ অর্থে
পাকা বাড়ী — ইঁটের তৈরি অর্থে
পাকা লোক — অভিজ্ঞতা অর্থে

সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তনের মতো অর্থ পরিবর্তনের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

✧ শব্দার্থ পরিবর্তন ✧

মূলশব্দ	আদি অর্থ	প্রচলিত অর্থ	পরিবর্তনের রীতি
অনবরত	বিশ্রামহীন	সর্বদা	অর্থের সংক্রম
অভাব	অবিদ্যামানতা	অনটন	অর্থের সংকোচ
অমায়িক	ছলচাতুরিশূন্য	সদালাপী, মধুর স্বভাব	অর্থের প্রসার
অপরূপ	কদাকার	অতিসুন্দর	অর্থের সংক্রম
অভিমান	জ্ঞান	অহংকার	অর্থের অবনতি
অভিযান	অগ্রগমন	দুঃসাহসিক যাত্রা	অর্থের সংকোচ
অধিকার	পরিদর্শন	স্বত্ব, প্রভুত্ব	অর্থের সংকোচ
অঙ্গীকার	অঙ্গীকরণ	প্রতিজ্ঞা	অর্থের সংক্রম
অরুণ	রক্তবর্ণ সূর্যসারথি	সূর্য	অর্থের সংক্রম
অনুগ্রহ	দুঃখ দূর করা	দয়া	অর্থের প্রসার
অমূলক	যার মূল নাই	অকারণ	অর্থের সংক্রম
অদৃষ্ট	অদেখা	ভাগ্য	অর্থের সংক্রম
অপেক্ষা	মন্দভাবে চেয়ে থাকা	চেয়ে	অর্থের সংক্রম
অন্ত	মৃত্যু	শেষ	অর্থের প্রসার
অস্ত্র	ক্ষেপণ যোগ্য	হাতিয়ার	অর্থের সংকোচ
অন্ন	খাদ্য	ভাত	অর্থের সংকোচ
অগ্রণী	প্রধান	নায়ক	অর্থেব উন্নতি
অর্ধচন্দ্র	অর্ধেক চাঁদের মত	গলাধাক্কা	অর্থের সংক্রম
আরতি	প্রেম	প্রদীপাদি যোগে পূজা	অর্থের সংক্রম
আড়ম্বর	তূর্যধ্বনি	জাঁকজমক	অর্থের সংক্রম
আসল	মূল, প্রকৃত	মূলধন	অর্থের সংকোচ
আসার	মুষলধারে বৃষ্টি	জল	অর্থের প্রসার
আহ্নিক	প্রাত্যহিক	সন্ধ্যাবন্দনা	অর্থের সংকোচ
আর্দ্র	যার মধ্যে প্রবিষ্ট	সিক্ত	অর্থের সংকোচ
আক্রোশ	দুর্বাক্য প্রয়োগ	রাগ	অর্থের সংক্রম
আস্তরণ	বিস্তার	আচ্ছাদন	অর্থের প্রসার
ইতর	অপর	নিম্নশ্রেণির লোক	অর্থের অপকর্ষ
ইষ্ট	অভিপ্রেত	উপাস্য	অর্থের উন্নতি

ইতি	এই	শেষ	অর্থের সংক্রম
ইতিহাস	ইত্যকার কাহিনি	ইতিকথা	অর্থের সংকোচ
উদবৃত্ত	বৃত্ত থেকে উদ্গত	বাড়তি	অর্থের সংক্রম
উৎকৃষ্ট	উত্তমরূপে কর্ষিত	শ্রেষ্ঠ	অর্থের সংক্রম
উজবুক	উজবেকিস্তানের লোক	নির্বোধ	অর্থের সংক্রম
উপদ্রব	দৈববিপদ	অত্যাচার	অর্থের প্রসার
উত্তর	পার হওয়া	জবাব	অর্থের সংক্রম
উকিল	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী	আইনজীবী	অর্থের সংক্রম
উদ্দাম	বন্ধনমুক্ত	উচ্ছৃঙ্খল	অর্থের প্রসার
উল্কা	জ্যোতিঃপুঞ্জ	আকাশে চলনশীল পিণ্ড	অর্থের সংকোচ
কলহ	মাধুর্যহীন শব্দ	বিবাদ, ঝগড়া	অর্থের সংকোচ
কনে	কন্যা	বিবাহের পাত্রী	অর্থের সংকোচ
কাতর	আর্ত	ব্যাকুল	অর্থের প্রসার
কানকাটা	কর্তিত কান	নির্লজ্জ	অর্থের সংক্রম
কাণ্ড	গাছের গুঁড়ি	ব্যাপার	অর্থের সংকোচ
কালি	কাল রং	লেখার জন্য তরল পদার্থ	অর্থের প্রসার
কাপুরুষ	কুৎসিত পুরুষ	ভীরু	অর্থের রূপান্তর
কৃত্রিম	ক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন	জাল, ভেজাল	অর্থের সংক্রম
কৌশল	নৈপুণ্য	চাতুর্য	অর্থের সংক্রম
খুন	রক্ত	হত্যা	অর্থের সংক্রম
গবাক্ষ	চোখের মত ঘুলঘুলি	জানালা	অর্থের প্রসার
গবেষণা	গরুখোঁজা	তত্ত্বানুসন্ধান	অর্থের উৎকর্ষ
গণ্য	গণনার যোগ্য	মান্য, মনে করা	অর্থের সংকোচ
গঙ্গাপ্রাপ্তি	গঙ্গাকে পাওয়া	মৃত্যু	অর্থের সংক্রম
গাঙ	গঙ্গা	যে কোন নদী	অর্থের বিস্তার
গ্রাম	সমূহ	পাড়াগাঁ	অর্থের সংক্রম
গৃহস্থ	গৃহে স্থিত	সংসারী লোক	অর্থের সংকোচ
গোধুলী	গরুর ক্ষুরে উড়া ধুলো	সন্ধ্যা	অর্থের সংক্রম
গৌরব	গুরুত্ব, গুরুত্বভাব	মর্যাদা, সম্মান	অর্থের প্রসার
গৌরচন্দ্রিকা	গৌরচন্দ্রবিষয়ক পদ	ভূমিকা	অর্থের প্রসার
গ্রন্থ	গাঁথা	বই	অর্থের সংক্রম
ঘন	মেঘ	পুরু, নিবিড়	অর্থের সংক্রম
ঘর	পরিবার	গৃহ	অর্থের সংক্রম

ঘর্ম	গরম	ঘাম, স্বেদ	অর্থের সংক্রম
ঘাস	খাদ্য	তৃণ	অর্থের সংকোচ
ঘৃণা	অনুকম্পা	বিদ্বেষ	অর্থের সংক্রম
চরণ	গমনের উপায়	পা	অর্থের সংকোচ
চরিত্র	আচরণ	স্বভাব, প্রকৃতি	অর্থের উন্নতি
চণ্ডী	অতি কোপনা স্ত্রী	দুর্গা	অর্থের সংক্রম
চক্রান্ত	চক্রের শেষ	ষড়যন্ত্র	অর্থের সংক্রম
চামার	চামড়ার কর্মী	নির্লজ্জ ব্যক্তি	অর্থের সংক্রম
ছল	প্রতারণা, শঠতা	হেতু	অর্থের সংক্রম
ছন্নছাড়া	ছন্দোহীন	এলোমেলো	অর্থের প্রসার
জগৎ	গমনশীল	পৃথিবী	অর্থের সংকোচ
জন্য	জননীয়, উৎপাদ্য	নিমিত্ত	অর্থের সংক্রম
জন্তু	জন্মে যে	পশু	অর্থের সংকোচ
জাপ্য	জপনীয়	গোপন	অর্থের প্রসার
জ্যাঠামী	জ্যেষ্ঠের মত ব্যবহার	পাকামি	অর্থের সংক্রম
ঝি	মেয়ে	দাসী	অর্থের অবনতি
ঠাকুর	গুরুজন দেবতা	পাচক	অর্থের অবনতি
তদন্ত	তার শেষ	অনুসন্ধান	অর্থের সংক্রম
তৎক্ষণাৎ	সেই ক্ষণ থেকে	তখনই	অর্থের সংকোচ
তপন	তপ্তকারী	সূর্য	অর্থের সংকোচ
তিতিক্ষা	ক্ষমা করার ইচ্ছা	ক্ষমাপরায়ণতা	অর্থের প্রসার
তৈল	তিল থেকে জাত	যে কোন তেল	অর্থের প্রসার
দন্ত	দমন করার উপায়	দাঁত	অর্থের সংকোচ
দণ্ড	লাঠি	শাসন, সাজা	অর্থের সংকোচ
দারুণ	কঠোর, কাঠের মত	খুবই ভাল	অর্থের সংক্রম
দ্বারস্থ	দ্বারস্থিত	প্রার্থী	অর্থের সংকোচ
দ্বিজ	দুবারে জাত	ব্রাহ্মণ	অর্থের সংকোচ
দুর্গ	যেখানে গমন দুঃসাধ্য	কেল্লা	অর্থের সংকোচ
দুহিতা	দোহণকারী	কন্যা	অর্থের রূপান্তর
ধরণী	ধারণশীলা	ভূমি	অর্থের সংকোচ
ধরা	যে ধারণ করে	পৃথিবী	অর্থের সংকোচ
ধর্ম	ধারণশীল	পুণ্যকর্ম, ঈশ্বর বিষয়ক	অর্থের সংক্রম
ধারা	জলের পতন	ক্রম	অর্থের সংক্রম

ধামাধরা	যে ধামা ধরে	তোষামুদে	অর্থের সংক্রম
ধুনী	নদী	অগ্নিকুণ্ড	অর্থের সংক্রম
নয়ন	রা নীত হয়	চোখ	অর্থের সংক্রম
নাগর	নগরবাসী	অবৈধ প্রেমিক	অর্থের সংক্রম
নিপাত	নিম্নে পতন	বিনাশ	অর্থের সংক্রম
নাস্তানাবুদ	যা নেই এবং ছিল না	নাকাল, নাজেহাল	অর্থের সংক্রম
নির্বাসন	গৃহ থেকে বহিষ্কার	দেশ থেকে বহিষ্কার	অর্থের সংকোচ
নৃশংস	নর হিংসক	অত্যন্ত নিষ্ঠুর	অর্থের সংক্রম
নেতা	বাহক	নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি	অর্থের প্রসার
নেত্র	যার দ্বারা নীত হয়	নয়ন, চোখ	অর্থের সংকোচ
নাস্তিক	বেদবিরোধী	ঈশ্বরের রূপগ্রহণ	অর্থের বিস্তার
নবান্ন	নতুন অন্ন	উৎসব বিশেষ	অর্থের রূপান্তর
পঙ্কজ	পাঁকে জন্মে যা	পদ্মফুল	অর্থের উৎকর্ষ
পণ	মূল্য	প্রতিজ্ঞা	অর্থের সংক্রম
পটল তোলা	পটলকে তোলা	মারা যাওয়া	অর্থের সংক্রম
পত্র	পাতা	চিঠি	অর্থের সংক্রম
পলাশ	মাংস যার খাদ্য	ফুল বিশেষ	অর্থের সংক্রম
পা-চাটা	পা চাটে যে	হীন, তোষামুদে লোক	অর্থের সংক্রম
পরাভব	নিন্দিত হওয়া	পরাজয়	অর্থের সংক্রম
পাষণ্ড	ভিন্নধর্মের লোক	অত্যাচারী	অর্থের সংক্রম
পাহাড়	পাষাণ	ক্ষুদ্রপর্বত	অর্থের প্রসার
পীতাম্বর	হলুদ কাপড় পরা ব্যক্তি	কৃষ্ণ	অর্থের সংকোচ
পীত	যা পান করা হয়েছে	হলুদ	অর্থের সংক্রম
পুরোহিত	সম্মুখের হিতকারী	পূজারী ব্রাহ্মণ	অর্থের সংকোচ
পিরিতি	প্রেম	অবৈধ প্রেম	অর্থের অপকর্ষ
পৌরুষ	পুরুষত্ব	বীরত্ব	অর্থের সংকোচ
প্রজা	প্রকৃষ্টভাবে জাত	রাজার শাসিত ব্যক্তি	অর্থের সংকোচ
প্রতিকূল	কুলের বিপরীত	বিরুদ্ধ	অর্থের প্রসার
প্রশস্ত	প্রয়োগকরণ	আবশ্যক	অর্থের সংক্রম
প্রসঙ্গ	প্রস্তাব	বিষয়	অর্থের সংক্রম
প্রসাদ	প্রসন্ন ভাব	অনুগ্রহ	অর্থের প্রসার
প্রভাত	প্রকৃত উজ্জ্বল	সকাল	অর্থের সংকোচ
প্রস্তুত	প্রকৃত স্তুতি যুক্ত	তৈরি	অর্থের সংক্রম

প্রেত	বিগত	ভূত	অর্থের সংকোচ
ফলার	ফলের আহার	ভাত বাদে অন্য খাবার	অর্থের প্রসার
বদন	যার দ্বারা কথা বলা হয়	মুখমণ্ডল	অর্থের প্রসার
বস্ত্র	আচ্ছাদন	পরিধান	অর্থের সংকোচ
বর	দেবতালব্ধ বিষয়	বিবাহের পাত্র	অর্থের সংক্রম
বর্ষ	বর্ষাকাল	বছর	অর্থের প্রসার
বর্বর	অনার্য জাতি	অসভ্য	অর্থের অবনতি
বনস্পতি	ফুল বাদে ফল হয় যে গাছে	বৃহৎ গাছ, বৃক্ষ	অর্থের সংকোচ
বিদায়	যাত্রার অনুমতি	প্রস্থান	অর্থের প্রসার
বিরল	অল্প	নির্জন স্থান	অর্থের সংকোচ
বিষম	অসম	ভীষণ	অর্থের সংক্রম
বিলক্ষণ	বিশেষ চিহ্নহীন	ভালরকম	অর্থের সংক্রম
বিবাহ	বিশেষভাবে বহন	পরিণয়	অর্থের রূপান্তর
বিধি	নিয়ম	ঈশ্বর	অর্থের সংক্রম
বিভীষণ	অতি ভীষণ	রাবণের ভ্রাতা	অর্থের সংক্রম
বিজ্ঞান	বিশেষ জ্ঞান	তত্ত্ববিদ্যা	অর্থের সংক্রম
বিশ্ব	পৃথিবী	লোক	অর্থের প্রসার
বৃত্তি	বিদ্যামানতা	পেশা	অর্থের সংকোচ
বৃদ্ধ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত	বুড়ো	অর্থের সংকোচ
বেদ	জ্ঞান	হিন্দু ধর্মগ্রন্থ	অর্থের প্রসার
বেদনা	অনুভূতি	ব্যথা	অর্থের সংকোচ
ব্যক্তি	ব্যক্ত আছে যা	লোক	অর্থের সংক্রম
ব্যঘ্র	বিশেষভাবে ঘ্রাণশীল	বাঘ	অর্থের সংকোচ
ব্রাহ্মণ	ব্রহ্মজ্ঞ	বামুন	অর্থের প্রসার
ভদ্র	কল্যাণ	সুসভ্য	অর্থের সংক্রম
ভিন্ন	বিভক্ত	ব্যতীত, ছাড়া	অর্থের সংক্রম
ভীমা	ভীষণা	চণ্ডী	অর্থের সংকোচ
ভূত	জীব, অতীত	প্রেত	অর্থের সংকোচ
ভুজঙ্গ	হাতে ভর দিয়ে ভ্রমণকারী	সাপ	অর্থের সংক্রম
ভ্রূক্ষেপ	দৃষ্টিপাত	গ্রাহ্য করা	অর্থের সংক্রম
ভেষজ	ভয়কে জয় করে যে	ঔষধ	অর্থের সংক্রম
মহাজন	মহৎ ব্যক্তি	সুদখোর	অর্থের অপকর্ষ
মন্দির	গৃহ	দেবতার আলয়	অর্থের উৎকর্ষ

মরদ	পুরুষ	শক্তিমান যুবক	অর্থের সংকোচ
মদ	অহংকার	সুরা	অর্থের রূপান্তর
মন্বন্তর	মনুর পরিবর্তন	দুর্ভিক্ষ	অর্থের রূপান্তর
মৃগয়া	মৃগ শিকার	যে কোন পশু শিকার	অর্থের বিস্তার
যম	আত্মদান	মৃত্যুদেবতা	অর্থের সংক্রম
যবনিকা	মঞ্চাবরণ	পর্দা	অর্থের প্রসার
যৎকিঞ্চিত	যা কিছু মাত্র	সামান্য	অর্থের সংকোচ
যন্ত্র	নিয়ন্ত্রণ	কল, মেশিন	অর্থের সংক্রম
রত	আসক্ত	নিযুক্ত	অর্থের সংকোচ
রক্ত	রঞ্জিত	শোনিত	অর্থের সংকোচ
রাজস্ব	রাজসম্পদ	খাজনা	অর্থের সংকোচ
রাগ	রঞ্জক দ্রব্য, প্রেম	ক্রোধ	অর্থের সংক্রম
রাবণ	ভীতিজনক	দশানন	অর্থের সংকোচ
রেত	বালুকাময় জমি	নদীর স্রোত	অর্থের সংক্রম
রৌদ্র	রুদ্রের ভাব	সূর্যের আলোক	অর্থের প্রসার
রাধা	আরাধিকা	বৃষভানু ও কলাবতীর কন্যা	অর্থের সংশ্লেষ
রাঙ্গা	রঙীন	লাল	অর্থের সংকোচ
লাবণ্য	লবণের ভাব	সৌন্দর্য	অর্থের সংক্রম
লিপি	চিত্র, বর্ণমালা	চিঠি	অর্থের সংক্রম
লুপ্ত	লোপপ্রাপ্ত	অদৃশ্য	অর্থের সংকোচ
শপথ	শাপ, আক্রোশ	প্রতিজ্ঞা	অর্থের সংক্রম
শব	যা পচে বা নষ্ট হয়	মৃতদেহ	অর্থের সংকোচ
শ্বাপদ	কুকুরের পা	হিংস্র জন্তু	অর্থের বিস্তার
শিবির	শয়ন স্থান	সেনানিবাস	অর্থের সংকোচ
শ্রীঘর	লক্ষ্মীনিবাস	জেলখানা	অর্থের সংক্রম
শুশ্রূষা	শ্রবণেচ্ছা	সেবা	অর্থের সংক্রম
শ্বশুর	যিনি শীঘ্র খান	পতি পত্নীর পিতা	অর্থের সংক্রম
সঘন	মেঘমুক্ত	ঘনঘন	অর্থের সংক্রম
সমগ্র	সঙ্গত অগ্র যার	সম্পূর্ণ	অর্থের সংক্রম
সমাচার	শিষ্টাচার	সংবাদ	অর্থের সংক্রম
সম্বল	পাথেয়	অবলম্বন	অর্থের প্রসার
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন	অর্থের রূপান্তর
সংস্কৃত	সংস্কার করা হয়েছে যা	ভাষা	অর্থের সংকোচ

সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	রাজাসন	অর্থের উৎকর্ষ
সংসার	জগৎ	পরিবার	অর্থের রূপান্তর
সন্তান	প্রসারণকারী	পুত্রকন্যা	অর্থের রূপান্তর
সাধারণ	সমান আধার বিশিষ্ট	সামান্য	অর্থের সংক্রম
সাঙ্গ	অঙ্গ সহ	অবসান	অর্থের সংক্রম
সিংহনাদ	সিংহের গর্জন	হুঙ্কার	অর্থের প্রসার
স্বীকার	আয়ত্তীকরণ	মেনে নেওয়া	অর্থের প্রসার
হঠাৎ	বলপূর্বক	সহসা	অর্থের সংক্রম
হর	হরণকারী	মহাদেব	অর্থের সংকোচ
হিন্দু	সিন্ধু পারের বাসিন্দা	বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়	অর্থের রূপান্তর
হরিণ	হরণকারী	মৃগ	অর্থের রূপান্তর
হেয়	ত্যাজ্য	ঘৃণ্য	অর্থের সংকোচ
ক্ষান্ত	সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল	বিরত	অর্থের সংক্রম
ক্ষেপণ	দূরে নিক্ষেপ	(দিন) যাপন	অর্থের সংক্রম

ভারতীয় অন্-আর্য শাখা

পৃথিবীর ভাষাগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি যে প্রধান প্রধান ভাষা গোষ্ঠির মধ্যে চারটি গোষ্ঠি আধুনিক ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে। এই গোষ্ঠিগুলি হল — (১) ইন্দো-ইউরোপীয় (২) অষ্ট্রিক (৩) দ্রাবিড় (৪) ভোট-চীনীয়। আগেই বলেছি যে প্রথম তিনটি ভাষাগোষ্ঠির প্রবেশ পথ ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আর ভোট-চীনীয় গোষ্ঠির প্রবেশ ঘটে উত্তর-পূর্ব পথে।

ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রধান জাতি অনুযায়ী এগুলির বিকল্প নাম দিয়েছেন। (১) আর্য (২) নিষাদ (৩) দ্রামিড় বা দ্রাবিড় (৪) কিরাত। এই সব ভাষাভাষি জাতি ছাড়া আরও দুটি আদি জাতি ভারতে প্রাচীনকালে এসেছিল — সেমেটিক ও নিগ্রো। কিন্তু এদের কোন ভাষা ভারতবর্ষে বর্তমানে আর প্রচলিত নেই। তবে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শেষ চিহ্ন থাকলেও থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেছেন।

ভাষাবিদ্রা বলছেন যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রথম নরগোষ্ঠি হিসাবে অষ্ট্রিকরা ভারতে প্রবেশ করে। সম্ভবত গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব, খাদ্য ও পশুচারণ ক্ষেত্রের সংকটে তারা ভারতের উত্তর-পূর্বে সরে যায়। তারপর আসে দ্রাবিড়রা । খ্রিষ্ট পূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করলে গোষ্ঠি দ্বন্দ্বে দ্রাবিড় গোষ্ঠি পরাস্ত হয়ে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে থাকে। দ্বিতীয়বার আবার এক আর্যগোষ্ঠি ভারতে আসে এবং প্রথম গোষ্ঠীকে ঠেলে দেয়। তৃতীয় আর একটি গোষ্ঠি ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবেশ করে সেটি হল ভোট-চিনিয় গোষ্ঠী । শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য এই আর্যেতর গোষ্ঠির নামকরণ করেছেন 'মঙ্গোল বা কিরাত'।

ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য যে সব গোষ্ঠির ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে সেগুলিকেই আমরা অন্-আর্য ভাষা বলছি। এগুলি হল —

(১) অষ্ট্রিক (নিষাদ) ভাষা গোষ্ঠি ঃ

(২) দ্রাবিড় (দ্রামিড়) ভাষা গোষ্ঠি ঃ

(৩) ভোট-চীনীয় (কিরাত) ভাষাগোষ্ঠি ঃ

এই ভাষাগুলির উৎস, পরিচয়ও বাংলায় এদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

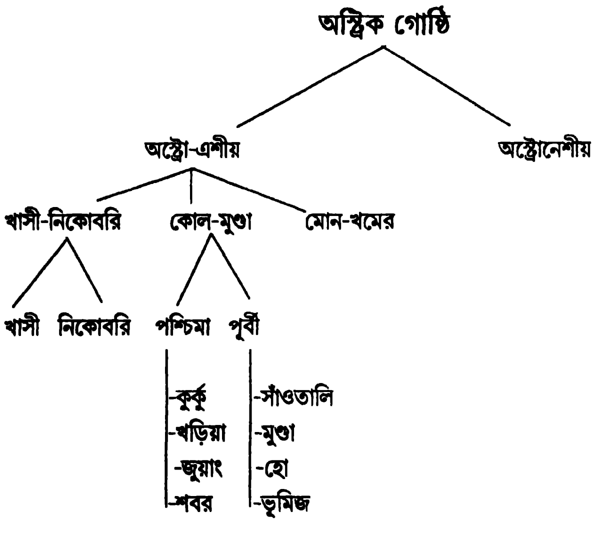
✧ অস্ট্রিক (নিষাদ) ভাষাগোষ্ঠি ✧

কোথা থেকে কিভাবে অস্ট্রিক গোষ্ঠির মানুষ ভারতে এল তার সুনির্দিষ্ট সমাধান করা সম্ভব হয় নি। সুনীতিবাবুর অনুমান প্রটো অষ্ট্রালয়েডরা মধ্য এশিয়ার সম্ভবত প্যালেস্টাইন থেকে ভারতে এসেছিল। রামেশ্বর শ' মনে করেন—

> পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রত্ন-অষ্ট্রালয়েড্ (Proto-Australoid) জাতির যে শাখা ভারতে এসেছিল তারাই এখানকার পূর্ববর্তী অধিবাসী নিগ্রোদের সঙ্গে মিশে অস্ট্রিক জাতির সৃষ্টি করে। ভারতে এখন যে সব বংশের ভাষা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অস্ট্রিক বংশই হলো ভারতে আগত প্রাচীনতম বংশ।

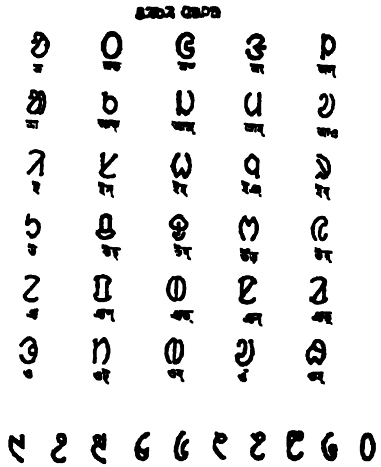
ভারতে প্রচলিত অস্ট্রিক বংশের ভাষাগুলির জন্ম-উৎস নিম্নে দেওয়া হলো —

মুন্ডা বা কোল ঃ পশ্চিমা — শবর, কর্কু, খড়িয়া, জুয়াং
পূর্বী — সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, কোডা, ভূমিজ ইত্যাদি।



এই গোষ্ঠির ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সাঁওতালি। ভাষাচর্চার দিক থেকে সাঁওতাল ভাষাভাষী জনসাধারণের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। সাঁওতালি ভাষা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেই বেশি প্রচলিত। এই ভাষায় এখন নিজস্ব লিপি অল চিকিতে লিখিত হয়। রঘুনাথ মুর্মু এই লিপি তৈরি করেছেন । এই লিপির দু-একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে —

অল চিকি



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার পরেই সাঁওতালি ভাষায় বেশি সংখ্যক মানুষ কথা বলে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি জুড়ে সাঁওতালদের বাস। সাঁওতালরা 'মুণ্ডা' নামেও পরিচিত। তাই শহীদুল্লাহ্ অনার্য বলতে মুণ্ডাকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে —

> "...বাঙ্গালার অষ্ট্রিক ভাষীরা বাঙ্গালা ভাষায় কেবল তাহাদের বাক্‌ভঙ্গীর ছাপই রাখিয়া যায় নাই, ইহার শব্দকোষেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বহু শব্দ যোগ করিয়াছে।"

বাংলাদেশের নানা নামকরণেও অষ্ট্রিক গোষ্ঠির ভাষা ছড়িয়ে আছে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে —

> " বাংলাব প্রাচীন জনপদ বিভাগের মধ্যে পুণ্ড্র-পৌণ্ড্র তামলিত্তি-তাম্রলিপ্তি-দামলিপ্তি এবং বোধহয় গঙ্গা (নদী) ও বঙ্গ এই দুটি নামও এই একই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর অন্তত এই দুটি নদীর নামও কোল কব-দাক্ এবং দাম-দাক্ হইতে গৃহীত।..."

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী তাঁর ' A Comparative Study of Santali and Bengali ' গ্রন্থে সাঁওতালি ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অভিন্ন শব্দাবলীর একটি তালিকা দিয়েছেন। ঐ তালিকায় অনার্য উৎস থেকে বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় আগত নিম্নোক্ত দেশি ও ধন্যাত্মক শব্দ রয়েছে।

✧ দেশি শব্দ

অ : অঢেল।

আ : আড্ডা, আধা খেঁচড়া, আকাট, আটক, আলাঝালা, আলু, আড়ি, আটাআটি, আড়ি।

উ : উলোট, উল্টা, উল্টানো, উল্টানোপাল্টানো, উড়ি (ধান), উসানো, উটকানো, উজাড়,উচ্ছে।

এ : এড়ানো।

ক : কচলানো, কদু, কলি (ঠাণ্ডা), কলি, কাঙ্গাল, কপচানো, কাটারী, কোল, কিল, কিলাকিলি, কিরা, কচাল, কোন্দল, কোড়া, করঞ্চা, কয়াল, কুটা, কুঁকড়ানো, কুলান, কলু, কুলি, কুড়ি, কুড়ে, কুটা।

খ : খাবলা, খাঁইখাঁই, খাল, খামচানো, খামচা খামচি, খাঁচা, খাঁজ, খাপ, খাঁড়ি, খড়ি, খোশ (পাঁচড়া), খাটুনি, খাটো, খাটাও, খেদা, খিচুরি, খিলান, খিলি, খেলি, খিড়কি, খোঁচা, খোঁজ, খোঁজা, খোরা, খোঁড়া, খসড়া, খোটা, খোলা, খোলাখুলি, খুঁটি, খোঁটা, খুপি, খুপরি, খুঁটাখুঁটি, খটাশ, খুটিনাটি, খুলি (১০ সের)।

গ : গাঁ, গণ্ড (গ্রাম), গাব, গাবানো, গারাও, গাদ, গাদা, গালি, গালগল্প (গল্প), গণ্ডা, গাঁজা, গড়, গোবর, গোদা, গোঁজ, গুজি, গজাল, গোল, গোলা, গোলাঘর, গলায়, গল্প-সল্প, গণ্ডগোল, গড়, গড়পরতা, গোটা, গুটানো, গুছানো, গোমরানো, গুড়া, গুড়, গুলানো।

ঘ : ঘেঁষাঘেষি, ঘাঁটা, ঘাঁটাঘাঁটি, ঘেরা, ঘোগ, ঘোল, ঘোরানো, ঘোরাঘোরি, ঘুরন্ত, ঘোরাফেরা, ঘুরপাক, ঘুষ, ঘুরি।

চ : চড়চাপড়, চাল (ছাদ), চালচুলা, চম্পট, চূড়া, চারা, চাষ, চাটাই, চাতান, চ্যাটা, চুটকি, চিপা, চিঁট, চিঠি, চোয়াড়, চোখা, চোঙ্গা, চুপসানো, চুয়ানো, চুচি, চুক্ (ভুল), চুলবুল, চুলা, চুপ, চুড়ি, চোষা, চিঠি (চিল্লা), চিংড়ি।

ছ : ছাকনা, ছালা, ছন, ছেওড়া, ছোড়া, ছাপাও, ছাপিয়ে, ছাটা, ছাতি ফাঁটা, ছ্যাচোর, ছ্যাঁক, ছোলা (সাফ করা), ছিনাল, ছিটকিনি, ছিটা, ছোট, ছুটা-ছুটি, ছিলিম, ছোক্লা, ছাঁচ, ছানা, ছিপি।

জ : জাব, জাবর, জাঁকজমক, জলপাই, জালা, জঞ্জাল, জেখি (মাগ) জোট, জোঁক, জুড়ি।

ঝ : ঝগড়া, ঝঞ্ঝাট, ঝাঁঝর, ঝাঁপ, ঝাঁপড়ি, ঝুপরি, ঝাড়, ঝড়া, ঝাড়ন, ঝিল, ঝিঙ্গা, ঝুড়ানো, ঝাড়, (ঝোঁপ), ঝাপসা, ঝোড়া, ঝোঁক, ঝিম।

ট : টিকা, টেকা, টিকলি, টিলা, টিপ, টোকনা, টোনা, টুলি, টাটানো, টাটি, টাটকা, টাট্টু, টেকা, টোটা, টুকরা, টোকরাটুকরি, টুকরি, টাঙানো, টোপড়, ট্যাংরা, টের, টেড়া।

ঠ : ঠগ, ঠাণ্ডা, ঠাসা, ঠাটা, ঠাটবাট, ঠেকনা, ঠেকা, ঠেলা, ঠেলাঠেলি, ঠেঙাঠেঙি,

ঠেস, ঠেসাঠেসি, ঠিক, ঠিকা, ঠিকাদার, ঠিকানা, ঠিকড়ানো, ঠিকঠাক, ঠোঙা, ঠোকা, ঠোকাঠুকি, ঠুটা, ঠেকানো, ঠোকরানো।

ড ঃ ডাগর, ডাগরডোগর, ডাক, ডাকা, ডাকসাইটে, ডাকু, ডাল-পালা, ডামাডোল, ডোবা, ডাবা, ডোল, ডোর (বাঁধন), ডর, ডুঙ্গি, ডেরা, ডিঙ্গি, ডাগর।

ঢ ঃ ঢেলা, ঢেঙ্গা, ঢেউ, ঢের, ঢেঁকি, ঢিপি, ঢাল, ঢালা, ঢোল, ঢোঁড়া (সাপ), ঢুমসি, ঢালা।

ত ঃ তোড়(স্রোত), তোৎলা, তাড়া, তাগড়া, তালা, তাড় (বাণ্ডিল), তাড়াহুড়া, ত্যাঁদোর।

থ ঃ থাপ, থুতনি, থুতি।

দ ঃ দাবাদাবি, দাবানো, দাদা, দাঙ্গা, দাপাদাপি, দলাদলি, দমাদম্, দঙ্গল, দল, দুরমুজ, দিদি।

ধ ঃ ধামা, ধাপ, ধর (দেহ), ধোঁকা, ধুঁকি (পিটে),ধমকানি, ধমক, ধাক্কা, ধোপ, ধপাস।

ন ঃ নিক্তি, নিড়ানো, নিরেট, নুনু, নুড়ি, ন্যাটা।

প ঃ পাগল, পাগলা, পাগলি, পাণ্ডা, পারব, পাঁঠা, পাঁঠি, পুঁচকে, পিঁড়ি, পিটা,পেটা, পগার, পন (৮০), পুদিনা।

ফ ঃ ফাঁক, ফাঁকি, ফাঁদ, ফটক, ফেচাঙ্, ফের, ফেরা, ফেরাফেরি, ফিটকিরি, ফোঁকলা, ফুঁকলি, ফোস্কা, ফোঁকরা, ফোঁড়া, ফর্সা, ফোকর,।

ব ঃ বাছা, বজড়া, বাতা(বাঁশের ফাড়া অংশ), বেলনা, বেটা, বিগড়ান, বেটি, বোবা, বোঝা, বল্লম, বোড়ো (ধান), বউনি, বুট, বঙ্গ।

ভ ঃ ভরসা, ভাটি, ভীড়, ভজকট, ভোন্দা, ভোদাই, ভোর, ভরকানো, ভুড়ি, ভোট্‌কা, ভুটকি, ভাঙ্গা, ভেঁপু।

ম ঃ মঙ্গল , মুনশি, মচকানো, মগরা, মাক্‌রি, মাকু, মিনমিনা, মিসি (কালো), মেথি, মোচড়ানো, মোচড়ামুচড়ি, মোটা, মোটকা, মোটামুটি, মোটাসোটা, মুড়া, মরাই, মুড়ি ।

র ঃ রগড়ারগড়ি, রগড়ানো, রাণ্ডি, রণ্ডা, রোলা, রোড়া, রোজরোজ।

ল ঃ লণ্ডভণ্ড, লোট, লুচ্চা, লহনা, লেঙ্‌টা, লেংটি, নেংটি, লাপটানো, লাপটালাপটি, লেংড়া, ল্যাবড়া।

শ ঃ শিল, শিটকে, শাঁকআলু, শ্যামকোল (পাখি)।

স ঃ সাবাড়, সাপ্টা, সাঁটা, সুতি।

হ ঃ হাঁকাহাঁকি, হাঙ্গর, হাঁপানো, হেঙ্গলা, হুড়া, হুড়াহুড়ি, হুড়কা, হেঁচকি।

লক্ষ্যণীয় যে 'খ' সিরিজের শব্দ সংখ্যাই বেশি। আরও কিছু অষ্ট্রিক গোষ্ঠিজাত শব্দ আছে যেগুলি সাঁওতালিতে না থাকলেও বাংলাতে আছে। এই শব্দগুলো কোল ও মুণ্ডা ভাষার। যেমন – তেঁতুল, ফাঁকা, ঝিঙে, জন্তু ইত্যাদি।

✧ **ধন্যাত্মক শব্দ :**

অ : অগরবগর।

আ : অ্যাঁঅ্যাঁ, আগরমবাগরম, আঁদার-পাঁদার ।

এ : এবড়ো-খেবড়ো।

ক : কাঁইকাঁই, কন্‌কন্‌, ক্যাঁওক্যাঁও, কাঁওম্যাও, কড়কড়, কুটখাট, কিচিমিচি, কিচিরমিচির, কিচিকিচি, কিস্‌কিস্‌, কিটকিট, কুকু, কুচুরকুচুর, কুটকুট, ক্যাটকেঁটে।

খ : খুসখুস, খাড়ফাড়, খুখু, খিট্‌খিট্‌, খুড়ুসখুড়ুস, খিচ্‌খিচ্‌ ।

গ : গরগর, গড়াগড়া,গোঁঙা, গোঁগা, গুবগুব, গুড়গুড়ম,গরগর,।

ঘ : ঘেঁষাঘেষি, ঘাঁটা, ঘাঁটাঘাঁটি, ঘেরা, ঘোগ, ঘোল, ঘোরানো, ঘোরাঘোরি, ঘুরন্ত, ঘোরাফেরা, ঘুরপাক, ঘুষ, ঘুরি, ঘসরঘসর, ঘিনঘিন, ঘুরঘুর্‌।

চ : চকচক, চক্‌মক্‌, চম্‌কানো, চন্‌মন্‌, চট্‌পট্‌, চটপাট,চিক্‌চিক্‌, চিড়বিড়, চিৎপটাং, চকচকানো, চুটচুট।

ছ : ছিছি, ছোত্‌ছোত্‌ ।

ঝ : ঝক্‌মক্‌, ঝল্‌মল্‌, ঝালর, ঝম্‌ঝম্‌, ঝজরঝমর, ঝন্‌মন্‌, ঝাপটা, ঝাপ্টা, ঝরঝর, ঝটাস, ঝটপট, ঝিকিমিকি, ঝিন্‌ঝিন, ঝিরিসিরি, ঝুনাঝুনি, ঝকঝক্‌ ।

ট : টিপটিপ্‌ , টলমল, টুবুটুব, টুটু।

ঠ : ঠকঠক, ঠকঠকি,ঠোকাঠুকি ।

ড : ডাগরডোগর, ডাকডাকা, ডগডগে, ডলডলে।

ঢ : ঢুপঢুপ, ঢক্‌ঢক্‌ , ঢপ্‌ঢপ্‌, ঢুক্‌ঢুক্‌ , ঢুড়াঢুড়ি।

ত : তরতর, তোড়বোড়ানো, তড়বড়, তেঁতে, তিলতিল।

থ : থরথর,

দ : দাবাদাবি, দাবানো, দাদা, দাউদাউ, দুবদুবি, দমদম।

ধ : ধামা, ধুমধাম, ধরমর, ধুনধুনি, ধুস, ⁄ রাস, ধরপর, ধরফর, ধূপধূপ।

প : পটপট, পটাস, পিচিরপিচির, পিচকারি।

ফ : ফর্‌ফর্‌, ফুসুরফুসুর, ফুসফুস, ফটাফট, ফটরফটর, ফন্‌ফন্‌, ফুফু, ফুক্‌ফুক্‌, ফুসলানো।

ব : বক্‌বক্‌, বাকবাকুম, ব্যাচব্যাচ, বক্‌বক্‌, বকরবকর, বাওবাও, বজবজ ।

ভ : ভক্‌ভক্‌, ভ্যানভ্যান, ভ্যাঁভ্যাঁ, ভ্যানভান, ভোঁভোঁ, ভ্যাজভ্যাজ, ভেউভেউ, ভোঁসভোঁস, ভটভট, ভুসভুস।

ম : মচ্‌মচ্‌, মুচুরমুচুর, মগমগ।

য : যবযবে।

র : রোজরোজ।

ল ঃ লক্লক্ , লাটপাট, লটরপটর, লেলানো।

শ ঃ শিরশির।

স ঃ সপসপ, সাইসাঁই, সটসট, সুড়সুড়, সুড়সুড়ি, সোড়সোড়, সুরসুর।

হ ঃ হাহা, হড়াস, হুড়হাড়, হাউহাউ, হাম্বাহাম্বা, হুয়া হুয়া, হুড়হুড়, হুহু, হুল্লোড়, হুস্‌হুস্ হুড়ুমদুড়ুম।

উল্লিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ছাড়াও বাংলায় আরও কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন — খট্‌খট্ , খট্-খটা, গিজ্‌গিজ্, ফুচ্‌ফুচ্ , টিঙ্‌টিঙ্ , পত্‌পত্ , মর্‌মর্ , ঘ্যাত্‌ঘ্যাত্, চিক্‌চিক্ ইত্যাদি। তবে এগুলিতে ভোট-বর্মির প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন।

✧ বাংলায় প্রভাব ✧

পাশাপাশি অবস্থানের ফলে অষ্ট্রিক ভাষার প্রভার বাংলায় সবচেয়ে বেশি। যে শব্দগুলি সোজাসুজি অষ্ট্রিক থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলি 'দেশি' নামে খাঁটি বাংলার মূল শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাশ প্রমুখ পণ্ডিতেরা সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন যে বাংলায় আর্য ভাষা বলে পরিচিত অনেক শব্দই অষ্ট্রিক -উৎস জাত। যেমন —মেনী (বিড়াল), চাউল, বোকা, ডাঙ্গা, ডোঙ্গা, হুড়কা (দরজার খিল), খুঁটি (সাঁওতালী খুন্টি) , মোটা, হাড়িয়া, ঢেঙ্গী. ঢিল, ঢিবি, মুড়ি, চিংড়ি ইত্যাদি। এমনকি 'বঙ্গ' শব্দটি অষ্ট্রিক উৎসজাত।

একথা ঠিক যে সকল অনার্য জাতি, আর্যদের দ্বারা পরাস্ত হলেও তাদের পক্ষে এতদিনের চর্চিত অনার্য অভ্যাস ও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। তাই ভাষা ও সংস্কৃতিতে কিছু কিছু লক্ষণ আজও বিদ্যমান। ডঃ শহীদুল্লাহ বলেছেন —

> বাঙ্গালা ভাষার গঠনে একমাত্র কোল (মুণ্ডা) ভাষা ভিন্ন অন্য অনার্য ভাষার প্রভাব নাই বলিলেই চলে।

শব্দগত প্রভাব ছাড়াও ধ্বনিতত্ত্ব , রূপতত্ত্ব যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায় —

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রভাব ঃ

১. বাংলা ভাষায় দ্বিস্বর ধ্বনির সংখ্যা আবদুল হাইয়ের মতে ৩১ টি । সংস্কৃত ভাষায় দ্বিস্বর নেই। মুন্ডা ভাষা থেকেই এই প্রভাব বাংলায় পড়েছে বলে মনে হয়।

২. বাংলায় যে কোন স্বরধ্বনিই অনুনাসিক হতে পারে। মুন্ডা ভাষাতেও এরূপ হয়। যেমন — চাঁ ।

৩. বাংলা ভাষার স্বরসঙ্গতি মুন্ডা ভাষা দ্বারা প্রভাবিত। দ্রাবিড় ভাষায় অবশ্য স্বরসঙ্গতি লক্ষ করা যায় তবে তা মুন্ডা প্রভাবিত।

৪. কোন খাঁটি বাংলা শব্দ যুক্ত ব্যঞ্জন দ্বারা শুরু হয় না। পালি ও প্রাকৃতে এমন ছিল।

মুন্ডা ভাষায়ও বাংলার মতো ণ, ড়, ঢ়, শব্দের আদিতে থাকে না ।

৫. যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে বাংলা শব্দ শুরু না হওয়াটা মুণ্ডা ভাষার প্রভাবে হয়েছে।

৬. বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় বাংলা ভাষাভাষিরা নিঃশ্বাস ভিতরে টেনে যে সম্মতিসূচক আওয়াজ করে তা মুণ্ডা ভাষার প্রভাব আছে।

✧ রূপতাত্ত্বিক প্রভাব ঃ

১. সাঁওতালি ব্যক্তিনাম সর্বনাম পদগুলি বাংলা ক্রিয়াপদ গঠনে সাহায্য করেছে। যেমন –

সাঁওতালি	বাংলা
আবো (আমরা)	যাবো (আমরা)
আপে (তোমরা)	যাবে (তোমরা)
আক্ (তারা)	যাক্ (তারা) ইত্যাদি।

২. অষ্ট্রিক ভাষায় লিঙ্গভেদ নেই । এর প্রভাবে বাংলাতেও লিঙ্গভেদ হ্রাস পেয়েছে। তবে বেটা-ছেলে, মেয়ে-ছেলে ইত্যাদি পুরুষ বা স্ত্রী বাচক শব্দ আগে যোগ করে যে লিঙ্গ নির্ণয় পদ্ধতি বাংলাতে প্রচলিত ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন তা ফারসি প্রভাবজাত। কিন্তু এর পিছনে অষ্ট্রিক গোষ্ঠির প্রভাবও আছে বলে মনে হয়।
সাঁওতালি ভাষায় – কোড়া হপন্ – পুং,
কুড়ি হপন্ – স্ত্রী অর্থে প্রচলিত।

৩. দহ,দা,কোল,ডাঙ্গা ইত্যাদি শব্দ প্রত্যয় আকারে বসে গ্রামনাম তৈরি করেছে। যা মূলত আষ্ট্রিক প্রভাব।

৪ কুড়ি সংখ্যা বা গণ্ডা গণনায় কোল ভাষার প্রভাব আছে।

৫. উত্তম পুরুষে বহুবচনের দ্বিবিধ রূপ মুণ্ডা ভাষার প্রভাব-জাত।

৬. বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের ব্যবহার অষ্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে।

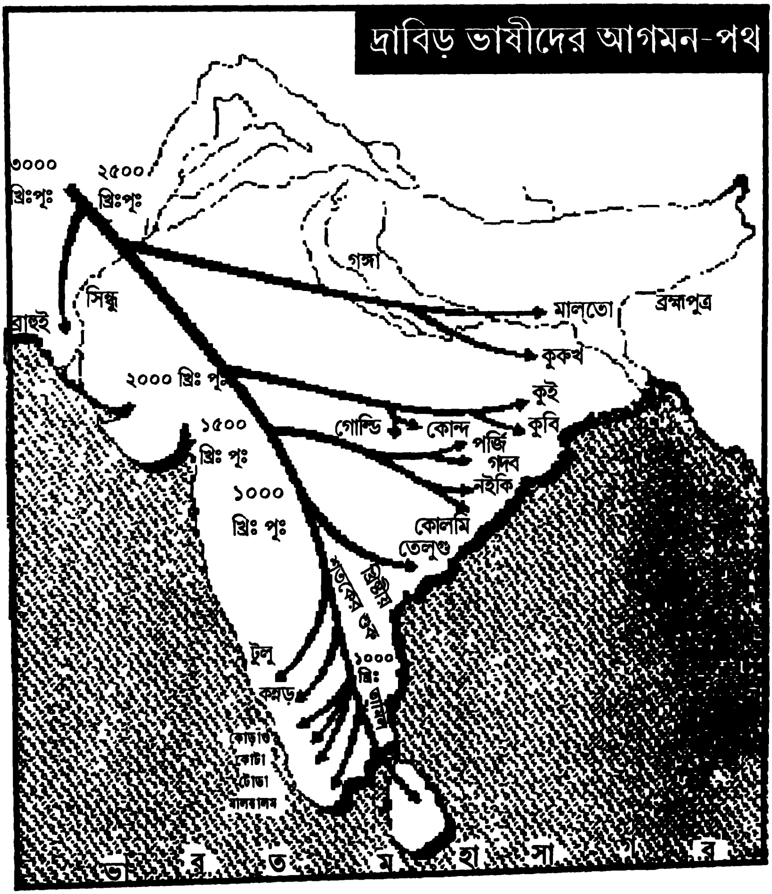
৭. বচনের তিনভেদ অর্থাৎ একবচন,দ্বিবচন,বহুবচন মুণ্ডা প্রভাব-জাত।

✧ দ্রাবিড় (দ্রামিড়) ভাষা গোষ্ঠি ✧

দ্রাবিড়দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশপ কল্ডওয়েল বলছেন যে 'তুরানীয়' তথা 'উরাল-আলতাই' ভাষাগোষ্ঠি থেকে এসেছে। ও. স্রাডের বক্তব্য এটি 'ফিন্নো-উগ্রীয়'ভাষা গোষ্ঠিজাত। এ প্রসঙ্গে রামেশ্বর শ' জানিয়েছেন –

> অষ্ট্রিকদের পর ভারতে এসেছিল দ্রাবিড় জাতির লোকেরা (আঃ খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০) । এই দ্রাবিড়দের আদি বাসস্থান ছিল সম্ভবত ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranian) অঞ্চলে। আসার পরে দক্ষিণ ভারতে এদের একচ্ছত্র বিস্তার ঘটে।

বর্তমান দক্ষিণ ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে এই ভাষাগোষ্ঠি-জাত ভাষাগুলির অবস্থান দেখা যায়। গ্রিয়ার্সন-এর বর্গবিভাজন করেছেন এইভাবে — ক) অন্ধ্রবর্গ খ) দ্রাবিড় বর্গ গ) মধ্যবর্তী বর্গ ঘ) উত্তর - পশ্চিমা বর্গ ঙ) সংকর দ্রাবিড় বর্গ । আধুনিক গবেষণায় এই বর্গবিভাজন মেনে নেওয়া হয় নি। পরেশচন্দ্র মজুমদার একটি মানচিত্রে দ্রাবিড় ভাষার বিস্তারটিকে দেখিয়েছেন।



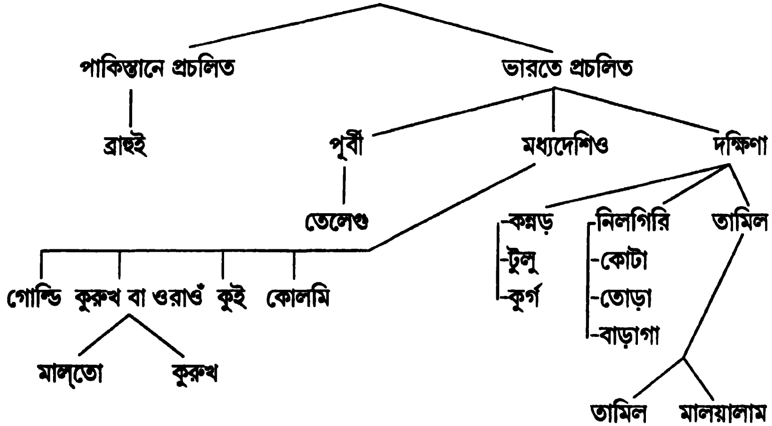
গোষ্ঠির প্রধান ভাষাগুলি বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের যে প্রদেশে বিস্তারিত তা হল —

তেলেগু	— অন্ধ্রপ্রদেশ
তামিল	— তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরি ও সিংহল
কন্নড়	— কর্ণাটক
মালয়ালাম্	— কেরালায়

ব্রাহুই	— পাকিস্তানের সিন্ধুর উত্তর ও বেলুচিস্তানের পূর্বাঞ্চল।
মালতে	— বাংলা - বিহার সীমান্তে রাজমহল পাহাড়
গোণ্ডি	— বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র

কুই, কোন্দ্, কোলমি, পর্জি ইত্যাদি কয়েকটি এই গোষ্ঠিভুক্ত ভাষা আছে। উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলির মধ্যে তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ও কানাড়া ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছে।

দ্রাবিড় গোষ্ঠি



✧ বাংলায় প্রভাব ✧

দ্রাবিড় ভাষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রভাব বাংলা ভাষায় আছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ও দ্রাবিড় ভাষার বহু সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। শব্দ প্রয়োগ, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রভাব লক্ষ করা যায় —

✧ শব্দ প্রয়োগে প্রভাব :

১. ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার কোল ভাষার মতো দ্রাবিড়েও দেখা যায়।

২. বাংলায় সহচর শব্দ বা অনুশব্দ (Echo Word) দ্রাবিড় এর মতো। যেমন — গাড়ি-টাড়ি, ভাত-টাত ইত্যাদি।

৩. বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে খাল, ঘড়া, মোট, চন্দন, কুন্তল ইত্যাদি দ্রাবিড় শব্দ আছে। যেমন — ছেলে-পিলে < তামিল পিল্লৈ, খাল < তামিল কাল্।

৪. বাংলা স্থান নামে দ্রাবিড় আছে। যেমন — হিট্টা, ভিট্টা, ভিট্টি ভিট্টু,গড্ডা, গড্ডি ইত্যাদি নাম থেকে বাংলায় এসেছে ভিটা, কাজরীভিটা, বামুনভিটা, বালুটে, শিলিগুড়ি,ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি।

✧ ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রভাব :

১. মূর্ধন্য বর্ণগুলি (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ ইত্যাদি) দ্রাবিড় ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে বলে মনে হয়। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এদের দেখা যায় না। তবে দন্ত্য ধ্বনি থেকেও মূর্ধন্য ধ্বনির উৎপত্তি হতে পারে। সুইডিশ ভাষায় র্ + দ = ড হয়েছে।

২. শব্দ ও বাক্যের আদিতে শ্বাসাঘাতের ক্ষেত্রে দ্রাবিড় প্রভাব আছে।

৩. বাংলায় বিপ্রকর্ষ গঠন দ্রাবিড় থেকেই এসেছে।

৪. বঙ্গালি উপভাষায় 'হ্'-এর মহাপ্রাণহীনত' অর্থাৎ হয় > অয় ইত্যাদি, দ্রাবিড় ভষার প্রভাবে হয়েছে।

৫. স্বরমধ্যবর্তী ড > ড় এবং ঢ > ঢ় পরিণত হওয়া দ্রাবিড় প্রভাব।

✧ রূপতাত্ত্বিক প্রভাব :

১. বিভিন্ন কারকের মিশ্রণ ও এক কারকে অন্য কারকের বিভক্তি প্রয়োগ দ্রাবিড় থেকে এসেছে ।

২. বাংলায় বিশেষণের তারতম্য বোঝাতে 'তর', 'তম' প্রয়োগ দ্রাবিড়- জাত ।

৩. বাংলা ভাষায় থেকে, দিয়ে প্রভৃতি অনুসর্গের আগমন ঘটেছে দ্রাবিড় থেকে ।

৪. বাংলায় যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দ্রাবিড় রীতির মতো ।

৫. সমাপিকা ক্রিয়ার বদলে শতৃ-শানচ প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত নামপদের ব্যবহার রীতি দ্রাবিড় ভাষা থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলায় এসেছে।

৬. বাংলার বহুবচনের 'গুলা', 'গুলি' বিভক্তি আসলে তামিল ভাষার 'গল' বিভক্তি।

৭. ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত পদের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ রীতি দ্রাবিড় ভাষায় আছে। যেমন — সোনার বাটি।

৮. কর্মভাববাচ্য গঠনের রীতি দ্রাবিড় প্রভাবে বাংলায় গৃহীত হয়েছে।

✧ বাক্যগঠনে প্রভাব :

ক্রিয়া উহ্য রেখে বাক্য রচনা দ্রাবিড় ভাষার মতো বাংলাতেও আছে।

যেমন —

তামিল — ইদু নম্ম মনে।

বাংলা — এটা আমাদের বাড়ী।

প্রশ্ন উঠেছে , আর্য ভাষা দ্রাবিড় দ্বারা প্রভাবিত না দ্রাবিড় ভাষা আর্য দ্বারা প্রভাবিত। ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করেন আর্য ভাষা হতে দ্রাবিড়ের ঋণ বললে ভাল হয় কারণ আর্য ধর্ম ও কৃষ্টির দ্বারা দ্রাবিড় জাতি বেশি প্রভাবিত। বাংলাদেশে দ্রাবিড় মালতো জাতির বাস ও শাসক সেন বংশীয়রা কর্নাটিও ছিলেন সে হিসাবে প্রভাব পড়া স্বাভাবিক।

তবে আর্যদের আগে ভারতে দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছিল এমতই গ্রাহ্য । সুতরাং বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব মেনে নিতেই হয়।

✧ ভোট-চীনীয় (কিরাত) ভাষাগোষ্ঠি ✧

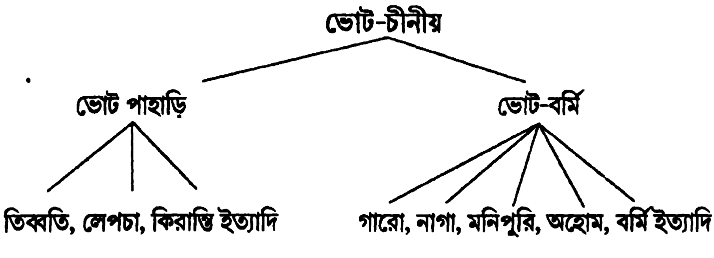
প্রাচীনকালে চীন ও তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। এই সূত্র ধরেই সম্ভবত ভারতে ভোট-চীনীয় ভাষার আগমন ঘটে। পরেশ ভট্টাচার্যের মতে –

> ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর তিনটি প্রধান শাখার একটি তিব্বতী-বর্মী বা ভোটবর্মী, এই ভাষার অনেকগুলো উপশাখা ভারতবর্ষে প্রচলিত। অপর একটি শাখা 'চীনা-থাই' বা 'শ্যামী-চীনা' ভাষার মাত্র একটা শাখাই ভারতে প্রচলিত। তৃতীয় 'য়েনিসি' (Yenissi) শাখার সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক নেই।

এই ভাষাগোষ্ঠির আগমন ও ভাষার বিস্তার সম্পর্কে রামেশ্বর শ' জানিয়েছেন–

> পূর্বদিকের কোন দেশ থেকে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দিতে ভোট-চীনীয় বংশের লোকেরা ভারতে আসেন। এই বংশের ভাষাগুলি এখন ব্রহ্মদেশ ও চীনের নিকটবর্তী আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং হিমালয়ের পাদদেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আকারে প্রচলিত আছে।

রেখা চিত্রে এর বিভাগগুলি দেখানো যেতে পারে –



✧ বাংলায় প্রভাব ✧

১. বাংলায় ভোট-চীনীও গোষ্ঠির প্রভাব কম । তবে লামা, লুঙ্গি, ফুঙ্গি, ঘুগনি, শব্দগুলি ভোট-বর্মি শব্দজাত বলে ধরা হয়।
২. বাংলায় অ-ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ বর্মি প্রভাব-জাত।
৩. বঙ্গালি উপভাষায় 'এ' ধ্বনির 'অ্যা' উচ্চারণ ভোটবর্মি প্রভাবজাত বলে মনে করা হয়।

৪. চট্টগ্রাম নোয়াখালি অঞ্চলে স্বতোনাসিক্যীভবন ও উষ্মভবনের প্রাধান্য এই ভাষার প্রভাবেই ঘটেছে।

৫. বঙ্গালি উপভাষায় শ, ষ, স > হ উচ্চারণে বর্মিভাষার প্রভাব আছে।

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের অনার্য ভাষার আগমন আছে ঠিকই, তবে বাংলা ভাষা গঠনে অনার্য ভাষার প্রভাব নিয়ে আরও স্বতন্ত্র গবেষণার প্রয়োজন।

✧ সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষায় অন্-আর্য ভাষার প্রভাব ✧

✧ ধ্বনিতত্ত্বে

১. বাংলায় অ-কারের উচ্চারণ অর্ধ বিবৃত, কিন্তু সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দির 'অ' সংবৃত। সংস্কৃতের আ-কার, অ-কারের দীর্ঘ রূপ। কিন্তু বাংলার 'আ' অ-কারের দীর্ঘ রূপ নহে। অথবা পড়ি স্বরে-অ, স্বরে-আ। এইরূপ বিবৃত উচ্চারণের মূলে খুব সম্ভবত অষ্ট্রিক বা ভোট-বর্মি প্রভাব আছে।

২. সংস্কৃতের তালব্য বর্ণগুলির উচ্চারণের ধারা প্রাকৃত যুগ থেকেই পাল্টাতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের চলিত ভাষায় 'চ' এর উচ্চারণ 'চ + শ' এই দুই বর্ণের মিলিত উচ্চারণ । 'চ' এর এইরূপ উচ্চারণ দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্য। আবার পূর্ববঙ্গের 'চ' এর উচ্চারণ 'ত + শ' এই দুই ধ্বনির মিলিত উচ্চারণ। 'চ' এর এই রূপ উচ্চারণ ভোট-বর্মি ভাষায় দেখা যায়।

৩. মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত হয়। কারণ মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষায় মূর্ধন্য বর্ণ ছিল না। ঋ, র, স প্রভৃতি বর্ণগুলি পূর্বে থাকলে সংস্কৃত দন্ত্যবর্ণ মূর্ধণ্য বর্ণে পরিণত হয়। পঠতি < বৈদিক পৃথতি, কট < কৃত , বিকট < বিকৃত (প্রাকৃত) , বুড্ঢ < বৃদ্ধ (প্রাকৃত)।

৪. বঙ্গালি উপভাষায় ঘোষ বর্ণ ও মহাপ্রাণ বর্ণগুলি কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণের ব্যাপারে বাংলা, গুজারাটি প্রভৃতি ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়। অষ্ট্রিক ও ভোট-বর্মি ভাষার মধ্যেও কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণগুলির অস্তিত্ব ছিল বৈদিক যুগে। বঙ্গালি উপভাষার মহাপ্রাণ বর্ণগুলির কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে উচ্চারণের মূলে অন-আর্য প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

৫. বাংলায় কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যেখানে নাসিক্যধ্বনির সংস্পর্শ ছাড়া স্বরধ্বনিগুলি আপনাআপনিই আনুনাসিক হয়। কাঁকড়া < কর্কট, নিঁদ < নিদ্রা। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির মধ্যেও নাসিক্যধ্বনি দেখা যায় —চেঁচান, ট্যাঁক-ট্যাঁক। এরূপ স্বতোনাসিক্যীভবনের পশ্চাতে অন্-আর্য প্রভাব আছে।

৬. স্বতোমূর্ধন্যীভবনের মূলে আছে দ্রাবিড় কিংবা অষ্ট্রিক প্রভাব। — ফড়িং < পতঙ্গ, ডাহিন < দক্ষিণ।

৭. স্বতোনাসিক্যীভবন ও উষ্মধ্বনির আধিক্য দেখাও যায়। — আকাশ > আঁশ, পূজা > ফুজা ইত্যাদি। এরকম ধ্বনিগত বিশেষত্বের মূলে নিঃসন্দেহে ভোটবর্মি প্রভাব আছে।

৮. পূর্ববঙ্গেও অসমীয়া ভাষায় শ, ষ, স, অনেক স্থলেই 'হ' হয়। দিবস > দিঅহ, কি কারণে বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় এই শিস ধ্বনিগুলি ই-কারে পরিণত হয় তাহা নির্ধারণ করা একটা ধ্বনিতত্ত্বগত সমস্যা। তবে ইহার পশ্চাতে ভোটধর্মি/অস্ট্রিক প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব।

৯. বঙ্গালি উপভাষায় 'হ' কার কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন —হয় > অয়, এই উচ্চারণের মূলেও অন্‌-আর্য প্রভাব আছে ।

১০. বাংলার স্বরসঙ্গতি মুণ্ডা ভাষা দ্বারা প্রভাবিত। দ্রাবিড় ভাষায় স্বরসঙ্গতি দেখা যায়।

১১. পাশ্চাত্য উপভাষায় আদি অক্ষরে যে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে তার মূলে দ্রাবিড় প্রভাব। যেমন — মাতা (মাথা)।

১২. শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক চরণকে কয়েকটি শ্বাসাঘাত বা অর্থদ্যোতক পর্বে ভাগ করা হয় এবং এক একটি পর্বে এক বা একাধিক শব্দ থাকে। প্রত্যেক পর্বের প্রথম শব্দের আদি অক্ষরে যে শ্বাসাঘাত পড়ে তার মূলেও আছে দ্রাবিড় প্রভাব।

✧ রূপতত্ত্বে

১. বাংলায় বহু বচনের পদ বোঝানোর জন্য গণ, গুলা, সব প্রভৃতি বহুবাচক বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করা হয়। দিয়া, থাকিয়া, হইতে প্রভৃতি অনুসর্গের সাহায্যে কারকের অর্থ প্রকাশ করা হয়। এই ব্যাপারে দ্রাবিড় ভাষাগুলির সঙ্গে বাংলার মিল থাকা অসম্ভব নয়।

২. প্রাচীন ও আদি-মধ্য যুগের বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী -প্রত্যয় পাওয়া গেলেও আধুনিক বাংলায় এই গুলি লুপ্ত হয়। ভোট-বর্মি বা অস্ট্রিক ভাষায় লিঙ্গ ভেদে নেই। সুতরাং বাংলায় লিঙ্গভেদের পার্থক্য দূরীভূত হওয়ার মূলে ভোট-বর্মি বা অস্ট্রিক প্রভাব থাকতে পারে।

৩. বিশেষণের স্তর নির্দেশ করার জন্য বাংলায় 'সবার চেয়ে ভালো', এর মধ্যে ভালো এইরূপ প্রয়োগের মূলে দ্রাবিড় প্রভাব আছে।

৪. বাংলায় কর্তৃকারকের বিভক্তি 'এ' এর সঙ্গে করণের বিভক্তি 'এ' এর মিশ্রণকে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক ভোট-বর্মি ভাষার প্রভাবের ফল বলে মনে করেন। ভোট-বর্মি ভাষার এইরূপ বিভক্তির মিশ্রণ ঘটে।

৫. করণ, অপাদান ও অধিকরণের বিভক্তির মিশ্রণ কিংবা এক কারকের অর্থে অন্য

কারকের বিভক্তির প্রয়োগের মূলে দ্রাবিড় প্রভাব বিদ্যমান।

৬. বাংলা ভাষায় অসমাপিকার ব্যবহার খুব বেশি। এই ব্যাপারেও দ্রাবিড় প্রভাব অনস্বীকার্য।

৭. বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন আছে। দ্রাবিড় ভাষা থেকেই এই রীতি আর্য ভাষায় গৃহীত হয়েছে।

৮. বাংলা বাক্যে অনেক সময় ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় না। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও এই রীতি আছে।

✧ **শব্দভাণ্ডারে**

১. বাংলায় গ্রাম-নামগুলিতে জোড়া শব্দ দেখা যায়। আবার গ্রামের নামের শেষে জোল, জোলী, ঝরা, ঝরি, ঝোর (নদী, জল, খাল, ইত্যাদি অর্থে), গুড়া, গুড়ি (নদীর তীর অর্থে), ভিটা, ভিটি, (বাড়ী অর্থে), পোল, (ভাল মাঠ অর্থে) প্রভৃতি শব্দগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠির ভাষা থেকে এসেছে।

২. ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দবোধক গ্রাম-নামগুলি অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় উপাদান লক্ষ কার যায়। — দমদম, বজবজ, কোল-কোল, জলটল, বুদবুদ, হিলিমিলি ইত্যাদি।

৩. গ্রাম-নামের শেষে 'দহ, দা কোল (নদী, জল অর্থে), বাড় (বাহির অর্থে) বির প্রভৃতি শব্দগুলি অষ্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত। আবার গ্রাম-নামের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি শব্দ ও প্রত্যয় অনার্য ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে । যেমন — ডাঙ্গা, ডিঙ্গি, ডহর ইত্যাদি ।

৪. কতকগুলি অষ্ট্রিক , দ্রাবিড় গোষ্ঠির শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়ে পরে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে — এগুলি তদ্ভব শব্দের পর্যায় ভুক্ত করা হয়েছে।
দ্রাবিড় গোষ্ঠিভুক্ত ঃ — মুটে (তামিল) > সংস্কৃত মুটক > প্রাকৃত মুডঅ > মোট। পিল্লে (তামিল) > পিল্লিক > প্রাকৃত পিল্লঅ > পিলে। খাল, ঘড়া ইত্যাদি ।
অষ্ট্রিক গোষ্ঠিভুক্ত ঃ — ঢৌকয়তি > ঢুক্কই (প্রা) > ঢোকে , ঢাক , ঢোল, টক > টস্ক > টঙ্ক।

৫. দেশি ভাষাগুলিতেও অনার্য প্রভাব কম নহে। দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় বাংলা ভাষায় কিছু রূপান্তরিত হয়ে দেশজ শব্দের রূপ লাভ করেছে। মেনী (বিড়াল) (মুণ্ডা), খুঁটি (খুঁটি সাঁওতালী), মোটা, হাঁড়িয়া, ডাঙ্গা, ঢিল, মুড়ি, কুড়ি, (কাল-কুড়ি সংখ্যা বা সংখ্যা গণনার রীতি কোলভাষা গোষ্ঠির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬. 'অজ্ঞাত মূল' শব্দগুলির মুল উৎস অনার্য প্রভাব। কাত্‌লা, চিংড়ি, হাঁক, উচ্ছে, খোকা , কুকি ইত্যাদি।

পরিভাষা

✧ পরিভাষা উদ্ভব ও বিকাশ ✧

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান অনুযায়ী পরিভাষা হল 'বিশেষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ বা সংজ্ঞা'। সংস্কৃতে পরিভাষাকে বলা হয়েছে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা (সংক্ষেপার্থে সংজ্ঞাবিশেষ), ইংরাজিতে ' টেকনিক্যাল শব্দ' (Technical word or term বা Technical terminology)। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে পিটার ব্রেইন তাঁর সঙ্কলিত গ্রন্থে শারীর বিদ্যার সম্পর্কে ছ'শোর মত পরিভাষা দিয়েছিলেন। এরপর ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত জন ম্যাক-এর 'প্রিনসিপলস অব রেজিষ্ট্রি'-র বাংলা অনুবাদে রসায়ন শাস্ত্রে বিভিন্ন শব্দের পরিভাষা ব্যবহার করেন। ১৮৭৭ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-র 'এ স্কীম ফর রেগুরিং অব ইউরোপীয়ান সায়ান্টিফিক টার্মস্ ইন টু দ্য ভারনাকুলারস্ অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯০৭ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ কেন্দ্রীয় সমিতির মাধ্যমে নানা শাস্ত্রের পরিভাষা ও শব্দ সঙ্কলন করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রদীপ, ভারতবর্ষ, ভারতী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কবিতা পত্রিকায় পরিভাষা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জানান যে, বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রচলিত ভাষা থেকে আলাদা। তাঁর মতে –

> জ্ঞানের ভাষা বা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি উচ্চারণ করিবে, তাহার যেন একটি নির্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট, হেঁয়ালিত্বহীন অর্থ থাকে। একটি নির্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে। সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি কবিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সূত্র।

যোগেশচন্দ্র রায় রচিত 'রত্নপরীক্ষা' , অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত 'পদার্থবিদ্যা' ,নবীনচন্দ্র দত্ত রচিত 'খগোল বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থে পরিভাষার পরিচয় দেন । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'নতুন কথা গড়া' প্রবন্ধে প্রচলিত ভাষার মধ্যে পারিভাষিক শব্দটি না পেলে প্রাদেশিক ভাষাতে অনুসন্ধান করতে বলেছেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাবিজ্ঞানের কিছু পরিভাষা তৈরি করেন। যেমন, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ইত্যাদি। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা তৈরি করেছিল। এর কেন্দ্রিয় সমিতিতে রাজশেখর

বসু , সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রমুখ ব্যক্তি ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পরিভাষা সংসদ গঠন করে সরকারি কাজকর্মে ব্যবহার করার জন্য একটি পরিভাষামালা তৈরি করেন। এই সংসদের সদ্যস্য ছিলেন রাজশেখর বসু , সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো পণ্ডিতরা। তাঁরা বলেছিলেন পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃতের সাহায্য নিতে হবে,বহুলপ্রচলিত বাংলা শব্দগুলিকে বাদ দিলে চলবে না এবং শব্দগুলি হবে সংক্ষিপ্ত ও সহজ উচ্চারণের। কিন্তু আজও তেমনভাবে সরকারি স্তরে পরিভাষা চালু হয় নি। ১৯৬০ ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল পরিভাষা তৈরির কমিশন গঠন করা হয় 'Commision of Scientific and Technical Terminology' নামক কমিশন। ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রথম ' পরিভাষা কোষ ' প্রকাশ করে।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা আকাডেমি পরিভাষা নিয়ে যে আলোচনা চক্র করেন তাতে বক্তব্য রাখেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (বাংলা পরিভাষা), কৃষ্ণ ধর (বাংলায় পরিভাষা নির্মাণ),সৌরীন ভট্টাচার্য (পরিভাষা ঃ চলা না-চলার সমস্যা), অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (বাংলা পরিভাষা ঃ সূত্র-সন্ধান), মৃণাল নাথ (বাংলা ভাষাচর্চায় পরিভাষার সমস্যা),দেবজ্যোতি দাশ (বিজ্ঞানে বাংলা পরিভাষা সমস্যা), শিশিররঞ্জন চক্রবর্তী (গণিতের পরিভাষা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব), সলিল লাহিড়ী (বাংলা পরিভাষা -- বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক)। সভাপতি ছিলেন ভবতোষ দত্ত। আলোচনার শেষে উপসমিতি একটি সুপারিশ গ্রহণ করেন।

পাশাপাশি পরিভাষা চর্চায় আমরা অপূর্বচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত , রাসবিহারী মণ্ডল ইত্যাদির কথা স্মরণ করবো। সুকুমার সেন, পুণ্যশ্লোক রায়, পবিত্র সরকার প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী পরিভাষা তৈরি করেছেন। কিন্তু সবাই একমত হয়ে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

১৯৪৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পরিভাষা উপসমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেগুলি গ্রহণযোগ্য । নিম্নলিখিত সূত্রগুলি মনে রেখে পরিভাষা সংকলন করা হবে —

১. পরিভাষা যথাযথ, সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত শব্দ বিদেশি হলেও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বর্জন না করা।

৩. পরিভাষায় গৃহীত শব্দ বাংলা ভাষা-স্বভাবের বিরোধী না হয়।

৪. পরিভাষা নিয়ে পূর্বেকার সমস্ত উদ্যোগ, যথাযোগ্যভাবে বিবেচনা।

৫. প্রশাসন ও বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তিদের পরিভাষা সংকলনে পরামর্শ গ্রহণ।

৬. পরিভাষা নির্মাণকালে হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় নির্মিত পরিভাষাও প্রয়োজনে বিবেচনা।

সুপারিশ হিসাবে, জনমত যাচাই করার জন্য পরিভাষায় খসড়া সংসদ পত্র বা সাময়িক পত্র বা পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করা দরকার। বাংলা ইংরাজি ও নাগরি হরফে পরিভাষারূপ গৃহিত শব্দ প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি নিয়ে উপসমিতি তৈরি করে পরিভাষা সংকলনের কাজ শুরু করা যেতে পারে।

✧ পরিভাষা ও বাংলায় তার প্রয়োগ ✧

পরিভাষা	বাংলা অর্থ	বাংলা বাক্যে-প্রয়োগ
১. abolished (অ্যাবলিশ্)	বিলুপ্ত	সহকারী হিসাব রক্ষকের পদ বিলুপ্ত করা হল।
২. absolute (অ্যাবসোলিউট)	চূড়ান্ত, পরম	চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা কাল শুরু হবে।
৩. abstract (অ্যাবস্ট্রাক্ট)	বিমূর্ত	নীলিমা শব্দটিতে বিমূর্তভাবনার প্রকাশ আছে।
৪. absurd (অ্যাবসার্ড)	উদ্ভট, কিম্ভূত	'এবং ইন্দ্রজিৎ' একটি উদ্ভট নাটক।
৫. accent (অ্যাকসেন্ট)	শ্বাসাঘাত	দলবৃত্ত ছন্দে শ্বাসাঘাত গুরুত্বপূর্ণ।
৬. action (অ্যাক্শন্)	ক্রিয়া	নাট্য ক্রিয়া নাট্যদ্বন্দ্বে সাহায্য করে।
৭. aesthetic (এস্থেটিক্)	নান্দনিক	ছবির নান্দনিক দিকটাই প্রধান।
৮. allegorical (অ্যালিগরিক্যাল)	রূপকাত্মক	রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর রূপকাত্মক রচনা।
৯. allegory (অ্যালিগরি)	রূপক	রূপকের আড়ালে আসল বক্তব্য ধরা পড়ে।
১০. allusion (অ্যালুশন)	পূর্বসূত্র, উল্লেখ	পূর্বসূত্র ধরেই কাব্যের আলোচনায় যেতে হয়।
১১. anachronism (অ্যানাক্রনিজম্)	কালানৌচিত্য দোষ	শ্রেষ্ঠ রচনায় কালানৌচিত্য দোষ থাকে না।
১২. analogy (অ্যানালজি)	সাদৃশ্য, উপমা	একের সাদৃশ্যে অন্যকে বিচার করা যায়।
১৩. analysis (অ্যানালিসিস্)	বিশ্লেষণ	সাহিত্য বিশ্লেষণেও সাহিত্যের সৌন্দর্য ধরা পড়ে।

১৪. annotation (অ্যানোটেশন্)	টিকাভাষ্য	টিকাভাষ্য পাঠককে আরও সমৃদ্ধ করে ।
১৫. antagonist (অ্যানটাগোনিষ্ট)	প্রতিপক্ষ	প্রতিপক্ষকে খাটো করে দেখা উচিত নয় ।
১৬. anti-climax (অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স)	প্রকর্ষ, নিকর্ষ	.প্রকর্ষ পাঠক-শ্রোতাকে বিষয়মুখী করে ।
১৭. antithesis (অ্যান্টিথিসিস্)	প্রতিস্থিতি	প্রতিস্থিতি একদিক থেকে বিষয়ের গুরুত্ব বাড়ায়।
১৮. antonym (অ্যানটোনিম্)	বিপরীতার্থক শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দগুলি বিপরীত ভাবনার সহায়ক।
১৯. appearance (অ্যাপিয়ারেন্স)	অবভাস, প্রতিভাস	অবভাস দেখলেই মানুষ চেনা যায়।
২০. archetype (আর্কিটাইপ)	আদিরূপ, প্রত্নপ্রতিমা	প্রত্নপ্রতিমা ঐতিহ্যে প্রকাশের সহায়ক ।
২১. art for art's sake (আর্ট ফর আর্টস্ সেক্)	কলাকৈবল্যবাদ, শিল্পের জন্য শিল্প	শিল্পের জন্য শিল্প এটি একটি সাহিত্যিক মতবাদ।
২২. articulation (আর্টিকুলেশন্)	সুচারু প্রকাশ	সুচারু প্রকাশ কবির সহজাত ব্যাপার।
২৩. artist (আর্টিস্ট)	শিল্পী	প্রকৃত শিল্পীর মর্মমূলে আছে যন্ত্রণা।
২৪. aside (অ্যাসাইড্)	জনান্তিকে	নাটকে জনান্তিকে সংলাপ চরিত্রের পরিচয়বাহী।
২৫. aspect (আস্পেক্ট)	বৈশিষ্ট্য	কবি কোন্ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেছেন ?
২৬. assimilation (অ্যাসিমিলেশন্)	সমীভবন	ধ্বনি পরিবর্তনের একটি রূপ সমীভবন।
২৭. association (অ্যাসোসিয়েশন)	অনুষঙ্গ	প্রকৃতির অনুষঙ্গে জীবনানন্দ কবিতা লিখেছেন।
২৮. atmosphere (অ্যাটমোস্ফিয়ার)	ভাবমণ্ডল	ভাবমণ্ডল ক্রমশ দুষনে ছেয়ে যাচ্ছে।
২৯. attitude (অ্যাটিচ্যুড)	দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিন্যাস	তোমার দৃষ্টিভঙ্গী ভালো।
৩০. authentic (অথেন্টিক)	প্রামাণ্য	প্রামাণ্য তথ্য দিলেই বিচার শুরু হবে।

৩১. automatic (অটোমেটিক্) — স্বয়ংক্রিয় — স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র গ্রন্থকার গবেষণায় সাহায্য করে।

৩২. background (বাক্‌গ্রাউণ্ড) — পটভূমি — রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার পটভূমি জেনে নাও।

৩৩. balance (ব্যালান্স) — সুমিতি — ভারতচন্দ্র শব্দের সুমিতি প্রয়োগ করেছিলেন।

৩৪. ballad (ব্যালাড্) — গাথা — গাথার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মৈমনসিংহ গীতিকা।

৩৫. beauty (বিউটি) — সৌন্দর্য — শেক্সপীয়ার সৌন্দর্য পিয়াসী ছিলেন।

৩৬. bibliography (বিব্‌লিওগ্রাফি) — গ্রন্থবিবরণী — গবেষণা পত্রের শেষে গ্রন্থপঞ্জি থাকে।

৩৭. blank verse (ব্ল্যাঙ্ক ভার্স) — অমিত্রাক্ষর ছন্দ — মেঘনাদবধ কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

৩৮. bombast (বোমবাস্ট) — বাগাড়ম্বর — প্রকৃত শিল্পী বাগাড়ম্বর করে না।

৩৯. burden (বার্ডেন) — ধুয়া — এরকম ধুয়া তোলা উচিত নয়।

৪০. burlesque (বার্লেসকিউ) — হাস্যকর উদ্ভট অনুকৃতি — এ ছবি হাস্যকর উদ্ভট অনুকৃতি মাত্র।

৪১. caption (ক্যাপ্‌শন) — শিরনামা — বিজ্ঞাপনে শিরনামা গুরুত্বপূর্ণ।

৪২. catastrophe (ক্যাটাস্‌ট্রফি) — চরম বিপর্যয়, বিপত্তি — ট্র্যাজেডির শেষে চরম বিপর্যয় থাকে।

৪৩. catharsis (ক্যাথারসিস্) — চিত্তশুদ্ধি, ভাবমোক্ষণ — ট্র্যাজেডি দর্শনে ভাবমোক্ষণ ঘটে।

৪৪. cause (কজ্) — কারণ — বিয়োগান্তক পরিণতির যথেষ্ট কারণ থাকে।

৪৫. chapter (চ্যাপটার) — পরিচ্ছেদ, অধ্যায় — রবীন্দ্র-গল্পে অধ্যায় বিভাজন আছে।

৪৬. characterization (ক্যারেক্টারাইজেসন) — চরিত্রচিত্রণ, চরিত্রাঙ্কন — উপন্যাস আসলে চরিত্রচিত্রণের খেলা।

৪৭. chorus (কোরাস) — সম্মেলক — সম্মেলক সংগীত থেকেই গ্রিক নাটকের জন্ম।

৪৮. chronological (ক্রোনোলজিক্যাল)	কালানুক্রমিক	নাট্যকারদের কালানুক্রমিক সাজাও।
৪৯. classical (ক্লাসিক্যাল)	ধ্রুপদী, মার্গীয়	রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদী সংগীত জানতেন।
৫০. climax (ক্লাইম্যাক্স)	চরম সংকট, শীর্ষবিন্দু	পঞ্চাঙ্ক নাটকের তৃতীয় অঙ্কটি শীর্ষবিন্দু।
৫১. combination (কম্বিনেশন)	সংযুক্তি	ভাব ও অর্থের সংযুক্তির জানা প্রয়োজন।
৫২. composition (কম্পোজিশন)	বিন্যাস	রাসায়নিক পরীক্ষার আগে মৌলের বিন্যাস জান।
৫৩. computer (কম্পিউটার)	গণকযন্ত্র	একবিংশ শতাব্দি গণকযন্ত্রের যুগ।
৫৪. concept (কন্সেপ্ট)	ধারণা	ধারণা থেকেই ধীরে ধীরে দর্শন জন্ম নেয়।
৫৫. concrete (কংক্রীট)	মূর্ত	মূর্ত ধারণা না থাকলে বিষয়ী প্রবন্ধ লেখা যায় না।
৫৬. conflict (কনফ্লিকট)	সংঘাত	নাট্য সংঘাত নাটককে গতি দান করে।
৫৭. contemporary (কনটেম্পরারি)	সমকালীন, সমসাময়িক	বিষ্ণু দে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমসাময়িক।
৫৮. content (কনটেন্ট)	আধেয়	পাঠদানে আধেয় গুরুত্বপূর্ণ।
৫৯. construct (কন্সট্রাক্ট)	নির্মিতি	নির্মিতি ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণের একটি প্রধান অংশ।
৬০. context (কনটেক্সট)	প্রসঙ্গ	তাৎপর্য লিখতে গেলে প্রসঙ্গ জানতে হবে।
৬১. continuity (কনটিনিউইটি)	ধারাবাহিকতা, অবিচ্ছিন্নতা	ভালো লেখায় প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটা ধারাবাহিকতা থাকে।
৬২. contrast (কনট্রাসট)	বৈপরীত্য	সুকান্ত আগামী কবিতার শুরুতেই বৈপরীত্য।
৬৩. convention (কনভেনশন)	প্রথা	প্রথাগুলি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত।
৬৪. correlation (কোরিলেশন)	পারস্পরিক সম্বন্ধ	ব্যবসা-বাণিজ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রয়োজন।

৬৫. criticism of life জীবন-ভাষ্য কথাসাহিত্যে জীবন-ভাষ্য রচিত হয়।
(ক্রিটিসিজম অব লাইফ)

৬৬. deductive অবরোহ অবরোহ পদ্ধতিতে পাঠদান ঠিক নয়।
(ডিডাকটিভ)

৬৭. degree পদ, ধাপ ধাপের জন্যই আজকে ছাত্রদের পড়াই।
(ডিগ্রী)

৬৮. descriptive বর্ণনামূলক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান পড়।
(ডেসক্রিপটিভ)

৬৯. destructive ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসবাদীরা ধ্বংসাত্মক কাজে নেমেছে।
(ডেসট্রাক্‌টিভ)

৭০. detachment নির্লিপ্তি নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকলে চলবে না।
(ডিটাচমেন্ট)

৭১. dialect উপভাষা রাঢ়ি বাংলার একটি প্রধান উপভাষা।
(ডায়ালেক্ট)

৭২. dialectical দ্বান্দ্বিক দ্বান্দ্বিক চেতনা থাকলে তবে নতুনের সূচনা হয়।
(ডায়ালেক্টিক্যাল)

৭৩. discovery উদ্‌ঘাটন মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন।
(ডিস্কভারি)

৭৪. double action দ্বৈত কার্য/ক্রিয়া দ্বৈতক্রিয়ার লোভ দেখিয়ে তেল বিক্রি হচ্ছে।
(ডাবল অ্যাকশন)

৭৫. dramatic monologue -নাটকীয় একক ভাষণ, নাটকীয় একোক্তি
(ড্রামাটিক মনোলগ) সত্যেন্দ্রনাথের সহমরণ কবিতাটি নাটকীয় একোক্তিমূলক।

৭৬. dualism দ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদী চিন্তায় মানুষটি পাগল।
(ডায়ালিজম)

৭৭. duration স্থিতিকাল একটা স্থিতিকালের উপর নির্ভর করে পরীক্ষা হয়।
(ডিউরেশন)

৭৮. dynamism গতিময়তা গতিময়তা না থাকলে জীবনের উন্নতি নেই।
(ডাইনামিজম)

৭৯. elegy শোকগাথা অনেক কবিই শোকগাথা রচনা করেছেন।
(এলিজি)

৮০. element উপাদান, উপকরণ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে ঘর সাজানো হয়।
(এলিমেন্ট)

৮১. emotion আবেগ আবেগ না থাকলে গীতিকবিতা জন্ম নিতে পারে?
(ইমোশন)

৮২. epic (এপিক)	মহাকাব্য	রামায়ণ একটি প্রাচীন মহাকাব্য ।
৮৩. epigram (এপিগ্রাম)	প্রবচন, সুভাষিত	প্রবচনে একটা অভিজ্ঞতা ধরা পড়ে ।
৯৪. episode (এপিসোড)	উপকাহিনি	উপন্যাসের উপকাহিনি মূলের অনুগামী।
৮৫. epistle (এপিস্‌ল)	পত্রকবিতা	মধুসূদন পত্রকবিতা রচনা করেছেন।
৮৬. error of judgement (এরর অফ জাজমেন্ট)	বিচার বিভ্রান্তি	সৌরভ বিচার বিভ্রান্তির শিকার হল।
৮৭. escapism (এস্কেপিজম)	পলায়নী মনোবৃত্তি	পলায়নী মনোবৃত্তি নিলে টিকে থাকা যায় না।
৮৮. escapist (এস্‌কপিস্ট)	স্বপ্নচারী	স্বপ্নচারী না হলে সাহিত্য রচনা করা যায় না।
৮৯. experience (এক্সপিরিয়েন্স)	অভিজ্ঞতা	অভিজ্ঞতাই নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে বাঁচিয়ে দিল ।
৯০. explanatory (এক্সপ্ল্যানেটোরি)	ব্যাখ্যামূলক	ব্যাখ্যামূলক রচনা ছাত্রদের উপযোগী।
৯১. exposition (এক্সপোজিশন)	প্রকটকরণ	নাটকের প্রকটকরণে নাট্য সমাপ্তি ঘটে।
৯২. extreme (এক্সট্রিম্)	প্রান্তিক	জঙ্গীরা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।
৯৩. fable (ফেবল)	কাহিনি, নীতিকথা	ঈশপের গল্পে নীতিকথা আছে।
৯৪. fact (ফ্যাক্ট)	ঘটনা, তথ্য	প্রকৃত ঘটনা জেনে বিচার কর।
৯৫. fairy tale (ফেয়ারি টেল)	রূপকথা	সে যেন রূপকথার গল্পের রাণী।
৯৬. fallacy (ফ্যালাসি)	অনুপপত্তি, কূটাভাস	কূটাভাসের জন্যই সে কাছে আসতে পারে না।
৯৭. fancy (ফ্যান্সি)	উৎকল্পনা	উৎকল্পনার উপর ভিত্তি করে গল্পটি রচিত ।
৯৮. fantasy (ফ্যান্টাসি)	অলীক কল্পনা	অলীক কল্পনা বাচ্চাদের কতটা উপযোগী ?

৯৯. farce (ফার্স)	প্রহসন	বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ একটি প্রহসন।
১০০. fatalism (ফেটালিজম্)	অদৃষ্টবাদ	অদৃষ্টবাদের উপর একটা দর্শন গড়ে উঠেছে।
১০১. feeling (ফিলিং)	ভাব, অনুভূতি	অনুভূতি না থাকলে দরিদ্রসেবা করা যায় ?
১০২. fiction (ফিকসন)	কল্পিত কাহিনি	কল্পিত কাহিনি দিয়ে বাস্তবকে ঢাকা যায় না।
১০৩. finalism (ফাইনালিজম্)	পরাতত্ত্ববাদ	পরাতত্ত্ববাদ সাহিত্যকে তেমন প্রভাবিত করেনি।
১০৪. folk culture (ফোক্ কালচার)	লোকসংস্কৃতি	লোকসংস্কৃতিই জাতির মূল শিকড় ।
১০৫. folk literature (ফোক লিটারেচার)	লোকসাহিত্য	লোকসাহিত্য মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে আছে।
১০৬. footnote (ফুটনোট)	পাদটিকা	উচ্চমানের গ্রন্থে পাদটীকা থাকে ।
১০৭. form (ফর্ম)	আকার, রূপ	আধুনিক সাহিত্যে নানা রূপ গড়ে উঠেছে।
১০৮. formal (ফর্মাল)	প্রথাগত	প্রথাগত শিক্ষা শিল্পের যুগে অচল।
১০৯. formality (ফর্মালিটি)	আচারধর্মিতা	আচারধর্মিতা আভিজাত্য বহন করে ।
১১০. formula (ফর্মুলা)	সূত্র	বীজগণিতের সূত্রগুলো ভালো করে দেখো।
১১১. free verse (ফ্রি ভার্স)	মুক্তক	রবীন্দ্রনাথ মুক্তক ছন্দে কবিতা লেখেন।
১১২. frequency (ফ্রিকুয়েন্সি)	ঘনত্ব	ঘনত্ব একটা পরিমাপ বহন করে।
১১৩. function (ফাঙ্শন)	কার্যকারিতা	দ্রব্যটির কার্যকারিতা জেনে নাও।
১১৪. fusion (ফিউশন)	মিশ্রণ, সমন্বয়	সমন্বয় সাধিত হলে অবশ্যই পূর্ণতা।
১১৫. futurism (ফিউচারিজম্)	ভবিষ্যবাদ	ভবিষ্যবাদ-এর কথা ভাবা দরকার।

১১৬. hamartia (হামারতিয়া)	চরিত্র-ভ্রান্তি	চরিত্র-ভ্রান্তি ট্র্যাজেডি সংগঠনে কাজ করে।
১১৭. harmony (হারমোনি)	সুসংগতি, সুষমা	শিল্প বিচারে সুসংগতির প্রয়োজন।
১১৮. hero (হিরো)	বীর, নায়ক	নবান্ন নাটকে একক নায়কে নেই।
১১৯. historical (হিস্টোরিক্যাল)	ঐতিহাসিক	ঔরঙ্গজেব ঐতিহাসিক চরিত্র।
১২০. humour (হিউমার)	হাস্যরস	বঙ্কিম প্রবন্ধের একটি বৈশিষ্ট্য হল হাস্যরস।
১২১. hyperbole (হাইপারাবল্)	অতিশয়োক্তি	অতিশয়োক্তি কাব্য-ঔচিত্যে বাধা সৃষ্টি করে।
১২২. hypothesis (হাইপোথিসিস্)	প্রকল্প	প্রকল্প রূপায়ণ খুব কঠিন কাজ।
১২৩. idea (আইডিয়া)	ভাব, ভাবনা, ধারণা	বিষয় সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা চাই।
১২৪. ideal (আইডিয়াল)	আদর্শ	কেবল আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামিও না।
১২৫. idealism (আইডিয়ালিজম্)	ভাববাদ, আদর্শবাদ	ভাববাদে রবীন্দ্রনাথও আক্রান্ত ছিলেন।
১২৬. idiom (ইডিয়ম)	বাগ্ধারা	বাগ্ধারা একার্থে লৌকিক অভিজ্ঞতা।
১২৭. illusion (ইল্যুশন)	মায়া, বিভ্রম	মরুভূমির বিভ্রমই মরীচিকা সৃষ্টি করে।
১২৮. image (ইমেজ)	প্রতিরূপ, বাক্প্রতিমা	কবিতায় বাক্প্রতিমা থাকা দরকার।
১২৯. imagery (ইমেজারি)	চিত্রকল্প	জীবনানন্দ অনেক চিত্রকল্প রচনা করেন।
১৩০. Imagination (ইমাজিনেশন্)	কল্পনা	কল্পনার রঙে ভেসো না।
১৩১. imitation (ইমিটেশন)	অনুকৃতি, অনুকরণ	জীবনের অনুকরণই সাহিত্য।
১৩২. impersonal (ইমপারসোনাল)	নৈর্ব্যক্তিক	সমালোচকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দরকার।

১৩৩. individuality (ইনডিভিজুয়ালিটি)	ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য	চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকা চাই।
১৩৪. inductive (ইনডাক্‌টিভ)	আরোহী	আরোহী পদ্ধতিতে পাঠদানই শ্রেষ্ঠ।
১৩৫. inspiration (ইন্সপিরেশন)	অনুপ্রেরণা	গুরু অনুপ্রেরণায় সে তীর্থ যাত্রা করল।
১৩৬. interpretation (ইন্টারপ্রিটেশন)	ব্যাখ্যা	ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে বিষয়টি জানা গেল।
১৩৭. irony (আইরনি)	শ্লেষ, বক্রাঘাত	আজকের যুগে শ্লেষ আর কোথায় ?
১৩৮. judgement (জাজমেন্ট)	বিচার	শেষ দিনের বিচারের দিকে তাকিয়ে আছি।
১৩৯. knowledge (নলেজ)	জ্ঞান	এ ব্যাপারে তোমার কতটুকু জ্ঞান আছে।
১৪০. lateral (ল্যাটারাল)	পার্শ্বিক	পার্শ্বিক অবস্থা দেখে আমাদের পথ ঠিক হল।
১৪১. linear (লাইনার)	রৈখিক	কবিতা আর পদ্যের এক রৈখিকে অবস্থান।
১৪২. logical (লজিক্যাল)	যৌক্তিক	প্রবন্ধকারকে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী চাই।
১৪৩. lyric (লিরিক)	গীতিকবিতা	পাশ্চাত্য লিরিকই হল বাংলা গীতিকবিতা।
১৪৪. lyrical (লিরিক্যাল)	গীতিধর্মী	বিহারীলাল গীতিধর্মী কাব্য রচনা করেন।
১৪৫. maker (মেকার)	স্রষ্টা	স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি যে মহান।
১৪৬. medieval (মিডিয়েভ্যাল)	মধ্যযুগীয়	মধ্যযুগীয় মানসিকতা তাদের ধ্বংস করেছে।
১৪৭. medium (মিডিয়াম)	মাধ্যম	আনন্দবাজারে লেখার জন্য মাধ্যম দরকার।
১৪৮. melodrama (মেলোড্রামা)	অতিনাটক	অতিনাটকের মূলে আছে সংগীতভূমিকা ।
১৪৯. melody (মেলোডি)	সুরবিন্যাস	সুরবিন্যাস গানকে আলাদা মর্যাদা দেয়।

১৫০. metaphor (মেটাফর) রূপক রূপকের আড়ালে লেখকের অভিপ্রায় নিহিত।

১৫১. metaphysical (মেটাফিজিক্যাল) পরাসত্তাভিত্তিক সে পরাসত্তাভিত্তিক চিন্তা চেনায় আগ্রহী।

১৫২. metre (মেট্রি) মাত্রা, মিতছন্দ মিতছন্দে এ জীবন এগিয়ে চলে।

১৫৩. mimesis (মাইমেসিস্) অনুকৃতি সাহিত্য-শিল্প আসলে মানব-জীবনের অনুকৃতি।

১৫৪. mode (মোড) রীতি, প্রত্যংশ লেখার সময়ে একটা প্রত্যংশ কাজ করে।

১৫৫. morphology (মর্ফোলজি) রূপতত্ত্ব ভাষাবিশ্লেষণে রূপতত্ত্বের ভূমিকা কম নয়।

১৫৬. motif (মটিফ) উপজীব্য বিষয় গল্পের উপজীব্য বিষয়টা জেনে নিতে হবে।

১৫৭. mould (মোল্ড) ছাঁচ একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে বক্তব্যকে সাজাতে হবে।

১৫৮. movement (মুভমেন্ট) গতিধারা, আন্দোলন পরাবাস্তব সাহিত্যের একটা আন্দোলন।

১৫৯. mutation (মিউটেশন) পরিবর্তন জমির পরিবর্তন করে বাড়ি বানাও।

১৬০. mysticism (মিস্টিসিজম) অতীন্দ্রিয়বাদ,মরমিয়াবাদ অতীন্দ্রিয়বাদ সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছিল।

১৬১. myth (মিথ্) পুরাণ আধুনিক কবিতায় মিথের ব্যবহার কম নয়।

১৬২. mythology (মিথলজি) পুরাণতত্ত্ব, পুরাণশাস্ত্র মন্দিরের ছবিগুলি পুরাণশাস্ত্র অনুযায়ী।

১৬৩. narrator (ন্যারেটর) কথক, কাহিনিকার শরৎচন্দ্রকে আমরা কাহিনিকার বলি।

১৬৪. naturalism (ন্যাচারালিজম্) প্রকৃতিবাদ, স্বভাববাদ প্রকৃতিবাদ একটি সাহিত্য আন্দোলন।

১৬৫. negative (নেগেটিভ) নেতিবাচক নেতিবাচক দৃষ্টিতে জীবনকে দেখা ঠিক নয়।

১৬৬. norm (নর্ম) পরাদর্শ, আদর্শমান কাজ শুরুর আগে জানো কী কী আদর্শমান আছে।

১৬৭. novel (নভেল)	উপন্যাস	বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়।
১৬৮. nucleus (নিউক্লিয়াস)	মূলাধার	জীবনই হলো কথাসাহিত্যের মূলাধার।
১৬৯. objective (অবজেক্টিভ)	বস্তুনিষ্ঠ, তন্ময়	প্রবন্ধ হল বস্তুনিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ।
১৭০. oblique (অব্লিক)	তির্যক	তির্যকচিহ্ন দিয়েই অথবা বোঝানো হচ্ছে।
১৭১. obscure (অবস্কিওর)	দুর্বোধ্য	আধুনিক কবিতা কিছুটা দুর্বোধ্য।
১৭২. octave (অক্টেভ্)	অষ্টক	সনেটের অষ্টকে মূলভাব ধরা পড়ে ।
১৭৩. ode (ওড্)	ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলক গীতিকবিতা	বাংলা সাহিত্যে ওড কোথায়?
১৭৪. opera (অপেরা)	অপেরা, গীতিনাট্য	মনোমোহন বসু গীতিনাট্য রচনা করেন।
১৭৫. one-act play (ওয়ান-অ্যাক্ট প্লে)	একাঙ্কিকা	রাজপুরী একটি উৎকৃষ্ট একাঙ্কিকা ।
১৭৬. ornamental (অরনামেন্টাল)	আলংকারিক	সাহিত্যে আলংকারিক প্রয়োগ কমেছে।
১৭৭. outline (আউটলাইন)	রূপরেখা	নাটক রচনার আগে তার একটা রূপরেখা চাই।
১৭৮. paradox (প্যারাডক্স)	বিরোধকল্প	বিরোধকল্পের মধ্যে দিয়েই কবিকে চেনা গেল।
১৭৯. parody (প্যারোডি)	ব্যঙ্গকবিতা	সজনীকান্ত ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেছিলেন।
১৮০. passion (প্যাসন)	ভাবাবেগ	কেবল ভাবাবেগে থাকলেই সাহিত্য রচনা হয় না।
১৮১. pattern (প্যাটার্ন)	রূপবন্ধন	একটা নির্দিষ্ট রূপবন্ধনে বক্তব্যকে সাজাতে হয়।
১৮২. pause (পজ)	যতি	ছন্দের ক্ষেত্রে যতি গুরুত্বপূর্ণ।
১৮৩. perspective (পার্সপেক্টিভ্)	প্রেক্ষিত	সমালোচনার আগে রচনার প্রেক্ষিতটা জানতে হয়।

১৮৪. pity and fear (পিটি অ্যাণ্ড ফিয়ার)	করুণা ও ভীতি	ট্র্যাজেডিতে থাকে করুণা ও ভীতি ।
১৮৫. probable (প্রোবাবল্)	সম্ভাব্য	কেনার আগে বইগুলির সম্ভাব্য তালিকা দাও।
১৮৬. projection (প্রোজেক্‌শন)	প্রক্ষেপণ, অভিক্ষেপ	প্রক্ষেপণের মধ্যে দিয়েই ছবিগুলি দেখা গেল।
১৮৭. play (প্লে)	নাটক	১৮৫২ সাল থেকে বাংলা নাটক শুরু।
১৮৮. plot (প্লট)	কাহিনিকাঠামো	উপন্যাসে ও নাটকে প্লটের গুরুত্ব কম নয়।
১৮৯. poetic (পোয়েটিক)	কাব্যিক	রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি অনেকটাই কাব্যিক ।
১৯০. poetic imagination (পোয়েটিক ইমাজিনেশন)	কবি-কল্পনা	কবি-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ সমৃদ্ধ ।
১৯১. point-of-view (পয়েন্ট অফ ভিউ)	দৃষ্টিকোণ	বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়।
১৯২. post modernism (পোষ্ট মডার্নিজম)	উত্তর আধুনিকবাদ	উত্তর আধুনিকতাবাদ বড় জটিল।
১৯৩. preface (প্রিফেস)	অনুক্রমণিকা	গ্রন্থের প্রথমেই একটি অনুক্রমণিকা থাকে।
১৯৪. prologue (প্রোলগ্)	প্রস্তাবনা	অ্যারিস্টটলও নাটকে প্রস্তাবনার কথা বলেছেন।
১৯৫. propriety (প্রোপ্রাইটি)	ঔচিত্যবোধ	ঔচিত্যবোধ সাহিত্যকে যথাযথ করে তোলে।
১৯৬. purgation (পারগেশন)	শুদ্ধি, বিমোক্ষণ	ট্র্যাজেডি দর্শনে একটা মানসিক শুদ্ধি আসে।
১৯৭. qualitative (কুয়ালিটেটিভ)	গুণগত	রচনাটির গুণগত উৎকর্ষ কম নয়।
২৯৮. quantitative (কুয়ানটিটেটিভ)	পরিমাণগত	পরিমাণগত বিচারেই তাকে সেরা বলা হল।
২৯৯. rational (র‍্যাশনাল)	বৌদ্ধিক	মননশীলদের বৌদ্ধিক চেতনার বিকাশ ঘটে ।
২০০. realism (রিয়ালিজম্)	বাস্তববাদ	বাস্তববাদ সাহিত্যের গতি বদলে দিয়েছে।

২০১. reason (রিজন্)	যুক্তি, প্রজ্ঞা	প্রজ্ঞা দিয়েই সে তার দোষ ঢেকে দিল।
২০২. representation (রিপ্রেজেন্টেশন)	উপস্থাপনা	বক্তার উপস্থাপনাই আমাদের আকৃষ্ট করে।
২০৩. response (রেসপন্স)	প্রতিক্রিয়া	তার মানসিক প্রতিক্রিয়া জেনে নাও।
২০৪. repetition (রিপিটিশন)	পুনরুক্তি	পুনরুক্তি দোষ বক্তব্যকে একঘেঁয়েমি করে।
২০৫. resolution (রেজোলিউশন)	সিদ্ধান্ত	তোমার শেষ সিদ্ধান্ত জানাও।
২০৬. rhyme (রাইম)	মিল	আধুনিক জীবনে মিল খোঁজো না।
২০৭. rhythm (রিদম)	তাল, লয়, ছন্দোস্পন্দ	গদ্যেরও একটা ছন্দোস্পন্দ থাকে।
২০৮. ritual (রিচুয়াল)	আচার-পদ্ধতি	আচার-পদ্ধতিগুলি জেনে নাও।
২০৯. romance (রোমান্স)	স্বপ্নিল	তার মুখের মধ্যেই একটা স্বপ্নিল-আভা ফুটে।
২১০. romantic (রোমান্টিক)	কল্পনাচারী	রবীন্দ্রনাথ কল্পনাচারী ছিলেন।
২১১. saga (সাগা)	বীরকাহিনি	বাংলায় তেমন একটা বীরকাহিনি রচিত হয়নি।
২১২. satire (স্যাটায়ার)	ব্যঙ্গ	রচনাটির মধ্যে ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে।
২১৩. scale (স্কেল)	ব্যাপ্তিরেখা	ব্যাপ্তিরেখাটিই এই রচনার প্রধান আকর্ষণ।
২১৪. scene (সিন)	দৃশ্য	রবীন্দ্রনাথ মাত্র দুটি নাটকে দৃশ্য বিভাজন করেন।
২১৫. semantics (সেমানটিক্স)	শব্দার্থতত্ত্ব	অর্থ ও শব্দের যোগের প্রশ্নটি শব্দার্থতত্ত্বে আছে।
২১৬. sensation (সেনসেশন)	সংবেদন	তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ।
২১৭. sensuous (সেন্সুয়াস)	ইন্দ্রিয়ঘন, ইন্দ্রিয়ানুগত	ইন্দ্রিয়ানুগত তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে।

২১৮. sentiment (সেন্টিমেন্ট)	ভাবপ্রবণতা	একমাত্র ভাবপ্রবণতার জন্যই সে পিছিয়ে গেল।
২১৯. sequence (সিকুয়েন্স)	অনুক্রম	অনুক্রমের উপর ভিত্তি করেই পরের পর্বটি রচিত।
২২০. serial (সিরিয়াল)	ধারাবাহিক	ধারাবাহিকভাবে সুনীলের লেখাটি প্রকাশিত।
২২১. sign (সাইন)	চিহ্ন, লক্ষণ	ছাত্রটির লেখার মধ্যে একটা ভালো চিহ্ন আছে।
২২২. situation (সিচুয়েশন)	অবস্থা,গতিক	গতিক দেখেই সে কেটে পড়ল।
২২৩. soliloquy (সলিলকি)	স্বগতোক্তি	নূরজাহান নাটকে অনেকগুলি স্বগতোক্তি আছে।
২২৪. sonnet (সনেট)	চতুর্দশপদী কবিতা	মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট।
২২৫. space (স্পেস)	ব্যোম, মহাকাশ	আজ মহাকাশে প্রমোদভ্রমণ হচ্ছে ।
২২৬. stage (স্টেজ)	নাট্যমঞ্চ, স্তর	নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় তিনিই প্রধান উদ্যোগী।
২২৭. stanza (স্ট্যাঞ্জা)	স্তবক	কবিতার এক একটা স্তবকে কবি-ভাবনা প্রকাশিত।
২২৮. story (স্টরি)	গল্প, কাহিনি	গল্পটা জেনে নাও তা হলেই হবে।
২২৯. structure (স্ট্রাক্‌চার)	কাঠামো	নাট্যকারকে একটা কাঠামো মানতেই হয় ।
২৩০. stylistics (স্টাইলিসটিক্স)	শৈলিবিজ্ঞান	বিপ্লববাবু শৈলীবিজ্ঞান নিয়ে বেশি ভাবছেন।
২৩১. subject (সাবজেক্ট)	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু না জেনে প্রশ্নের উত্তর দেবে না।
২৩২. subjective (সাবজেক্টিভ)	আত্মলীন, অন্তর্মুখী	রচনাটি অনেকটাই অন্তর্মুখী রচনা ।
২৩৩. sublime (সাবলাইম)	মহতী	কবিতাটিতে কবির মহতী উপলব্ধি প্রকাশিত।
২৩৪. substitute (সাবসটিটিউট)	বিকল্প	রবীন্দ্রনাথের বিকল্প নেই ।

২৩৫. suggestion ইঙ্গিত, আভাস — পরীক্ষার জন্য প্রশ্নে একটা আভাস চাই।
(সাজেশন)

২৩৬. suggestive ইঙ্গিতপূর্ণ, আভাষময — লেখাটি ইঙ্গিতপূর্ণ।
(সাজেসটিভ)

২৩৭. suffering যন্ত্রণা — ট্র্যাজেডির নায়ককে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।
(সাফারিং)

২৩৮. supernatural অতিপ্রাকৃত — ক্ষুধিত পাষাণ অতিপ্রাকৃত গল্প।
(সুপারন্যাচারাল)

২৩৯. surrealism পরাবাস্তববাদ, অধিবাস্তববাদ
(সুররিয়ালিজম) — জীবনানন্দের কবিতায় আছে পরাবাস্তববাদ।

২৪০. surrealist পবাপ্রাকৃত — কবি জীবনানন্দ দাশ পরাপ্রাকৃত ছিলেন।
(সুররিয়ালিস্ট)

২৪১. suspense উৎকণ্ঠা — উৎকণ্ঠাই নাটকটিকে গতিদান করেছে।
(সাস্‌পেন্স)

২৪২. symbol প্রতীক — রাজা নাটকে প্রতীক কম নেই।
(সিম্বল)

২৪৩. sympathy সহানুভূতি সমবেদনা, দবদ — তোমার সহানুভূতি নেই।
(সিম্প্যাথি)

২৪৪. synaesthesis ইন্দ্রিয়বিপর্যয — ইন্দ্রিয়বিপর্যয় ঘটেছে তার মন ও মননে।
(সিনেসথিসিস)

২৪৫. synchronic সমকালীন — মোহিতলাল নজরুলের সমকালীন।
(সিংক্রেনিক্)

২৪৬. synopsis চুম্বক — গবেষণার আগে তার চুম্বক জমা দাও।
(সিনপসিস্)

২৪৭. syntax পদবিন্যাস — পদবিন্যাস রীতিটি তিনি দেখালেন।
(সিনট্যাক্স)

২৪৮. synthesis সমন্বয়, সংশ্লেষণ — কবিতাটিতে শব্দ ও অর্থের সমন্বয় ঘটেছে।
(সিনথেসিস)

২৪৯. talent প্রতিভাধর — কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রতিভাধর।
(ট্যালেণ্ট)

২৫০. technique প্রকরণ, আঙ্গিক — নাট্যরচনার একটা প্রকরণ আছে।
(টেকনিক)

২৫১. temporary তৎকালীন — রাকেশের চাকরিটা তৎকালীন।
(টেমপোরারি)

উচ্চারণ	pronunciation	উপ-ন্যূনতম	sub-minimal
উলম্ব	vertical	উচ্চ	high
উপকণ্ঠ্য	subglottal	উগ্রশুদ্ধি	hypercorrection
উদ্ভট আইন	absurd law	উন্নয়ন তাত্ত্বিক	development theorist
উপান্তিক ভাষা	marginal language		
উধ্বরগমন	highering		
ওষ্ঠ্য ধ্বনি	labial	ওঠানামা	modulation
ওষ্ঠ-লালাস্রাবী	labio-slavry	ওপর থেকে নিচে	transverse
ঔষ্ঠিষিক	coronal		
কৃতঋণ শব্দ	borrowings	ক্রোমানোঁ	cromagnon
কর্কশ ধ্বনি	cracky voice	কেন্দ্র	nucleus
কেন্দ্র, চূড়া	peak	কম্পনজাত	rolling
কোমল তালু	soft palate	কম্পনজাত	trill
কৈশোর	adolescence	কৃত্রিম স্বর	artificial voice
ক্লোমশাখা	bronchus	কালানুক্রমিক	
কম্পাঙ্ক	frequency	প্রত্যক্ষণ	diary study
কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট	glottal stop	কণ্ঠনালী	glottis
কণ্ঠমণি	larynx	কুহর	meatus
কর্মবাচ্য	passive voice	কোষদেহ	soma
কর্কশ	strident	কম্পক	vibrator
কথক	speaker	কৃৎ -কৌশল	heuristics
খাদ্যনালি	aesophagus	গলদেশ	throat
গলনালি-	trachea, pharynx	গুঞ্জন ধ্বনি	murmuring
গোলাকৃতি	round	গলদেশ	throat
গুচ্ছ-পরিসর	bandwidth	গভীর	dark
গ্রাহী	ingressive	গুণ	quality
গতি	velocity of sound		
ঘৃষ্ট	affricate	ঘোষ	voice
ঘোষ	voiced		
চিড়	crack	চুষি	papilla
চেতনাবাদী	cognitivistic	জ্ঞানতত্ত্ব	epistemology
জোড়	pair	জিহ্বামূলীয়	velaric
টান	tension	ডেসিবেল	decibel
ডেনড্রাইট	dendrite	ডি. এন. এ	D.N.A
তরল ধ্বনি	liquids	তালব্য	palatal
তীব্রতা	intensity	তালব্য-দন্তমূলীয়	palato-alveolar

তালু	palate	তাড়নজাত ধ্বনি	tap
তন্তু	tussue	তীক্ষ্ণতা	pitch
তল	surface	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য	wave length
দন্তমূলীয়	alveolar	দন্ত, দন্ত ধ্বনি	dental
দন্তমূল	dental ridge	দৃঢ়	tense
দ্বিমুখী	binary	দ্বিপাদ চাল	bipedal gait
দৃঢ় মুষ্টি	prehensile grip	দ্রষ্টব্য	rina glottidis
ধ্বনিমূল	phoneme	ধ্বনিতাত্ত্বিক	phonetic
ধ্বনিবিজ্ঞান	phonetics	ধ্বনিতত্ত্ব	phonology
ধ্বনিখণ্ড	segments	ধ্বনি, বাগধ্বনি	sound
ধ্বনিসন্ধি	juncture	ধ্রুবসত্য	absolute truth
নেকড়ে বালিকা	wolf girl	নির্দেশক বিশেষণ	midifiers
নির্মিত সত্য	constructed truth	নিয়মিতকরণ	regularization
নিঃসারণ	expiration	নিম্ন	low
ন্যূনতম	minimal	নেহাই	anvil
নাসিক্য	nasal	নাসিক্যিভূত	nasalised
ধ্বনি	vowels		
নির্যাসন	abstrac	পশ্চাৎ	back
পাতা	blade		
প্রশস্ত লিপ্যন্তব	broad transcription	প্রতিবেশগত-অবস্থান	complimentary distribution
প্রতিবেশ	context	প্রতিবেশগত	contextual
প্রথাশাসিত	conventionalized	পেছনের দিক/ অংশ	dorsal side
পরীক্ষামূলক	experimental	পরিবার	family
প্রকল্প	hypothesis	পার্শ্বিক	lateral
পেষক দাঁত	molar	স্পর্শ ধ্বনি	plosives
পশ্চাৎ অংশ	posterior part	পুরঃপেষক দাঁত	premolar
প্রাথমিক	primary	প্রতিবেষ্টিত	retroflex
প্রতিকল্পন	substitution	পাঠ	text
প্রকাশ ক্ষমতা	capacity	পরিবর্তন বিন্দু	change point
প্রধান শব্দ	content word	পুনরাবৃত্তি প্রবণতা	echolalia
পার্শ্ব্য	lateral	প্রাবল্য	loudness
প্রধান শ্রেণীগত ধর্ম	major class feature	প্রাক ভাষা	prelanguage
		পর্দা, পটহ	tympanum
পশ্চাৎগামিতা	backing	পরিস্থিতি	situation
পুনরোদ্যোগ	reissue	প্রকৃত-বিশ্ব	real universe

ফুসফুসীয়	pulmonic	ফলক উপাস্থি	thyroid ca
বায়ুপ্রবাহ কৌশল	airstream mechanism	বর্ণ	alphabet
		বায়ুনালি	bronchus
ব্যঞ্জনধ্বনি	consonants	বহির্গামী বাতাস	eggressive air
বৈশিষ্ট্য	feature	অর্ধ-বিবৃত	half-open
বায়ুগ্রহণ	inhalation	বলয়	ring
বাকপ্রত্যঙ্গ, বাগযন্ত্র	speech organs	বিন্যাস	structure
বক্ষকোটর	thorasic case	বক্ষগহ্বর	thorax
বর্ণীকরণ, লিপ্যন্তর	transcription	বৈচিত্র্য	variant
বাক-সংকেত	vocal sign	বিস্তার	amplitude
বৈপরীত্য	contrast	বিশ্বভাষিক	universal Language
বর্ণীকরণ	alphabetization	বহির্করণ	externalization
ব্যক্তিক অপ্রতুলতা	individual inadequacy		
বায়ুগতিতত্ত্ব	aerodynamics	বিচ্যুতি	deviation
ভাষাপঞ্জী	register	ভঙ্গি	setting
ভাষিক	linguistic	ভাষাতত্ত্ব	linguistics
ভাষা-বদল	language shift	ভাষা-সংস্কার	language reform
ভাষা-সম্প্রদায়	speech Community	ভাষা-পরিকল্পনা	language planning
ভাষা-সৃষ্টি	•language creation	ভাষা-সমস্যা	language problem
ভাষা-পরিচর্যা	language treatment	ভাষা-রাজনীতি	language politics
ভাষা-সমাগম	language contact	ভাষার বাজার	language market
ভাষিক আনুগত্য	language loyalty	ভুল সূচনা	false start
ভাষা-রক্ষণাবেক্ষণ	language maintenance		
ভাষার সমাজতত্ত্ব	sociology of language		
ভাষা-উন্নয়ন	language development		
ভাষার সমাজ-মনস্তত্ত্ব	social psychology of language		
ভাষার ব্যাকরণীকরণ	grammatization of language		
মুখবিবর	buccal Cavity	মহাপ্রাণ	aspiration
মৌলিক	cardinal	মধ্য	central
মূর্ধা	cerebral	মূল অংশ	core
মধ্য	mid	মুক্ত	open
মুখগহ্বর	oral cavity	মৌখিক	oral
মুখ-গলনালি	oro-pharynx	মীড়, স্বরগ্রাম	pitch
মেরুদণ্ডগত স্তম্ভ	spinal cord	মেরুদণ্ডাস্থি	vertebra
মহাপ্রাণতা	aspiration	মুখবিবর	vocal cavity
মিনিজোড়	minimal pair	মনোভঙ্গী	attitude

মনোভাষাবিজ্ঞান	psycholinguistics
যৌগিক স্বরধ্বনি	diphthong
রুদ্ধ	closure
রেকাব	stirrup
শ্রবণমূলক	auditory
শীৎকার ধ্বনি	click
শক্ত তালু	hard palate
শব্দোচ্চতা	loudness
শ্বসন প্রক্রিয়া	respiratory system
শিরবল্কল	cortex
শর্তিত রিফ্লেক্স	conditioned reflex
শ্রবণাতীত শব্দ	ultrasonic sound
সংরক্ষিত বায়ু	reserved volume
স্বাধীন বৈচিত্র্য	free variation
স্বরিত ধ্বনি	glides
সংযোগস্থল	juncture
স্বরযন্ত্রীয় গলনালি	lagryangeo-pharynx
সংকীর্ণ	narrow
স্পর্শধ্বনি	plosives
স্পৃষ্ট ধ্বনি	stops
সুর	tone
স্বরতন্ত্র	vocal Cords
স্বরপেশি	vocal muscle
স্বরধ্বনি	vowels
সহধ্বনিগত ভেদ	allophonic variation
সমতান	Harmonics
সুরেলা শব্দ	musical sound
সচেতন ব্যাকরণ	prescriptive grammar
সংকেতের সংকেত	signal of signals
সংবদ্ধ	tense
সমাজীয় ভাষাবিজ্ঞান	sociolinguistics
হাতুড়ি	hammer

মানব-বিকাশ	human Development
যোগ্যতা	completence
রূপমূল, শব্দাঙ্গ	morpheme
শ্রুতিমূলক	acoustic
শ্বসিত ধ্বনি	breathy voice
শব্দকোষ	glossary
শিথিল	lax
শরীরবৃত্ত	physiology
শ্বাসাঘাত	stress
শারীরবিদ্যা	physiology
শব্দখণ্ড	segment
শব্দার্থতত্ত্ব	semantics
সহধ্বনি	allophone
সংবৃত	close
সম্মুখ	front
স্বররন্ধ্র	glottis
স্বরযন্ত্রীয়	laryngealized
স্বরযন্ত্র	larynx
স্বর	phonation
সংকেত	sign
সংবিধি, শৃঙ্খলা, সংশ্রয়	system
সম্পূর্ণ	total
স্বরবন্ধনী	vocal ligaments
স্বরপথ	vocal tract
সহধ্বনি	allophonic
সম্মুখী	anterior
স্বচ্ছ	clear
সাধু শব্দ	learned Word
সম্পাদন সৌকর্য	performance
স্বরাভাস	pseudo-voice
স্বরগ্রাম	scale, musical
সমীকৃত স্বরগ্রাম	tempered scale
স্বরমঞ্জুষা	voice box

বাংলা বানান

✧ বানান কেন ভুল হয় ?

শুধু ছাত্র-ছাত্রী কেন বয়স্ক মানুষেরও বানান ভুল হয়। চর্চা নেই তাই বানান ভুল হয়। অনেকেই বলছেন কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা ঠিক বুঝি না। খবরের কাগজে কোথাও দেখি 'গাওস্কর' আবার কোথাও শুনি ' গাভাস্‌কার'। আমরা সাধারণ মানুষ কি লিখি বলোতো?

বিদ্যালয়ের সিলেবাস বদলেছে , পাতা সংখ্যা কমিয়ে নতুন করে বই লিখতে হবে, প্রকাশকরা তৎপর। নামকরা বিদ্যালয়ের নামকরা শিক্ষকদের দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছেন যাতে টি.বি. নাম্বার (Text Book Number)পেতে অসুবিধা না হয়। পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া হল। জীবনবিজ্ঞানের এক অধ্যাপিকা সংশোধন করে পাঠালেন। একজায়গায় লিখলেন — ' বানান ভূল ঠিক করুন'। 'ভুল' লেখিকার অজান্তেই 'ভূল' হয়ে গেল। দু-একটা পত্রিকাতো ঘোষণাই করেছে — আমরা বানান বানাই, তোমরা বানান খাও।

নানাকারণে বানান ভুল হয়—

১. প্রুফ দেখতে গিয়ে চোখে পড়ে নি । আমরা বলি 'প্রিন্ট মিস্‌টেক্‌' ।

২. প্রাইমারি লেবেলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল হচ্ছে। কারণ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান নয়। বলছি 'বিশ্‌শাস্‌' কিন্তু লিখতে বলছি ' বিশ্বাস'।

৩. উচ্চারণ করছি কিন্তু বাংলাতে লিপি কই? 'এ্যা' লিপি নেই অথচ বাঙালি উচ্চারণে আছে।

৪. দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ বাংলায় আজ আর নেই। অথচ বানানে আছে । তাই 'চীন' বানান 'চিন' হয়ে যাচ্ছে।

৫. রাঢ়িতে 'অ' কখনো কখনো 'ও'। তাই 'অতুল' লেখার সময় ' ওতুল' হতেই পারে।

৬. উ-কার এবং যুক্তব্যঞ্জনগুলো তলায় লিখবো না যুক্ত আকারে লিখবো এ নিয়েও মতভেদ তৈরি হয়েছে।

এসব নানা কারণ ছাড়া পণ্ডিতমহলে কেউ বলেন পুরানো রীতি মেনে চলো, কেউ বলেন উচ্চারন অনুযায়ী বানান হোক। তাই বানান-দ্বন্দ্ব সামলাতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এগিয়ে আসে ও আলোচনা-পর্যালোচনার পর কতকগুলি প্রস্তাব দেয়। সেগুলি হল —

✧ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের বানান ✧

✧ **হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্নের ব্যবহার ঃ** মনে রাখতে হবে আধুনিক বাংলায় দীর্ঘস্বর নেই। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে যেখানে হ্রস্ব ই উ/ই-কার উ-কার এবং দীর্ঘ ঈ ঊ/ঈ-কার ঊ-কার দুটি রূপই প্রচলিত ও গৃহীত, সেখানে সাধারণভাবে হ্রস্ব বিকল্পটিকেই নেওয়া হয়েছে। যেমন — অপেক্ষাকৃত নতুন রূপগুলি হল ঃ

অঙ্গুরি, অঙ্গুলি, অবনি, আবির, উষসী, উষা, ঔষধি, কটি, কেলি, কোটি, ক্ষৌণি গাগরি, চিৎকার, চুল্লি, ত্রুটি, দরি, তরি, দীপাবলি, দ্রোণি, ধমনি, ধরণি, ধূলি, নাড়ি, নেমি, পঞ্জি, পদবি, পরিপাটি, পল্লি, পাটি, পুত্তলি, পুরন্ধ্রি, পেশি, প্রসূতি, বদরি, বলি, বাজি, বেদি, বেলি, ভৃঙ্গি, ভেরি, রজনি, শরণি, সরণি, সুরভি, সূচি, বারি (হাতি বাঁধবার জায়গা)

মনে রাখতে হবে, হ্রস্ব বিকল্প না-থাকলে তৎসম শব্দের বানানে দীর্ঘ স্বরচিহ্নই লিখতে হবে।

সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত মূল শব্দটিকে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত 'বাংলা' শব্দ ধরতে হবে। অর্থাৎ সমাস হলেও তার দীর্ঘ ঈ-কারের ব্যতিক্রম ঘটানো চলবে না। তাই — আগামীকাল, পরবর্তীকাল, মন্ত্রীগণ, মন্ত্রীসভা, শশীভূষণ।

কিন্তু, তৎসম — ত্ব ও — তা প্রত্যয় যোগ করা হলে এইসব শব্দের হ্রস্ব ই-কারান্ত (অর্থাৎ ইন্-এর ন লোপের পর যা থাকে) মূল প্রাতিপাদিক রূপেই লেখা হবে। যেমন— প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা, মন্ত্রিত্ব, সহমর্মিতা, স্থায়িত্ব ইত্যাদি।

এছাড়া লিঙ্গান্তরের ক্ষেত্রেও নী-যোগের আগে এই নিয়ম পালিত হবে, যেমন — প্রতিদ্বন্দ্বিনী, প্রতিযোগিনী। অবশ্য অতৎসম প্রত্যয় যুক্ত হলেও উপরের 'মন্ত্রীগণ'-সংক্রান্ত বিধি প্রযোজ্য হবে। যেমন, মন্ত্রীগিরি।

কোনো কোনো তৎসম শব্দে বাংলা প্রত্যয়-ই লাগিয়ে বিশেষণ করা হয়, যেমন— আগমনি, উত্তরপ্রদেশি, উদয়পুরি, কৃত্তিবাসি, জনকপুরি, জনসঙ্ঘি, তৃণমূলি, দক্ষিণি, প্রণামি প্রসাদি (— ফুল) বয়সি, বিহারি, মমিপুরি, রামপ্রসাদি, হিন্দুস্থানি।

✧ **বিসর্গ (ঃ) রক্ষা ও বর্জন**

যেখানে -তস্ বা -শস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিকে অন্ত্যবিসর্গের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল, সেগুলিতে এখন আর বিসর্গ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ, প্রথমতঃ, লতঃ, বস্তুতঃ, ক্রমশঃ, প্রায়শঃ নয়, লেখা হবে অন্তত, প্রথমত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ।

বিসর্গসন্ধিযুক্ত পদেও অন্ত্যেবিসর্গ বর্জিত হবে।

যেমন — ইতস্তত (ইতস্ততঃ নয়), অহরহ, মুহুর্মুহু, অধ, কিন্তু অধঃপাত

কিন্তু সন্ধিতে যেখানে পদমধ্যে বিসর্গ রক্ষিত থাকে সেখানে পদমধ্যস্থ বিসর্গ লিখতে হবে। যেমন, অতঃপর, অধঃপাত, অন্তঃকরণ, বয়ঃসন্ধি, মনঃপূত।

সন্ধি-সমাস নিষ্পন্নরূপেই গৃহীত ও প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে বিসর্গসন্ধিজাত ও-কারের প্রচলিত ও দীর্ঘকাল-গৃহীত রূপগুলি থাকবে। যেমন অকুতোভয়, ততোধিক, বয়োজ্যেষ্ঠ, মনোযোগ, মনোরঞ্জন, মনোরম। তবে অর্ধতৎসম শব্দ 'মন'-কে পূর্বপদ হিসাবে রেখে সমাস করলে ও-কার যোগ হবে না। যেমন, মনপবন, মনমাঝি, মনমেজাজ ইত্যাদি।

দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, বয়স্থ, মনস্থ, শব্দগুলি 'ঃ' বিসর্গ ছাড়াই ব্যবহৃত হবে।

✧ হস্ (্) চিহ্নের রক্ষা ও বর্জন ঃ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে পদান্ত হস্ বর্জিত হবে।

অবাক, আশিস, দিক, ধিক, পরিষদ, পৃথক, বণিক, বিপদ, বিরাট, ভিষক, সভাসদ্, সম্রাট, ইত্যাদি। আবার — রুচিমান, শক্তিমান, শ্রীমান, সংস্কৃতিমান এবং ঘটমান, ম্রিয়মাণ, ধাবমান, বর্তমান, জ্ঞানবান, ধনবান, ভগবান ইত্যাদি।

তবে সংস্কৃত সন্ধিজাত শব্দে পূর্বপদের শেষে হস্ চিহ্ন থাকবে। যেমন, দিগ্‌ভ্রান্ত, পৃথক্‌করণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বাক্‌সিদ্ধ, বাগ্‌ধারা, বাগ্‌রূপ।

✧ রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ

রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হবে না। যেমন — অর্চনা, অর্জন, আর্য, ঊর্ধ্ব, কর্ম, চর্চা, তূর্য, পূর্ব, বর্জন, ভট্টাচার্য, মূর্ছনা, হার্দিক।

✧ ঙ আর ং -এর ঃ

ঙ আর ং দুটোই যে-বানানে (সংস্কৃত ব্যাকরণমতে) শুদ্ধ, সেখানে কেবল ং-ই ব্যবহৃত হবে। যেমন — অলংকার, অহংকার, দীপংকর, ভয়ংকর, শংকর, শুভংকর, সংগত, সংগীত।

কিন্তু, যেসব শব্দে ম্-এর সন্ধি-পরিণাম হিসাবে ং আসেনি, সেখানে ং ব্যবহার অবৈধ। তাই অংক নয়, অঙ্ক (অন্‌ক্ + অল), বংগ নয়, বঙ্গ ; শংকা নয়, শঙ্কা ; সংগে নয়, সঙ্গে। অনুরূপে ঃ অঙ্কুশ, আতঙ্ক, কঙ্কাল, পঙ্ক।

দ্রষ্টব্য ঃ সম্ + গীত সংগীত হলেও সম্ + বোধন কিন্তু সংবোধন নয়, সম্বোধন। ম্-এর পরে বর্গীয় ব থাকলে তা ম্-ই থাকবে, ং হবে না ; ম্-এরপরে অন্তঃস ব থাকলে তবেই সেটা ং হবে। তাই কিংবদন্তী, কিংবা, প্রিয়ংবদা, সংবর্ধনা, সংবাদ; কিন্তু সম্বন্ধ, সম্বুদ্ধ, সম্বোধন, সম্বোধি।

✧ কিছু বিশেষ্য শব্দের য-ফলা ঃ

কিছু বিশেষ্য শব্দ য-ফলা দিয়ে লিখতে হবে। যেমন — চারিত্র্য, দারিদ্র্য, বৈচিত্র্য, বৈদগ্ধ্য, বৈমাত্র্য, সৌগন্ধ্য, সৌভ্রাত্র্য, সৌহার্দ্য ইত্যাদি।

✧ শ-ষ-স -এর প্রয়োগ ঃ

যেসব তৎসম শব্দে শ-ষ বা শ-স দুটোই সংস্কৃত অভিধানে স্বীকৃত। সেগুলির ক্ষেত্রে শুধু "শ" ব্যবহার করতে হবে। উশীর-উষীর, কিশলয়-কিসলয়, শায়ক-সায়ক ইত্যাদি।

কোশ-কোষ, শরণি-সরণি নিয়ে প্রথমে একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু এ দুটি যেহেতু একই শব্দের বিকল্প বানান সুতরাং কোশ, শরণি-ই হবে।

✧ অতৎসম শব্দ বিষয়ে ✧

✧ হ্রস্ব ই-কার ও দীর্ঘ ঈ-কার-এর ব্যবহার ঃ

অতৎসম শব্দে ঈ-কার বর্জন করাই ভালো। যেমন — কাহিনি, কুমির, চাঁদনি, ছেনি, দিঘল, দিঘি, দিয়াশলাই, নিলা, পশমি, পাখি, পাটি, পাথুরি, পারানি, পিরিতি, বাড়ি, বাঁশি, সুপারি, সেঁউতি, হাতি, হিরা, হিরে ইত্যাদি শব্দ সবসময়েই হ্রস্ব ই-কার ব্যবহৃত হবে।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে প্রচলিত বাংলা লেখায় এই নিয়ম অনুসৃত হচ্ছে না, সুতরাং এই ধরনের নতুন শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে প্রস্তাব ঃ মূল শব্দ + করণ, ভবন (এসব ক্ষেত্রে পূর্ব স্বরের পরিবর্তন হবে না)। যেমন — বন্ধ্যাকরণ, অন্ধকরণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, রাষ্ট্রীয়করণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ, শুদ্ধকরণ, নগদকরণ, মেরুকরণ, বহুকরণ, চারুকরণ ইত্যাদি। বাংলায় প্রচলন অনুযায়ী লঘুকরণ বানান গ্রহণযোগ্য।

সংস্কৃত স্ত্রীবাচক প্রত্যয়ের নীতি অনুসারে অতৎসম শব্দেও দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানোর রীতি এখনও কমবেশি চললেও ব্যাপকতর সমতার জন্য এ ক্ষেত্রেও হ্রস্ব ই-কার ব্যবহার করতে হবে। যেমন — কাকি (-মা), কামারনি, খাণ্ডারনি, খুকি, খুড়ি, খেঁদি, গয়লানি, চাকরানি, চাচি, ছুঁড়ি, ছুকরি, জেঠি (-মা), ঝি, ঠাকুরানি, ধাঙড়নি, নেকি, পাগলি, পিসি, পেঁচি, বাঘিনি, বামনি, বেটি, ভেড়ি, মামি (-ম), মাসি, মুদিনি, মেথরানি, রানি, সাপিনি, সোহাগি, স্যাঙাতনি ইত্যাদি।

জীবিকা ভাষা গোষ্ঠী সম্প্রদায় জাতি বোঝাবার জন্য যে ই-কারান্ত প্রত্যয় ব্যবহার করা হয় তা দীর্ঘ ঈ-কার হবে না, সবসময় হ্রস্ব ই-কার হবে। যেমন — উজিরি, ওকালতি, জজিয়তি, জমিদারি, ডাক্তারি, তবলচি, পণ্ডিতি, ফকিরি, বরকন্দাজি, মাস্টারি, মোক্তারি, হাকিমি, আরবি, ইংরেজি, কাশ্মীরি, গুজরাতি, পাঞ্জাবি, ফরাসি, পারসি, ভিয়েতনামি, মারাঠি, মালয়ালি, মৈথিলি, সিন্ধি, হিন্দি, আকালি, কংগ্রেসি, জনসঙ্ঘি, ঝাড়খণ্ডি, ইরাকি, ইরানি, ওড়িশি, কাবুলি, জাপানি, পাকিস্তানি, বর্মি, বাঙালি, লাডাকি, হানাফি।

কিছু অতৎসম, মিশ্র ও বিদেশি বিশেষণ শব্দে যে ই-প্রত্যয় যুক্ত হয় তাও হ্রস্ব ই-কার দিয়েই লিখতে হবে। যেমন — আন্দাজি, আসামি, কারবারি, কয়েদি, কুদরতি, খানদানি,

খুনি, গায়েবি, জঙ্গি, জবানবন্দি, জরুরি, জাহাজি, ঠগি, তুফানি, তেজারতি, দরকারি, দরদি, দেশি, ধানি (-রং), নজরবন্দি, নাকি (- সুর), পশ্চিমি, ফরায়েজি, ফরিয়াদি, বন্দি (– কয়েদি), বিদেশি, মজলিশি, মরমি, মরসুমি, মুলতুবি, মৌসুমি, রাজি, শরবতি, সরকারি, হজমি, হিসেবি, হিসাবি।

কিছু দেশি-বিদেশি সাধারণ বিশেষ্য শব্দেও হ্রস্ব ই-কার লিখতে হবে। যেমন – কবুলতি, কাঁসারি, কেরামতি, কোরবানি, ক্যারদানি, খবরদারি, গোলামি, চালাকি, চালিয়াতি, জালিয়াতি, টিটকিরি, ঠুংরি, ডুগডুগি, ঢাকি (যারা ঢাক বাজায়), থানকুনি, হেলি, পড়শি, ফরসি, সরফরাজি সালিশি, হালালি, হম্বিতম্বি, হুজ্জতি।

সংস্কৃত ঈয় প্রত্যয় যদি অতৎসম শব্দ বা শব্দাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে অর্থবোধের সুবিধার জন্য দীর্ঘ ঈ-কার বজায় রাখতে হবে। যেমন – অস্ট্রেলীয়, আর্টেজীয়, আলজিরীয়, ইউরোপীয়, ইতালীয়, এশীয়, কানাডীয়, ক্যারিবীয়, ক্যালাডোনীয়, জর্জীয়, পোলিনেশীয়, লাইবিরীয়, সাইবেরীয়।

✧ 'কী' আর 'কি'-এর প্রয়োগ ঃ

মনে রাখতে হবে ঃ যে-প্রশ্নের উত্তর হয় 'হ্যাঁ' হবে, না হয় 'না' হবে (Yes-No question) সে-ক্ষেত্রেই শুধু হ্রস্ব ই-কারযুক্ত কি ব্যবহৃত হবে ; বাকি সব জায়গাতেই 'কী' হবে। যেমন –

তুমি খাবে কি ? – এর উত্তর হবে হ্যাঁ বা না।

তোমার নাম কী ? – এর উত্তর হবে শ্রোতা যা দেকেছে নাম বা বর্ণনা।

তাছাড়া কীভাবে, কীরকম, কী জন্য, কী রে, কী হে – এগুলিতে 'কী' হবে।

✧ হ্রস্ব উ-কার, দীর্ঘ ঊ-কার-এর প্রয়োগ ঃ

দীর্ঘ ঊ-কারযুক্ত তৎসম শব্দ কিংবা উপসর্গের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় কিংবা শব্দ যুক্ত হলেও দ্রুত অর্থবোধের সহায়ক বলে মূলের দীর্ঘ উ/ঊ-কার পালটাতে চাই না। তাই ধূর্তামি, মূর্খামি, পূজারি।

কিন্তু শব্দগুলি অর্ধতৎসম রূপ গ্রহণ করলে দীর্ঘ ঊ-কারের বদলে হ্রস্ব উ-কারই হবে। যেমন – উনত্রিশ, উনচল্লিশ, উনপঞ্চাশ, উনপাঁজুরে, মুখ্‌খুমি, পুজুরি ইত্যাদি।

✧ শব্দান্তে ও-কারের প্রয়োগ ঃ

কালো, খাটো, ছোটো, ছোটোগল্প, বড়ো, বড়োদিন, ভালো, ভালোবাসা, মতো, এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো।

কিন্তু, তে, কত, তত, যত ইত্যাদি শব্দে ও-কার ব্যবহার চলবে না। আবার ও-কারের পরিবর্তে ও বর্ণ বলতে হবে।

অর্থাৎ আজো, আরো, এখনো, তোমারো, রামেরো, নয়; লেখা হবে — আজও, আরও, এখনও, তোমারও, রামেরও ইত্যাদি। অনুরূপে ই-কার নয় ই-বর্ণ বসবে।

অর্থাৎ আজি, কেবলি, তোমারি, সকলি, নয় — আজই কেবলই তোমারই সকলই হবে।

আবার উচ্চারণ অনুযায়ী ঘোরাল, ছুঁচোল, জোরাল, ধারাল, টিকোল, প্যাঁচাল নয় — ঘোরালো, ছুঁচোলো, জোরালো, ধারালো, টিকালো, প্যাঁচালো।

✧ **ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপে নিম্নবর্ণিত পার্থক্যগুলি বজায় থাকবে ঃ**

নিয়মিত অভ্যস্ত ঘটনাসূচক নিত্যবর্তমানকাল অ-কারান্ত হবে। যেমন — তুমি কোন্ কাগজ পড় ?

বর্তমান অনুজ্ঞায় ও-কারান্ত ঃ এটা পড়ো তো দেখি।

তুচ্ছার্থক বর্তমান অনুজ্ঞায় হলন্ত ঃ তুই পড়্।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় অর্থাৎ আদেশে, অনুরোধে একাধিক ও-কার ঃ এ বইটা অবশ্যই পোড়ো।

বস্ ধাতুর ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপ হবে বোসো।

✧ **চলিত ক্রিয়ারূপে ও-কার দেবার প্রয়োজন নেই। যেমন ঃ —** বলল, বলত, বলব, হল, হত।

নীচের বানানগুলি লক্ষ করুন ঃ

করানো, (করান নয়), এগোবে, জুড়োল, পিছোবে, পৌঁছোল, ফুরোল, লুকোবে, বলে, কয়ে, হয়ে, সয়ে, পড়ে, চলে, বোস্, বোসো, হোন, হোক, করিয়ো, দেখিয়ো, শুনিয়ো, কেয়ো, দিয়ো, যেয়ো।

✧ **ঐ ঐ-কার, ঔ ঔ-কারের বিশ্লেষ ঃ**

ঐ-কার বা ঔ-কারের বদলে অই বা অউ ব্যবহার প্রয়োজনমতো করা যেতে পারে, যেমন — কই, দই, বই (বৈ কি), হইচই, রইরই, পইপই, ইত্যাদি শব্দ ঐ-কার ছাড়া লিখতে হবে। তেমনই বউ, মউ তবে কৈফিয়ত, পৈতা, মৌরালা, মৌর, মৌলবি, মৌলানা, মৌলালি, মৌসুমি ইত্যাদি প্রচলন মেনে লেখা হবে।

✧ **জ এবং য-এর প্রয়োগ ঃ**

অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দে জ-এর বদলে য ব্যবহার করলে মূল শব্দটির কথা স্মরণ করে দ্রুত অর্থবোধের সহায়তা হয় এজন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে জ-এর বদলে মূলে য লিখতে হবে ঃ

যখ, যখন, যত, যন্তন্না, যন্তর, যবে, যাওয়া, যিনি, যে ইত্যাদি।

কিন্তু, প্রচলিত কয়েকটি ক্ষেত্রে য-এর বদলে জ হবে। যেমন -- কাজ, জাঁতা, জাউ, জুঁই, জুতসই, জো, জোগাড়, জোগান, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।

✧ ণ এবং ন-এর প্রয়োগ ঃ

সংস্কৃত ণত্ব-বিধান কেবল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তৎসম নয়, অথবা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে পরিবর্তিত এই সব শব্দে দন্ত্য ন হবে ঃ

অঘ্রান, কান, কোনাকুনি, ঘরানা, চিরুনি, চুন, ঠাকরুন, দরুন, ধরন, (রকম বা প্রকার), নরুন, পুরানো, পুরোনো, মানিক, রানি, সোনা ইত্যাদি।

অতৎসম শব্দের মূর্ধন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন-এর ক্ষেত্রে দন্ত্য ন গ্রাহ্য হবে। তাই ঃ ঝন্টু, প্যান্ট, প্যান্টালুন, ফ্যান্টা, লন্ঠন, ঝান্ডা, মুন্ডা, মুন্ডারি, লন্ডভন্ড ইত্যাদি।

কিন্তু আণ্ডা, কুণ্ডু, মুণ্ডু, ষণ্ডা লেখা হবে।

শিক্ষালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ণ্ট ন্ট ণ্ঠ এবং ন্ড ও ণ্ড-এর রূপগত পার্থক্য স্পষ্ট করা প্রয়োজন। পুণ্য গণ্য ইত্যাদি শব্দের পুণ্যি গণ্যি এই রূপভেদ চলবে।

✧ য-ফলার প্রয়োগ ঃ

অতৎসম শব্দে য-ফলা সবক্ষেত্রে বর্জন করা সম্ভব নয় ঃ তাই বিশেষত অর্থতৎসম শব্দে য-ফলা দিতে হবে। তাই কব্বি, জন্নে, ভুজ্জি, মান্নিগন্নি ইত্যাদি না-লিখে কাব্যি জন্যে, ভুজ্যি, মানিগণ্যি, সাধ্যি, সুজ্জি হিসাবে লিখতে হবে। হিস্যা > হিস্‌সা, লস্যি > লস্‌সি লিখতে হবে। মফঃস্বল নয়, মফস্‌সল। এগুলি বিদেশি শব্দ।

✧ শ ষ স-এর প্রয়োগ ঃ

অতৎসম , বিশেষত তদ্ভব, শব্দে প্রচলন অনুযায়ী শ-ষ-স তিনটিরই ব্যবহার হবে যেমন ভাশুর, ষাঁড় মোষ মাসি পিসি।

✧ ক্ষ এবং খ -এর প্রয়োগ ঃ

ক্ষুদ, ক্ষেত, ক্ষ্যাপা ইত্যাদি শব্দে ক্ষ-এর বদলে খ ব্যবহারই সংগত। লিখতে হবে খুব ,খেত, খ্যাপা। এভাবেই লেখা হবে খিরাই। কিন্তু ক্ষীর তৎসম শব্দ বলে 'ক্ষীর'ই থাকবে।

✧ বিদেশি শব্দে বানানবিধি ✧

১. বিদেশি শব্দ দীর্ঘ স্বরচিহ্ন না-দিয়ে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমন -- ইদ, গির্জা, জানুয়ারি, টিম, নেভি, ফিরিঙ্গি, ব্রিজ, মুভি, সুফি, হাজি ,হিজরি।

২. বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ণ প্রযোজ্য হবে না, সর্বত্রই দন্ত্য ন ব্যবহার করতে হবে। যেমন — কনসার্স, কার্বন, কার্নিশ, গভর্নর, ট্রেন, পরগনা, ব্যারন, বোর্নিও।

৩. st বর্ণগুচ্ছ-বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দে স্ট ব্যবহার করতে হবে। তাই লিখতে হবে ঃ খ্রিস্ট, পোস্ট, পোস্টার, মাস্টার, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট। তবে উচ্চারণ তত্ত্ব অনুযায়ী 'চ' হওয়া উচিত ছিল।

৪. lb বর্ণগুচ্ছ-বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দ বাংলায় লিখতে ল্‌ব্‌ লিখতে হবে, ল্ব নয় ঃ bulb বাল্ব নয় বাল্‌ব্‌।

✧ বিদেশি শব্দে শ-স-এর ব্যবহার ঃ

১. সব আরবি-ফারসি শব্দে স ব্যবহারই চলবে। যেমন — ইসলাম, তসবির, ফারসি, মুসলিম, মুসলমান, সাদা, সাবান, সাহেব, সিতারা, সুলতান, সোফিয়া ইত্যাদি।

২. আমাদের চালু অভ্যাসের মধ্যে এসে গেছে বলে এই শব্দগুলি তালব্য শ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন — আপশোশ, আয়েশ, আশরফি, উশুল, ওয়াশিল, কিশমিশ, কোশিস, চাপরাশি, তপশিল, তহশিল, পোশাক, বকশিশ, বাদশাহি, বালিশ, মজলিশ, শিশুমহল, হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

৩. এই ইংরেজি শব্দগুলির বাংলা রূপে তালব্য শ হবে। যেমন — অ্যাশট্রে, কার্নিশ, নোটিশ, বার্নিশ, পালিশ, পুলিশ, মেশিন, রাবিশ, শিওর, শুটিং (shooting), শ্যালো, হাশিস ইত্যাদি।

ইংরেজি S-এর উচ্চারণ বাংলা শব্দে বজায় থাকলে তা দন্ত্য স দিয়ে কেস, ক্রস (ক্রশ নয়), জুস (juice), নার্স, নার্সারি (নার্শারি নয়), পার্স, প্র্যাকটিস (প্র্যাকটিশ নয়), মিস, মেস, সুট, সুটকেশ (সুটকেশ নয়), সুটিং ইত্যাদি।

বাংলা মান্য উচ্চারণ অনুসারে স-এর S-এর যুক্ত শব্দকে ছ দিয়ে লেখা ঠিক হবে না। লিখতে হবে — ইসলাম, মুসলমান, সালাম, সুলতান, সোলেমান।

ভারতীয় বাংলা য দিয়ে Z-উচ্চারণ বোঝানোর রীতি মান্যতা পায়নি। তাই এই রীতি গ্রহণযোগ্য হয়নি। এজন্য অযু বা ওযু নয়, অজু বা ওজু। নামায নয়, নামাজ। হযরত নয়, বিশেষভাবে উচ্চারণ দেখানোর প্রয়োজন হলে হজরত।

র-ফলা ঃ বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ঋ-কার ব্যবহার না করে র-ফলা ই-কার ব্যবহার করাই উচিত। কারণ ঋ বা ঋ-কারের বাংলা উচ্চারণ লুপ্ত। তাই খৃষ্ট নয় খ্রিস্ট, বৃটিশ নয় ব্রিটিশ। এইভাবে ব্রিটেন, ব্রিস্টল ইত্যাদি। তবে উচ্চারণ অনুযায়ী 'খ্রিষ্ট' হতে দোষ কী ?

✧ ব্যঞ্জনপূর্ব র্‌-রেফ

১. হলন্ত র-এর পর ব্যঞ্জন থাকলে সাধারণভাবে র্‌-রেফ হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় বসবে, যেমন - উর্দি, উর্দু, কার্তুজ, পর্দা, বর্মা, বর্মি, তুর্কি, মার্কেট, ইত্যাদি।

২. তবে সমাসবদ্ধ বা বিদেশি উপসর্গ যুক্ত বা প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দে অর্থবোধের সুবিধার জন্য রেফ না দিয়ে মূলের র বজায় থাকবে। যেমন — কারচুপি, কারসাজি, খবরদার, গরমিল, গরহাজির, জোরদার, তরতাজা, দরদাম, নজরদারি, বরকন্দাজ, বরখাস্ত, শোরগোল, হরতাল, হরদম, হরবোলা ইত্যাদি।

৩. এ ছাড়া ধাতুর শেষ উপাদান র্ হলে তার পরবর্তী সংযোজনে ওই র্ রেফ হিসাবে না লিখে পূর্ণ রূপেই লিখতে হবে। ঝরনা (ঝরন + আ), ভরতি, ভরতুকি, ধরনা, ধরতাই ইত্যাদি।

✧ ব্যক্তিনাম, পদবি, গ্রন্থনাম, স্থাননাম ঃ

গ্রন্থনামে মূল প্রাচীন বানান মান্য। অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী'-কে 'পথের পাঁচালি' বা 'রাধারানী'-কে 'রাধারানি' লেখা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে গ্রন্থনামের সংরক্ষিত এলাকার বাইরে শব্দগুলি সাধারণবাবে ব্যবহৃত হলে অ-তৎসম শব্দের বানান-সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। যেমন, গ্রন্থনামে 'কাহিনী' 'পূরবী' 'রূপসী' (বাংলা) (পথের) 'পাঁচালী' 'পাঁচালী' রক্ষণীয়। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে শব্দগুলির ব্যবহার্য বানান হবে যথাক্রমে কাহিনি, পূরবি, রূপসি, পাঁচালি।

বাঙালিদের পদবির ইংরেজি ধরনের রূপে — ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি, গাঙ্গুলি ইত্যাদিতে হ্রস্ব ই-কার দিতে হবে, দীর্ঘ ঈ-কার নয়।

অ-তৎসম শব্দের বানান পরিবর্তনের সূত্রে স্থাননামের বানানেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটছে। যেমন — নদিয়া, নৈহাটি, দিঘা, মেমারি, রানাঘাট।

✧ লিখনরীতি বিষয়ে ✧

✧ সমাসে শব্দবন্ধন ও হাইফেন প্রয়োগ ঃ

কোন্ শব্দগুচ্ছ একসঙ্গে লিখব, কোন্‌গুলিকে পৃথক রাখব বা হাইফেন দিয়ে যুক্ত করব, সে সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ দৃষ্টান্ত ঃ

যেসব ক্রিয়াজাত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একাধিক অংশে বিভক্ত এবং সাধারণভাবে অসমাপিকার ও সমাপিকার যোগফলে তৈরি, সেগুলিতে হাইফেন ব্যবহার করতে হবে, যেমন ঃ খসে-পড়া, ভুলে-যাওয়া, চোখে-চাওয়া ইত্যাদি।

দুই বা দুইয়ের বেশি শব্দ নিয়ে তৈরি সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রেও হাইফেন বাঞ্ছনীয়, যেমন নাম -না জানা, সদ্য-ভরতি-হওয়া, না-বলা, না-দেখা, কত-না ইত্যাদি।

✧ না-নি-নে-এর ব্যবহার ঃ

নিষেধাত্মক 'না' ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হলে 'না' -কে পৃথক লিখতে হবে। যেমন — দেব না, বলি না, কোরো না, শুনল না, যেত না। কিন্তু, নিষেধাত্মক ও অতীতবাচক 'নি'

যদি ক্রিয়াপদে যুক্ত হয় তা ক্রিয়ারূপের সঙ্গে জুড়ে লেখাই সংগত : কারণ পূর্বপদের ধ্বনিপ্রবাহের ধারাবাহিকতার সঙ্গে পরবর্তী 'নি' যুক্ত এবং নি-র কোনো পৃথক ও স্বাধীন প্রয়োগ নেই। যেমন — হয়নি, করিনি, দেখিনি, শুনিনি, ধরেনি, ভাবেনি।

একই যুক্তিতে 'নে'-ও ক্রিয়ারূপের সঙ্গে যুক্তভাবে লিখতে হবে। যেমন — করিনে, যাইনে, ভাবিনে। [১]

বানানের এই পরিবর্তন সবাই অনুসরণ করতে পারলেই ভালো। লেখা অভ্যাস করলেই ধিরে ধিরে আয়ত্বে এসে যাবে। তবে বানান বিধির আরও সরলীকরণের প্রয়োজন বলে মনে করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষাতাত্ত্বিক টিকা (শব্দের বুৎপত্তি)

আমি ঃ কারো মতে শব্দটি সংস্কৃত 'অস্মাভিঃ' শব্দ থেকে এসেছে। আবার কারও মতে শব্দটি বৈদিক 'অস্মে' শব্দ থেকে বাংলা শব্দভাণ্ডারে এসেছে। সং অস্মাভিঃ > অম্হাহি (স্ম > ম্হ ঃ যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ ; ভিঃ > হিঃ মহাপ্রাণবর্ণের হ-কার পরিণতি) > অম্হহি (হা > হ ঃ মধ্যস্বরলোপ) > অমহে / আম্ভে / আমহে (হহি > হে ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি এবং দ্বিত্বব্যঞ্জনের একক পরিণতি) > আমি (মহে > মি ঃ শ্বাসাঘাতপ্রবণতা)। বৈ অস্মে > প্রা অম্হে ; (স্ম > মস্ > মহঃ বিপর্যয় হ-কারী ভবন) > প্রা-বাং অমহে > মা-বাং আহ্মি > আমি (হ-কার লোপ)।

আঠার ঃ শব্দটি সংস্কৃত 'অষ্টাদশ' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। সং অষ্টাদশ > অট্ঠারস (ষ্ট > ট্ঠ ঃ সমীভবন; দ > র ঃ র-কারী ভবন) > অট্ঠারহ (স > হ ঃ হ-কারীভবন) > আঠার (অ > আঃ দীর্ঘীভবন; ট্ঠ > ঠ্ঃ একক ব্যঞ্জন পরিণতি)।

আনারস ঃ পর্তুগিজ আনানস্ (Annanas) থেকে বাংলায় শব্দটি এসেছে। পর্তু আনানস্ > আনারস (ন > র ঃ র-কারীভবন) অথবা রসাল ফল বলে 'নস' স্থলে 'রস' বসানো হয়েছে।

আস্তাবল ঃ শব্দটি ইংরাজি 'stable' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। ইং স্ট্যাব্‌ল > স্তাবল (স্ট্য > স্ত ঃ দন্তীভবন) >আস্তাবল (আদি স্বরাগম)। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন শব্দটি আরবি 'ইস্ত্বল' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। ইস্ত্বল > আস্তবল (ই > আ ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি) > আস্তাবল (স্ত্ > স্তা ঃ মধ্যস্বরাগম্)।

উজবুক ঃ শব্দটি তুর্কি 'উজবেগ' শব্দ থেকে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এসেছে। তু উজবেগ > উজবুক (এ > উঃ স্বরসঙ্গতি, গ > ক ঃ অঘোষীভবন) শব্দটির অর্থ-সংক্রম ঘটেছে। মূল তুর্কিতে এর অর্থ ছিল শক্তিশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাংলায় এর অর্থ বোকা।

উনুন ঃ সংস্কৃত 'উষ্মাপন', থেকে বাংলায় এসেছে। সং উষ্মাপন > উন্হাবন (ষ্ম > ন্হ ঃ বর্ণবিপর্যয় ও ঘোষীভবন) > উন্হাঅন (ব > অ ঃ একক অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনলোপ) > উনান (উদ্বৃত্তস্বর

লোপ, হ্-লোপ) > উনুন (স্বরসঙ্গতি)।

এগার ঃ সংস্কৃত 'একাদশ' শব্দ থেকে বাংলায় স্থান পেয়েছে।
সং একাদশ > প্রা এগ্গারহ্ (কা >গ্ গা ঃ ঘোষীভবন এবং ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ; দ > র ঃ র-কারীভবন, শ > হ ঃ হ্-কারী ভবন) > প্রা-বাং এগারহ্ (যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক পরিণতি) > এগার (পদস্থিত 'হ্' লোপ)।

এয়ো ঃ সংস্কৃত 'অবিধবা' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে। সং অবিধবা > অইহআ (ব > ই ঃ অল্প প্রাণ লোপ, ধ > হ ঃ মহাপ্রাণের হ্-কার পরিণতি, বা > আ ঃ স্পর্শব্যঞ্জন লোপ) > আইও (অ > আ ঃ শ্বাসাঘাত জনিত কারণে, ই-কার লোপ, স্বরসঙ্গতি) > এয়ো (য়-শ্রুতি)।

কুনুই ঃ সংস্কৃত 'কফনিকা' থেকে বাংলা এসেছে।
সং কফনিকা > প্রা কহনিআ (ক > হ ঃ স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণের হ্-কার পরিণতি, ক - একক অল্পপ্রাণ লোপ) > কঅনি (হ > অ ঃ আ-লোপ > কণই (অ-লোপ) > কুনুই (স্বরাগম) > কুনুই (স্বরসঙ্গতি)।

কবজ ঃ বিদেশি শব্দজাত।
আরবি 'কব্দ' (qubd) থেকে শব্দটি বাংলায় এসেছে।
আ ঃ কব্দ > ফা কব্জ > বাং কবজ (মধ্য স্বরাগম)
মাদুলি বা তাবিজ অর্থে বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

কাছারিঃ শব্দটি সংস্কৃত 'কৃত্যগৃহ'/কৃত্যগৃহীকা' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।
সং কৃত্যগৃহ > কচ্ছঘর (কৃ > কঃ প্রাকৃতস্তরে 'ঋ ' বর্জিত, ত্য > চ্ছ ঃ তালব্যীভবন, গৃ > ঘ ঃ ঋ -লোপ ও মহা প্রাণীভবন, হ > র ঃ র-কারীভবন) > প্রা কচ্ছহরি (ঘ > হ ঃ মহাপ্রাণতা রক্ষিত, ই-আগম) > কাছারি (চ্ছ > ছ ঃ একক ব্যঞ্জন পরিণতি এবং পূর্বস্বরের দীর্ঘত্বলাভ, হরি > রি ঃ হ্-লোপ)।
শব্দটি অর্থ-সংকোচ হয়েছে এর আদি অর্থ ছিল কাজকর্মের যে কোন গৃহ বর্তমান অর্থ কেবল খাজনা আদায় গৃহ।

কাহন ঃ সংস্কৃত 'কার্ষাপণ' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে।
সং কার্ষাপণ > প্রা কাহাবন (র্ষ > হ ঃ র-লোপ, হ্-মহাপ্রাণতা রক্ষিত, প > ব ঃ ণ > ন ঘোষীভবন, দন্তীভবন) > বাং কাহন (হা > হ ঃ শ্বাসাঘাতে স্বরের ক্ষীণতা, বন > ন ঃ একক অল্পপ্রাণ লোপ)।

কাঁসাই (নদী) ঃ সংস্কৃত 'কংস' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে বলে মনে হয়। কংসের মতো ক্ষতিকর এবং স্ত্রী লিঙ্গে 'কংসাবতী'।
কংসাবতী > কাঁসাঅই (কং > কাঁ ঃ সানুনাসিকতা ও পূর্বস্বরের দীর্ঘত্ব, ব > অ ঃ একক স্পর্শ ব্যঞ্জন লোপ এবং উদ্বৃত্তস্বরাগম, তী > ই ঃ একক ব্যঞ্জন লোপ) > কাঁসাই (উদ্বৃত্ত স্বরলোপ)।

বা, সং কাংস্যা > কাঁসা (সানুনাসিক) > কাঁসাই (অন্তস্বরাগম)।

কোঁৎকা ঃ দেশি 'ক্যাঁৎ' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে।
ক্যাঁৎ > কোঁৎ (অ্যা > ও ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি) > কোঁৎকা (ব্যঞ্জনাগম ও স্বরাগম)।

খামকা ঃ শব্দটি ফারসি 'খামখোয়া' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। ফা খামখোয়া > বাং খামকা (ম > মা ঃ স্বরের দীর্ঘত্বলাভ; খ > কঃ অল্পপ্রাণীভবন; য়-লোপ)।

খুড়ো ঃ সংস্কৃত 'ক্ষুদ্রতাত' শব্দ থেকে এটি উৎপত্তি হয়েছে। ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলায় এসেছে।
সং ক্ষুদ্রতাত > খুড্ডআঅ (ক্ষু > খু ঃ ব্যঞ্জন লোপ, দ্র > ড্ডঃ যুক্ত ব্যঞ্জনের যুগ্ম পরিণতি এবং মূর্ধান্যীভবন, তাত > আঅ ঃ এককঅল্পপ্রাণ লোপ) > খুড়আ (ড্ড > ড়ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলীভবন, উদ্বৃত্ত স্বরলোপ) > খুড়া (উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধি) > খুড়ো (আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

গারদ ঃ ইংরাজি 'Guard' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। এটি কৃতঋণশব্দ। ইং গার্ড > গারদ (র্ড > রদ ঃ মধ্যস্বরাগম এবং দন্ত্যীভবন) বাংলায় এসে শব্দটির অর্থ-সংক্রম ঘটেছে। মূল অর্থ ছিল পাহারাদার, বর্তমান অর্থ কয়েদখানা।

গাড্ডা ঃ কুর্বি শব্দ 'কাড্ডা' থেকে সৃষ্টি। কুর্বিতে অর্থ ছিল নদী গর্ভস্থ কর্দমাক্ত জায়গা। কাড্ডা > গাড্ডা (ক > গ ঃ ঘোষীভবন)। বাংলায় শব্দটি গর্তে পড়া বা মাথায় মারা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গাংচিল ঃ সংস্কৃত 'গঙ্গা' শব্দ থেকে এসেছে 'গাং' শব্দ। সং গঙ্গা > গাং (ব্যঞ্জন লোপ ও পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘত্বলাভ) গাং + চিল = গাংচিল। শব্দটির অর্থ নদী বক্ষে বিচরণকারী চিল বিশেষ। গঙ্গা শব্দটির অর্থ বিস্তার ঘটেছে।

গির্জে ঃ পর্তুগিজ 'ইগরেজা' (Igreja) শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে। পর্তু ইগ্‌রেজা> গীরেজা (ইগ্ > গী ঃ স্বরের স্থান পরিবর্তন) > গীর্জা (স্বরলোপ) > গির্জে (দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব, র্জ > র্জে ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

গোঁসাই ঃ শব্দটি সংস্কৃত 'গোস্বামী' জাত।
সং গোস্বামী > গোস্‌সামী (স্ব > স্‌স ঃ সমীভবন) > গোসাঁই (সস্ > স ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জন পরিণতি, ম-ব্যঞ্জন লোপ এবং এর ফলে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যীভবন)।

গেলাসঃ ইংরাজি 'Glass' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে।
ইং গ্লাস্ > বাং গেলাস্ (গ্লা > গেলা ঃ মধ্যস্বরাগম)।

গোয়ালা ঃ সংস্কৃত 'গোপালক' শব্দ থেকে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে। সং গোপালক > গোপালঅ (ক > অ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক

অল্পপ্রাণ লোপ) > গোআলা (ব্যঞ্জন লোপ, যুক্তস্বরপরিণতি) > গোয়ালা (য়-শ্রুতি)।

ঘুগনি ঃ শব্দটি বর্মি ভাষা 'ঘুগন' থেকে বাংলায় এসেছে। মটর আলু দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য। ঘুগন > ঘুগনি (ন > নি ঃ অন্ত্য স্বরাগম)।

ঘড়েল ঃ সংস্কৃত 'ঘটিকাপাল' থেকে সৃষ্ট।
সং ঘটিকাপাল > ঘড়িআআল (ট > ড় ঃ ঘোষীভবন, কা > আ ; পা > আ ঃ একক ব্যঞ্জন লোপ) > ঘড়িল (আ-লোপ) > ঘড়েল (ড়ি > ড়েঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

চশমা ঃ ফারসি 'চশ্‌মহ্‌' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে। ফা চশ্‌মহ্‌ > চশমা (হ-লোপ; অন্ত্য স্বরাগম) শব্দটির মূল অর্থ ছিল দৃষ্টি। বর্তমান অর্থ দৃষ্টি সহায়ক। এক্ষেত্রে অর্থ সংক্রম ঘটেছে।

চাম্‌চে ঃ বিদেশি শব্দজাত। ফারসি 'চম্‌চহ' থেকে বাংলায় এসেছে অর্থ সংক্রমের ফলে। ফা চম্‌চহ > চামচ (চম্ > চাম্ ঃ মধ্যস্বরাগম, হ-লোপ) > চামচে (অন্ত্য স্বরাগম) চামচে শব্দটি বাংলায় অনুগামী ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল ফরাসি 'চম্‌চহ' - এর অর্থ ছোট হাতা বিশেষ।

ছুতোর ঃ সংস্কৃত 'সূত্রধর' শব্দ থেকে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় শব্দটি এসেছে এবং অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে।
সং সূত্রধর > সত্তহর (ত্র > ত্ত ঃ সমীভবন, ধ > হ ঃ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের হ-কার পরিণতি) > ছুত্তঅর (স > ছ, হ-লোপ) > ছুতর (ত্ত > ত ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক পরিণতি, উদ্বৃত্ত স্বরলোপ) > ছুতোর (ত > তো ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি)

ছ্যাঁকা ঃ সংস্কৃত 'সেক' শব্দ থেকে এসেছে।
সং √ সিচ্ + অ = সেক > ছেকা (স > ছ ঃ প্রাদেশিক রূপ) > ছেঁকা (স্বতোনাসিক্যভবন) > ছ্যাঁকা (আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

জাঁদরেল ঃ ইংরাজি 'জেনার‍্যাল্' (General) শব্দ থেকে বাংলায় এসে অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে।
ইং ঃ জেনার‍্যাল > জান্‌রেল (এ > আ ঃ স্বরসঙ্গতি এবং উচ্চরণ বিকৃতি) > জাঁদরেল(আ > আঁ ঃ নাসিক্যীভবন)।
ইংরাজিতে অর্থ ছিল সেনাপতি, অর্থ সংক্রম হয়ে বাংলায় এর অর্থ প্রভাবশালী ব্যক্তি।

ঝি ঃ শব্দটি সংস্কৃত 'দুহিতা' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। সং দুহিতা > ধিতা (উ-কার লোপ; দহ > ধ ঃ মহাপ্রাণীত) > ঝিঅ (ধ > ঝ ঃ তালব্যীভবন; তা > অ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ লোপ, আ > অ ঃ হ্রস্ব স্বর পরিণতি) > ঝি (অন্ত্যস্বর লোপ)। শব্দটির অর্থসংক্রম ঘটেছে।

ট্যাঁটা ঃ শব্দটি সংস্কৃত 'ধৃষ্ট' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে সং ধৃষ্ট > ধিট্ঠ (ধৃ > ধি ঃ প্রাকৃতস্তরে 'ঋ' লোপ বা সরলীকরণ; ষ্ট > ট্ঠ ঃ যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্ম ব্যঞ্জন পরিণতি) > ধিঁটা (ট্ঠ > ট ঃ একক ব্যঞ্জন পরিণতি ও স্বরের দীর্ঘত্ব) > ঢ্যাটা (ধি > ঢ্যা ঃ মুর্ধন্যীভবন ও আংশিক স্বরসঙ্গতি) > ট্যাঁটা (স্বতোনাসিক্যীভবন)।

ডিউজ (বল) ঃ সংস্থার নামে বলের নামকরণ হয়েছে। 'ডিউকস্' ছিল একটি ক্রিকেট বল তৈরির সংস্থা। ডিউকাস > ডিউস (ক ব্যঞ্জন লোপ) > ডিউস (স > জ ঃ উচ্চারণ বৈচিত্র্য) এখন যে কোন সংস্থাই ঐ ধরণের বল তৈরি করুক না কেন তা ডিউস বল নামে পরিচিত। এখানে অর্থ বিস্তার ঘটেছে।

ডুমুর ঃ সংস্কৃত 'উদুম্বর' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে।
সং উদুম্বর > ডুম্বর (আদিস্বর লোপ, দ্ > ড ঃ মূর্ধন্যীভবন) > ডুম্মর (ম্ব > ম্ম ঃ সমীভবন) > ডুমুর (ম্ম > ম ঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক পরিণতি) ডুমুর (ম > মু ঃ স্বরসঙ্গতি)।

তক্তা ঃ শব্দটি ফারসি 'তখ্তা' থেকে বাংলায় এসেছে। ফা তখ্তা > তক্তা (খ > ক ঃ অল্পপ্রাণীভবন) ফারসীতে শব্দটির অর্থ ছিল চেরা চওড়া কাঠ বা কাঠফলক বর্তমানে খাট বোঝাতেও শব্দটি কোথাও কোথাও ব্যবহার করা হয়।

তুরুপ ঃ পর্তুগিজ 'ত্রোফ্' (Turf) শব্দই হল তুরুপ শব্দের উৎস।
পর্তুগিজ ত্রোফ্ > তুরোফ (ত্রো > তুরো ঃ স্বরভক্তি) > তুরুপ (রো > রু ঃ অল্পপ্রাণিত) শব্দটি তাস বিষয়ক।

তেরো ঃ শব্দটি সংস্কৃত 'ত্রয়োদশ' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে সং ত্রয়োদশ > প্রা তেরস (ত্র > ত্ ঃ যুক্তব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জন পরিণতি ; ত > তে ঃ স্বরসঙ্গতি ; দ > র ঃ র-কারীভবন, শ > স ঃ দন্তীভবন) > তেরহ (স > হ ঃ হকারীভবন) > তের < হ-লোপ) > তেরো (আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

তোরঙ্গ ঃ বিদেশি শব্দ জাত। ইংরাজি 'Trunk' (ট্রাঙ্ক) শব্দজাত। ইং ট্রাঙ্ক > বাং তোরঙ্গ (ট > ত ঃ দন্তীভবন, ক > গ ঃ ঘোষীভবন)। শব্দটি বড় বাক্স অর্থে ব্যবহার হয়।

দরিদ্র ঃ সংস্কৃত 'দরিদ্র' থেকে বাংলায় এসেছে।
সং দরিদ্রা + অ (তৃ) > বাং দরিদ্র (অন্তস্বরলোপ)।

দিশি ঃ সংস্কৃত 'দিশ' ধাতু থেকে শব্দটিজাত। দিশ + ৭মি = দেশি। সং ঃ দেশি > দিশি (দে > দি ঃ স্বরসঙ্গতি)। রাঢ়ি ও বঙ্গালি উপভাষায় উচ্চারিত।

দেউল ঃ এটি সংস্কৃত 'দেবকুল' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে।
সং দেবকুল (দিব + অচ্ = দেব ; কুল্ + ক = কুল) > প্রা দেঅউল

(ব >অ, এ > উ ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণলোপ) > দেউল (অ উদ্বৃত্তস্বর লোপ)।

দেশলাই ঃ সংস্কৃত 'দীপশলাকা' থেকে বাংলায় এসেছে।
সং 'দীপশলাকা' > দীঅশলাআ (প > অ, কা > আ ঃ স্বর মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণলোপ) দীয়াশালাই (অ > য়া ঃ য়-শ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি, আ > ই ঃ স্বরসঙ্গতি) > দেশালাই (সংকোচন ও শ্বাসাঘাতের জন্য মধ্যে আ-লোপ)।

ধার ঃ সংস্কৃত 'উদ্ধার' শব্দজাত।
সং উদ্ধার > উধার (দ্ধ > ধা ঃ যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ) > ধার (আদিস্বরলোপ)। বাংলায় এটি ঋণ এবং ধার বা প্রান্ত বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ধোঁয়াশা ঃ এটি একটি নবগঠিত শব্দ। ব্যাকরণ নিয়মে জোড়কলম শব্দ। ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা। 'ধোঁয়া' ও 'কুয়াশা' দেখতে একই রকম। 'ধোঁয়া' শব্দের সঙ্গে 'কুয়াশা' শব্দের 'শা' অংশ যোগে শব্দটি গঠিত।

নাতি ঃ সংস্কৃত 'নৃপ্তক' শব্দ জাত। সং নৃপ্তক > নপ্তিক(ঋ > ই ঃ প্রাকৃত স্তরের বিবর্তন রূপ) > নত্তিঅ (প্ত > ত্ত ঃ যুক্ত ব্যঞ্জনের যুগ্ম পরিণতি, প>অ ঃ একক অল্পপ্রাণলোপ) > নাতি(ত্ত > তঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক পরিণতি, ন > না ঃ সরলীকরণ হেতু পূর্বস্বরের দীর্ঘত্ব, উদ্বৃত্ত স্বরলোপ)।

নিশ্চুপ ঃ শব্দটি জোড় কলম শব্দ। নিশ্চল + চুপ = নিশ্চুপ। 'নিশ্চল' শব্দের 'নিশ্‌' এবং 'চুপ' যোগে শব্দটি গঠিত।

পরশু ঃ সংস্কৃত 'পরশ্বস' শব্দ থেকে জাত শব্দটি সময় বোঝাতে বাংলায় ব্যবহার করা হয়।
সং পরশ্বস > পরশ্ব (অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ) > পরশু (ব্যঞ্জনলোপ এবং অন্ত স্বরাগম)

পাতলাঃ সংস্কৃত 'পত্র' শব্দ থেকে শব্দটির উৎপত্তি।
সং পত্র > প্রা পত্ত (ত্র > ত্ত ঃ সমীভবন) > পাত (প > পা ঃ একক ব্যঞ্জন পরিণতির জন্য পূর্বস্বরের দীঘত্ব, ত্ত > তঃ যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলীকরণ এবং একক ব্যঞ্জন পরিণতি)
পাত + ল + আ = পাতলা (প্রত্যয়যোগে) শব্দটি ক্ষীণ অর্থে প্রযোজ্য।

পিরীতঃ সংস্কৃত শব্দ 'প্রীতি' শব্দের অর্থাবনতি হয়ে এটি বাংলায় এসেছে। সং প্রীতি > পিরীতি(স্বরভক্তি) > পিরীত(তি > তঃ অন্ত্যস্বরলোপ)

পেন্নাম্‌ঃ সংস্কৃত 'প্রণাম' থেকে 'পেন্নম্‌' শব্দের উৎপত্তি।
সং প্রণাম > পরনাম (প্র > পর ঃ স্বরভক্তি) > পনাম (ব্যঞ্জনলোপ) > পেন্নাম (আদিস্বরাগম ও শ্বাসাঘাতের জন্য দ্বিত্ব ধ্বনি)।

পৈতে ঃ সংস্কৃত 'পবিত্র' শব্দ বাংলায় এসেছে।
পবিত্র > পইত(বি > ই ঃ একক অল্পপ্রাণ বর্ণলোপ) > পইতা (ত > তা ঃ অন্ত্যস্বর দীর্ঘত্ব > পৈতা (অই > ঐ ঃ দুই স্বরের যৌগিক পরিণতি) > পৈতে (তা > তে ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি)।

ফড়িৎ ঃ সংস্কৃত 'পতঙ্গ' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে। সং পতঙ্গ > ফড়িঙ (প > ফ ঃ মহাপ্রাণীভবন ; ত > ড > ড় ; মূর্ধন্যীভবন; ঙ্গ > ং ঃ স্বতোনাসিক্যীভবন) > ফড়িং (উচ্চারণ বৈচিত্র্য)।

বাটপাড় ঃ হিন্দি 'বাটপারনা' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে।
সং বিট + নিচ + অ = বাট
হি বাটপারনা > বাটপার (অন্ত্য স্বরলোপ, ব্যঞ্জনলোপ)
> বাটপাড় (র > ড় ঃ উচ্চারণ স্থান পরিবর্তন)।
অথবা, সং বর্ত্ম > বট্র > বাট + পাড় = বাটপাড়।

বাস্‌কো ঃ শব্দটি ইংরাজি Box শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে।
ইং Box (বক্স) > বাক্স (ব > বা ঃ স্বরের দীর্ঘত্বলাভ) > বাস্ক (ক্স > স্ক ঃ বর্ণবিপর্যয়) > বাস্‌কো (অন্ত্যস্বরাগম)।

বাইশ ঃ শব্দটি সংস্কৃত 'দ্বাবিংশ' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। সং দ্বাবিংশ > বাবীস (দ্ব > ব ঃ যুক্ত ব্যঞ্জনের একক পরিণতি, বি > বী ঃ দীর্ঘীভবন ; ং-এর লোপ ; শ > স ঃ দন্ত্যীভবন) > বাইস (বী > ই ঃ স্বরমধ্যবর্তী একক অল্প প্রাণ লোপ। > বাইশ (স > শ ঃ তালব্যীভবন)।

বাঁদর ঃ সংস্কৃত 'বানর' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে। সং বানর > বান্দর (ন > ন্দ ঃ দ-শ্রুতি) > বাঁদর (বা > বাঁ ঃ ন লোপে পূর্বস্বরে নাসিক্যীভবন)।

বামপন্থী ঃ শব্দটির অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে। আদি অর্থ ছিল 'সংসদে শাসকের বিরোধী পক্ষ' যারা অধ্যক্ষ্যের বামদিকে বসত। বর্তমানে এর অর্থ কমিউনিজমে বিশ্বাসী দল।

বিচ্ছিরি ঃ সংস্কৃত 'বিশ্রী' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে।
সং বিশ্রী > বিশ্‌শিরি (শ্রী > শ্‌শিরি ঃ স্বরভক্তি) > বিচ্ছিরি (প্রাদেশিক উচ্চারণ)।

বিঁড়ে ঃ সংস্কৃত 'বীটি' শব্দ থেকে এসেছে।
সং বীটি > বীডি(ট > ডঃ ঘোষীভবন) > বীড় (ড়-পরিনতি) > বিড়ে (স্বরসঙ্গতি)।

বুজরুকি ঃ শব্দটি ফারসি 'বুর্জুগ' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে।
ফা বুজুর্গ > বুজুরগ (র্গ > রগ ঃ স্বরভক্তি) > বুজরুগ (জুর > জরু ঃ স্বরের স্থান পরিবর্তন) > বুজরুক (গ > ক ঃ অঘোষীভবন) > বুজরুকি (ক > কিঃ অন্ত্যস্বরাগম)।

বেঞ্চি ঃ ইংরাজি 'Bench' থেকে শব্দটি বাংলায় এসেছে।
ইং বেঞ্চ্(Bench) > বেঞ্চি (ঞ্চ > ঞ্চি ঃ অন্ত্যস্বরাগম)।

বৈঠা ঃ সংস্কৃত 'বহিত্র' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে।
সং বহিত্র > বহিত্ত (ত্র > ত্ত ঃ যুক্ত ব্যঞ্জনের যুগ্ম পরিণতি) > বহিট্ট (ত্ত > ট্ট ঃ মূর্ধন্যীভবন) > বইট (হ-লোপ, যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলীকরণ) > বইঠা (ট > ঠ ঃ ঘোষীভবন) > বৈঠা (অই > ঐ ঃ যৌগিক স্বরপরিণতি)।

বোঁচকা ঃ তুর্কি 'বুক্চা' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে।
তু বুক্চা > বুচ্কা (ক্চা > চ্কা ঃ বর্ণ বিপর্যয়) > বোঁচকা (স্বরসঙ্গতি ও স্বতোনাসিক্যীভবন)।

ভোগ ঃ ভোগ এবং 'ভোজ' শব্দ দুটি একার্থ বাচক। তবে এদের অর্থ উৎকর্ষজনিত পার্থক্য আছে। 'ভোগ' শুধু দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। ভোজ > ভোগ।

ভ্যাপ্সা ঃ তদ্ভব শব্দ। সং বাষ্প + ক = বাষ্পক। > সং বাষ্পক > বাপ্ফসাঅ > (ষ্প > প ফ ঃ সমীভবন-ক ; লোপ, অ-উদ্বৃত্তস্বরের আগম) > ভ্যাপসা (ব > ভঃ মহাপ্রাণী ভবন, আ > এ্যা ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি, পফ > প ঃ ফ- লোপ, আ-অন্ত্য স্বরলোপ)।

মট্কানো ঃ দেশি 'মটকা' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে।
মটকা > মট্কান (কা > কান ঃ ব্যঞ্জনাগম) > মটকানো (ন > নো ঃ অন্ত্যস্বরাগম)। শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।

মাসি ঃ শব্দটি সংস্কৃত 'মাতৃস্বসৃকা' থেকে বাংলায় এসেছে। সং মাতৃস্বসৃকা > প্রা মাউস্সসিআ (তৃ > উ ঃ অল্পপ্রাণ স্পর্শবর্ণ লোপ, ঋ > উ ঃ রূপান্তর ; স্ব > সস ঃ সমীভবন ; সৃ > সি ঃ রূপান্তর ; কা > আ ঃ অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ) > অপ মাউসিঅ (সসসি > সি ঃ সমাক্ষর লোপ) > বাং মাসি ('উ' এবং 'অ'-এর লোপ)।

মাইরি ঃ মারিয়া (Maria) মাইরি > মাইরি (খ্রিস্টানরা মা মেরির নামে শপথ নেয়, সেই থেকে বাংলায় দিব্যি অর্থ সংক্রম ঘটেছে।

মিছিল ঃ শব্দটি আরবি 'মিস্ল' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে।
মিস্ল > মিছল (স্ > ছ ঃ প্রাদেশিক রূপ) > মিছিল (ছ > ছি ঃ মধ্যস্বরাগম)। আরবিতে শব্দটির অর্থছিল শোভাযাত্রা, আদালতের নথিপত্র। বাংলায় এর অর্থ এখন রাজনৈতিক আন্দোলনে সমবেত যাত্রা।

মিট্মিটে ঃ অব্যয় হিসাবে শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয়। দেশি শব্দ মিট্মিট্ > মিট্মিটে (ট্ > টে ঃ অন্ত্যস্বরাগম) অর্থের রূপান্তর ঘটেছে। আলোর বিকিরণ সূচক থেকে ব্যক্তির দুষ্টমিতে অর্থ বদল ঘটেছে।

মুরোদ ঃ আরবি 'মুরাদ' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে।
মুরাদ > মুরোদ (রা > রো ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি) শব্দটি শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ বোঝাতে বাংলায় ব্যবহার করা হয়।

মেয়ে মদ্দ ঃ সংস্কৃত 'মাতৃকা' শব্দ থেকে 'মেয়ে' শব্দের উৎপত্তি।
সং মাতৃকা > মাইআ > মেয়ে। ফারসি 'মর্‌দ' থেকে 'মর্দ্দ' শব্দ এসেছে।
মর্‌দ্‌ > মর্দ > মদ্দ। মেয়ে + মদ্দ = মেয়েমদ্দ ।

মোচ্ছব ঃ 'মহাউৎসব' শব্দ থেকে মোচ্ছব শব্দ এসেছে।
মহাউৎসব > মহৎসব (হা > হ ঃ স্বরলোপ, উ-লোপ) > মহচ্ছব (ৎ স্‌ > চ্ছ ঃ প্রাদেশিক উচ্চারণ) > মোচ্ছব (ম > মো ঃ আদিস্বরাগম, হ্‌-লোপ)।

ম্যাড়মেড়ে ঃ আধুনিক বাংলায় ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শব্দটি মালিন্য বা অনুজ্জ্বলতার ভাব প্রকাশক।

মৌমাছি ঃ সংস্কৃত 'মধুমক্ষিকা' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে।
মধু > মহু (ধু > হু ঃ স্পর্শব্যঞ্জনের হ্‌-কার পরিণতি) > মউ (হু > উ ঃ হ লোপ) > মৌ (অউ > ঔ ঃ যৌগিক স্বর পরিণতি)।
সং মক্ষিকা > মাচ্ছিআ (ক্ষ > চ্ছ ঃ তালবীভবন, কা > আ ঃ একক স্পর্শব্যঞ্জন লোপ) > মাচ্ছিঅ (আ > অ ঃ হ্রস্বতা) > মাছি (উদ্বৃত্ত লোপ, যুগ্মব্যঞ্জনের একক পরিণতি)। মৌ + মাছি = মৌমাছি।

রাখাল ঃ সংস্কৃত 'রক্ষপাল' থেকে বাংলায় এসেছে।
রক্ষপাল > প্রা রক্‌খআল (ক্ষ > কখ ঃ সমীভবন ; পা > আ ব্যঞ্জনলোপ) > রাখাল (ক খ > খ ঃ যুগ্মব্যঞ্জনের একটি লোপ ; র > রা ঃ ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন)।

রোদসীঃ বৈদিক রৌদস + ঈ = রোদসী। শব্দটির অর্থ একত্রে পৃথিবী ও স্বর্গ।

লতা ('সাপ' অর্থে) ঃ ভয়ংকর বিষয়কে এড়িয়ে যাবার জন্য অপেক্ষাকৃত মৃদু বা নিরীহ শব্দ প্রয়োগ করে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হয়। সাপকে 'লতা' শব্দের সাদৃশ্য প্রয়োগ করা হয়।

লেডিকেনি ঃ ইংরাজি ব্যক্তি নাম থেকে বাংলায় এসেছে। লেডিক্যানিং এর আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে বিশেষ মিষ্টান্ন তৈরি করা হয়েছিল। তার থেকে এই নাম।
লেডিক্যানিং Lady Canning > লেডিকেনি (ক্যা > কে ঃ আংশিক স্বরসংগতি ; নিং > নি ঃ ব্যঞ্জনলোপ)।

শরৎ ঃ অনেকে মনে করেন এটি ইন্দো-ইরানীয় 'শরদ' শব্দ থেকে প্রাচীন পারসীয় হয়ে বাংলায় এসেছে।
শরদ্‌ > শরৎ (দ্‌ > ৎ ঃ অঘোষীভবন)।

শী(পদবী) ঃ সংস্কৃত 'সিংহ' শব্দ থেকে এটি বাংলায় এসেছে। সিংহ > সীহ (সিং >

সী ঃ ব্যঞ্জন লোপের ফলে স্বরের দীর্ঘীভবন) > সী (হ্-কার লোপ)> শী (তালব্যীভবন)।

সতের ঃ সংস্কৃত 'সপ্তদশ' শব্দ থেকে উৎপত্তি।
সপ্তদশ > সত্তরস (প্ত > ত্ত ঃ যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্ম পরিণতি, দ > র ঃ র-কারীভবন) > সতেরহ (ত্ত > তেঃ যুগ্মের একক পরিণতি ও আংশিক স্বরসংগতি, স > হ্ ঃ হ্-কার পরিণতি) > সতের (হ্-লোপ)।

সন্দেশ ঃ অর্থসংকোচের ফলে শব্দটি তৈরি হয়েছে। সংস্কৃতে 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ ছিল খাবার সহ মিষ্টান্ন অর্থে ব্যবহার করা হত। বর্তমানে সন্দেশ বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন বোঝায়।

সমঝোতা ঃ শব্দটি হিন্দি 'সমঝৌতা' থেকে বাংলায় এসেছে। হি সমঝৌতা > বা সমঝোতা (ঔ > ও ঃ যৌগিক স্বরের একক স্বরে পরিণতি)। এটি একটি কৃতঋণ শব্দ।

সিঙ্গাড়া ঃ সংস্কৃত 'শৃঙ্গাতক' শব্দ থেকে উৎপত্তি।
শৃঙ্গাতক > প্রা সিঙ্গাটক (ঋ > ই ; ত > টঃ মূর্ধন্যীভবন) > সিঙ্গাডঅ (ট > ড ঃ ঘোষীভবন ; ক > অ ঃ অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনের লোপ) > সিঙ্গাড়া (ড + অ = ডা ঃ সন্ধি; ডা > ড়া)।

সুবর্ণ সুযোগ ঃ শব্দটি ইংরাজি Golden Opportunity শব্দের অনুদিত রূপ। বাংলা শব্দ ভাণ্ডেরে এই শব্দগুলিকে কৃতঋণ শব্দ বলা হয়।

সুরঙ্গ ঃ শব্দটি গ্রিক 'সুরিংক্‌স' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। গ্রি সুরিংক্‌স > সং সুরুঙ্গ (রি > রু ঃ স্বরসঙ্গতি; ক > গ ঃ ঘোষীভবন; স-ব্যঞ্জন লোপ) > সুড়ঙ্গ (স্বরলোপ)।

সেঁকো ঃ ইংরাজি 'Arsenico' থেকে বাংলায় এসেছে।
আর্‌সেনিকো > সেঁকো (আদি স্বরলোপ, ব্যঞ্জনলোপ, নাসিক্যীভবন)।

হরতাল ঃ শব্দটি গুজরাটি 'হড়তাল' থেকে উৎপত্তি।
গুজরাটি শব্দ হড়তাল (অর্থ হাটেতালা) > হরতাল (ড় > র)। বাংলায় এর অর্থ দাঁড়িয়েছে - 'ধর্মঘট'। অর্থ-সংক্রম ঘটেছে।

হাসপাতাল ঃ ইংরাজি 'Hospital' শব্দের বিবর্তিত রূপ। লোক নিরুক্তি (Folketymologe)-র ফলে শব্দটি বাংলায় এসেছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় Hospital হল নরক। নরকের অবস্থান পাতালে। পাতালে থাকে জল। জলে থাকে হাঁস। সুতরাং হাঁসপাতাল। ডঃ সুকুমার সেনের মতে নিছক ধ্বনি সাম্যের ফলে শব্দটি তৈরি হয়েছে। হসপিটাল> হাঁসপাতাল (হস > হাঁস ঃ স্বতোনাসিক্যীভবন, পি > পা ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি, ট > তঃ দন্ত্যীভবন)।

হেস্তনেস্ত ঃ ফারর্সি 'হস্ত্‌ নীস্ত্‌' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। হস্ত্‌নীস্ত্‌ > হেস্তনেস্ত (হ

> হে, আদিস্বরাগম, স্ত্ > স্ত, স্বরাগম; নী > নে ঃ আংশিক স্বরসঙ্গতি, স্ত্ > স্ত ঃ অন্ত্যস্বরাগম)

হ্যান্‌ডেল ঃ ইংরাজি 'Handle' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। ইং হ্যাণ্ডেল (Handle) > হ্যান্‌ডেল (ণ > ন ঃ দন্তীভবন)।

ভাষাতাত্ত্বিক টিকা সংজ্ঞা সহ উদাহরণ

অঘোষবর্ণ ঃ স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন তাদের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে শ্বাসবায়ু অবাধে যাতায়াত করে তখন তারা কম্পিত হয় না। ফলে তাদের কম্পনজাত কোন সুর সৃষ্টি হয় না, তখন অঘোষ ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এই ধ্বনিগুলির লেখ্যরূপকে অঘোষ বর্ণ বলে। এরা বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যঞ্জন। যেমন ক, খ, চ, ছ ইত্যাদি।

অর্ধস্বর ঃ যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা নিচের ওষ্ঠ ইত্যাদি নিম্নস্থ উচ্চারক স্বরধ্বনির এলাকা ছাড়িয়ে আরো উপরে উঠে যায়,অথচ উপরের ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতি উর্ধস্থ উচ্চারককে স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুর গতিপথে পুরোপুরি বাধা সৃষ্টি করে না বা ঘর্ষণ শোনার মতো আংশিক বাধাও সৃষ্টি করে নি, অথচ শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথটি স্বরধ্বনির মতো পুরো বাধাহীনও নয়, অল্প একটু বাধা থাকে তাকেই অর্ধস্বর বলে। যেমন– বাংলা 'য়' ও 'য' সংস্কৃত-'ব' ,'য' ইংরাজি ('w', 'j') প্রভৃতি ধ্বনি অর্ধস্বর।

অর্ধবিবৃত স্বর ঃ বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে 'এ' এবং 'ও' -এই দুটি ধ্বনি উচ্চারণ কালে মুখবিবর অর্ধ বিবৃত হয় বলে এই দুটি ধ্বনিকে অর্ধবিবৃত স্বর ধ্বনি বলে।

অনুসর্গ ঃ যে সকল অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে পৃথকভাবে অবস্থান পূর্বক শব্দ বিভক্তির কাজ করে, তাদের অনুসর্গ বা পরসর্গ বলে। যেমন - দ্বারা, দিয়া, থেকে ইতাদি। বাড়ি থেকে দেখলাম।

অন্ত্যস্বরাগম ঃ বাংলা ভাষা উচ্চারণে বেশির ভাগ বিদেশি শব্দগুলি ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ হওয়ায় শব্দান্তে নতুন করে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে একে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন –

বেঞ্চ > বেঞ্চি (ব্ + এ + ঞ্ + চ্ > ব্ + এ + ঞ্ + চ্ + ই)

অপিনিহিতি ঃ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে "শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ'

থাকিলে সেই 'ই' বা 'উ' কে আগে হইতেই উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার রীতি বাঙলার একটি বৈশিষ্ট্য। এই রীতির নামকরণ হইয়াছে অপিনিহিতি।" যেমন – আজি > আইজ

আ+ জ্ + ই > অ + ই + জ্

এছাড়া যে ফলা যুক্ত শব্দ, 'জ্ঞ' বা 'ক্ষ' থাকলে তার আগে ই-কারের আগম ঘটে এই রীতি ও অপিনিহিতি। যেমন বাক্য > বাইক্য।

সুকুমার সেনের মতে, "যুগ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে ই-কারের আগম হইলে বলে অপিনিহিতি।" বঙ্গালি উপভাষা ছাড়াও কথ্য ভাষায় এর প্রয়োগ আছে।

অবরোহী দ্বিস্বর – যদি পাশাপাশি অবস্থিত দুটো সমশ্রেণির স্বরধ্বনি অথবা অসম শ্রেণির স্বরধ্বনি নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে আক্ষরিক ধ্বনি গঠন করে এবং দ্বিতীয় স্বরটির তুলনায় প্রথমটা দীর্ঘ ও স্পষ্ট হয়, তাহলে এই শ্রেণির আক্ষরিক স্বরধ্বনিটিকে দ্বিস্বরধ্বনি বলা হয়। বাংলা বর্ণমালায় ঐ এবং ঔ হল দ্বিস্বর ধ্বনি। এছাড়া আমরা আরও প্রায় ২৯ টি দ্বিস্বর উচ্চারণ করি যেমন ইএ, এউ,আই, আউ ইত্যাদি। অনেকের মতে দ্বিস্বরের সংখ্যা ১৬টি।

অবিভাজ্য ধ্বনি ঃ ভাষা উচ্চারণ কালে যে ধ্বনিগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় না অথচ ধ্বনির উচ্চারণ ও অর্থবোধে তারতম্য ঘটায় সেই স্বনিমগুলিকে অবিভাজ্য ধ্বনি বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার অবিভাজ্য ধ্বনিগুলি হল শ্বাসাঘাত, যতি, সুরাঘাত ইত্যাদি।

অভিনিধান ঃ বাংলা লেখন পদ্ধতি অনুসারে শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থিত দু'টো ধ্বনি সাধারণ্যে যুক্তাক্ষর নামে পরিচিত। যেমন 'একটা' শব্দে 'ক্ +ট'। শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থিত এ-ধরণের দুটো ধ্বনির প্রথমটি স্পর্শধ্বনি হলে তার উচ্চারণ সংস্কৃতের হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো; তার আনুষঙ্গিক স্বরধ্বনি এ ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয় না। পাণিনি প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবিদ ব্যঞ্জন ধ্বনির এরকম অসম্পূর্ণ উচ্চারণকে 'অভিনিধান' বলেছেন। সূত্র – W.S. Allen : phonetics in Ancient India pp-71-72

অভিশ্রুতি ঃ অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ' ধ্বনি যদি লোপ পায় অথবা অপর স্বরের প্রভাবে অথবা স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নবরূপ প্রাপ্ত হয়, তবে তাকে বলা হয় অভিশ্রুতি। যেমন– আজি > আইজ > আজ, হাটুয়া > হেটো। অভিশ্রুতিতে শব্দ মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা তিন প্রকার –

১. একাক্ষর শব্দে অপিনিহিতি 'ই' বা 'উ' লোপ। চারি > চইর > চার।

২. একধিক অক্ষরময় শব্দে বাংলা সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী আভ্যন্তর সন্ধি হতে   যেমন — বহিন > বইন > বোন।

৩. স্বরসঙ্গতির নিয়মানুযায়ী স্বরসন্ধি ও স্বর পরিবর্তন হতে পারে।
মাছ + উয়া = মাছুয়া > মাউছা > মেছো।

অভিশ্রুতি হল রাঢ়ি উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অযোগবাহ বর্ণ ঃ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংস্পর্শহীন হওয়ার সত্ত্বেও কয়েকটি ধ্বনি আমাদের বাক্‌যন্ত্র থেকে নিস্পন্ন হয়। এদের উচ্চারণ অপরিবর্তনীয় এরা অন্য কোন ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয় না বলে লিখিতরূপে বর্ণগুলিকে আযোগবাহ বর্ণ বলে। যেমন - ং , ঃ

আদি স্বরাগম ঃ শব্দ উচ্চারণ কালে শব্দের আদিতে যুক্ত বর্ণের পূর্বে যে স্বরের আগমন ঘটে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন — স্কুল > ইস্কুল
স্ + ক্ + উ + ল্ > ই + স্ + ক্ + উ + ল্

উপধ্বনি ঃ যে সব ধ্বনিতা বা Phoneme বিভিন্ন ধ্বনির সমাবেশ বা সন্নিধ্যের জন্য বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয় তাকে উপধ্বনি বা Allophone বলে। যেমন 'ল' এই ধ্বনিটির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য দুটি পৃথক শব্দে ভিন্ন উচ্চারণ স্থানে উচ্চারিত হয়। 'আলতা' শব্দে 'ল' দন্তমূল উচ্চারণ, আবার 'উল্‌টা' শব্দে 'ল' মূর্ধায় উচ্চারিত হয়। আসলে 'আলতা' শব্দের দন্ত্যধ্বনি 'ত' এর জন্য এবং 'উল্‌টা' শব্দে মূর্ধাধ্বনি 'ট' এর জন্য এই উচ্চারণ পার্থক্য ঘটে।

ঔচিত্য ঃ একদেশে যে অর্থে একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় অন্যদেশে সেই শব্দের অর্থ আলাদা এই বিষয়টিকে ঔচিত্য বলে। যেমন, ফরাসি ভাষায় 'খুন' শব্দের অর্থ 'রক্ত' , কিন্তু বাংলাভাষায় শব্দটির অর্থ 'হত্যা' ।

ঘৃষ্ট ধ্বনি ঃ কতকগুলি ধ্বনি উচ্চারণের সময় একই সঙ্গে স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনি উচ্চারণের প্রক্রিয়া ঘটে যায়। অর্থাৎ এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণ কালে শ্বাসবায়ু গতিপথে স্পর্শ ধ্বনির মতো পুরোপুরি বাধার সৃষ্টি করে এবং পরে তা আংশিক বাধায় পরিণত হয়। এই ধরণের ধ্বনিকে ঘৃষ্টধ্বনি বলে। যেমন চ, ছ, জ, ঝ।

জোড়কলম শব্দ ঃ দুটি ভিন্নশব্দ কাটছাঁট করে একটি নতুন শব্দ তৈরি করা হলে তাকে জোড়কলম শব্দ বলে। কখনো আবার দুটি ভিন্ন ভাষার শব্দাংশকেও একত্রিত করা হয়। উদাঃ- নিশ্চল + চুপ = নিশ্চুপ ; আঃ মিনৎ + সং বিজ্ঞপ্তি = মিনতি।

দ-শ্রুতি ঃ শব্দ দ্রুত উচ্চারণ কালে এক উচ্চারণ স্থান থেকে অন্য উচ্চারণ স্থানে যাওয়ার সময় জিহ্বা অসতর্ক ভাবে শব্দ মধ্যস্থিত দুই স্বরের মধ্যবর্তী

স্থানে কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলে, এই ভাবে অসতর্ক উচ্চারণে যদি দ-ধ্বনির আগমন ঘটে তবে তাকে দ-শ্রুতি বলে। যেমন - বানর > বান্দর।

দ্বিস্বর ধ্বনি ঃ যদি পাশাপাশি অবস্থিত দুটো সমশ্রেণির স্বরধ্বনি অথবা অসম শ্রেণির স্বরধ্বনি নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে আক্ষরিক ধ্বনি গঠন করে এবং দ্বিতীয় স্বরটির তুলনায় প্রথমটা দীর্ঘ ও স্পষ্ট হয়, তাহলে এই শ্রেণির আক্ষরিক স্বরধ্বনিটিকে দ্বিস্বরধ্বনি বলা হয়। বাংলা বর্ণমালায় ঐ এবং ঔ হল দ্বিস্বর ধ্বনি। এছাড়া আমরা আরও প্রায় ১৬ টি দ্বিস্বর উচ্চারণ করি যেমন ইএ, এউ, আই, আউ, ইত্যাদি।

দ্বিমাত্রিকতা ঃ বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী কোন শব্দ বা পদ যত দীর্ঘই হোক না কেন, উচ্চারণকালে তা দুই অক্ষরের গুচ্ছে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সূত্রটিকে দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা বলে। যেমন গা মোছা > গামছা।

নিম্ন-মধ্য-স্বরধ্বনি ঃ নিম্নমধ্যস্বরধ্বনি দুই প্রকার ১. নিম্নমধ্য সম্মুখ নিম্নমধ্য পশ্চাৎ ২. নিম্নমধ্য সম্মুখ পর্যায় অন্তর্ভুক্ত স্বরধ্বনি হল 'এ্যা' (æ), আ। এই স্বরধ্বনিটি উচ্চারণে ঠোঁটের অবস্থা নির্লিপ্ত থাকে প্রসৃত এবং চোয়ালদুটি মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। জিহ্বামূল ওপরে উঠে নাসিকা পথ বন্ধ করে দেয়। জিহ্বার সামনের অংশ শক্ত তালু থেকে দূরে থাকে। বাংলা বর্ণমালায় এই স্বরধ্বনিটি উচ্চারিত হলেও এর বর্ণরূপ নেই।

নিম্ন-মধ্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনিটি হল 'অ'। এটি উচ্চারণে ঠোঁট দুটো খোলা থাকে এবং গোলাকার আকৃতি ধারণ করে। জিহ্বা দ্রুত পিছনে চলে আসে। বিদ্যাসাগরীয় বর্ণমালায় এটি প্রথম ধ্বনি।

ন্যূনতম শব্দজোড় ঃ যখন দুটি শব্দ যথাসাধ্য ছোটো শব্দ হয় এবং তাদের মধ্যে সব দিক দিয়ে মিল থাকে, শুধু প্রত্যেক শব্দের একটি করে ধ্বনির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং শব্দদুটির অর্থ পৃথক হয়, তখন সেই শব্দদুটিকে ন্যূনতম শব্দজোড় বলে বা স্বল্পপ্রভেদক শব্দযুগ্ম বলে। যেমন— 'কান ও টান' এর মধ্যে 'ক' ও 'ট' ধ্বনি বাদে অন্যসব ধ্বনিগুলির মিল আছে। এই দুটি শব্দের অর্থ পার্থক্য হচ্ছে এই 'ক' ও 'ট' ধ্বনির প্রভেদের জন্য।

বাক্যশ্বাসাঘাত ঃ বাক্যের মধ্যে একটি অর্থকে বেছে নিয়ে তার উপর জোর দেওয়া হলে অর্থপার্থক্য ঘটে। যেমন — মিহির বর্ধমানে কাজ করে। কর্তা মিহিরের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিভাজন ঃ একটি স্বনিমের যে উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি থাকে, তাদের ব্যবহারের যে অবস্থানগত ও ধ্বনি সংযোগগত শর্তগুলি থাকে, তা ভাষার গঠনগত

পরিবর্তন জনিত কারণে যদি উঠে যায় তা হলে উপধ্বনিগুলি স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা পায়। এই একটি স্বনিম একাধিক স্বনিমে পরিণত হওয়াকে বিভাজন বলে। বাংলায় ড ও ড় আগে একই স্বনিম ছিল বর্তমানে আলাদা।

বিভক্তি ঃ যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের উত্তরে যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে তাদের বিভক্তি বলে। যেমন বল + এ = বলে।

বিভাজ্য ধ্বনি ঃ ধ্বনি প্রবাহে যে ধ্বনিগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় তাকে বিভাজ্য ধ্বনি বলে। এগুলি মূলত বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনে দেখানো যায়।

মহাপ্রাণ বর্ণ ঃ কোন কোন ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর বেশি আকুঞ্চিত হয় বলে একটি অতিরিক্ত বাধার সৃষ্টি হয়, ফলে ধ্বনিগুলির সঙ্গেই যুক্ত হয়। এই ধ্বনিগুলি হল মহাপ্রাণ ধ্বনি। এদের লেখ্যরূপকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ। এছাড়া 'হ' এবং 'ঃ' হল মহাপ্রাণ বর্ণ।

অল্পপ্রাণ + হ = মহাপ্রাণ

K+ h = Kh ; ক + হ = খ

মাত্রাসূত্র ঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় 'এ' এবং 'ও' দুটি স্বর দীর্ঘস্বর রূপে উচ্চারিত হত মধ্য ভারতীয় আর্যে এদের হ্রস্ব রূপ দেখা গেল। শব্দের মধ্যে স্বরের মাত্রা সাম্য রক্ষার এক বিশেষ নিয়ম দেখা গেল যাকে মাত্রাসূত্র বলে। এর ফলে দীর্ঘস্বরের পর যুক্তব্যঞ্জন আর থাকল না। এক্ষেত্রে দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বর হয়েছে না হয় যুক্ত ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। যেমন – জীর্ণম > জীন্নং, নীড়ং > নীডং ইত্যাদি।

মুক্তরূপমূল ও বদ্ধরূপমূল ঃ যে সমস্ত রূপমূলের স্বাধীন ও একক ব্যবহার যোগ্যতা আছে অর্থাৎ যে সমস্ত রূপমূলের সঙ্গে অপর কোন রূপমূল যোগ না করেই ব্যবহার করা যায়, তাদের মুক্তরূপমূল বলে। যেমন মা, বাপ, ভাই ইত্যাদি ধাতুমুলের স্বতন্ত্র ব্যবহার আছে তাই এরা মুক্ত রূপমূল।

যে সমস্ত রূপমূলের অর্থময়তা আছে অথচ স্বাধীনভাবে একক ব্যবহার যোগ্যতা নেই 'কিম্বা অন্য রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হলেই তার অর্থময়তার তাৎপর্য বোঝা যায় তাকে বদ্ধরূপমূল বলে, যেমন মো, তা, আস, ইত্যাদি এরা অন্যের সঙ্গে মিশে তবে গুরুত্ব পায়, তাই এরা বদ্ধরূপমূল।

মুক্তবৈচিত্র্য ঃ একটা ভাষায় একটা ধ্বনি যে যে অবস্থায় থাকে তা হল তার অবস্থান একেই বলে মুক্তবৈচিত্র্য বলে। যেমন, কিল, কূল কেলি ইত্যাদি শব্দে 'ক' নিজ অবস্থানেই থাকে।

যৌগিক স্বর ঃ একটি স্বরধ্বনি উচ্চারণের কাল সীমায় যদি দুটি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়ে যায়, অর্থাৎ স্বরধ্বনিটি উচ্চারণ কালে জিহ্বা প্রথমে এক অবস্থান থেকে একটু পরেই অন্য অবস্থানে সরে যায় কিন্তু তার জন্য দুটি স্বরধ্বনি

উচ্চারণের সময় লাগে না, তবে তাদের যৌগিক স্বর বলে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বর দুটি ঐ=ও+ই এবং ঔ=ও+উ। কিন্তু সুনীতিবাবু বাংলা ভাষায় ২৫টি যৌগিক স্বরের উচ্চারণ লক্ষ করেছেন। আবার ধ্বনি বিজ্ঞানী আব্দুল হাই ১৯টি নিয়মিত এবং ১২টি অনিয়মিত নিয়ে মোট ৩১টি যৌগিক স্বরের কথা বলেছেন। যেমন - আই, আউ, আয়, ইউ, ইত্যাদি। দ্বিস্বর ছাড়া ত্রিস্বর, চতুঃস্বর, পঞ্চস্বর এরা যৌগিক স্বরের অন্তর্গত।

রূপিম বা রূপমূল ঃ রূপমূল হল এক বা একাধিক স্বনিমের সমন্বয়ে গঠিত এমন অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক যা পৌনঃপুনিক এবং এর অংশ বিশেষের সঙ্গে অন্যশব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য নেই। অর্থাৎ রূপমূল এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্রতম একক। 'আম' একটি রূপমূল কিন্তু 'আ' বা 'ম' স্বতন্ত্র রূমিপ বা রূপমূল নয়। আবার 'আমসত্ত্ব' শব্দে 'আম' ও 'সত্ত্ব' দুটি রূপিম বা রূপমূল আছে।

লগ্ন ব্যঞ্জন ঃ দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করেও যখন তারা নিশ্বাসের এক ঝোঁকে উচ্চারিত না হয়ে, বিভাজিত হয়ে যায় তখন তাকে লগ্ন ব্যঞ্জন বলে। যেমন, বিপ্লব = বিপ্ + প্লব , রন্ধন = রন্ + ধন্ ।

শব্দজোড় বা শব্দযুগ্ম ঃ দুটি শব্দ সবথেকে বেশি ছোট হলে যখন তাদের মধ্যে সবদিক্ মিল থাকে, কিন্তু প্রত্যেক শব্দের একটি করে ধ্বনি পার্থক্য থাকে ও শব্দদুটির অর্থ পৃথক হয় তখন শব্দদুটিকে নূনতম শব্দজোড় বা শব্দযুগ্ম বলে। যেমন 'কাল' ও 'খাল' দুটি শব্দেই 'অ' ও 'ল' ধ্বনি আছে। কিন্তু এদের মধ্যে একটি করে যে ধ্বনিপার্থক্য আছে তা হলো 'ক' এবং 'খ', যারা শব্দ দুটিতে অর্থপার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

শ্বাসাঘাত / ঝোঁক / প্রস্বর ঃ অর্থবোধের জন্য বাক্যের অন্তর্গত কোন বিশেষ ধ্বনি বা অক্ষরের উপরে জোর বা বল দিয়ে উচ্চারণ করলে সেই জোরের মাত্রাকে শ্বাসাঘাত বলে। শ্বাসাঘাত দুই প্রকার — ১. শব্দ শ্বাসাঘাত ২. বাক্য শ্বাসাঘাত।

শব্দ শ্বাসাঘাত ঃ শব্দের অন্তর্গত কোন বিশেষ ধ্বনি বা অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়ে অর্থপার্থক্য সৃষ্টি করে। যেমন - পড়া = পাঠ করা, পড়া = পণ্ডিত হওয়া।

সমধ্বনি গণ্ডীরেখা ঃ অনেক সময় দেখা যায় কোন ভাষা অথবা উপভাষার একটি বিশেষ শব্দ বা ধ্বনি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে। মানচিত্রে যখন রেখা টেনে কোন বিশেষ ধ্বনির ব্যবহার স্থানের সীমা নির্দেশ করা হয় তখন সেই রেখাকে সমধ্বনি গণ্ডীরেখা বলে।

সমীভবন ঃ কোন শব্দ উচ্চারণ কালে দুটি নিকটস্থ ভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনি পরস্পরের

প্রভাবে বা একে অপরের প্রভাবে উচ্চারণ প্রকৃতির অল্পবিস্তর সাম্যলাভ করলে তাকে সমীভবন বলে। সমীবভন তিন প্রকার--

১. প্রগতি ঃ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনি যদি পরবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনিকে প্রভাবিত করে। যেমন – পদ্ম > পদ্দ ।

২. পরাগত ঃ পরবর্তী ব্যঞ্জনের প্রভাবে যদি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন বদলে যায়। যেমন – বড়ঠাকুর > বটঠাকুর।

৩. অন্যোন্য ঃ পরস্পরের প্রভাবে যদি দুটি ব্যঞ্জন বদলে গিয়ে নতুন ব্যঞ্জন আসে তবে তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন -- উৎ-শ্বাস > উচ্ছ্বাস।

বাংলায় আবার কখনো কখনো উচ্চারণ স্থান বদল ঘটিয়ে ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়। যেমন – মাখন > মাখম ইত্যাদি।

সহরূপমূল ঃ একাধিক রূপমূল যদি একই ব্যাকবণগত অর্থপ্রকাশ করে তা হলে তাকে সহরূপমূল বলে। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী সহরূপমূলকে রূপমূলের পরিবর্তনীয় রূপ হিসাবে চিহ্নিত কবা উচিৎ বলে মনে করেন। যেমন বা, গুলো, গুলি সমূহ গণ এগুলি ভিন্ন রূপমূল হলেও প্রয়োগগত দিক দিয়ে এরা একই ব্যাকরণ গত অর্থ প্রকাশ করে।

উদাহরণ – ১. ছেলেরা মাঠে খেলা করে

২. ছেলেগুলো মাঠে খেলা করে।

৩. ছেলেগুলি মাঠে খেলা কবে।

৪. ছেলেসমূহ মাঠে খেলা করে।

৫. ছেলেগণ মাঠে খেলা করে।

সাধিত ধাতু ঃ মৌলিক ধাতুর সঙ্গে বা শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন কর + আ = করা।

সামাজিক উপভাষা ঃ একই ভাষার মধ্যে অল্পস্বল্প পার্থক্য সৃষ্টি হয় সামাজিক স্বর-ভেদের কারণে। একজন অধ্যাপক, একজন মিস্ত্রী, একজন রাজনৈতিক নেতা, একজন অপরাধী গুণ্ডা এদের মধ্যে শব্দ ব্যবহারের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই পার্থক্যকে সামাজিক উপভাষা বা Social dialect বলে। যেমন সাধারণ মানুষ যাকে 'হাতবোমা' বলে গুণ্ডাদের কাছে তা হল 'আলু'।

সুভাষণ – অকল্যাণসূচক বা অসুন্দর কোন কিছুকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে অথবা বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয় সেই শব্দকে সুভাষণ বলা হয় । যেমন- গঙ্গালাভ করা (মৃত্যু বরণ করা অর্থে); দুটো শাক ভাত খেয়ে আসবেন। গরীবের কুটীরে পা দেবেন ইত্যাদি ।

সুরাঘাত / স্বরাঘাত / সুরতরঙ্গ : শব্দকে উচ্চারণের সময় তীব্রভাবে উচ্চারণ করতে হলে স্বরতন্ত্রীর কম্পনকে বাড়াতে হয় এবং এর ফলে সুরের যে তীব্রতা বাড়ে তাকে সুরাঘাত বা স্বরাঘাত বলে। এক্ষেত্রে সুরের বৈচিত্র্য অনুযায়ী অর্থপার্থক্য ঘটে। যেমন

র্রাজপুত্র - রাজা যার পুত্র

রার্জপুত্র - রাজার পুত্র

শুধু শব্দ নয় বাক্যের ক্ষেত্রে ও এই পার্থক্য ঘটে। প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে

র্তুমি কি যাবে ? - 'তুমি' ব্যক্তি যাবে, অন্য কেউ নয়।

তুমি র্কি যাবে ? - 'তুমি' ব্যক্তি যেতেও পারে নাও পারে।

তুমি কি র্যাবে ? - 'তুমি' ব্যক্তিটি অবশ্যই যাবে।

স্বনিম : বিভাজ্য ধ্বনি ও অবিভাজ্য ধ্বনি এই দুই প্রকার ধ্বনির মধ্যে ভাষা বিশেষ যেগুলি শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ মূলধ্বনিগুলিকে সেই ভাষার স্বনিম বা ধ্বনিতা বলে।

স্বরাগম : স্বরধ্বনির আগমনের অবস্থান অনুযায়ী তিন প্রকার —

১. আদি স্বরাগম : শব্দের আদিতে স্বরের আগমন ২. মধ্য স্বরাগম : শব্দের মধ্যে স্বরের আগমন ৩. অন্ত্য স্বরাগম : শব্দের অন্ত্যে স্বরাগম ।

স্বরভক্তি বা মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ : যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণকে সহজ সরল করার লক্ষ্যে যুক্ত ব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয়ে শব্দ মধ্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে মধ্যস্বরাগম হয়। যেমন— মুক্তা > মুকুতা

ম্ + উ + ক্ + ত্ + অ > ম্ + উ + ক্ + <u>উ</u> + ত্ + অ । এখানে 'উ'-এর আগমন ঘটেছে।

স্বরতন্ত্রী : ফুসফুস থেকে শ্বাসনালী দিয়ে নিঃশ্বাস বায়ু বের হওয়ার পথে প্রথম যেখানে বাধা পায় তাকে স্বরতন্ত্রী বলে। এই অংশে শ্বাসনালী খানিকটা স্ফীত হয়েছে। অংশটি দুটো পাতলা অথচ মজবুত স্থিতিস্থাপক ঝিল্লি সামনের দিকে জোড়া লাগানো। অথচ পিছনের দিকটা খোলা-এর নাম স্বরতন্ত্রী। স্বরধ্বনি সৃষ্টিতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

স্বরসঙ্গতি : শব্দ উচ্চারণ কালে কোন এক স্বরধ্বনির প্রভাবে যদি অপর স্বরধ্বনি সঙ্গতি লাভের উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত হয় তবে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। স্বরসঙ্গতি চারপ্রকার—

১. প্রগত : পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির যদি পরিবর্তন ঘটে যেমন- মিত্র > মিত্তির, জুতা > জুতো ইত্যাদি।

২. পরাগত : পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত

হয়। যেমন — চাকরি > চাকুরি।

৩. মধ্যগত ঃ কোন কোন সময় দুয়ের অধিক স্বরধ্বনির প্রভাবে মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়। যেমন - বিলাতি > বিলিতি।

৪. অন্যোন্য ঃ যদি কখনো শব্দমধ্যস্থ একাধিক স্বরধ্বনি পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। যেমন। মধু > মেধো।

স্বরসঙ্গতিতে মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি উচ্চে অথবা নিচে স্থান পরির্বতন করে।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্য স্বরাগম ঃ যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার জন্যে বা তার উচ্চারণের কর্কশতা কমিয়ে তাকে মধুর করার জন্যে আমরা যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি এনে যোগ করি। ব্যঞ্জনের মাঝে এরূপ স্বরধ্বনির আবির্ভাবকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্য স্বরাগম বলে। বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আকর্ষণ যে প্রক্রিয়ায় বিগত হয়। আর এই প্রক্রিয়ায় স্বরধ্বনির প্রতি ভক্তি বা অনুরাগ দেখানো হয় তাই একে স্বরভক্তি বলে। যেমন — ভক্তি > ভকতি

ভ্+অ+ক্+ত্+ই > ভ্+অ+ক্+<u>অ</u>+ত্+ই।

সহধ্বনি ঃ ধ্বনির উচারণ প্রায় একই, কিন্তু তাদের অবস্থানের শর্ত যখন নির্দিষ্ট তখন তাদের একটি স্বনিম ধরতে হবে। তাদের মধ্যে উচ্চারণ বৈচিত্র্য থাকলেও অর্থপার্থক্য নেই তখন তারা সমধ্বনি বা সহরূপ। যেমন, 'সঙ্কর' এর সঙ, 'সঞ্চয়' এর সঞ্, 'সম্ভব' এর 'সম্' ধ্বনিগত ভাবে পৃথক হলেও এরা একই রূপমূল। 'সম' রূপমূলটি রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র তাই এরা সহরূপমূল।

সংকর শব্দ ঃ কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে দুটি ভিন্ন ভাষার উপাদানে নতুন শব্দ গঠন করাকে সংকর শব্দ বলে। ইং হেড + সং পণ্ডিত = হেডপণ্ডিত।

সংযোজক মূলক/ যৌগিকমূল ধাতু ঃ ভাষার ভাবকে গাঢ় ক'রে তোলার প্রয়োজনে বিশেষ্যপদের সঙ্গে (কখনো বা বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে) কয়েকটি বিশেষ ধাতুমূল যোগ করে মনোভাব প্রকাশ করা হয়। বিশেষ্যযুক্ত এইরূপ ধাতুকে সংযোজক মূলক ধাতু বা যৌগিক মূল ধাতু বলে। যেমন —'খাওয়া' স্থলে 'আহার করা' বা 'দেখ' স্থলে 'দর্শন' করা ইত্যাদি।

হ-শ্রুতি ঃ শব্দ দ্রুত উচ্চারণকালে এক উচ্চারণ স্থান থেকে অন্য উচ্চারণ স্থানে যাওয়ার সময় জিহ্বা অসর্তকভাবে শব্দের দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্থানে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলে, এইভাবে অসতর্ক উচ্চারণে যদি হ ধ্বনির আগমন ঘটে তবে তাকে হ-শ্রুতি বলে। যেমন — Villa >বেহ্লা।

'য়' শ্রুতি.ঃ অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণ কালে এক উচ্চারণ স্থান থেকে অন্য উচ্চারণ স্থানে যাওয়ার সময় জিভ অসতর্ক ভাবে মধ্যবর্তি স্থানে কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলে, এই ভাবে অসর্তক উচ্চারণে যদি 'য়' ব্যঞ্জনের আগমন ঘটে তবে তা য়-শ্রুতি বলে। যেমন, শৃগাল > শিয়াল।

ধ্বনিতা /মূলধ্বনি /ধ্বনিমূল /স্বনিম ঃ

ক্রবেৎসকয় ধ্বনিতা নিয়ে যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তারপর এই সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে ।আধুনিক মতামত অনুযায়ী , কোন ভাষায় ক্ষুদ্রতম একক যার নিজস্ব কোন অর্থ নেই, কিন্তু অর্থপ্রকাশে সাহায্য করে এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে পরিবর্তিত হয়, তাকে ধ্বনিতা বলে। যেমন– ক,খ ইত্যাদি। ধ্বনিতা কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন দ্বিজেন বসু। ধ্বনিতা বা স্বনিম হল একটি Abstract বা মানুষের চিত্রকল্প বা বিমূর্ত রূপ। বিস্বনগুলির মিলিত রূপ হল ধ্বনিতা । বৈচিত্র্যটাই আমাদের চোখের সামনে থাকে এবং সেটাই হল ধ্বনির বাস্তব রূপ।

তৃতীয় অধ্যায়

ভাষার ইতিহাস ও আধুনিক ভাষাতত্ত্ব জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ঃ ভাষা কাকে বলে ?

উঃ ডঃ সুকুমার সেন ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন , "অল্প কথায় নির্দেশ করিতে গেলে, মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।" ট্রেগারের ভাষায় – "A Language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates."

প্রশ্ন ঃ ভাষাতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের পারস্পরিক সম্পর্ক কি ?

উঃ ক. ভাষাতত্ত্বকে এককথায় শব্দশাস্ত্র বলে। তেমনি ব্যাকরণকেও শব্দশাস্ত্র বলা হয়।

খ. ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান একালের শাস্ত্র কিন্তু ব্যাকরণ হল আড়াই হাজার বছরের পুরানো।

গ. ভাষাবিজ্ঞান হল যে কোন ভাষাকে খোলা মনে বৈজ্ঞানিক সূত্র ধরে আলোচনা করা হয় অন্যদিকে সুনীতিকুমারের মতে – "যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহা প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।"

প্রশ্ন ঃ আধুনিক ভারতের অধিকাংশ ভাষা কোন্ লিপি থেকে উদ্ভূত ?

উঃ ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত।

প্রশ্ন ঃ বাংলা ভাষা কোন্ লিপি থেকে উদ্ভূত ?

উঃ গুপ্ত শাসন আমলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপির যেরূপ প্রচলিত ছিল তাকে কুটিল লিপি বলা হত। এই লিপি থেকেই বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

উঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন ঃ ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি ?

উঃ ক. ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞান উভয়ই হল ধ্বনিসম্পর্কিত আলোচনা।

খ. ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রটি ব্যাপক। এখানে ধ্বনিবিষয়ক যাবতীয় আলোচনাই করা হয়।

অন্যদিকে ধ্বনিবিজ্ঞান হল ধ্বনিতত্ত্বের একটা বিশেষ ধারা।

প্রশ্ন ঃ আদর্শ কথ্য ভাষা কাকে বলে ?

উঃ অঞ্চলবিশেষে কোন একটি প্রধান ভাষা উপভাষায় বিভক্ত হলেও কোন একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উপভাষাই বেশি গুরুত্ব পায়। এই কেন্দ্রীয় উপভাষাকে সাহিত্য রচনার উপযোগী করে যখন মার্জিত ও সংস্কৃতরূপে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে আদর্শ কথ্য ভাষা বা আদর্শ চলিত ভাষা বলে।

প্রশ্ন ঃ নি-ভাষা বা নিজ ভাষা কাকে বলে ?

উঃ কোন ব্যক্তি বিশেষ বা পরিবার বিশেষে নিজস্ব ব্যবহার্য ভাষায় যখন বাগ্‌ব্যবহারে ধ্বনি বা শব্দ প্রয়োগে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তখন তাকে নিভাষা বলে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর রাজনৈতিক বক্তৃতায় অতিরিক্ত 'হচ্ছে' শব্দের প্রয়োগটি নিভাষার উদাহরণ।

প্রশ্ন ঃ এস্‌পেরান্ত কি ?

উঃ পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির ব্যবহারযোগ্য সর্বাধিক প্রচলিত যে কৃত্রিম ভাষা তৈরি করা হয়েছে তাকে এস্‌পেরান্ত বলে।

প্রশ্ন ঃ অপার্থ ভাষা বা সংকেত ভাষা কাকে বলে ?

উঃ অপরাধ জগতের মানুষেরা গোপন তথ্য সরবরাহের জন্য প্রকাশ্যে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করে যেগুলির অর্থ সহজবোধ্য নয় এই ধরণের শব্দগুলিকে অপার্থ বা সংকেত ভাষা বলে। যেমন -- গোয়েন্দাকে 'টিকটিকি', পুলিশকে 'ফেউ', পিস্তলকে 'খোকা', হাতবোমাকে 'আলু' বলে।

প্রশ্ন ঃ অপভাষা কি ?

উঃ কোন ব্যক্তি মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় দক্ষতা না করে ভাষা ব্যবহার করতে গেলে উচ্চারণ বিকৃতি ও প্রমাদ ঘটে এই ধরণের ভাষাকে অপভাষা বা ম্লেচ্ছ ভাষা বলে। যেমন -- গো শব্দের উচ্চারণ 'গাই'।

প্রশ্ন ঃ ভাষা সৃষ্টির দুটি মতবাদ লেখ।

উঃ ১) **দৈবী মতবাদ ঃ** ভাষা ঈশ্বরের সৃষ্টি। হিন্দুদের কাছে সংস্কৃত 'বেদ ভাষা'। মুসলমানদের কাছে আরবি ভাষা খোদার সৃষ্টি।

২) **ধাতু সিদ্ধান্ত ঃ** ভাষা সৃষ্টির মূলে আছে ধাতু। পাণিনি ও ম্যাক্সমুলার এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ শৈলী বা স্টাইল কি ?

উঃ ভাষার উপকরণের সঙ্গে যখন লেখকের ব্যক্তিগত প্রবণতা তথা সামগ্রিক সত্তাটি

ধরা পড়ে তখন তাকে ঐ লেখকের প্রকাশরীতি বা শৈলী বলে।

প্রশ্ন : কিসের উপর ভিত্তি করে ভাষার শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে ?

উঃ (ক) রূপতত্ত্ব অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ (খ) বংশানুক্রমিক বা ঐতিহাসিক শ্রেণিবিভাগ (গ) ভৌগোলিক শ্রেণিবিভাগ (ঘ) জাতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ।

প্রশ্ন : পৃথিবীর ভাষাগুলিকে যে সমস্ত বংশে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে তার প্রধান কয়েকটি উল্লেখ কর।

উঃ (ক) ইন্দো-ইউরোপীয় (খ) সেমীয়-হামীয় (গ) দ্রাবিড় (ঘ) অষ্ট্রিক (ঙ) ভোটচীনীয় ইত্যাদি।

প্রশ্ন : আজ থেকে কত বছর আগে মূল ভাষা থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জন্ম হয়েছে ?

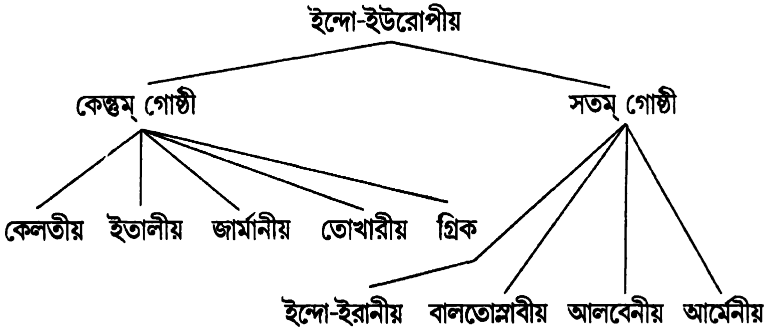
উঃ আনুমানিক সাড়ে চার হাজার বছর আগে।

প্রশ্ন : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের প্রধান শাখাগুলি কি কি ?

উঃ ক) ইন্দো-ইরানীয় (খ) বালতোস্লাবীয় (গ) গ্রিক (ঘ) আর্মেনীয় ও আলবেনীয় (ঙ) কেলতীয় (চ) ইতালীয় (ছ) জার্মানীয় (জ) তোখারীয় (ঝ) হিট্টীয়

প্রশ্ন : পুর কণ্ঠ স্পৃষ্ট্য ধ্বনি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

উঃ ক) কেন্তুম ও (খ) সতম্



প্রশ্ন : ভারতীয় আর্য ভাষা কোন সময় ইন্দো-ইরানীয় শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল?

উঃ আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ দেড় হাজার বছর পূর্বে।

প্রশ্ন : ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন কি ?

উঃ ঋক্‌বেদের ভাষা।

প্রশ্ন : প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিস্তৃতিকাল কতদূর পর্যন্ত।

উঃ খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন : ইন্দো-ইরানীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন কি ?

উঃ আবেস্তার ভাষা (জেন্দ-আবেস্তা)।

প্রশ্ন : প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সময়কাল কত ?

উঃ খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন : প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ (ক) ঋ, ৠ, ৯ ইত্যাদি সরল ধ্বনির ব্যবহার ছিল।

(খ) র্দ্ধ, ষ্ট্র, ক্র ইত্যাদি যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার ছিল।

প্রশ্ন : প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ (ক) একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন এই তিনটি বচনের ব্যবহার ছিল।

(খ) পুং, স্ত্রী ও ক্লীব — তিন লিঙ্গের ব্যবহার ছিল।

প্রশ্ন : পাণিনির লেখা গ্রন্থটির নাম কি ?

উঃ অষ্টাধ্যায়ী (খ্রিঃ পূঃ ৫০০ অব্দ)

প্রশ্ন : মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ ক) 'ঋ' ধ্বনিটির সরলীকরণ ঘটেছে অথবা লুপ্ত হয়েছে।

যেমন — অমৃত > অমিঅ

খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের যুক্তব্যঞ্জন এই স্তরে যুগ্মব্যঞ্জনের পরিণত হয়েছে।

যেমন — ধর্ম > ধম্ম

প্রশ্ন : কোন্ সময় থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শুরু ?

উঃ খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময় থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শুরু।

প্রশ্ন : মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার নিদর্শন কি ?

উঃ পালি ভাষায় রচিত 'ত্রিপিটক'।

প্রশ্ন : 'প্রাকৃত' শব্দটির কোন ব্যাখ্যা সুকুমার সেন দিয়েছেন ?

উঃ "প্রাকৃত বা প্রাকৃত ভাষা কথাটির আসল তাৎপর্য হইতেছে 'প্রকৃতির অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত ভাষা।'

প্রশ্ন : মধ্যভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত ভাষার দুটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যে তিনটি বচন (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) কিন্তু এই স্তরে দ্বিবচন লোপ পায় এবং দ্বিবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হতে থাকে।

খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব নির্দেশক অনুজ্ঞা, অভিপ্রায়, নির্বন্ধ, বিধিলিঙ্ এগুলির মধ্যে অভিপ্রায় এবং নির্বন্ধ লুপ্ত হয়।

প্রশ্ন : মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার ব্যাপ্তিকাল কতদূর ?

উঃ আঃ ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন : মধ্যভারতীয় আর্য ভাষাস্তরে প্রধান ভাষা কোনটি ?

উঃ প্রাকৃত ভাষা।

প্রশ্ন ঃ কোন্ ভাষান্তরকে অপভ্রংশ বলা হয় ?

উঃ মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা তথা প্রাকৃত স্তরে অন্ত্য স্তরের ভাষাকে অপভ্রংশ-অবহট্ঠ স্তর বলে।

প্রশ্ন ঃ পতঞ্জলির মহাভাষ্য কোন স্তরের ভাষায় রচিত ?

উঃ মধ্যভারতীয় আর্য স্তরের ভাষায় (খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দিতে রচিত)।

প্রশ্ন ঃ কোন্ সময়সীমাকে নব্য ভারতীয় আর্য স্তর বলা হয় ?

উঃ আনুমানিক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত।

প্রশ্ন ঃ কোন্ প্রাকৃত ভাষার শাখা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম বলে মনে করা হয় ?

উঃ মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম বলে মনে করা হয়।

প্রশ্ন ঃ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ ক. পদান্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি প্রায় লুপ্ত হয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে।

যেমন — সংস্কৃত রাম > বাংলায় রাম্।

খ. যুক্তব্যঞ্জন থেকে বিবর্তিত যুগ্মব্যঞ্জন এই স্তরে একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে।

যেমন ধর্ম > ধম্ম > ধাম।

প্রশ্ন ঃ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পদান্তে স্বরধ্বনি অনুসারে অনেক সময় লিঙ্গ নির্ণয় করা হয়। কিন্তু নব্য ভারতীয় আর্যে অর্থ অনুসারে লিঙ্গ নির্ণয় শুরু হয়।

খ. অধিকাংশ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ থাকল না।

গ. এই স্তরে একাধিক ধাতুর সংযোগে যৌগিক কাল গঠিত হয়।

যেমন □√কর্ + ইয়া + √আছ্ + এ = করেছে।

প্রশ্ন ঃ নব্য ভারতীয় আর্যের একটি নিদর্শন বল ?

উঃ চর্যাগীতি

প্রশ্ন ঃ বাংলা ভাষাকে কয়টি স্তরে ভাগ করা যায় ও কি কি ?

উঃ ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বাংলাকে প্রধান তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা —

ক. প্রাচীন বাংলা (আনুঃ ৯০০-১৩৫০ খ্রিঃ)

খ. মধ্য বাংলা (আনুঃ ১৩৫০- ১৮০০ খ্রিঃ)

গ. আধুনিক বাংলা (১৮০০খ্রিঃ থেকে আজ পর্যন্ত)।

প্রশ্ন ঃ আদি বাংলার নিদর্শন কি ?

উঃ চর্যাগীতি।

প্রশ্ন ঃ চর্যাগীতি ছাড়া আদি বাংলার আর একটি নিদর্শন কি ?

উঃ সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব অথবা সেকশুভোদয়া।

প্রশ্ন ঃ আদি বাংলা বা প্রাচীন বাংলার দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ ?

উঃ ক. পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মাঝে শ্রুতিধ্বনির আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন

— নিঅড্ডী > নিয়ডী ('য়' শ্রুতি)।

খ. নাসিক্য ব্যঞ্জন অনেকক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে ফলে পূর্ববর্তীস্বর আনুনাসিক হয়েছে। যেমন — চন্দ্র > চাঁদ।

প্রশ্ন ঃ আদি বাংলার দুটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ ?

উঃ ক. নামপদে লিঙ্গ ভেদ ছাড়াও সর্বনাম, বিশেষণ এবং সম্বন্ধ বাচক শব্দেও লিঙ্গ ভেদ ছিল। যেমন — হাড়েরি মালী

খ. আধুনিক কালের মত একবচন ও বহুবচনে পার্থক্য ছিল।

যেমন ঃ একবচন — পাবত, বহুবচন — উঁচা উঁচা পাবত।

প্রশ্ন ঃ চর্যাগীতির এমন দুটি বৈশিষ্ট্য বল যা অন্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না ?

উঃ ক. কর্তার লিঙ্গভেদ অনুসারে ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ। যেমন — পুং— সসুরা নিদ গেল, স্ত্রী — সবরী নিচেতন ভইলী।

খ. ষষ্ঠীতে 'র' বিভক্তি। যেমন— রুখের তেন্তলি।

গ. অতীত কালে 'ইল' এবং ভবিষ্যত কালে 'ইব' প্রত্যয়।

প্রশ্ন ঃ মধ্য বাংলাকে কটি উপভাগে ভাগ করা যায় ? তাদের কালসীমা লেখ ?

উঃ মধ্যবাংলা স্তরকে দুটি উপবিভাগে ভাগ করা যায় —

ক. আদি-মধ্য বাংলা (আঃ ১৩৫০-১৫০০খ্রিঃ)।

খ. অন্ত্য-মধ্য বাংলা (আঃ ১৫০০ খ্রিঃ-১৮০০ খ্রিঃ)

প্রশ্ন ঃ আদি মধ্য বাংলার দুটি সাহিত্যিক নিদর্শন লেখ ?

উঃ (ক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (বড়ু চণ্ডীদাস) (খ) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (মালাধর বসু)।

প্রশ্ন ঃ অন্ত্য-মধ্য বাংলার দুটি সাহিত্যিক নিদর্শন লেখ ?

উঃ (ক) কবিকঙ্কন মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' (খ) কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত।

প্রশ্ন ঃ আদি-মধ্য বাংলার দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ (ক) 'আ'-কার-এর পরবর্তী 'ই'-কার বা 'উ'-কার ধ্বনির ক্ষীণতা এই যুগের একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বলে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন।যেমন — আউলাইল > আ^{উ}লা^{ই}ল (খ) 'ই', 'ঈ', কিংবা 'উ', 'ঊ', এর পার্থক্য ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আদি-মধ্য বাংলার দুটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ ক. কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ ঘটে।

যেমন — 'শীতল মনোহর বাঁশি কেনা বাএ।'

খ. সর্বনাম পদের সঙ্গে কর্তৃকারকের বহুবচনে রা-বিভক্তি যুক্ত হত।

যেমন — 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী।'

প্রশ্ন ঃ অন্ত্য-মধ্য বাংলার সময়সীমা কত ?

উঃ ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তবে অনেকেই এই সময়সীমাকে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বলে মনে করেন।

প্রশ্ন ঃ অন্ত্য-মধ্য বাংলার উল্লেখযোগ্য দু'জন কবির নাম লেখ।

উঃ জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস।

প্রশ্ন ঃ অন্ত্য-মধ্য বাংলার দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ ?

উঃ ক. পদান্তের একক ব্যঞ্জনে অ-কার লোপ কিন্তু যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে অ-ধ্বনি বজায় আছে। যেমন – একক ব্যঞ্জন – তখন্, ভিতর্। যুক্তব্যঞ্জন – শক্ত, ভক্ত, গোবিন্দ।

খ. নতুন স্বরধ্বনি হিসাবে 'অ্যা' ধ্বনির উদ্ভব ঘটেছে। যেমন – ব্যাভার, ব্যায়।

প্রশ্ন ঃ অন্ত্য-মধ্য বাংলার দুটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ ক. ক্রিয়া ও বিশেষণ পদে যে লিঙ্গান্তর ঘটতো তা রইল না।

খ. কর্তার বহুবচনে 'রা' বিভক্তি নির্দেশক বহুবচনে 'গুলা', 'গুলি' যোগে পদ গঠন শুরু হল।

প্রশ্ন ঃ আধুনকি বাংলার সময় সীমা লেখ।

উঃ ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত।

প্রশ্ন ঃ আধুনিক বাংলার দুটি সাহিত্যিক নিদর্শন লেখ।

উঃ বিদ্যাসাগবেব 'শকুন্তলা' , রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী'।

প্রশ্ন ঃ আধুনিক বাংলা ভাষার দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ ক. আধুনিক বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে স্বরসঙ্গতি লক্ষ করা যায়।

যেমন দেশী > দিশি।

খ. আধুনিক বাংলায় বিশেষ করে বঙ্গালি উপভাষায় অপিনিহিতি এবং রাঢ়ি উপভাষায় অভিশ্রুতি লক্ষ করা যায়।

যেমন – করিয়া > কইর্যা (অপিনিহিতি) > করে (অভিশ্রুতি)।

প্রশ্ন ঃ আধুনিক বাংলার দুটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

উঃ ক) সংযোজক অব্যয় (ও, এবং) এর ব্যবহার বেশি। (খ) সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ তথা দীর্ঘরূপ বর্তমান। আর চলিত ভাষায় এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়।

সাধু রূপ	চলিত রূপ
করিয়া	করে
বলিয়া	বলে
ছাড়িয়া	ছেড়ে
চলিয়া	চলে
তাহার	তার
তাহাদের	তাদের
কাহাদের	কাদের

শব্দ

প্রশ্ন ঃ শব্দ কাকে বলে ? কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ কণ্ঠোচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনি বা ধ্বমিসমষ্টিকে শব্দ বলে। শব্দ দুই প্রকার — ক. মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ খ. সাধিত শব্দ

প্রশ্ন ঃ মৌলিক শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।

উঃ সুনীতিবাবুর মতে — " অন্য ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ, সেই ভাষার মৌলিক বা মূল শব্দ না হইলেও, বাঙলা ভাষায় যদি সেগুলির বিশ্লেষ এবং বিশ্লেষ -অনুযায়ী ভগ্ন অংশের অর্থগ্রহ না হয়, তাহা হইলে বাঙলার পক্ষে সেগুলি মৌলিক শব্দ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য; যেমন— হস্ত, চরণ, চন্দ্র, জমীন, নাজির, প্রিণ্টার, রোমাণ্টিক .. " ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ সাধিত শব্দ কাকে বলে ? সাধিত শব্দ কয়প্রকার ও কি কি ?

উঃ যে সকল শব্দ বাংলায় বিশ্লেষণযোগ্য তাদের সাধিত শব্দ বলে। সাধিত শব্দ দুই প্রকার — ক. প্রত্যয়-নিষ্পন্ন খ. সমস্ত শব্দ ।

প্রশ্ন ঃ প্রত্যয় - নিষ্পন্ন শব্দ বলতে কি বুঝ ?

উঃ যে সব শব্দের বিশ্লেষণে শব্দের মধ্যে একটি মৌলিক শব্দ এবং ভাবের প্রসারক, সঙ্কোচক বা পরিবর্তনকারী কোন অংশ বর্তমান থাকে তাকে বলে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ বলে।

প্রশ্ন ঃ সমস্ত শব্দ বা সমাসবদ্ধ শব্দ কাকে বলে ?

উঃ যে সব শব্দের বিশ্লেষণে একাধিক মৌলিক শব্দ পাওয়া যায়, তাদের বলে 'সমস্ত শব্দ' বা ' সমাসবদ্ধ শব্দ' ।

প্রশ্ন ঃ 'ইতর' শব্দ কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও।

উঃ অনেকটা গোপনে ব্যবহার করার জন্য ইতর বা অভদ্র জনেরা যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে তাকে ইতর শব্দ বলে। যেমন — ল্যাং মারা, বাঁশ দেওয়া, মাল খাওয়া, চামচা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ খণ্ডিত শব্দ কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও ?

উঃ দ্রুত উচ্চারণ ও ব্যবহারের সুবিধার জন্য যখন শব্দের অংশ বিশেষ কেটে বাদ দিয়ে উচ্চারণ করা হয় তাকে খণ্ডিত শব্দ বলা হয়।

যেমন — ফোন (টেলিফোন), মাইক (মাইক্রোফোন)

প্রশ্ন ঃ মুণ্ডমাল শব্দ কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও।

উঃ দীর্ঘ পদগুচ্ছের বা কোন দীর্ঘ নামের শব্দগুলির প্রথম বর্ণ নিয়ে যে শব্দ তৈরি হয় তাকে মুণ্ডমাল শব্দ বলে। যেমন — সি.পি. এম. (কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসিস্ট)

ধ্বনি

প্রশ্ন ঃ ধ্বনিবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে কোন্ যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয় ?

উঃ কাইমোগ্রাফ্, প্লেটোগ্রাফ, স্পেক্টোগ্রাফ।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ অঙ্গ নিয়ে বাগযন্ত্র গঠিত ?

উঃ ফুসফুস, স্বরতন্ত্রী, কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠ, নাসিকা, তালু, দন্ত-এইসব নিয়ে বাগযন্ত্র গঠিত।

প্রশ্ন ঃ বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কোন্গুলি ?

উঃ বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি হল — অ, আ, ই, উ, এ, ও, এ্যা — এই মোট সাততি।

প্রশ্ন ঃ স্পৃষ্ট ধ্বনি বা স্পর্শধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু বের হবার পথে বাগযন্ত্রে প্রত্যক্ষ বাধার ফলে যে ব্যঞ্জনগুলি উচ্চারিত হয় সেগুলিকেই স্পৃষ্টধ্বনি বা স্পর্শধ্বনি বলে। প থেকে ম পর্যন্ত ধ্বনিগুলি স্পর্শ ধ্বনি।

প্রশ্ন ঃ শিষ ধ্বনি বা উষ্ণধ্বনি কোনগুলি ?

উঃ শ, ষ এবং স এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করার সময় শ্বাসবায়ু সংকীর্ণ পথে বেব হয়ে এই প্রকার ধ্বনির সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ঃ দুটি ঘৃষ্টব্যঞ্জনের উদাহরণ দাও।

উঃ চ, ছ হল ঘৃষ্টব্যঞ্জন। এগুলি জিহ্বা ও তালুব স্পর্শে ও ঘষর্ণে সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ঃ দুটি প্রতিবেষ্ঠিত ধ্বনির উদাহরণ দাও।

উঃ ট, ঠ।

প্রশ্ন ঃ দুটি দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনির উদাহরণ দাও।

উঃ খ (ক + হ), ধ (দ + হ)।

প্রশ্ন ঃ দুটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ও দুটি সম্মুখ স্বরধ্বনির উদাহরণ দাও।

উঃ সম্মুখ — ই, এ। পশ্চাৎ স্বরধ্বনি — উ, ও।

প্রশ্ন ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় কটি স্বরধ্বনিকে স্বনিম বলেছেন।

উঃ তিনি ১৬ টি স্বরধ্বনিকে স্বনিম রূপে স্বীকার করেছেন।

প্রশ্ন ঃ এমন একটি ব্যঞ্জনের উদাহরণ দাও যে স্বরের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারতি হয় ?

উঃ 'ৎ' হল সেই ব্যঞ্জন।

প্রশ্ন ঃ ড়, ঢ় এগুলি কি প্রকার ধ্বনি ?

উঃ এগুলি তাড়িত ধ্বনি।

প্রশ্ন ঃ বিদ্যাসাগরের বর্ণমালায় দ্বিস্বর দুটি কী কী ?

উঃ বিদ্যাসাগরীয় বর্ণমালায় দ্বিস্বর দুটি হল ঐ,ঔ।

বাক্যগঠন

প্রশ্ন ঃ প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী বাক্যের কয়টি অংশ ও কি কি ?

উঃ প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী বাক্য দুটি অংশ — উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

প্রশ্ন ঃ উদ্দেশ্য কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ একটি বাক্যে যাকে অবলম্বন করে বক্তা তার মনোভাব প্রকাশ করে তাকে উদ্দেশ্য বলে । যেমন — রহিম স্কুল যাবে। 'রহিম' এখানে উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ঃ বিধেয় কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ উদ্দেশ্যের সম্পর্কে যখন কিছু বলা হয় তখন তাকে বিধেয় বলা হয়। যেমন — রহিম স্কুলে যাবে। 'স্কুলে যাবে' এখানে বিধেয়।

প্রশ্ন ঃ গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যের কয়টি শ্রেণি ও কি কি ?

উঃ গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় — ক. সরল বাক্য খ. মিশ্র বা জটিল বাক্য গ. যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য।

প্রশ্ন ঃ সরল বাক্য কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও ।

উঃ যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন — বিকাশ ফুটবল খেলে।

প্রশ্ন ঃ মিশ্র বা জটিল বাক্য কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও ।

উঃ যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় থাকার পরও তার উপর নির্ভর করে অন্য একটি খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ থাকে তাকে বলে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন — যে খাতাটি তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তা হারিয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও ।

উঃ যে বাক্যে একাধিক সরল বাক্য বা মিশ্র বাক্য থাকে এবং বাক্যগুলো সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দিয়ে যুক্ত থাকে তাকে যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য বলে। যেমন -- নিধির বাঁশি বাজালো এবং আমি দুটো কবিতা আবৃত্তি করলাম।

প্রশ্ন ঃ অর্থগত দিক থেকে বাক্যকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ও কি কি ?

উঃ অর্থগত দিক থেকে বাক্যকে সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় —

ক. নির্দেশাত্মক বাক্য

খ. প্রশ্নাত্মক বাক্য

গ. ইচ্ছার্থক বা প্রার্থনাত্মক বাক্য

ঘ. আদেশাত্মক বাক্য

ঙ. কার্যকারণাত্মক বাক্য

চ. সন্দেহাত্মক বাক্য

ছ. বিস্ময়াত্মক বাক্য

প্রশ্ন ঃ নির্দেশাত্মক বাক্য কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ দুই প্রকার — ক. অস্ত্যর্থক বা সদর্থক খ. ন্যস্তর্থক বা নঞর্থক

প্রশ্ন ঃ একটি কার্যকারণাত্মক বাক্যের উদাহরণ দাও ।

উঃ যদি বোলিং খারাপ হয় তবে আর বিশ্বকাপের আশা করো না।

প্রশ্ন ঃ বৈয়াকরণরা বাক্যের তিনটি লক্ষণের কথা বলেছেন সেগুলি কি কি ?

উঃ তিনটি লক্ষণ হল — ক. আকাঙ্ক্ষা খ. যোগ্যতা গ. আসত্তি

প্রশ্ন ঃ বাংলা বাক্যগঠনের পদক্রমটি কি ?

উঃ বাংলা বাক্যগঠনের পদক্রমটি হল প্রথম কর্তা তারপর কর্ম ও শেষে থাকে ক্রিয়া। তবে অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলেও এদের প্রসারকগুলি সহ পরিবর্তন ঘটে।

বাগ্‌যন্ত্র

প্রশ্ন ঃ বাগ্‌যন্ত্র কাকে বলে ?

উঃ দেহের যে সকল প্রত্যঙ্গ বা যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কথা বলি, তথা নানাপ্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকি, তাকে 'বাগযন্ত্র' বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ বাগ্‌ধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ বাগ্‌যন্ত্রের সহায়তায় উচ্চারিত ও শ্রুতিনিবদ্ধ ধ্বনিকে বলা হয় বাগ্‌ধ্বনি।

প্রশ্ন ঃ বাগ্‌ধ্বনি উচ্চারণের সক্রিয় স্থানগুলি কি কি ?

উঃ মুখবিবরে আছে সর্বাধিক সক্রিয় জিহ্বা, কণ্ঠনালী, তালু, দন্ত এবং ওষ্ঠ। এছাড়া আছে নাসিকা-বিবর।

প্রশ্ন ঃ ঘোষ ধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ নিঃশ্বাস বায়ু বহির্গমনের পথে স্বরযন্ত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যখন সবেগে বেরিয়ে আসতে চায়, তখনই স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়ে একপ্রকার ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করে, ফলে উৎপন্ন হয় ঘোষবৎ বা সঘোষ ধ্বনি, সংক্ষেপে ঘোষধ্বনি বলা হয়। বাংলা স্বরবর্ণগুলো এবং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণ ঘোষধ্বনি।

প্রশ্ন ঃ অঘোষ ধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ যে সকল ধ্বনি স্বরযন্ত্রে বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে অবাধে চলে এসে মুখবিবরের কোথাও বাধা পায়, তবে নাদ সৃষ্টি করে না , তাদের বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ, তিনটি শিস্‌ধ্বনি এবং বিসর্গ এগুলো হলো অঘোষ ধ্বনি।

প্রশ্ন ঃ স্বরধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ স্বরযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসবার পর যদি নিঃশ্বাস বায়ু মুখবিবরে আর কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে কোন ধ্বনি উচ্চারণ করে, তবে তাকে বলা হয় স্বরধ্বনি।

প্রশ্ন : বাংলায় স্বরধ্বনির সংখ্যা কত ?

উঃ ৭ টি।

প্রশ্ন : সম্মুখ স্বরধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ যে স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ সম্মুখবর্তী হয়, তাকে সম্মুখ স্বরধ্বনি বলে। যেগুলি আসলে স্বরচিত্রের সামনের দিকে থাকে। যেমন — ই, এ, এ্যা, আ।

প্রশ্ন : পশ্চাৎ স্বরধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ যে স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট হয় তাকে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলে। যেমন — আ, অ, ও, উ।

প্রশ্ন : যৌগিক স্বর বা সন্ধিস্বর কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ একাধিক স্বরধ্বনিকে যদি একটিমাত্র প্রচেষ্টায় উচ্চারণ করা যায়, তবে তাকে যৌগিক স্বর বা সন্ধিস্বর বলা হয়। যেমন — ঐ, ঔ, এই, উও ।

প্রশ্ন : ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ স্বরতন্ত্রী থেকে বেরিয়ে আসবার পর যদি নিঃশ্বাস বায়ু মুখবিবরে বা অন্য কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্রশ্ন : শিস্‌ধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ স্বরতন্ত্রী থেকে বেরিয়ে আসবার পর নিঃশ্বাসবায়ু মুখবিবরে আংশিক বাধাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন কোন সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে বায়ু বেরিয়ে আসে, তখন শিস্ দেবার মত একপ্রকার ধ্বনি নির্গত হয়, তাকে বলা হয় শিস্‌ধ্বনি বা উষ্মধ্বনি। যেমন -- শ, ষ, স।

প্রশ্ন : ঘৃষ্ট ধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ কতকগুলি ধ্বনি উচ্চারণের সময় একই সঙ্গে স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনি উচ্চারণের প্রক্রিয়া ঘটে যায়। অর্থাৎ এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু গতিপথে স্পর্শ ধ্বনির মতো পুরোপুরি বাধার সৃষ্টি করে এবং পরে তা আংশিক বাধায় পরিণত হয়। এই ধরণের ধ্বনিকে ঘৃষ্টধ্বনি বলে। যেমন - চ, ছ, জ, ঝ।

প্রশ্ন : স্পৃষ্টধ্বনি বা স্পর্শধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ স্বরযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসবার পথে নিঃশ্বাসবায়ু কখন কখন সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একেবারে থেমে গিয়ে পরে বিস্ফারিত হয়। মুখের ভিতরে কোন এক অঙ্গ অপর এক অঙ্গকে স্পর্শ করে বলেই সম্পূর্ণ বাধার সৃষ্টি হয় — এরূপে উচ্চারিত ধ্বনিকে বলা হয় স্পৃষ্টধ্বনি বা স্পর্শধ্বনি। বাংলা বা সংস্কৃতে 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত ধ্বনিগুলো স্পর্শজাত ধ্বনি।

প্রশ্ন : কণ্ঠ্যধ্বনির অন্য নাম কি ?

উঃ কণ্ঠকে আশ্রয় করে উচ্চারিত ধ্বনি । কণ্ঠ্যধ্বনিগুলির প্রকৃত উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল। সেইজন্য কণ্ঠধ্বনির অন্য নাম জিহ্বামূলীয় ধ্বনি। যেমন — আ, আ।

প্রশ্ন : তালব্য ধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ জিহ্বা ও তালু স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে তালব্য ধ্বনি বলে। যেমন — চ, ছ, জ, ঝ।

প্রশ্ন : 'মূর্ধন্য ধ্বনি' কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ জিহ্বা মূর্ধা স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে মূর্ধন্য ধ্বনি বলে। যেমন — ট বর্গের ধ্বনি এবং ন, র, ল ধ্বনি।

প্রশ্ন : প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ খাঁটি মূর্ধন্য ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র পিছনে বেঁকে মূর্ধা স্পর্শ করে, তাই এগুলোকে বলা হয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। যেমন — ট , ঠ , ড , ঢ ।

প্রশ্ন : রণিত ধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ নাসায় বা মুখগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে যখন বায়ু নিঃসৃত হয়, তখন তাদের রণিত ধ্বনি বলে। যেমন — ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

প্রশ্ন : পার্শ্বিক ধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ ধ্বনির উচ্চারণ কালে জিহ্বার পার্শ্ব দিয়ে বায়ু বহির্গত হয় বলে তাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। যেমন — 'ল'।

প্রশ্ন : কম্পিত ধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ ধ্বনির উচ্চারণ কালে জিহ্বাগ্র কম্পিত হয় বলে তাকে কম্পিত ধ্বনি বলে। যেমন — 'র'।

প্রশ্ন : তাড়িত ধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ ধ্বনির উচ্চারণ কালে জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্তমূল তাড়িত হয় বলে তাকে তাড়িত ধ্বনি বলে । যেমন — ড়, ঢ়।

প্রশ্ন : নাসিক্য ধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ নাসাপথ দিয়ে ধ্বনি বহির্গত হলে নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন -- বর্গের পঞ্চমবর্ণগুলো নাসিক্য ধ্বনি — ঙ, ঞ,ণ, ন, ম।

প্রশ্ন : অর্ধস্বর কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ কোন ধ্বরধ্বনির উচ্চারণ-কালে যদি ভিতরে কোন অবরোধের সৃষ্টি হয় এবং ধ্বনিটি ঈষৎ উষ্ম উচ্চারিত হয়, তবে অর্ধস্বরে পরিণত হয়। যেমন — ই > য়্, উ > ব্, ইংরাজি y, w

প্রশ্ন : অর্ধব্যঞ্জন কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ যে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো স্বয়ং অথবা অপর ব্যঞ্জন ধ্বনির বাহক-রূপে অক্ষর সৃষ্টি করতে পারে, তাদের বলে অর্ধব্যঞ্জন। যেমন — 'ন্, ম্, র্, ল্' — এরূপ অর্ধব্যঞ্জন।

প্রশ্ন : মহাপ্রাণ ধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ কোন ধ্বনির উচ্চারণ-কালে কণ্ঠনালীর আকুঞ্চনে যদি অতিরিক্ত বাধার সৃষ্টি হয়,

অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর পরিমান বাড়ে তবে তাকে বলে মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন — বর্গের দ্বিতীয় (খ) ও চতুর্থ (ঘ) ধ্বনি হল মহাপ্রাণ ধ্বনি।

প্রশ্ন ঃ অল্পপ্রাণ ধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ কোন ধ্বনির উচ্চারণ-কালে কণ্ঠনালীর আকুঞ্চনে যদি অতিরিক্ত বাধার সৃষ্টি হয় না, তাকে বলে অল্পপ্রাণ ধ্বনি। এক্ষেত্রে শ্বাসবায়ুর পরিমান কম থাকে। যেমন - - বর্গের প্রথম (ক) ও তৃতীয় (গ) অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

প্রশ্ন ঃ দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি কাকে ? উদাহরণ দাও।

উঃ দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনি যদি যুগপৎ একটি ধ্বনির উচ্চারণকাল মধ্যে উচ্চারিত হয়, তবেই দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি হতে পারে। যেমন — খ, ধ ইত্যাদি।

ধ্বনির উচ্চারণ

প্রশ্ন ঃ বাংলা ভাষার বর্ণগুলি কোন্ ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে ?

উঃ বাংলা ভাষার বর্ণগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে ।

প্রশ্ন ঃ সংস্কৃত বর্ণমালায় স্বরধ্বনি কয়টি ?

উঃ সংস্কৃত বর্ণমালায় স্বরধ্বনির সংখ্যা ছিল ষোলটি।

প্রশ্ন ঃ সংস্কৃত বর্ণমালায় নেই কিন্তু বাংলায় উচ্চারিত হয় এমন স্বরধ্বনি কোনটি ?

উঃ মৌলিক স্বরধ্বনি হিসাবে বাংলায় 'এ্যা' ধ্বনির ব্যবহার সংস্কৃত ভাষায় ছিল না।

প্রশ্ন ঃ বাংলায় কয়টি দীর্ঘ স্বর আছে ?

উঃ বাংলায় দীর্ঘ স্বর নেই । তাই ঈ ও ঊ এর উচ্চারণ বাংলায় নেই।

প্রশ্ন ঃ 'এ' বর্ণটি ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় উচ্চারণ কি ছিল ?

উঃ এ বর্ণটি ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় উচ্চারণ ছিল 'অই'।

প্রশ্ন ঃ বাংলায় যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষর কোন্ বর্ণটি ?

উঃ ঐ হল যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষর ঐ = ও + ই

প্রশ্ন ঃ দন্ত্যবর্ণগুলির উচ্চারণ স্থান কোথায় ?

উঃ দন্ত্যবর্ণগুলির উচ্চারণ স্থান দন্ত্যমূলে ।

প্রশ্ন ঃ ব্যঞ্জনবর্ণ কিন্তু অর্ধস্বর বলা হয় কোন্ ব্যঞ্জনকে ?

উঃ য়,ব এরা অর্ধস্বর ।

প্রশ্ন ঃ বাংলায় অযোগবাহ বর্ণের উদাহরণ দাও।

উঃ বাংলায় ং , ঃ হল অযোগবাহ বর্ণ।

প্রশ্ন ঃ বাংলায় তরল ধ্বনিদুটি কি কি ?

উঃ 'র' এবং ' ল' হল তরল ধ্বনি ।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ সংস্কৃত ভাষায় মূর্ধন্যবর্ণ গুলি উচ্চারণে জিহ্বা উল্টে মূর্ধা স্পর্শ করতো তাই মূর্ধন্য বর্ণগুলিকে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলে।

প্রশ্ন : বাংলায় প্রচলিত একটি দ্বিস্বরের উদাহরণ দাও।

উঃ খাও (আ + ও)।

ধ্বনি পরিবর্তন

প্রশ্ন : ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলি কি কি ?

উঃ ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলি হল – (১) ভৌগোলিক পরিবেশ (২) অন্যভাষার প্রভাব (৩) সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণ (৪) উচ্চারণের ত্রুটি ও আরামপ্রিয়তা। (৫) শ্রবণ ও বোধেব ত্রুটি ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান সূত্রগুলি কি কি ?

উঃ ধ্বনিপরিবর্তনের প্রধান সূত্রগুলি হল – (১) নতুন ধ্বনির আগমন (২) ধ্বনিলোপ (৩) ধ্বনির উচ্চারণ স্থান পরিবর্তন (৪) ধ্বনির বিপর্যাস।

প্রশ্ন : পলকা > অপলকা – এটি কোন্ ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন ?

উঃ এটি আদি স্বরাগম।

প্রশ্ন : স্টেশন > ইস্টিশন, স্কুল > ইস্কুল, স্ত্রী > ইস্ত্রী, স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্বাদ > আস্বাদ – এগুলি কোন্ ধরণের ধ্বনিপরিবর্তন এবং কেন ?

উঃ এগুলি আদি স্বরাগম, কারণ উচ্চারণের সুবিধা এবং অন্য কোন কারণে শব্দের আদিতে স্বরের আগমন ঘটেছে তাই আদি স্বরাগম।

প্রশ্ন : প্রীতি > পিরীতি – কোন্ ধরণের ধ্বনিপরিবর্তন ?

উঃ উচ্চারণ অথবা ছন্দের প্রয়োজনে শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে মধ্য স্বরাগম হয়। যেমন – রত্ন > রতন।

প্রশ্ন : বেঞ্চ > বেঞ্চি – কোন্ ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন ?

উঃ অন্ত্যস্বরাগম অর্থাৎ অন্ত্যে স্বরের আগমন ঘটেছে।

প্রশ্ন : চারি > চাইর, বাক্য > বাইক্ক, কাঁচি > কাঁইচি, সাধু > সাউধ, রাখিয়া > রাইখ্যা – এই ধ্বনি পরিবর্তনগুলিকে কি বলে ?

উঃ এই ধরণের ধ্বনি পরিবর্তনকে অপিনিহিতি বলে।

প্রশ্ন : একটি আদি ব্যঞ্জনাগমের উদাহরণ দাও।

উঃ ওমলেট > মামলেট।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় কতগুলি শ্রুতিধ্বনি দেখা যায় ?

উঃ বাংলা ভাষায় প্রায় পাঁচটি শ্রুতিধ্বনির ব্যবহার আছে।
যেমন – ১) 'য়'-শ্রুতি – শৃগাল > শিয়াল, বচন > বয়ান। (২) 'ওয়' শ্রুতি –

মোদক > মোওয়া, খাআ > খাওয়া। (৩) 'হ' - শ্রুতি— বিপুলা > বেহুলা, নবীন > ন (৪) 'দ'-শ্রুতি-বানর > বান্দর ; সুনর > সুন্দর। (৫) 'ব' শ্রুতি — অম্ল > অম্বল।

প্রশ্ন : খোকা > খোকন — কোন্ ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন ?

উঃ অন্ত্যব্যঞ্জনাগম।

প্রশ্ন : অলাবু > লাউ ; উদুম্বর > ডুমুর ; ওঝা > ঝা — কোন্ ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে ?

উঃ আদিস্বরলোপ।

প্রশ্ন : দুটি মধ্যস্বরলোপের উদাহরণ দাও ?

উঃ জানালা > জান্‌লা ; কলিকাতা > কলকাতা।

প্রশ্ন : দ্বিমাত্রিকতা কাকে বলে ?

উঃ বাংলা অক্ষর গঠনে একটি অক্ষরে একটি মাত্র স্বরধ্বনি থাকে কিন্তু কোন দীর্ঘশব্দ বা পদ উচ্চারণ কালে তা দুই অক্ষরগুচ্ছে বা তার গুণিতকে ভেঙ্গে যায় একেই দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা বলে। যেমন— গা মোছা > গাম্‌ছা।

প্রশ্ন : দুটি অন্ত্যস্বরলোপের উদাহরণ দাও।

উঃ সন্ধ্যা > সাঁঝ ; রাশি > রাশ।

প্রশ্ন : কৃষ্ণনগর > কৃষনগর ; খড়দহ > খড়দা, শিয়ালদহ > শিয়ালদা — এই ধ্বনি পরিবর্তন গুলিতে কি ঘটেছে ?

উঃ ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ ঘটেছে।

প্রশ্ন : সমাক্ষর লোপ কি ? একটি উদাহরণ দাও।

উঃ একটি শব্দে যদি একই রকমের দুটি ধ্বনি বা সমধ্বনিযুক্ত অক্ষর থাকে তবে দ্রুত উচ্চারণের সময় একটি ধ্বনি বা অক্ষর লোপ পেলে তাকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন — বড়দাদা > বড়দা।

প্রশ্ন : কদলক > কলা ; নখহরণিকা > নরুণ — কোন্ ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে ?

উঃ সংকোচনের ফলে এই ধরণের ধ্বনিপরিবর্তন ঘটেছে।

প্রশ্ন : পূজা > পুজো ; বিলাত > বিলেত — কোন ধরণের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ ?

উঃ এগুলি প্রগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ ।

প্রশ্ন : দুটি পরাগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ দাও।

উঃ চাকরি > চাকুরি ; দেশী > দিশি।

প্রশ্ন : বিলাতি > বিলিতি — কোন ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন ?

উঃ মধ্যগত স্বরসঙ্গতি।

প্রশ্ন ঃ মজা > মুজো ; মধু > মেধো — কোন নিয়মে শব্দের এমন পরিবর্তন ঘটেছে ?

উঃ এক্ষেত্রে শব্দ মধ্যস্থ একাধিক স্বরধ্বনি পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে অন্যান্য স্বরসঙ্গতি ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ সন্ধির নিয়মে বাংলায় কোন্ ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে।

উঃ বাংলা শব্দে অপিনিহিতির কারণে যে 'ই' বা 'উ' ধ্বনি আগে উচ্চারিত হয় তার ফলে দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি এসে যায় এবং তাদের সন্ধির ফলে অভিশ্রুতি জনিত ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন ঃ কোন্ ভাষাতত্ত্ববিদ বাংলায় প্রকৃত অভিশ্রুতি আছে কিনা এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ?

উঃ ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার।

প্রশ্ন ঃ চক্র > চক্কর — কোন্ ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন ?

উঃ প্রগত সমীভবন।

প্রশ্ন ঃ পরাগত সমীভবনের দুটি উদাহরণ দাও ?

উঃ মোহৎসব > মচ্ছব : উৎশ্বাস > উচ্ছ্বাস।

প্রশ্ন ঃ চন্দননগর > চন্দরনগর — কোন ধরণের ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে এমনটি হয়েছে ?

উঃ বিষমীভবনের ফলে এই ধ্বনিপরিবর্তন হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ডাকঘর > ডাগঘর — কেন হয়েছে ?

উঃ ঘোষীভবনের ফলে এমনটি হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ দুটি অঘোষীভবনের উদাহরণ দাও ?

উঃ অবসর > অপসর ; গুলাব > গোলাপ।

প্রশ্ন ঃ স্তম্ভ > থাম — কেন হয়েছে ?

উঃ মহাপ্রাণীভবণ অর্থাৎ শব্দের অল্প প্রাণ 'ত' মহাপ্রাণ 'থ' পরিণত হওয়ায় এমনটি ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ মহার্ঘ > মাগ্‌গি — কোন্ ধরণের ধ্বনিপরিবর্তন ?

উঃ অল্পপ্রাণীভবন।

প্রশ্ন ঃ দুটি মূর্ধন্যীভবনের উদাহরণ দাও ?

উঃ মৃত্তিকা > মাটি, বিকৃত > বিকট।

প্রশ্ন ঃ পতঙ্গ > ফড়িং — কোন্ প্রকার ধ্বনিপরিবর্তন ?

উঃ স্বতোমূর্ধন্যীভবন।

প্রশ্ন ঃ নাসিক্যীভবন কেন ঘটে ?

উঃ শব্দ মধ্যস্থিত 'ঙ', 'ঞ', 'ণ', 'ন', 'ম', 'ং' এই নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলি ক্ষীণ হয়ে

পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক স্বরে পরিণত করলে নাসিক্যীভবন ঘটে।
যেমন — চন্দ্র > চাঁদ।

প্রশ্ন ঃ বাংলায় স্বতোনাসিক্যীভবন কোন্ ভাষার প্রভাব বলে মনে হয় ?

উঃ অনেকে মনে করেন এটি অনার্য ভাষার প্রভাবে ঘটেছে। এই প্রকার ধ্বনিপরিবর্তনের উদাহরণ — অস্থি > আঁটি, হাতি > হাঁতি।

প্রশ্ন ঃ বিনাসিক্যীভবন কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও।

উঃ শব্দের অন্তর্গত নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ পাবার পরও যখন পূর্ববর্তী স্বর অনুনাসিক হয় না তখন তাকে বিনাসিক্যীভবন বলে। যেমন — লম্ফ > লাফ; মঞ্চ > মাচা।

প্রশ্ন ঃ অন্ধকার > আঁধার — কোন্ ধরণের ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে এমনটি ঘটেছে?

উঃ শব্দস্থিত পাশাপাশি ধ্বনির একে অপরের সঙ্গে লীন হয়ে সংকোচনের ফলে এমনটি ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ কণ্ঠনালীয়ভবন কি ? এর অন্য নাম কি ?

উঃ ধ্বনি উচ্চারণকালে কণ্ঠনালীর পেশী ও মুখগহ্বর যদি একই সঙ্গে সংকুচিত ও রুদ্ধ হয় তাহলে অন্তঃস্ফোটক ধ্বনির সৃষ্টি হয় একে কণ্ঠনালীয়ভবন এবং ভিন্ননামে অবরুদ্ধ ধ্বনি বলে। যেমন — ভাত > বা'ত।

প্রশ্ন ঃ অপশ্রুতি কাকে বলে ?

উঃ শব্দের অর্ন্তভুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো অক্ষুণ্ণ রেখে যদি স্বরধ্বনির একটি আনুক্রমিক পরিবর্তন ঘটে তবে তাকে অপশ্রুতি বলে। গুণ ও বৃদ্ধির ফলে এই প্রক্রিয়াটি ঘটে। যেমন — √যজ্ > যজ্ঞ (গুণ), √যজ্ > যাগ্ (বৃদ্ধি)।

প্রশ্ন ঃ পিশাচ > পিচাশ ; মুকুট > মুটুক ; রিক্সা > রিস্কা — কোন্ ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন ?

উঃ এটি ধ্বনির বিপর্যাস বা স্থানান্তর জনিত ধ্বনি পরিবর্তন।

প্রশ্ন ঃ স্পুনারিজম্ বা দুরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস বলতে কি বোঝ ?

উঃ উচ্চারণ শিথিলতার ফলে একই বাক্যের অন্তর্গত দুটি পদের অন্তর্গত ধ্বনির বিনিময়কে স্পুনারিজম বা দুরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস বলে।
যেমন — এক কাপ চা > এক চাপ কা।

প্রশ্ন ঃ অর্থ প্রভাব কারণ জনিত একটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ দাও।

উঃ টাকার কুবের > টাকার কুমীর (সাদৃশ্যের ফলে এই ধরণের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথ 'রোদসী' শব্দের সাদৃশ্যে 'ক্রন্দসী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন — এটি কোন্ ধরণের ধ্বনিপরিবর্তন ?

উঃ রবীন্দ্রনাথ 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থ করেছেন 'অন্তরীক্ষ'। অথচ বৈদিক সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ ছিল 'গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সৈন্য।' এক্ষেত্রে অর্থের সাদৃশ্যেই ধ্বনিপরিবর্তন ঘটেছে। তাই এটি সাদৃশ্য বা অ্যানালজি ধ্বনি পরিবর্তন।

প্রশ্ন ঃ 'তড়িৎ' শব্দের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ 'ঝটিৎ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। কোন্ ধরণের ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে এমনটি ঘটেছে।

উঃ দ্বিমিশ্রণের ফলে এই ধরণের ধ্বনিপরিবর্তন ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ জোড়কলম শব্দ কি ভাবে তৈরি হয় ? দুটি জোড়কলম শব্দের উদাহরণ দাও।

উঃ দুটি শব্দের অংশবিশেষ কেটে জোড়া দিয়েই জোড়কলম শব্দ তৈরি করা হয়। উদাহরণ – মিন্নৎ (আরবি) + বিজ্ঞপ্তি (সংস্কৃত) = মিনতি, জেদী + তেজালো > জেদালো।

প্রশ্ন ঃ লোকনিরুক্তি কাকে বলে ? দুটি উদাহরণ দাও ?

উঃ অপরিচিত এবং জটিল উচ্চারণের কোন শব্দ অল্পবিস্তর ধ্বনিসাম্যের ফলে যদি পরিচিত কোন শব্দে পরিণত হয় তবে তাকে লোকনিরুক্তি বলে।

যেমন – বিস্ফোটক > বিষফোঁড়া, পাসপোর্ট > বাঁশফোঁড়। অ্যাডভ্যাটাইজ্ > ইটভাঁটা।

প্রশ্ন ঃ বিভাজ্যধ্বনি কাকে বলে উদাহরণ দাও ?

উঃ ভাষার ব্যবহৃত যে ধ্বনিগুলিকে স্বতন্ত্র প্রতীকরূপে দেখানো যায় তাদের রূপান্তর ও বৈচিত্রকে তুলে ধরা যায় সেগুলিকেই বলা হয় বিভাজ্য ধ্বনি। যেমন – স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি যেগুলি প্রতীক সমস্ত প্রকার রূপে চিহ্নিত।

প্রশ্ন ঃ অবিভাজ্য ধ্বনি কাকে বলে ?

উঃ বিশ্লেষণযোগ্য নয় অথচ ধ্বনির উচ্চারণে ও অর্থবোধে বিশেষভূমিকা পালন করে এরকম স্বনিমকে বা ধ্বনিকে অবিভাজ্যধ্বনি বলে। মাত্রা, প্রস্বর, সুর, ঝোঁক ইত্যাদি হল অবিভাজ্য ধ্বনির উদাহরণ।

প্রশ্ন ঃ উৎসগত বিচারে বাংলাভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ও কি কি ?

উঃ উৎসগত বিচারে বাংলাভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। – ১. মৌলিক বা নিজস্ব ২. আগন্তুক বা কৃতঋণ ৩. নবগঠিত।

প্রশ্ন ঃ শব্দভাণ্ডারে মৌলিক শব্দ কাকে বলে ?

উঃ যে সব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বৈদিক ও সংস্কৃত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে মৌলিক শব্দ বলে।

প্রশ্ন ঃ মৌলিক শব্দকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ?

উঃ মৌলিক বা নিজস্ব শব্দগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় – ১. তৎসম শব্দ ২. অর্ধতৎসম শব্দ ৩. তদ্ভব শব্দ।

প্রশ্ন ঃ এমন একটি শব্দের উদাহরণ দাও যার অর্ধতৎসম ও তদ্ভব দুটি রূপই বাংলায় বর্তমান।

উঃ **কৃষ্ণ > কেষ্ট (অর্ধতৎসম), কৃষ্ণ > কানু (তদ্ভব)।**

প্রশ্ন ঃ তৎসম শব্দগুলিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ?

উঃ তৎসম শব্দগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় –

১. সিদ্ধ তৎসম ঃ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

২. অসিদ্ধ তৎসম ঃ ব্যাকরণ সিদ্ধ নয় কেবল মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল। যেমন – ঘর, কৃষাণ।

প্রশ্ন ঃ দুটি অনুদিত শব্দের উদাহরণ দাও।

উঃ

বাংলা	ইংরাজি
বাতিঘর	Light-house
সুবর্ণসুযোগ	Golden - oppartunity

প্রশ্ন ঃ বাংলায় দুটি পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দাও।

উঃ Commission – আয়োগ। Police – আরক্ষণ

প্রশ্ন ঃ তৎসম শব্দ অথচ তৎসম বলে মনে হয় না এরকম দুটি শব্দের উদাহরণ দাও।

উঃ ঘাস, পাগল ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ শব্দার্থ পরিবর্তনের দুটি কারণ কি কি ?

উঃ শব্দার্থ পরিবর্তনের প্রধান দুটি কারণ হল – (১) পরিবেশগত কারণ (২) মানসিক কারণ।

প্রশ্ন ঃ 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' এটি কোন্ ধরণের শব্দার্থ পরিবর্তন ?

উঃ এটি সুভাষণ রীতির উদাহরণ। কারণ নিন্দিত বা অকল্যাণসূচক শব্দকে বর্জন করে তার জায়গায় কল্যাণবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ শব্দার্থ পরিবর্তনের কয়টি ধারা ও কি কি ?

উঃ শব্দার্থ পরিবর্তনের তিনটি ধারা সেগুলি হল— ১. অর্থের প্রসার বা বিস্তার ২. অর্থের সংকোচ ৩. অর্থ সংক্রম বা সংশ্লেষ।

প্রশ্ন ঃ অর্থের প্রসার বা বিস্তার কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও।

উঃ একসময় শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হত পরে শব্দটির অর্থের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

যেমন – 'গাঙ' শব্দের অর্থ ছিল একটি বিশেষ নদী কিন্তু বর্তমানে গাঙ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন – গাঙশালিক, গাঙচিল।

প্রশ্ন ঃ অর্থ পরিবর্তনের দুটি স্থূল কারণ কি কি ?

উঃ ১. ভৌগোলিক কারণ। ২. ঐতিহাসিক কারণ।

প্রশ্ন ঃ অর্থ পরিবর্তনের দুটি সূক্ষ্ম কারণ কি কি ?

উঃ ১. সাদৃশ্য ২. মানসিক বিশ্বাস।

প্রশ্ন ঃ 'কালি' শব্দের আদি অর্থ কি ছিল ? বর্তমান অর্থ কি হয়েছে ?

উঃ আদি অর্থ — কালো রঙের তরল পদার্থ। বর্তমান অর্থ — যে কোন রঙের তরল পদার্থ।

প্রশ্ন ঃ কোন্ ধরণের অর্থ পরিবর্তনের ফলে 'সন্দেশ' শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে মিষ্টান্ন ?

উঃ অর্থ-সংক্রমের ফলে এমনটি ঘটেছে। 'সন্দেশ' শব্দের আদি অর্থ ছিল — মিষ্টান্ন সহ খবর। কিন্তু বর্তমান অর্থ কেবলমাত্র 'খবর' অর্থাৎ অর্থসংক্রম ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ সুভাষণ রীতি কি ?

উঃ অকল্যাণকর বা কুৎসিত শব্দকে বর্জন করে তার জায়গায় কল্যাণ বাচক শব্দ বা শিষ্টশব্দ প্রয়োগ করাকে সুভাষণ রীতি বলে। যেমন — ঘরে চাল না থাকলে বলা হয় — চাল বাড়ন্ত।

প্রশ্ন ঃ অর্থ অবনতির একটি উদাহরণ দাও।

উঃ অর্থ অবনতিব একটি উদাহরণ হল 'মহাজন' শব্দটি। পূর্বে 'মহাজন' শব্দের অর্থ ছিল 'মহৎ ব্যক্তি'। কিন্তু বর্তমানে শব্দটির অর্থ হযেছে 'সুদ্খোব ব্যক্তি'। অর্থাৎ অর্থের অবনতি ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ বিমুখ ধ্বনি পরিবর্তন কি ?

উঃ একই শব্দ যদি ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে একাধিক রূপ লাভ করে অর্থাৎ একটি শব্দ থেকে একাধিক শব্দের জন্ম হয় তবে সেই ধরণের ধ্বনি পরিবর্তনকে দ্বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন বলে। যেমন — ভণ্ড < ভান, ভাঁড়

প্রশ্ন ঃ সম্মুখ ধ্বনিপরিবর্তন কাকে বলে ?

উঃ যদি একাধিক শব্দ পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারণ ও বানানে একই রূপ লাভ করে তবে এই ধরণের ধ্বনি পরিবর্তনকে সম্মুখ ধ্বনিপরিবর্তন বলে। যেমন — শ্রবণ > শোনা, সুবর্ণ > সোনা।

প্রশ্ন ঃ বাংলায় কোন্ কোন্ স্বরধ্বনির অপিনিহিতি ঘটেছে ?

উঃ সাধারণত বাংলায় 'ই' এবং 'উ' স্বরধ্বনির অপিনিহিতি ঘটে।

প্রশ্ন ঃ বাংলা চলিত ভাষা কোন্ উপভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ?

উঃ বাংলা চলিত ভাষা রাঢ়ি উপভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ঃ 'সন্দেশ' শব্দের বর্তমান অর্থ 'মিষ্টান্ন' বিশেষ — শব্দার্থতত্ত্বের কোন্ নিয়মে ঘটেছে ?

উঃ শব্দার্থের সংকোচন নিয়মে ঘটেছে।

প্রশ্ন ঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ উপভাষাকে কি বলা হয় ?

উঃ নিভাষা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ পদান্তরে একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী 'অ' কারের লোপ, কোন্ বাংলার লক্ষণ ?

উঃ আধুনিক বাংলার লক্ষণ।

প্রশ্ন : আদি-মধ্য বাংলার প্রামাণিক নিদর্শন গ্রন্থ কোন্‌টি ?

উঃ আদি-মধ্য বাংলার প্রামাণিক নিদর্শন গ্রন্থ হল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

প্রশ্ন : 'পড়শী' শব্দের সংস্কৃত রূপ লেখ।

উঃ 'পড়শী' শব্দের সংস্কৃত রূপ 'প্রতিবেশী'।

প্রশ্ন : 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' — 'টাপুর টুপুর' কি জাতীয় শব্দ?

উঃ 'টাপুর টুপুর' অনুকার ধন্যাত্মক শব্দ।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষা কোন্‌ প্রাকৃত থেকে এসেছে ?

উঃ বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত থেকে এসেছে।

প্রশ্ন : ল. সা. গু. কি জাতীয় শব্দ ?

উঃ ল. সা. গু. মুণ্ডমাল জাতীয় শব্দ।

প্রশ্ন : মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার কালসীমা কত ?

উঃ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার কালসীমা আনুমানিক খ্রিঃ পূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন : 'ক্রন্দসী' শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে ?

উঃ বৈদিকে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থ ছিল 'গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সৈন্য'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'রোদসী' শব্দের সাদৃশ্যে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থ করেছেন 'অন্তরীক্ষ'।

প্রশ্ন : উপভাষা কাকে বলে ?

উঃ উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ বিশেষ রূপ যা এক একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত। যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য থাকে। এককথায় কোন ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোট ছোট দলে বা অঞ্চলে ভাষার যে বিশেষ ছাঁদ প্রচলিত থাকে তাকে উপভাষা বলে।

প্রশ্ন : বাংলার প্রধান উপভাষা (উপভাষাগুচ্ছ) পাঁচটি নাম লেখ।

উঃ ১. রাঢ়ি ২. ঝাড়খণ্ডি ৩. বরেন্দ্রি ৪. কামরূপি ৫. বঙ্গালি।

প্রশ্ন : যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার করে একটি বাক্য লেখ।

উঃ শিক্ষক ছাত্রটিকে <u>মারতে লাগলো</u>।

প্রশ্ন : আধুনিক বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির সংখ্যা ক'টি ?

উঃ আধুনিক বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বর সাতটি (অ, আ, ই, উ, এ, ও, এ্যা)। যৌগিক স্বর দুটি (ঐ, ঔ) এছাড়া সুনীতিকুমার এর মতে আরো ২৫ টি যৌগিক স্বর আছে। আব্দুল হাই বলেছেন ৩১ টি যৌগিক স্বর।

প্রশ্ন : বিপর্যাস বা বিপর্যয়ের একটি উদাহরণ দাও।

উঃ বিপর্যাস বা বিপর্যয়ের একটি উদাহরণ মুকুট > মুটুক।

প্রশ্ন ঃ 'কাক' শব্দ উচ্চারণে অনেক সময় 'কাগ' এ পরিণত হয়। উচ্চারণে কি ঘটনা ঘটার ফলে এই পরিণতি হয় ?

উঃ 'কাক' শব্দের দ্বিতীয় 'ক' অঘোষ বর্ণ এই 'ক' বর্ণটি 'গ' উচ্চারিত হচ্ছে অর্থাৎ অঘোষবর্ণ উচ্চারণে ঘোষবর্ণ হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটিকে ভাষাবিজ্ঞানে ঘোষীভবন বলে।

প্রশ্ন ঃ 'আলমারি' শব্দটি কোন্ ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে বাংলায় এসেছে ?

উঃ আলমারি শব্দটি পর্তুগিজ ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে এসেছে।

প্রশ্ন ঃ 'সিন্দুক' শব্দটি সংস্কৃত, নাকি ফারসি নাকি আরবি শব্দ ?

উঃ সিন্দুক শব্দটি ফারসি ।

প্রশ্ন ঃ আদি-মধ্য বাংলা ভাষার স্থিতিকাল আনুমানিক কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে কত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয় ?

উঃ ডঃ রামেশ্বর'শ এর মতেআদি-মধ্য বাংলা ভাষার স্থিতিকাল ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়।

প্রশ্ন ঃ 'বিদ্যা' শব্দ মুখের ভাষায় 'বিদ্যে' হয়ে যায় কেন ?

উঃ স্বরসঙ্গতির প্রভাবে 'বিদ্যা' শব্দ মুখের ভাষায় 'বিদ্যে' হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ প্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন কোন রচনায় পাওয়া যায় ? সেই রচনাটি কত খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় ?

উঃ প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'চর্যাগীতি' পুথিতে। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের অভিলেখালয় বা পুথিশালা থেকে চর্যাগীতিগুলি (সাড়ে ৪৬ টি) আবিষ্কার করেন।

প্রশ্ন ঃ 'কুমড়ো' শব্দটির উৎসমূল নির্দেশ কর।

উঃ 'কুমড়ো' শব্দটি সংস্কৃত 'কুষ্মাণ্ডক' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। সং কুষ্মাণ্ডক > প্রা কুম্হণ্ডঅ (ষ্ম > মষ্ বিপর্যাস ; ষ্ম > মহ্ (হ -কারীভবন স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন -লোপ) > অপ কুমহণ্ডঅ > বা কুমড়া (মহাপ্রাণতার লোপ, বিনাসিক্যীভবন, অন্ত্যস্বরের পূর্বস্বরের সঙ্গে সন্ধি)।

পদ প্রকরণ

প্রশ্ন ঃ পদ কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ শব্দ বা ধাতুকে বিভক্তি যোগে বাক্যে ব্যবহার যোগ্য করলে তাকে পদ বলে।

পদ দু প্রকার –

১. নামপদ অর্থাৎ শব্দ জাত

২. ক্রিয়াপদ অর্থাৎ ধাতু জাত

প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রয়োগের দিক থেকে পদ পাঁচ প্রকার –

১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. অব্যয় ৫. ক্রিয়া ।

প্রশ্ন ঃ নামের প্রকৃতি অনুযায়ী বিশেষ্যপদ কয় প্রকার ও কী কী ?

উঃ নামের প্রকৃতি অনুযায়ী বিশেষ্যপদ ছয় প্রকার — ১. সংজ্ঞাবাচক ২. গুণবাচক ৩. বস্তুবাচক ৪. জাতিবাচক ৫. সমষ্টিবাচক ৬. ক্রিয়াবাচক ।

প্রশ্ন ঃ অব্যয় পদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়। কি কি ?

উঃ অব্যয়পদ তিন প্রকার — ১. পদান্বয়ী ২. বাক্যান্বয়ী বা সমুচ্চয়ী ৩. অনন্বয়ী ।

প্রশ্ন ঃ 'মনুষ্য বুদ্ধিমান ও ধার্মিক হইতে পারে — তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ **বিজ্ঞতা** ছিল।' — **স্থুলাক্ষর পদগুলি কোন্ পদ ? এদের পদ পরিবর্তন কর।**

উঃ মনুষ্য, বুদ্ধিমান ও ধার্মিক এই তিনটি হল বিশেষণ পদ। বিজ্ঞতা হল বিশেষ্য পদ। মনুষ্য — মানুষ, বুদ্ধিমান — বুদ্ধি, ধার্মিক — ধর্ম, বিজ্ঞতা — বিজ্ঞ।

প্রশ্ন ঃ 'এই সময়ে সেই বালক, কই কি খেলনা দিবে দাও বলিয়া, **হস্ত প্রসারণ** করিল।'- -**স্থুলাক্ষর পদ দুটি পরিবর্তন করে বাক্যটি পুনরায় লিখ।**

উঃ 'এই সময়ে সেই বালক, কই কি খেলনা দিবে দাও বলিয়া হাত প্রসারিত করিল।

প্রশ্ন ঃ নিবেদিল রাজভৃত্য, 'মহারাজ, বহু **অনুনয়ে**
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার **সোনার** দেবালয়ে
না লয়ে **আশ্রয়** আজি পথ**প্রান্তে** তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসংকীর্তন। — **স্থুলাক্ষর পদগুলি পরিবর্তন করে লেখ।**

উঃ অনুনয় — অনুনীত, সোনা — সোনালী, আশ্রয় — আশ্রিত, প্রান্ত — প্রান্তিক।

প্রশ্ন ঃ ধানের ক্ষেতের সবুজে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে। — উদ্ধৃতাংশে 'সোহাগ' শব্দটি কোন পদ ? পদটি পরিবর্তন কর।

উঃ উদ্ধৃতাংশে 'সোহাগ' শব্দটি বিশেষ্য পদ। সোহাগ — সোহাগী।

প্রশ্ন ঃ 'এ **নির্ভর**ও বিশেষ **জোরালো** নয়, পদ্মার **মাছ** ধরিবার মত উপযুক্ত জাল তার নাই।' — **স্থুলাক্ষর শব্দগুলির পদপরিচয় দাও। পদগুলি পরিবর্তন করলে কি হবে ?**

উঃ নির্ভর ও জোরালো শব্দদুটি বিশেষণ। মাছ শব্দটি বিশেষ্য। নির্ভর — নির্ভরতা, জোরালো — জোর, মাছ — মেছো।

প্রশ্ন ঃ 'আমার হাতে আমার মেবার—রাণা প্রতাপের মেবারের আজ পতন হল।' — 'পতন' কোন্ পদ ? পদটি পরিবর্তন করলে কি হবে ?

উঃ 'পতন' বিশেষ্য পদ। পতন — পতিত।

প্রশ্ন ঃ 'চিরদিন **পিপাসিত** করিয়া **প্রয়াস**।' — **স্থুলাক্ষর শব্দদুটি কোন্ পদ এবং পদপরিবর্তন কর।**

উঃ **'পিপাসিত' বিশেষণ পদ এবং 'প্রয়াস' বিশেষ্য পদ। পিপাসিত — পিপাসা, প্রয়াস**

— প্রয়াসী।

প্রশ্ন ঃ দম্ভী, আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে। — 'দম্ভী' শব্দটি কোন্ পদ ? পদ পরিবর্তন কর।

উঃ 'দম্ভী' শব্দটি বিশেষণ পদ। দম্ভী — দম্ভ।

প্রশ্ন ঃ অথচ, বুদ্ধির এই **কৃশতা নির্জীবতা** যে আমাদের প্রকৃতিগত নয় তার বর্তমান প্রমাণঃ জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়, ব্রজেন্দ্র শীল। — **স্থূলাক্ষর শব্দ দুটি কোন্ পদ? শব্দদুটির পদ পরিবর্তন কর।**

উঃ কৃশতা ও নির্জীবতা বিশেষণ পদ। কৃশতা — কৃশ, নির্জীবতা — নির্জীব।

কারক ও বিভক্তি

প্রশ্ন ঃ কারক কাকে বলে ? কারক কয়প্রকার ?

উঃ বাক্যের অন্তর্গত সমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে ঐ বাক্যের বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। তাই বলা হয়েছে 'ক্রিয়ান্বয়ী কারকম্'। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র ধরে বাংলা কারক ছয় প্রকার —

১. কর্তৃকারক ২. কর্মকারক ৩. করণকারক ৪ অধিকবণ ৫. অপাদান ৬. সম্প্রদান বা নিমিত্ত কারক ।

আধুনিক মতে বাংলা কারকের বিভাগ —

বাংলা কারক

বিভক্তি প্রধান | **অনুসর্গ প্রধান** | **শব্দবিন্যাস প্রধান**

প্রশ্ন ঃ সম্প্রদান কারককে কি বাংলা কারক বলা যাবে ?

উঃ প্রচলিত ব্যাকরণে 'সম্প্রদান কারক' বাংলায় ব্যাখ্যার কোন অর্থ হয় না। একথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনেক আগেই জানিয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — "বাংলাতে সম্প্রদান কারককে কর্মকারকের অন্তর্গত করলে ক্ষতি নেই"। রবীন্দ্রনাথের মতে "সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদান কারক বলিয়া একটি স্বতন্ত্র কারক আছে। বিভক্তিটিই তার প্রমাণ, বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তা সম্পূর্ণ লুপ্ত।"

প্রশ্ন ঃ কারক ও বিভক্তির সম্পর্ক কি ?

উঃ সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক-বিভক্তির সম্পর্ক সুদৃঢ়। প্রতিটি কারক বা পদের জন্যে বিশেষ বিশেষ বিভক্তি নির্দিষ্ট। যেমন — কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া ইত্যাদি। কিন্তু বাংলায় বিভক্তির সংখ্যা মাত্র চারিটি —এ, -কে, -তে, -র বিভক্তি। তাই

বিভক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে কারকের সংখ্যা কম হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ কারকের সঙ্গে অনুসর্গের সম্পর্ক কি ?

উঃ প্রাকৃত স্তর থেকে কারকের সঙ্গে অনুসর্গের সম্পর্ক গঠিত হয়। অর্থকে স্পষ্ট করার জন্যেই কারক বাচক অনুসর্গগুলির ব্যবহার ঘটেছিল। অর্থবোধের দিক থেকে অনুসর্গগুলি কারক-বাচক হিসাবে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ঃ অনুসর্গ কাকে বলে ? কয়প্রকার ও কি কি ?

উঃ কোন পদের অব্যবহিত পরে অপর কোন পদ বসে পূর্বপদের কারক অর্থ সুনির্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট করলে দ্বিতীয় পদটিকে অনুসর্গ বলে।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে অনুসর্গের দুটি ভাগ –

১. নাম অনুসর্গ – এগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ পদ। তিনটি ভাগ – তদ্ভব, তৎসম, বিদেশি।

২. ক্রিয়া অনুসর্গ –ক্রিয়াজাত পদ । তদ্ভব অসমাপিকা।

প্রশ্ন ঃ বিভক্তি কাকে বলে ? বিভক্তি কয়প্রকার ও কি কি ?

উঃ যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি নাম শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে, যার দ্বারা সংখ্যা ও কারকের বোধ জন্মায় তাকে বলা হয় বিভক্তি। বিভক্তি দুই প্রকার – শব্দবিভক্তি এবং ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তি।

প্রশ্ন ঃ কারক বিভক্তি প্রসঙ্গে শূন্য বিভক্তি এসেছে কেন ?

উঃ বিভক্তিহীন শব্দ বাক্যে স্থান পায় না। কারণ বিভক্তি না থাকলে বাক্যে অবস্থিত পদের সঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় অধিকাংশ কারকেই বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। তা সত্ত্বেও অর্থ প্রকাশ পায় বলে নিয়মরক্ষার জন্যে একে শূন্যবিভক্তি বলে। যেমন – 'মধু ভাত খায়' – 'মধু' নামক কর্তৃকারকে কোন বিভক্তি নেই তাই শূন্যবিভক্তি হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ প্রযোজক ও প্রযোজ্য কর্তা কাকে বলে ?

উঃ **প্রযোজক কর্তা** – বাক্যে ব্যবহৃত যে কর্তা নিজে কাজ না করে অপরকে নিয়ে কাজ করিয়ে নেয় তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন – 'মা শিশুকে চাঁদ দেখান' – এখানে মায়ের দ্বারাই শিশু চাঁদ দেখার কাজটি করছে। সুতরাং 'মা' হলেন প্রযোজক কর্তা।

প্রযোজ্য কর্তা – প্রযোজক কর্তা যাকে দিয়ে কাজটি করাচ্ছেন তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন – স্কুল সার্ভিস কমিশন অধ্যাপক দিয়ে খাতা দেখায়। এখানে অধ্যাপক হচ্ছেন প্রযোজ্য কর্তা।

প্রশ্ন ঃ অনুক্ত কর্তা কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও।

উঃ কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে কর্তা প্রধানরূপে স্পষ্ট বা উক্ত নন। তাই একে অনুক্ত কর্তা বলা হয়। দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি যোগে এই কর্তার সৃষ্টি হয়। যেমন – নাথুরাম

গডসে কর্তৃক মহাত্মা গান্ধী নিহত হন। এখানে 'নাথুরাম গডসে' অনুক্ত কর্তা।

প্রশ্ন ঃ উদাহরণ সহযোগে মুখ্যকর্ম এবং গৌণকর্মের পার্থক্য লেখ।

উঃ দ্বিকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাক্যে দ্বিকর্মক থাকলে দুটি কর্মের যেটি বস্তুবাচক তাকে মুখ্যকর্ম বলে এবং যেটি ব্যক্তিবাচক তাকে গৌণকর্ম বলে। মুখ্যকর্ম বিভক্তির চিহ্ন লোপ পায় কিন্তু গৌণকর্মে বিভক্তির চিহ্ন থাকে। যেমন — মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে আধুনিক অস্ত্র দিলেন — 'পুলিশকে' হচ্ছে গৌণ কর্ম এবং 'আধুনিক অস্ত্র' মুখ্যকর্ম।

প্রশ্ন ঃ সমধাতুজ কর্ম কিভাবে গড়ে তা ব্যাখ্যা কর।

উঃ কর্ম ও ক্রিয়া একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে। যেমন — শচীন তেণ্ডুলকর কি খেলা না খেলল। — বাক্যটিতে কর্ম 'খেলা' এবং ক্রিয়াপদ 'খেলল' উভয়ই 'খেল' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই 'খেলা' এখানে সমধাতুজ কর্ম।

প্রশ্ন ঃ উদাহরণ সহযোগে কালাধিকরণ বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

উঃ যে সময় বা কালে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় তাকে কালাধিকরণ বলে।

এর দুটি ভাগ — ক্ষণমূলক এবং ব্যাপ্তিমূলক।

ক্ষণমূলক — সময়ের মান বোঝায়, যেমন — 'সকালে ঘুম থেকে ওঠে।

ব্যাপ্তিমূলক — সময়ের ব্যাপ্তিবোঝায়, যেমন — 'বসন্তকালে কোকিল ডাকে।

প্রত্যয়

প্রশ্ন ঃ প্রত্যয় কাকে বলে ? উদাহরণ দাও। কয়প্রকার ও কি কি ?

উঃ শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করলে নতুন শব্দ বা ধাতুর সৃষ্টি হয় সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে।

যেমন, গা (ধাতু) + ইয়ে (প্রত্যয়) > গাইয়ে (নতুন শব্দ)।

প্রত্যয় দুই প্রকার — ধাতু-প্রত্যয় (কৃৎ) ও শব্দ-প্রত্যয় (তদ্ধিত)

কৃৎ-প্রত্যয় ঃ যে প্রত্যয় ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তা কৃৎ প্রত্যয়। অক্, আলু, শানচ্, শতৃ ইত্যাদি। চল্ + শতৃ (অৎ) = চলৎ, বস্ + অত = বসত ইত্যাদি।

কৃৎ-প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দকে কৃদন্ত শব্দ বলে। এখানে চলৎ, বসত কৃদন্ত শব্দ। এগুলিতে শতৃ (অৎ) ও অত-কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

তদ্ধিত প্রত্যয় ঃ শব্দ বা নাম প্রকৃতির উত্তরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন প্রাতিপদিক (শব্দ) গঠিত হয়, তাকে (প্রত্যয়) তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন — ষ্ণি, ষ্ণিক, আই, আলি ইত্যাদি তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন — ষ্ণি (ই) — রাবণ + ষ্ণি (ই) = রাবণি। তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। এখানে, রাবণি, শাঁখারি, ঠাকুরালি তদ্ধিতান্ত শব্দ।

প্রশ্ন ঃ ধাতু প্রত্যয় (কৃৎ) ও শব্দ-প্রত্যয় (তদ্ধিত) -এর পার্থক্য লেখ ।

উঃ কৃৎ ও তদ্ধিত উভয়ই নতুন নতুন শব্দ গঠনকারী প্রত্যয়। তবে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয় ধাতুর উত্তর, আর তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয় শব্দের উত্তর। সাধারণত ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় মাত্র একবার যুক্ত হয়। কিন্তু শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় কখনও কখনও একাধিকবার যুক্ত হতে পারে। যেমন – দৃশ্ + ক্ত = দৃষ্ট (কৃৎ প্রত্যয়)। কিন্তু বস্তু + ষ্ণ = বাস্তব (তদ্ধিত প্রত্যয়)। এই শব্দের পর প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাস্তবতা হতে পারে। তা ছাড়া স্ত্রী প্রত্যয়গুলি সাধারণত কৃৎ প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তদ্ধিত প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন – জনক + ষ্ণ + ঈ = জানকী।

প্রশ্ন ঃ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে ? কয়েকটি সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও ।

উঃ সংস্কৃত ধাতুর উত্তর যে সকল সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় বলে।

শতৃ, শানচ্, অনট্, অন, ণক, অক, তব্য, অনীয়, তৃচ্, তৃ, ইষ্ণু, ক্তি, তি, ক্ত, ত, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্, আলু প্রভৃতি।

চল্ + শতৃ = চলৎ	জাগৃ + শতৃ = জাগ্রত	বৃধ্ + শানচ্ = বর্ধমান
বিদ্ + শানচ্ = বিদ্যমান	নী + অনট্ = নয়ন	ভূ + অনট্ = ভবন
দৃশ + ণক্ = দর্শক	নী + ণক্ = নায়ক	গম্ + তব্য = গন্তব্য

ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ বাংলা কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে ? কয়েকটি বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় উদাহরণ দাও ।

উঃ বাংলায় ধাতুর উত্তর যে সকল সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের বাংলা কৃৎ প্রত্যয় বলে।

অ, অত, অতি, আ (-ওয়া), আও, আই, ইয়া (ইয়ে), উক, আরি, উরি, উনি, তি প্রভৃতি।

চল + অ = চল	নাচ + অ = নাচ	বস্ + অত = বসত
চল + আ = চলা	উঠ্ + আ = ওঠা	ঘির্ + আও = ঘেরাও
ঢাল্ + আও = ঢালাও	যাচ্ + আই = যাচাই	লড়্ + আই = লড়াই

প্রশ্ন ঃ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় কাকে বলে ? কয়েকটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও ।

উঃ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

ষ্ণ, অ, ষ্ণি, ই ষ্ণিক, ষ্ণায়ন, আয়ন, ষ্ণেয়, ষ্ণীয়, ঈয়, ইত (ইতচ্), ইন, ইমন,

ইল, ল, উন, তন, মতুপ, ময়ট, বিন্, শালিন্, র, তর, তম, ঈয়স্, ইষ্ঠ প্রভৃতি।

মনু + ষ্ণ = মানব শক্তি + ষ্ণ = শাক্ত সুর + ষ্ণি = সৌরি

সুমিত্রা + ষ্ণি = সৌমিত্রি দিতি + ষ্ণ্য = দৈত্য নৌ + ষ্ণিক = নাবিক

পথ + ষ্ণিক = পথিক রস + ষ্ণায়ন = রসায়ন পথ + ষ্ণেয় = পাথেয়

প্রশ্ন ঃ বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় কাকে বলে ? কয়েকটি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও ।

উঃ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ (তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ইত্যাদি) প্রত্যয় যোগে যে শব্দ গঠন করে তাকে বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

আমি, আরি, আরু, ইয়া > এ, টিয়া > টে, উক, পনা, উয়া, পানা, পারা, বন্দ, মন্ত প্রভৃতি।

বাঁদর + আমি = বাঁদরামি কাঁসা + আরি = কাঁসারি

বোমা + আরু = বোমারু পাহাড় + ইয়া = পাহাড়িয়া পাহাড়ে

ভাড়া + টিয়া = ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে পেট + উক = পেটুক ইত্যাদি।

ধাতু

প্রশ্ন ঃ ধাতু কাকে বলে ? ধাতু কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ ক্রিয়ার মূল অবিভাজ্য মৌলিক অংশকে ধাতু বলা হয়।

বাংলা ভাষায় প্রায় দেড় হাজার ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়।

উৎপত্তিব দিক থেকে বাংলা ধাতুগুলি প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত — (১) সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু (২) সাধিত ধাতু এবং (৩) সংযোগমূলক ধাতু। আবার অনেকে উৎপত্তি ও প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করে ধাতুকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা — (১) সিদ্ধ ধাতু বা মৌলিক ধাতু, (২) সাধিত ধাতু, (৩) সংযোগমূলক ধাতু (৪) যৌগিক ধাতু।

প্রশ্ন ঃ বিভক্তি কাকে বলে ? কয় প্রকার ?

উঃ যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করলে শব্দ বা ধাতু পদে পরিণত হয়, তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তির দ্বারা সংখ্যা, কারক বা পুরুষের বোধ জন্মে। বিভক্তি দুই প্রকার-

শব্দবিভক্তি — শব্দের উত্তরে যে সকল চিহ্ন যোগ হয় তাদের শব্দবিভক্তি বলে ।

ক্রিয়াবিভক্তি — ধাতুর উত্তর যে সকল চিহ্ন যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাদের বলে ক্রিয়াবিভক্তি।

প্রশ্ন ঃ সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু কাকে বলে ? কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ যে সমস্ত ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ, যেগুলিকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, সেগুলি মৌলিক ধাতু বা সিদ্ধ ধাতু। যেমন — চল্, নে, খা, কর্, যা ইত্যাদি ।

উৎস বিচারে সিদ্ধ ধাতুকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. **সংস্কৃত বা তৎসম ধাতু** ঃ চল্, ফল্, দা, দুল্, লিখ্ ইত্যাদি।

খ. **তদ্ভব ধাতু** ঃ কর্ (< কৃ), মর্ (< মৃ), গা (< গৈ), পড়্ (< পঠ্), জান্ (< জ্ঞা), কাঁদ্ (ক্রন্দ্) ইত্যাদি।

গ. **অজ্ঞাতমূলক খাঁটি বাংলা ধাতু** ঃ ঘির্, ভাস্, কাট্, ফেল্ ইত্যাদি।

ঘ. **ধ্বন্যাত্মক ধাতু** ঃ ফুঁস্, ধুক্ ইত্যাদি ।

প্রশ্ন ঃ সাধিত ধাতু কাকে বলে ? উদাহরণ দাও। কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ যে ধাতুকে ভাঙা যায় এবং ভাঙলে একাধিক অর্থদ্যোতক অংশ পাওয়া যায়, সেই ধাতুকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন, করা–কর্+ আ = করা, খেলা – খেল্ + আ = খেলা ইত্যাদি।

সাধিত ধাতুকে আবার চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায় – (ক) প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু (খ) নাম ধাতু (গ) ধ্বন্যাত্মক ধাতু (ঘ) কর্মবাচ্যের ধাতু।

প্রশ্ন ঃ প্রযোজক ধাতু কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ প্রেরণ বা প্রবর্তন করা অর্থে মূল বা সিদ্ধ ধাতুর উত্তর 'আ' বা 'ওয়া' যোগে সে সকল ধাতু গঠিত হয়, তাদের প্রযোজক ধাতু বলে। যথা – মৌলিক ধাতু 'দেখ্' + আ (প্রত্যয়) = প্রযোজক ধাতু 'দেখা'। 'কর্' + আ = প্রযোজক ধাতু 'করা', অনুরূপে – হ্ + আ = হওয়া, খা + ওয়া = খাওয়া।

প্রশ্ন ঃ নামধাতু কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয় পদের সঙ্গে সাধারণত 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে নামধাতু বলে। যেমন – ফেন (বিশেষ্য) + আ = ফেনা। ঠেঙ (বিশেষ্য) + আ = ঠেঙা। বেত (বিশেষ্য) + আ = বেতা। কিল (বিশেষ্য) + আ = কিলা। ঘন (বিশেষণ) + আ = ঘনা।

বাক্যে ব্যবহার – ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান। এই বাক্যে 'ফেনাইয়া' নামধাতুজাত।

প্রশ্ন ঃ উদাহরণ সহ প্রযোজক ক্রিয়ার সংজ্ঞা দাও। একে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা যায় কিনা?

উঃ যে পরকে দিয়ে কাজ করায় তাকে প্রযোজক এবং যাকে দিয়ে কাজ করান হয় তাকে প্রযোজ্য বলে। যেমন – রাম হাসে (মূল ক্রিয়া)। আর সে রামকে হাসায়-- এই বাক্যে প্রযোজক (ণিজন্ত) ক্রিয়া হচ্ছে 'হাসায়'। প্রযোজক কর্তা 'সে', প্রযোজ্য 'রামকে'। সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রেরণার্থ বোঝাতে 'ণিচ্' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় ; তাই প্রেরণার্থক ক্রিয়াকে ণিজন্ত ক্রিয়া বলে। বাংলায় 'ণিচ্' প্রত্যয়ের ব্যবহার নেই, তাই প্রযোজক ক্রিয়াকে ণিজন্ত ক্রিয়া না বলাই ভালো।

ক্রিয়া ও কাল

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াপদগুলি কি কি ?

উঃ গঠনের দিক থেকে ক্রিয়াপদকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায় —

(১) মৌলিক বা সিদ্ধ ক্রিয়া ঃ চলিব, করব, ডাকিবে ইত্যাদি।

(২) প্রযোজক/প্রেরণার্থক ণিজন্ত ক্রিয়া ঃ হাসাল, কাঁদাচ্ছে, শুনাইল,ইত্যাদি ।

(৩) নামধাতুজ ক্রিয়া ঃ উত্তরিল, রাঙাইব ইত্যাদি।

(৪) ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ঃ খাঁ-খাঁ করছে, হু হু করে ইত্যাদি।

(৫) সংযোগমূলক ক্রিয়া ঃ তামাশা কর, ডুব দে, নাম লেখাবে, ইত্যাদি ।

(৬) যৌগিক বা মিশ্র ক্রিয়া ঃ লেগে যা, বসে পড়, ভেসে চল, করে ফেল ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ অপূর্ণ বা পঙ্গু ক্রিয়া কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ এমন কিছু কিছু ধাতু আছে যাদের সাহায্যে ক্রিয়াপদগুলোর সর্বকালের রূপ পাওয়া যায় না। অন্য কোন ধাতুর সাহায্য নিয়েই এদের অসম্পূর্ণতা দূর করা হয়। এইসব অসম্পূর্ণ ধাতুকে অপূর্ণ বা পঙ্গু ধাতু বলে। যেমন — আছ্, বট্, যা ইত্যাদি। ধাতু বিভক্তিযুক্ত অপূর্ণ বা পঙ্গু ধাতুকে অপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বা পঙ্গু ক্রিয়া বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ ক্রিয়ার কাল কাকে বলে ? কয় প্রকার ও কি কি ?

ক্রিয়া-সংঘটনের সময়কে ব্যাকরণে বলা হয় ক্রিয়ার কাল। সময়ানুসারে ক্রিয়ার কালকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

যেমন — (ক) বর্তমান, (খ) অতীত (গ) ভবিষ্যৎ।

প্রশ্ন ঃ ঐতিহাসিক বর্তমান কাকে বলে ? একটি উদাহরণ দাও।

উঃ সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান কালের ক্রিয়াকে অতীত কালের অর্থে ব্যবহার করলে তার কালকে ঐতিহাসিক বর্তমান বলে।

যেমন — সম্রাট অশোক কলিঙ্গদেশ আক্রমণ করেন।

প্রশ্ন ঃ ক্রিয়ার কালের শ্রেণিবিভাগ কর।

ক্রিয়ারকাল

- মৌলিক কাল
  - নিত্য বর্তমান
  - নিত্য অতীত
  - নিত্যবৃত্ত অতীত
  - সাধারণ ভবিষ্যৎ
- যৌগিক কাল
  - ঘটমান বর্তমান
  - ঘটমান অতীত
  - ঘটমান ভবিষ্যৎ
  - পুরাঘটিত বর্তমান
  - পুরাঘটিত অতীত
  - পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বা (সম্ভাব্য অতীত)

প্রশ্ন ঃ উদাহরণ সহ যৌগিক বা মিশ্রকালের সংজ্ঞা দাও এর কয়টি রূপ ?

উঃ মূল ধাতুর উত্তর 'ইতে' বা 'ইয়া' যুক্ত অসামাপিকা ক্রিয়ারূপের সঙ্গে 'আছ্' ধাতুর সমাপিকা রূপ যুক্ত হয়ে যে সকল ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাদের কালকে যৌগিক বা মিশ্র কাল বলে। যেমন — দেখ্ + ইতে + আছে = দেখিতেছে। দেখ্ + ইতে + আছিল = দেখিতেছিল। দেখ্ + ইয়া + আছিল = দেখিয়াছিল। কারো কারো মতে যৌগিক কালের রূপ দশটি — ঘটমান বর্তমান, ইদানীন্তন অতীত, ঘটমান অতীত, তদানীন্তন অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ, নিত্যবৃত্ত বর্তমান, নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান, ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত এবং পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বা পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত, পুরাঘটিত সম্ভাব্য বা সম্ভাব্য অতীত।

প্রশ্ন ঃ ক্রিয়ার প্রকার বা ভাব কাকে বলে ? কয় প্রকার ?

সমাপিকা ক্রিয়ার কাজটি কিভাবে ঘটছে তা যে বিশিষ্ট বা ভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ করা হয়, সেই রীতিকে ক্রিয়ার ভাব বা প্রকৃতি বা প্রকার বা হয়।

বাংলায় ক্রিয়ার প্রকার বা ভাব তিন প্রকার — (১) নির্দেশক ভাব (২) অনুজ্ঞা ভাব (৩) সংযোজক বা আপেক্ষিক বা ঘটনান্তরপেক্ষিত ভাব।

সমাস

প্রশ্ন ঃ সমাস কাকে বলে ? কয়প্রকার ও কি কি ?

উঃ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা দুই এর অধিক পদকে এক পদে পরিণত করাকে সমাস বলে। সমাস শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল সংক্ষেপ। প্রচলিত ব্যাকরণে সমাস ছয় প্রকার — দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, বহুব্রীহি।

সমস্যমান পদ ধরে সমাস চার প্রকার —

(১) উভয় প্রধান — দ্বন্দ্ব সমাস

(২) পূর্ব পদ প্রধান — অব্যয়ীভাব সমাস

(৩) পরপদপ্রধান — তৎপুরুষ সমাস

(৪) অন্যপদ প্রধান — বহুব্রীহি সমাস

প্রশ্ন ঃ সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য কি ?

	সন্ধি	সমাস
(১)	বর্ণের মিল হল সন্ধি।	দুই বা ততোধিক পদের মিলনকে সমাস বলে।
(২)	সন্ধিতে অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে	সমাসে অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে বা নাও পারে।
(৩)	পদের অবস্থানগত পরিবর্তন সন্ধিতে হয় না।	সমাসে পদের অবস্থানগত পরিবর্তন হতেও পারে নাও পারে।
(৪)	পূর্ব পদের বিভক্তি সাধারণত	সমাসে বিভক্তি লোপই প্রধান লক্ষণ

লুপ্ত হয় না।

(৫) সন্ধির উদ্দেশ্য ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টি। আর সমাসের ক্ষেত্র অর্থবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বৃদ্ধি উচ্চারণের সুবিধা কিন্তু অর্থবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

প্রশ্ন ঃ নঞ তৎপুরুষ ও নঞ বহুব্রীহির দুটি বৈসাদৃশ্য লেখ।

উঃ ১. নঞ তৎপুরুষে পদটি কোন ভাব বা অবস্থাকে বোঝায় আর নঞ বহুব্রীহিতে ভাব ও অবস্থার পাশাপাশি গুণও বোঝায়।

২. প্রথমটিতে সমাসবদ্ধ পদটি পর পদানুসারে বিশেষণ কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সর্বদাই বিশেষণ।

প্রশ্ন ঃ নিত্য সমাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন ?

উঃ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলি নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই সমাসবদ্ধ থাকে তাকে নিত্য সমাস বলা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক পদ পদগুচ্ছের ন্যায় স্বাভাবিকভাবেই অবস্থান করে, এদের জন্যে আলাদা কোন ব্যাসবাক্য ব্যবহার করতে হয় না। কিন্তু পাশাপাশি অবস্থানকারী পদগুলি অর্থবোধের সম্পর্কযুক্ত। তাই বাংলাভাষায় এই সমাসটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন – কালসাপ – কালো রঙের সাপও হতে পারে। আবার কাল বা যমরূপী (মৃত্যু) সাপও হতে পারে। এক্ষত্রে পূর্বপদ ও পরপদ সম্পর্কযুক্ত।

শব্দের বর্গ নির্ধারণ

প্রশ্ন ঃ তৎসম শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ যে-সকল সংস্কৃত শব্দ তার লিখিত রূপকে অবিকৃত রেখে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের তৎসম শব্দ বলে। বাংলা ভাষা তার উপত্তিকাল থেকে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ গ্রহণ করে আসছে। আধুনিক কালেও এই ব্যাপার চলছে। বাংলা ভাষায় প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শব্দের মধ্যে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার শব্দই তৎসম শব্দ। তৎসম শব্দের উদাহরণ – সূর্য, চন্দ্র, জীবন, মৃত্যু, আকাশ, নক্ষত্র, মানব।

প্রশ্ন ঃ তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ তদ্ভব কথাটির মানে তদ্ অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে ভব অর্থাৎ উদ্ভুত। যে-সব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা অথবা সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত হয়ে প্রাকৃত, অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে তাদের তদ্ভব শব্দ বলে। তদ্ভব শব্দগুলিই খাঁটি বাংলা শব্দ। 'কৃষ্ণ' একটি সংস্কৃত শব্দ। এর প্রাকৃত রূপ কণ্‌হ এবং বাংলা রূপ কান। অন্যান্য উদাহরণ – সং – কর্ম > প্রা – কম্ম > বা – কাম।

প্রশ্ন ঃ অর্ধতৎসম শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ তৎসম শব্দগুলোকে অনেকস্থলে কিছুটা বিকৃত করে ব্যবহার করা হয়। এই শব্দগুলো তৎসম শব্দ থেকে পরিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ না করে সরাসরি বাংলা ভাষায় আসতে গিয়ে উচ্চারণগত বিকৃতি লাভ করেছে। অর্থাৎ উচ্চারণগত বিকৃতি থেকে এগুলো সৃষ্ট। এইরূপ বিকৃত তৎসম শব্দকে অর্ধতৎসম অথবা ভগ্নতৎসম শব্দ বলে। অশিক্ষিত ও গ্রাম্য মানুষের মুখেই সাধারণত এই ধরনের উচ্চারণ ঘটে থাকে। অর্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ — গিন্নী (< গৃহিণী)।

প্রশ্ন ঃ আগন্তুক শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ গ্রিক, তুর্কি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইতালি, ফরাসি , আরবি, ফারসি, চীনা, ইত্যাদি শব্দ থেকে যে শব্দগুলি বাংলায় এসেছে তাদের বিদেশি বা আগুন্তুক শব্দ বলে। যেমন — গ্রিক দম্ম > বাং দাম, তুর্কি — বিবি , চীনা — চা, আরবি — আইন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ দেশি শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ আর্যদের আগমনের আগে থেকেই ভারতে দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক প্রভৃতি অনার্যগণ বাস করত। বাংলা ভাষায় এই সব অনার্যজাতির ভাষা থেকে কিছু কিছু শব্দ প্রবেশ করেছে। এইসব শব্দকে দেশি শব্দ বলে। তবে এই সব দেশি শব্দ বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। যথা, প্রা — চঙ্গ > চাঙ্গা। প্রা — পেট্ট > পেট, প্রা— চট্টি > চাটা। প্রা —গোড্ড > গোড় , প্রা— খড্ডু > খাড়ু ।

প্রশ্ন ঃ সংকর শব্দ বা মিশ্র শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ বিভিন্ন ভাষার শব্দ,উপসর্গ, প্রত্যয় যোগে যে শব্দগুলি তৈরি হয় তাদেব সংকর শব্দ বা মিশ্র শব্দ বলে। যেমন , হেডপণ্ডিত ।ইংরাজি 'হেড' ও বাংলা ' পণ্ডিত' শব্দ যোগে তৈরি।

বিবিধ

প্রশ্ন ঃ 'পাষণ্ড' শব্দটি বর্তমান অর্থ কি ? — শব্দটির আদি অর্থ কি ছিল ? কোন্ ধরনের শব্দ পরিবর্তনের ফলে এমনটি ঘটেছে।

উঃ ' পাষণ্ড' শব্দের বর্তমান অর্থ হল 'অত্যাচারী'। শব্দটির আদি অর্থ ছিল ধর্ম সম্প্রদায়। এক্ষেত্রে শব্দটি অর্থ সংকোচ ঘটেছে । প্রথম অর্থ ধর্ম সম্প্রদায় > বিরুদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায় > বিরুদ্ধ ধর্মের উপাসক > ধর্মজ্ঞানহীন অত্যাচারী ।

প্রশ্ন ঃ 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' এটি কোন ধরণের শব্দার্থ পরিবর্তন ?

উঃ এটি সুভাষণ রীতির উদাহরণ। কারণ নিন্দিত বা অকল্যাণসূচক শব্দকে বর্জন করে তার জায়গায় কল্যাণবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ কবে কোথায় বাংলা ভাষা আন্দোলন হয়েছিল ? কারা শহিদ হয়েছিলেন ?

উঃ ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা আন্দোলন হয়। শহিদ হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এম.এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাখার শেষবর্ষের ছাত্র আবুল বরকত ; মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের আই.কম.-এর ছাত্র রফিকউদ্দিন আহমদ ; গফরগাঁও-এর কৃষক পরিবারের সন্তান আবদুল জব্বার। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আবদুস সালাম হাসপাতালে মারা গেলেন। এছাড়া রাজমিস্ত্রীর ছেলে ওয়াহিদুল্লাহ , রিক্সাচালক আবদুল আওয়াল শহিদ হয়েছিলেন।

নির্ঘন্ট

(শব্দসূচি)

আ